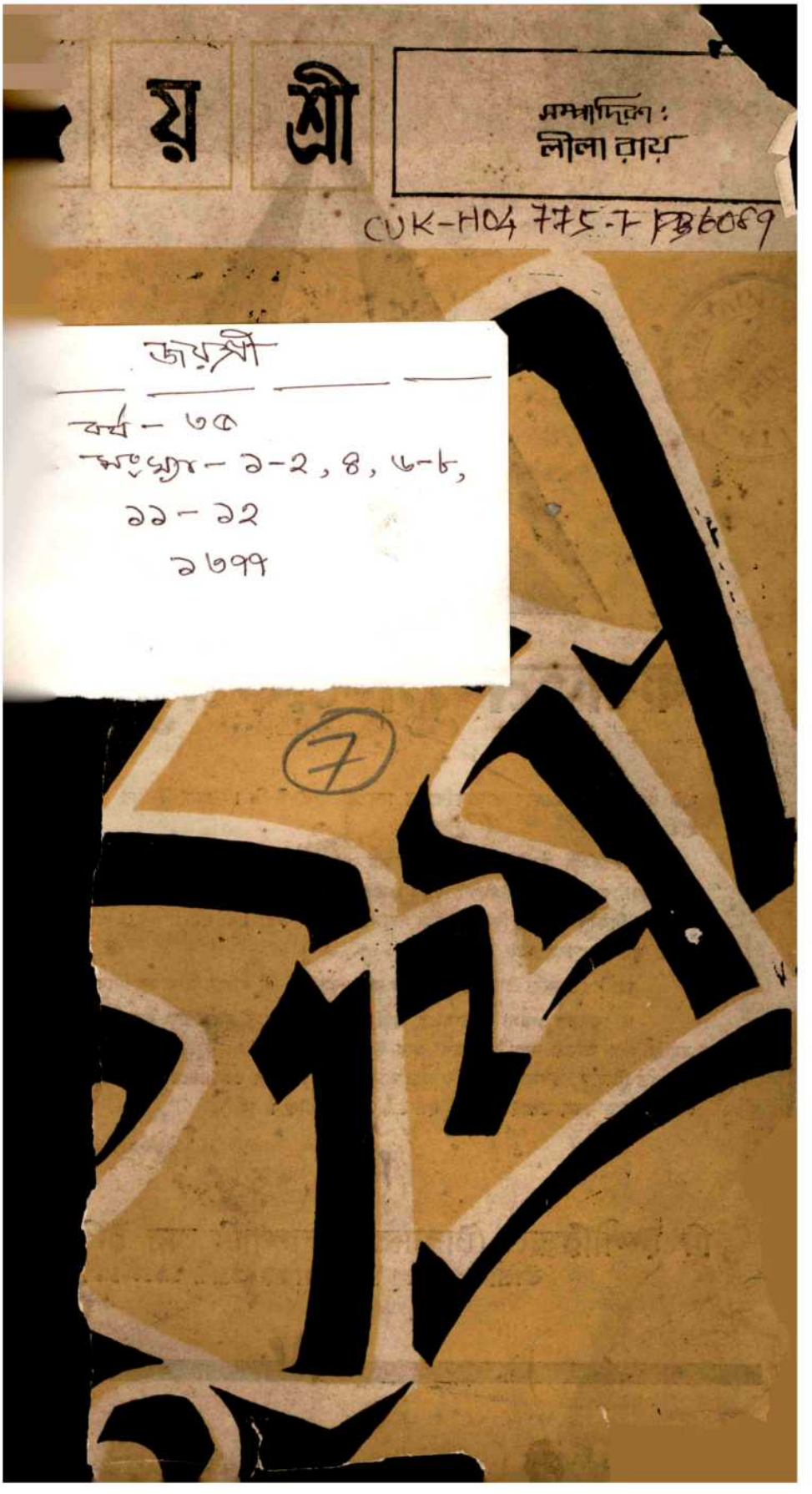


CUK-HQ 775-F FB6069

জয়শ্রী

বর্ষ - ৬৩

সংখ্যা - ১-২, ৪, ৬-৮,
১১-১২

১৩৭৭

# এক নতুন যুগ-এক নতু

ষাট বছর আগে এদেশে তামাকশিল্পের প্রবর্তক আই-টি-সি। আই-টি-সির
ইতিহাস।

ভার্জিনিয়া তামাকপাতার চাষআবাদ করা এবং রপ্তানিযোগ্য একটি প্রধা
তুলে ধরা, তামাকজাত উৎকৃষ্ট জিনিস তৈরি করা, গ্রামাঞ্চলের বাজারে ছড়ি
শিল্পাদির বিকাশ ঘটানো, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অ
সবার আগে থেকেছে আই-টি-সি।

অতীতের সেরা ঐতিহ্যকে মূলধন ক'রে আই-টি-সি সমানে সামনের দিকে

খরিদ্দারের পয়সা খরচ যাতে সার্থক হয় তার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া,
প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করা, গবেষণা আর উন্নয়ন মারফত নব নব উদ্ভাবনার আ
ক্রমাগত নিজের গুণমান উন্নত করার জন্যে সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে কোম্পানি
যে অগ্রণী ভূমিকা, তারই দ্যোতক হল এই নতুন প্রতীক।

**দি ইম্পীরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানি অব ইণ্ডি**

**কালকের পথিকৃৎ—আজকের অগ্রণী ১৯১০-১৯৭**

P 36,089

UNIVERSITY OF CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

## মহাপ্রয়াণ

উনত্রিশ মাস রোগভোগের পর গত ১১ই জুন বৃহস্পতিবার রাত্রি বারটা কুড়ি মিনিটে আমাদের
য়া দিদি, শ্রীযুক্তা লীলা রায় পি. জি. হাসপাতালের হার্ট ইউনিটের পাঁচ নম্বর ক্যাবিনে
ত হয়েছেন। চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, হাসপাতালের সেবাব্রতীদের নিরবচ্ছিন্ন সেবায়,
রিজন, সহকর্মী, অনুগামী, শুভানুধ্যায়ী এবং দেশবাসীর অব্যক্ত আবেগের পরিধি অতিক্রম করে
হাপ্রয়াণের মধ্যে সর্বস্বসমর্পণের যে সংগ্রাম দিয়ে তিনি তাঁর জীবনবেদ রচনা করেছিলেন,
নের পরিসমাপ্তিতে তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। জীবনব্যাপী সাধনার নিঃশঙ্ক-সংগ্রাম
ংগ্রামে সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে এক অলৌকিকত্ব দান করেছে। আজ তাঁ[illegible]প্রয়াণে
থেকে আমাদের বেদনার্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ীবন-মৃত্যুর সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ের দিনগুলিকে হাসপাতাল[illegible]
সংখ্যা জয়শ্রী প্রকাশে বিলম্ব হয়ে গেল। আশা করি আ[illegible]
ংশ্লিষ্ট সকলে আমাদের দুঃখভার লাঘব করবেন। আগ[illegible]
।

একদা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকাকে এক দুর্যোগের দিনে অন্তর দিয়েছিলেন,

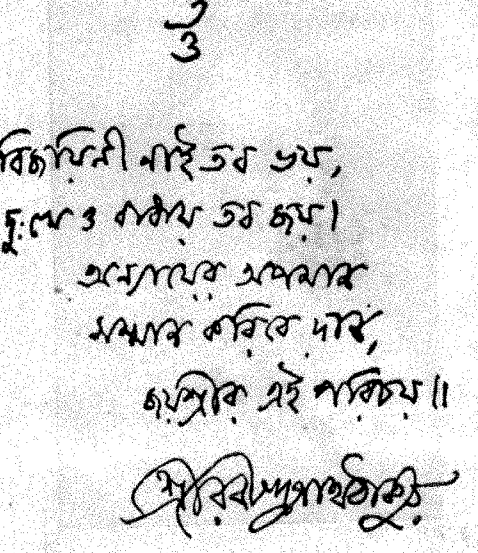

আমাদের এই দুর্যোগে আমরা কবিগুরুর সেই অভয়বাণীকে স্মরণ করে এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকার আশীর্বাদ নিয়ে অগ্রসর হবো।

১৩ই জুন, ১৯৭০

পরিচালক

# সূচীপত্র

## বৈশাখ—১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সুভাষবাণী | | ১ |
| বজ্রবাণী | | ২ |
| সম্পাদকীয় | | ৫ |
| ক্ষণজন্মা পুরুষ অরবিন্দ (রাজনৈতিক প্রবন্ধ) | কালীচরণ ঘোষ | ৯ |
| বিদেশী ঋণের পরিশোধ : জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন (প্রবন্ধ) | অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য | ১৭ |
| কবি-কাহিনী (কবিতা) | সুজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় | ২৫ |
| কবিতাগুচ্ছ : | দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| একদিন আমার আমার অগোচরে নিয়ে গেছো | | ২৭ |
| এক রাত্রি ঘুম | | ২৭ |
| এক অজানা জনের জন্য | | ২৮ |
| গাছের প্রতীক | | ২৯ |
| পুরানো মানুষদের ভূত | | ২৯ |
| দেখেছি রূপোবাহিনী নদীজলে | | ৩০ |
| একদিন আমাদের | | ৩১ |
| বাংলা ছোটগল্পের যানচিত্র : ৯ (প্রবন্ধ) | সুরজিৎ দাশগুপ্ত | ৩৩ |
| কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস) | মিহির মুখোপাধ্যায় | ৪৫ |
| সাহিত্যের লক্ষ্যহীন যাত্রা (আলোচনা) | বিজয় কুমার দত্ত | ৫১ |
| জাপানের দিনগুলি (ভ্রমণকাহিনী) | বারীন বর্ধন | ৫৭ |
| জাতীয়তার রূপায়ন (প্রবন্ধ) | দীপঙ্কর | ৬৩ |



সম্পাদনা : সুনীল দাস

সহযোগী সম্পাদক

# রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী

পাঠভেদ-সংবলিত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর অধিকাংশ রচনায় বার বার পাঠ-সংস্কার করেছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে সে কথা সুবিদিত, এবং এই সকল পাঠ-পরিবর্তনের পূর্ণ বিবরণ পেতে পাঠক আগ্রহান্বিত।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এই সকল পাঠ-সংস্কারের আনুপূর্বিক ইতিহাস রক্ষা করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন।

## সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ সন্ধ্যাসংগীত, যে 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।'

এই সংস্করণে বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তন সহ, বিভিন্ন কালে এই গ্রন্থ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে প্রকাশসূচী, বিভিন্ন প্রসঙ্গে সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে কবির মন্তব্যও সংকলিত হয়েছে।

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতার দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিচিত্রাদিতে সমৃদ্ধ। মূল্য ৭·০০ টাকা।

## ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। সন্ধ্যাসংগীতের ন্যায় এই গ্রন্থেও পাঠ-পরিবর্তন নির্দিষ্ট হয়েছে এবং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবির মন্তব্য ও বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থ থেকে বর্জিত কবিতাও সংকলিত হয়েছে; এছাড়া প্রথম সংস্করণ থেকে পদাবলীর রাগ-তাল, এবং শব্দের অর্থ সংকলিত হয়েছে। ১২৯১ শ্রাবণ সংখ্যা 'নবজীবনে' রবীন্দ্রনাথ বিনাস্বাক্ষরে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে যে ব্যঙ্গ-রচনা প্রকাশ করেছিলেন সেটিও এই সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৬·০০ টাকা।

---

## স্বরবিতান

সুরভেদ, পাঠভেদ ও ছন্দোভেদ সংবলিত সংস্করণ

| | |
|---|---|
| খণ্ড ১৩ ॥ ৪·০০ | খণ্ড ৩০ ॥ ৬·০০ |
| ১৪ ॥ ৩·০০ | ৪৬ ॥ ৩·৫০ |
| ২৩ ॥ ৩·০০ | ৪৮ ॥ ৬·০০ |

## বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

# ভারতী

৩৫ বর্ষ ০ প্রথম সংখ্যা ০ বৈশাখ ১৩৭৭

## সুভাষ-বাণী

"মিশর বা ব্যবিলন বা গ্রীসের মতো ভারতের প্রাচীন সভ্যতা মরে যায় নি। দু' বা তিন হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের মতো আজও আমাদের জীবনে মূলতঃ একই চিন্তা, একই জীবনের আদর্শ এবং একই অনুভূতির প্রভাব রয়েছে। অন্যথায় অতীতকাল থেকে আজকের দিনেও ভারতবাসীর জীবনে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। এরূপ অবিচ্ছিন্ন ধারা-বাহিকতা ইতিহাসের এক মৌলিক পরিচয়। গত তিন হাজার বৎসরে নতুন আদর্শ, সংস্কৃতি নিয়ে বাইরে থেকে বহুলোক এসেছে। এই সমস্ত নতুন প্রভাব, নতুন আদর্শ ও নতুন সংস্কৃতি ভারতের জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে আপন করে নিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে বহু হাজার বৎসরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা-বাহিকতা রয়েছে তথাপি কালের অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের পরিবর্তনও হয়েছে।"

( টোকিও বক্তৃতা )

# বজ্রবাণী

## মহাকাল

Men are born equal—একেবারেই ভুল কথা। Men are not born equal। Science পর্যন্ত একথা প্রমাণিত করছে, merit এর প্রাধান্য স্বীকার করতেই হবে। কোনো weightage নয়, Scheduled caste বলে চাকুরী দিতে হবে, সে সব আর নয়। Democracy : নিজেদের ঠাঁট বজায় রাখবার জন্য এ-সব ব্যবস্থা। Secularism ? জহরলালের master-রা এই বুলি শিখিয়ে গেছে। Secular বললে তো বলতে হয় ধর্মবিরোধী। জহরলালকে চেপে ধরেছিল নানা দিক থেকে তবে কি ধর্মবিরোধিতারই নাম secularism ? সব রাষ্ট্রের একটা State Religion আছে, যারা Democracy র কথা শিখিয়েছে তোমাদের, Mother of Parliament যাদের, তাদের তো democracyর পাশাপাশি State Religion Christianity বলতে বাধেনি। State Policy তাদের Christianity নয়। তবে জহরলালের বাধলো কেন State Religion Hinduism বলতে এবং State Policy Rule of Law বলতে? সবাই assured হতো, non-Hindu দের ওপর Hinduর ধর্ম চাপানো হবে না, theocratic state নয় এবং Hindu ধর্মের অনুশাসন দ্বারা State Policyও guided হবে না। জহরলাল বেগতিক দেখে রাধাকৃষ্ণন এদের দিয়ে ব্যাখ্যা করালো secularism মানে anti-religion নয়, ধর্ম্মনিরপেক্ষতা। তোতাপাখীর মত এসব বুলি শিখেছো তোমরা। আসলে ইংরেজরা যা শিখিয়ে দিয়েছে জহরলাল তাই বলেছে। ইংরেজরা বুঝেছে, আজ যদি secularism না বলানো যায়, তা হোলে divide and rule বজায় রাখা যাবে না এবং যদি ওদের দেখাদেখি State Religion Hinduism বলে ফেলে তাহোলে ভীষণ বিপদ..... ..... .....

জন্মের কথা স্মরণ আছে এমন লোকদের interview করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়। Scientifically প্রমাণিত হলেও ওদের পক্ষে স্বীকার করা বিপদ, church কখনই স্বীকার করতে পারবে না। তাহলে সমস্ত Christendon topple করবে।

* * * *

Courage of conviction থাকা চাই। তাহলে ওরা ভয়ও পাবে শ্রদ্ধাও করবে। Jomo Kenyatta কিছু দিন আগে একটা বই লিখেছিল। African, বিশেষ করে ওর দেশের manners, customs ইত্যাদিকে প্রবলভাবে Justify করে। ওতো বিলেতে পড়াশুনা করেছে। সে-সময় African-দের নিয়ে হাসি-তামাসা শুনতে শুনতে ওর কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকানরা অসভ্য, মেয়েরা প্রায় নগ্ন থাকে, চুল কামায়, ছেলেদের চুলগুলি খাড়া খাড়া, দাঁতগুলো উঁচু, মিশকালো ইত্যাদি। Kenyatta অবশ্যি দুই বিয়ে করেছে, বিলেতে থাকতে একজন ইংরাজ মহিলা, দেশে গিয়ে আবার একজন আফ্রিকান মহিলাকে। Kenyatta-কে ইংরাজরা দীর্ঘকাল জেলে রেখে অত্যাচার করেছে। কিন্তু Kenyattaকে দমাতে পারে নাই। সে ওদের দেশের manners এবং customs প্রতিটিকে দেখিয়েছে sociologically, geographically, climatically কতটা উপযোগী, মায় মেয়েদের প্রায়-নগ্ন থাকাটাকেও। তার জন্য Kenyatta লজ্জাবোধ করেনি। Kenyatta-র এই বইয়ের সমালোচনায় কেউ কোনো বিরূপ কথা লেখে নাই। বরং Kenyatta-র বিশ্লেষণ কে সমর্থন করেছে। Kenyatta-র ও সম্মান বেড়ে গেছে ওদের চোখে।

* * * *

India-র সব চাইতে বড় casualty হোলো আনন্দ। কারো মুখে আনন্দ নেই, সব গম্ভীর, sombre। Leader-রা সারা দিনরাত radioতে কতকগুলি sermon দিচ্ছে। Radio তে একটা প্রাণবন্ত Programme নেই, সব insipid. আর Leader-রা যার যার গলা শুনতে ব্যস্ত। কি craze অন্ধ অনুকরণের। যখন ওদেশে কিছু একটা discard করতে আরম্ভ করে তখন সেটার craze হয় আমাদের দেশে। T. V. সম্বন্ধে যখন ওদের দেশে নানা প্রশ্ন উঠেছে, research হচ্ছে, আমাদের দেশে T. V. craze শুরু হল। টাকা নেই, ইন্দিরা গান্ধী ১০০ কোটি টাকা sanction করিয়ে নিলো। এসব নিয়ে কেউ কিছু বলেও না। চোখের অসুখ, nerve-এর অসুখ, concentration নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। T. V. disease বলে এক ধরণের অসুখ দেখা দিয়েছে। অবশ্য T. V. Education-এর best media, সেই Educational programme যদি T. V. র সাহায্যে চালু করতো তবুও বুঝতাম।

* * * *

কত আর বিলেত, America ও France-এর অন্ধ অনুকরণ করবে তোমরা। জানো ওদেশের অনুকরণে দিল্লীতে Call Girl প্রথা চালু হয়েছে। Prostitution ছাড়া কিছু নয়। বিলিতি অনুকরণ, বিলিতি শিক্ষা আমাদের সর্বনাশ করেছে। Everyman is born equal, Demo-cracy ! সমাজে ওরা সব oppressed এই সব শিখিয়ে আমাদের whole society কে undermine করা হয়েছে। আমাদের বলা হয় নোংরা। Sanitation জানি না। আমাদের দেশে ছোট ছোট মেয়ে মা হয়, আমরা লেখা-পড়া জানি না ইত্যাদি। আমি challenge দিয়ে বলতে পারি এ সবগুলিই মিথ্যা। আমাদের দেশে ছোট ছোট মেয়েরা মা হয় ! আর ওদের দেশে ১১ বছরের মেয়েরা মা হয়েছে, ৮ বছরের মেয়েও হয়েছে, it is on record ! আমরা নোংরা ! ওদের দেশে great mass of unwashed are on move। এদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন হবে। Dustbin থেকে, রাস্তা থেকে, backyard থেকে নোংরা খুঁটে খুঁটে খাবার খায় এরা। এদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান নেই, current-এ move করছে। জামা কাপড় নেই, sanitation-এর ওরা বড়াই করে, আমি নিয়ে দেখাতে পারি বড় রাস্তা ছাড়া ভিতরকার রাস্তা-ঘাট কিরকম অপরিষ্কার, ময়লা, নর্দমার ওপর ন্যাকড়া, কাগজের টুকরো পড়ে আছে।

* * * *

Morality ? ওদের Health Report দেখে নাও—সিফিলিস, গণোরিয়ায় ছেয়ে গেছে—১৮ বছরের ছেলেরাও তার victim। ওদের মস্ত বড় headache এই moral health, তারপর unmarried mothersরা by law protection পায় hospital-এ bed পাবে ; সকলে ছুটি পাবে, তাদের নাম কেউ জানবে না। কি বলছ ? এরই নাম morality ?

ওদের public স্কুলে শেখায় নিজেদের দেশের সবই ভাল, আর আমাদের Public school-এ ওদের অনুকরণ করে।

আমি বলছি এই অন্ধ অনুকরণ এটা একটা abysmal shortsightedness। U. K.-ই তার কারণ। এমন attitude হওয়া উচিত নিজের দেশ সম্বন্ধে, বলতে হবে আমার দেশের বিষ্ঠাও অন্য দেশের চাইতে ভাল। এই অন্ধ অনুকরণের attitude thoroughly বদলাতে হবে।

নিয়ে যেতে পারবো না, না হলে দেখাতাম France এবং Russia-র upper society তে কিরকম ইন্দ্রিয় লালসা চলছে। তবে ওদের চোখ খুলছে। আগামী ১৫।২০ বছরের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রের মুখ্য মুখ্য জিনিষগুলি ওরা গ্রহণ করবে।

# সম্পাদকীয়

## বিজ্ঞপ্তি

আটাশ মাস উত্তীর্ণ হতে চললো শ্রীযুক্তা লীলা রায় পি, জি-হাসপাতালের ক্যাবিনে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন। দিনের হিসাবে ৮৪৬ দিন। গত ২রা মে বেলা বারটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত পর পর তিনবার convulsion হয়ে তাঁর অবস্থা গুরুতররূপে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। ইনজেকশন, অক্সিজেন ইত্যাদির প্রয়োগে ধীরে ধীরে সঙ্কট কেটে গেলেও, এবারকার convulsion-এর প্রকোপ সামলাতে বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। বর্ত্তমানে রক্তের চাপের ওঠানামার সঙ্গে শারীরিক অবস্থার উনিশ-বিশ চলছে।

বাইরের বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষার চেষ্টা এখনও ফলপ্রসূ হয় নাই।

রোজই বহু মহিলা ও পুরুষ বিকেলবেলা ক্যাবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে নীরব প্রার্থনা জানিয়ে যান। এঁদের অনেকেই কোনো না কোনো সময়ে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, কেউ বা দূর থেকে নাম শুনেছেন।

বিধাতার কাছে আমরা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিচালকমণ্ডলী

২৮শে মে, ১৯৭০ জয়শ্রী

## আর একটি নূতন বছর

জয়শ্রী বৈশাখে আর একটি নূতন বছরের যাত্রা শুরু করলো। জয়শ্রীর জন্মলগ্নের পর ছেচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও, বৈশাখ সংখ্যা থেকে জয়শ্রীর ৩৫-তম বছরের পরিক্রমা শুরু হলো। চরম দুর্যোগও যাকে নিরুদ্যম করতে পারে নাই, প্রতিকূল পরিবেশকেও মনের ঐশ্বর্য দিয়ে সূর্যালোকিত করে রাখবার যাঁর স্বভাবজ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছি, আমাদের সকল কর্মের উৎস ও আনন্দের নির্ঝর, জয়শ্রীর প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের আটাশ মাসের সংজ্ঞাহীন রোগশয্যায় জয়শ্রীর আর একটি নূতন বছর শুরু হলো। আমাদের গ্রাহক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী এবং বিজ্ঞাপন-দাতাদের আনুকূল্য দিয়ে গত আটাশ মাস যে-দায়িত্ব পালন করে এসেছি, এই নূতন বছরেও সে দায়িত্ব পালনে যেন উত্তীর্ণ হই,—বেদনার্ত মন নিয়ে এই প্রার্থনা জানাই।

## কাজী আবদুল ওদুদ

অবিভক্ত বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় একনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক দূত, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর মূর্তপ্রতীক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, কীর্তিমান প্রাবন্ধিক এবং মানব-দরদী কাজী আবদুল ওদুদ পরিণত বয়সে গত ১৯শে মে লোকান্তরিত হয়েছেন। কাজী

আবদুল ওদুদের সঙ্গে যাদের একবার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তারাই তাঁর চারিত্রিক প্রশান্তি এবং উদার ও সার্থক মানবতাবোধের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদের এই প্রকৃতি তাঁকে স্বকীয়তা দান করেছিলো এবং এই কারণেই বিভিন্ন রুচির লোকেরাও ওদুদ সাহেবের গুণমুগ্ধ এবং অনুরক্ত ছিলেন।

ওদুদ সাহেব এম, এ পাশ করবার পর ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার অধ্যাপনা শুরু করে অল্প-কালের মধ্যেই আপন মাধুর্যে ঢাকার শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতে মর্যাদার আসন গ্রহণ করেন। তাঁর অনুরাগী ছাত্রসমাজের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব নেন।

ওদুদ সাহেব অধ্যাপনার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনায় মন দেন এবং ১৯২৬ সালে দুই খণ্ডে তাঁর প্রথম প্রবন্ধের পুস্তক 'নবপর্যায়' প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া 'রবীন্দ্র কাব্যপথ' (১৯২৮) 'পথ ও বিপথ' নামক নাটক (১৯৫১) এবং 'বাংলায় জাগরণ' (১৯৫৬) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও রাজা রামমোহন সম্পর্কেও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ইংরেজীতে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক রচনার মধ্যে ধর্মগ্রন্থ কোরাণের বাংলায় অনুবাদ এবং বাংলায় হযরত মহম্মদের জীবনী অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপে ১৯৬৯ সালে তাকে 'শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার' দেওয়া হয়।

জয়শ্রীর সঙ্গে ওদুদ সাহেবের পরিচয় খুব অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ ছিল এবং জয়শ্রীর প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার একজন অনুরাগী সুহৃদ ছিলেন। জয়শ্রী তাঁর বহু লেখা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

## কলকাতার উন্নয়ন

অনেক পরিমাপ করে চতুর্থ পরিকল্পনায় কলকাতার উন্নয়নের জন্য ১৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী ৩৫টি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে চুলচেরা তর্ক সেই তৃতীয় পরিকল্পনার আমলেই সুরু হয়েছিল। দশবছর পূর্বে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে প্রেরিত মিশন তৃতীয় প্লানে কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে গভীর উপেক্ষা তীব্রভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। তারপরও কলকাতার উন্নয়ন কেবল প্ল্যান, প্রজেক্ট এবং স্কীমের মধ্যেই সীমিত রয়েছে এবং এই প্ল্যান, প্রজেক্ট, স্কীমের পাহাড়ও ক্যালকাটা মেট্রোপোলিটন প্ল্যানিং অর্গ্যানাইজেশন, ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের দাক্ষিণ্যে রচনা করে গেছে। কংগ্রেসী আমলে একবার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পি, এল, ৪৮০-র মজুত তহবিল থেকে কলকাতার উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সেদিন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কলকাতার জন্য সে-অর্থ ব্যয় করতে দেন-নাই। যুক্তফ্রন্টের আমলে কলকাতার উন্নয়নের আমরা কোনো প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করি নাই, কেবলমাত্র দেখা গেছে দ্বিতীয় হাওড়া পুলের উচ্চতা নিয়ে পোর্ট কমিশনার-দের সঙ্গে সরকারের বিরোধ চলেছে।

কলকাতার জল, ড্রেন, মাটির তলার নর্দমা, বস্তি, রাস্তা-ঘাট, পরিবহন এবং সর্বোপরি বেকার সমস্যা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কলকাতায় যে পরিমাণ বেকার, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের হার শতকরা ৪ থেকে শতকরা ১০-এ উন্নীত করতে হবে এবং সেই কারণেই লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু মূলধন কোথায়?

কলকাতার করপোরেশন প্রায় দেউলিয়া হয়ে গেছে, বেতনের দায় মেটাতেই উপার্জিত অর্থের শতকরা আশীভাগ যেখানে ব্যয় হয়ে যায়, সেখানে কাজের আশা সুদূরপরাহত। এ-ছাড়া, করপোরেশনের প্রশাসন, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং

দলীয় কোন্দলে একেবারে আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। কলকাতার উন্নয়নের জন্য সি, এম, পি, ও কে ঢেলে সেজে 'ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডিষ্ট্রিক্ট অথরিটিতে' রূপান্তরিত করা হবে। এই 'অথরিটি'ও "ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং ও স্যানিটেশন অথরিটি"র মতই প্রহসনে পরিণত হবে কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

প্রশাসনের অনিশ্চয়তার সঙ্গে অর্থসংগ্রহের অনিশ্চয়তা কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রেখেছে। বর্তমান বছরে কলকাতার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ২২ কোটি টাকার সঙ্কুলানও অনিশ্চিত রয়ে গেছে। এই অঙ্কের পাঁচ কোটি টাকা কেন্দ্র ঋণ দেবে, সাত কোটি টাকা ১৯৭০-৭১-এর বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বাজার ঋণ সাত কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে। আর অকট্রয় শুল্ক বসিয়ে আয়ের সাত-আট কোটি টাকার মধ্যে তিন কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা গেছে। কলকাতায় প্রবেশ শুল্কের পরীক্ষা নূতন, এতোদিন এই শুল্ক বসানোর কোনো চেষ্টা হয় নাই, কারণ বোম্বাই-এর দুইটি প্রবেশ পথের তুলনায় কলকাতার ১৭টি প্রবেশ পথে পাহাড়া বসাতে হবে। তাছাড়া, কলকাতায় যে পণ্য প্রবেশ করে, তার সবই কলকাতায় ব্যবহৃত হয় না। কলকাতা একটি আন্তঃরাজ্য বিতরণ-কেন্দ্র। প্রবেশ-কর বসালে কলকাতার বিতরণ-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিত হয়ে প্রবেশ শুল্কের আয় হ্রাস করে কলকাতার বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে পারে। তাছাড়া গোড়ায় এই সূত্রে দশ কোটি আয় ধরা হয়েছিল। সেই অঙ্ক নেমে ৭।৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এই আয়ের জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় ৫ কোটি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত 'লাভের ধন পিঁপড়ের নিয়ে' কত প্রকৃত আয় হবে বলা মুস্কিল। এ-ছাড়া সেই আয় দিয়ে কলকাতা এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির ঘাটতি মিটিয়ে অবশিষ্ট অংশ দিয়ে উন্নয়ন তহবিল পূরণ করা হবে। সুতরাং ২২ কোটি টাকার বরাদ্দ অনিশ্চিত। সেই হিসাবে গোটা ৪র্থ প্ল্যানে ১৫০ কোটির বরাদ্দও অনিশ্চিত, যদিনা কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র ঋণ না দিয়ে অনুদান বাবদও অর্থ বরাদ্দ করেন এবং পি, এল, ৪৮০র মত তহবিলের টাকা দিয়ে কলকাতার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেন। অন্যথায় বছর গেলে দেখা যাবে উন্নয়নের সোরগোলই সার—উন্নয়ন দূর অস্ত।

## সরকারী ব্যবসা

সরকারী শিল্প-ব্যবসায়ের যোগ্যতার বহর বছরের পর বছর সপ্রমাণ হচ্ছে। ৭৩টি শিল্প-ব্যবসায়ে—যেগুলি গড়ে উঠছে সেগুলি বাদে—১৯৬৮-৬৯ সালে ৭৭ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। গতবছরের চাইতে এই লোকসানের পরিমাণ ৯ কোটি টাকা কম। এই লোকসানের মাত্রার সব চাইতে সিংহভাগ বহন করছে হিন্দুস্তান ষ্টীল এবং তাদের লোকসানের মাত্রা ৩৯·৪২ কোটি টাকা। গতবছরের চাইতে এই লোকসানের পরিমাণ ৬৫ লক্ষ টাকা বেশী। এতো লোকসানের বহরের পরও পার্লামেণ্টে সরকারী তরফ থেকে বলা হয়েছে ১৯৭০-৭১ সালে সমগ্রভাবে সরকারী শিল্প-ব্যবসায় 'কিছুটা উন্নতি' দেখা যাবে। কিছুদিন পূর্বে হিন্দুস্তান ষ্টীলের সুবিধার জন্য সরকার টনপ্রতি ইস্পাতের দর ৭৫ টাকা বৃদ্ধি করেছে। এই দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও হিন্দুস্তান ষ্টীলের এই হাল। মাথাভারী ব্যয়, অযোগ্যতা, দুর্নীতি, ব্যয়সঙ্কোচ শ্রমিক-অসন্তোষ হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা না করতে পারলে কেবলমাত্র পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে এই দুর্বলতাগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে মাত্র, শিল্পের উন্নতি হবে না। অ-পুঁজিবাদী অর্থনীতি গঠনে রাষ্ট্রীয় শিল্প-ব্যবসার নীতিগত কিম্বা তত্ত্বগত অপরিহার্যতা থাকলেও প্রয়োগিক অপঘাতে তার মূলে আঘাত করা হচ্ছে। ফলে পরোক্ষে পুঁজিবাদেরই পোষকতা করা হয়। যদিও রাষ্ট্রীয় শিল্প-ব্যবসার ফলে আর্থিক কাঠামোর গুরুতর পরিবর্তন ইতিমধ্যে সাধিত হয়েছে।

## দাক্ষিণ্যের অন্তরালে

কয়েকদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন প্ল্যান-বহির্ভূত ঘাটতি মেটাতে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও পশ্চিম বঙ্গের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এই নয়টি রাজ্যে চতুর্থ পরিকল্পনায় ৮০০ কোটি টাকা প্ল্যান-বহির্ভূত ঘাটতি হবে এবং ১৯৭০-৭১ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৭৩.১২ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে এই ঘাটতির জন্য অতিরিক্ত বাজেটে ২৭৫ কোটি টাকা মঞ্জুরী নেওয়া হয়ে গেছে এবং এই দুই বছরের মঞ্জুরীর যোগ ফল ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ৮০০ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়ে গেছে। অবশিষ্ট তিন বছরে প্ল্যান-বহির্ভূত ঘাটতি মেটাবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর হাতে থাকবে ৩৫০ কোটি টাকা।

এই ব্যয় বরাদ্দ একেবারে অভূতপূর্ব। রাজ্যগুলিকে বিশেষ সাহায্যদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতে তার বিবেচনা-সাপেক্ষ ব্যয়ের বিধানে একদিকে যেমন সাংবিধানিক ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হয়েছে, তেমনি দাক্ষিণ্যের আড়ালে রাজনৈতিক অনাচারের পথ সুগম করে রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, যেখানে নানা দল ও নানা আঞ্চলিক গোষ্ঠির উপর তার সরকার নির্ভরশীল, সেখানে এই অর্থের কৌশলী বণ্টনের মধ্য দিয়ে সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টা হোতে পারে। সংবিধানের ২০৬ (২) ধারায় স্পষ্টই বলা আছে প্রতিটি বরাদ্দের জন্য পৃথক বিস্তৃত আনুমানিক হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেকটি বরাদ্দের অন্তর্বর্তী পৃথক পৃথক ব্যয়ের খাতেরও বর্ণনা থাকবে। এই বরাদ্দের দাবী লোকসভায় উত্থাপনের সময় কোন কোন রাজ্য এই বরাদ্দ পাবে, সাহায্যের নিরিখ কি হবে, কাকে কত দেওয়া হবে এবং সাহায্যের পরিমাণ কে নির্ধারণ করবে —এ-সবই উহ্য রেখে সংবিধানের ২০৬(২) ধারাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়েছে। এই বরাদ্দের ফলে ঘাটতি রাজ্যগুলিকে ঘাটতি বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা হবে কি না, ফেডারেল কাঠামোর উপর অনভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করা হবে কি না —এই প্রশ্নগুলি সঙ্গতভাবে দেখা দেবে। এই বিশেষ বরাদ্দের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিগুলির জবাবে প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা যেমন অস্পষ্ট, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক। তার মতে যে সব রাজ্য ঋণের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য অর্থসঙ্কটে ভুগছে, যাদের ঋণ ও সুদের পরিশোধ্য ক্রমের পুনর্বিচারের প্রয়োজন এবং যাদের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন, তাদের জন্য এই তহবিল রাখা হোলো। আসলে ফাইনান্স কমিশনের এক্তিয়ার এড়িয়ে, বাজেটের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে, সমর্থকদের পোষকতা করবার জন্য এই ব্যবস্থা কি না সে-সম্পর্কে গুরুতর সংশয় রয়েছে। দাক্ষিণ্যের আড়ালে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের এ-এক কৌশল, এ সংশয় দূর হবার নয়। এই তহবিলের নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু প্রয়োগই তা দূর করতে পারবে।

## অরাজকতার তাণ্ডব

গোটা মে মাসে পশ্চিম বাংলায় অরাজকতার তাণ্ডব গুরুতররূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিনই হয় কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, নয়তো কলেজে, স্কুলে কিম্বা পরীক্ষার হলে, সরকারী অফিসে, বেসরকারী লোকের ব্যক্তিগত গৃহে, সরকারী দপ্তরে, সরকারী কর্মচারীদের বাড়ীতে অথবা পুস্তকের দোকানে অব্যাহত দৌরাত্ম্য চলেছে। এর উপর বোমা বিস্ফোরণ, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার, বোমা-আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার পাশাপাশি চলেছে। যেখানেই আক্রমণের উদ্দামতা দেখা দিয়েছে, সেখানে বিস্তর সম্পত্তিও ধ্বংস হয়েছে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি- স্কুল, কলেজ তার সাক্ষ্য বহন করছে। হাবড়া থানার অশোকনগরে গুলি বিনিময়ের ফলে গত ১৭ই মে

( শেষাংশ ২৩ পৃষ্ঠায় )

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস
ধারাবাহিক রচনা

# বিস্ফোরণ

কালীচরণ ঘোষ

## আলিপুর মামলার মধ্যমণি—শ্রীঅরবিন্দ

আলিপুর বোমার মামলা সম্পর্কে বলতে গেলে সর্ব্ব প্রথমেই শ্রীঅরবিন্দর কথা মনে আসে। তাঁকে কেন্দ্র করেই মামলা,—সরকারের পক্ষে একাগ্র চেষ্টা, জব্দ করা আর দেশবাসীর পক্ষে একমাত্র কামনা তাঁকে সকল বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।

কেবল আলিপুর মামলা কেন, বাঙলার সামগ্রিক বিপ্লবের মধ্যমণি হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর কথা পূর্ব্বে নানা স্থানে উল্লেখ করতে হয়েছে কারণ তাঁকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের ইতিহাস লেখাই অসম্ভব। তাঁকে ঘিরে প্রথমে যে চক্র গড়ে উঠেছিল সেইটাই ক্রমে বিরাট রূপ পরিগ্রহ করেছে।

দণ্ডিত অবস্থায় ইংরেজের জেলে বাস তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না। এর অবশ্যম্ভাবিতা সত্ত্বেও বিধির বিধানে তিনি মুক্ত অবস্থায় কাটিয়েছেন। বিচারাধীন আসামীর কারবাস তাঁর ভাগ্যের লিখন মাত্র।

মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ১৯০৮ মে ২-রা তাঁর ৩৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট বাসায় পুলিশ গিয়ে আবির্ভূত হয়। ভোর পাঁচটায় হোমরা চোমরা পুলিশ সাহেব, ধূর্ত্ত শঠ পদস্থ বাঙালী পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, থানা-তল্লাসীর সাক্ষীতে তাঁর শয়নের ক্ষুদ্র ঘরটি ভরে উঠলো। অরবিন্দ বলছেন "হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামান সহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিয়াছে। তল্লাসীর বড়কর্ত্তার হুকুমে অরবিন্দর হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি পড়ল। ঘণ্টাখানেক বাদে সে দড়ি খুলেও নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ পুঙ্গবের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, "তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন। যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট আইনভঙ্গকারী। আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

খানাতল্লাসী সাড়ে পাঁচটায় আরম্ভ হয়ে প্রায় সাড়ে এগারোটায় শেষ হয়। "বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায় কিছুই এই সর্ব্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না।" (অরবিন্দ : কারাকাহিনী ১৩৭৩, পৃঃষ্ঠা ৪)

গ্রেপ্তারের পর কদিন লালবাজার ও রয়ড ষ্ট্রীট থানা ঘুরে মে ৫-ই অরবিন্দ আলিপুর জেলে পৌঁছান। আগে থেকেই তাঁর জন্য নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি পার হয়ে জজ বীচক্রফ্‌টের কোর্টে মামলা চলছে। বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এক প্রকার নিশ্চিৎ যে তাঁর দীর্ঘ কারাবাস হবে। তা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টের আশঙ্কা ছিল যে যদি অরবিন্দ মুক্তি পান

তা হলে সমূহ বিপদ। সরকার মনে করতো অরবিন্দ যে "Undoubtedly the leader of the whole movement"—সমস্ত (বৈপ্লবিক) আন্দোলনের তিনিই নায়ক। ছোটলাট বাহাদুর "has no doubt....that he is the master mind at the back of the whole extremest campaign in Bengal."

—তিনিই বাঙলার উগ্র রাজনীতির মন্ত্রণাদাতা। অন্যান্য সকল আসামী দণ্ডিত হয়েও যদি একা অরবিন্দ মুক্তি পান তাহলে আবার দল গড়ে উঠবে, আবার ঝামেলা জুটে যাবে। এ মামলায় মুক্তি যদি কপালে থাকে তাহলে তাঁকে অন্ততঃ বাঙলার ১৮১৮ সালের ৩ আইনে আটক রেখে দিতেই হবে।

আইনের দোহাই পেড়ে তাঁকে কয়েদ করবার চেষ্টা বারে বারে বিফল হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্' রাজদ্রোহ মামলায় তিনি রক্ষা পেলেন, সাজা হয়েছিল মুদ্রাকর অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বসুর।

আলিপুর মামলায় ১৯০৮ মে ৫-ই থেকে আলিপুর জেলে তাঁর কারাবাস আরম্ভ। পরবৎসর মে ৬-ই তিনি নিষ্কৃতি পান। তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ় ধারণা ছিল যে তিনি নিশ্চিৎ মুক্তি পাবেন। এ সম্পর্কে ধরা পড়ার পর পঞ্চম দিনে আদালতককে তিনি আত্মীয়কে বলেন "বাড়ীতে ব'ল কোন ভয় যেন না করে, আমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হবে।" (কারাকাহিনী পৃঃ ১২)

এ বিশ্বাসে তিনি অটুট ছিলেন। তাঁকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য আলিপুর মামলা সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও কৌঁসুলী চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি। তাঁর সম্পর্কে কবি বলেছেন

"দেবতার দীপ হস্তে আসিল যে ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার,
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।....."

অরবিন্দকে দণ্ডিত করবার জন্য কত হীন প্রচেষ্টা হয়েছে তার তুলনা ইংরেজের বিচার বিভাগে ভারতে-ও অতি বিরল। যখন পুলিশ হাল চাল লক্ষ্য করে বেশ বুঝতে পারল আসামী নরেন গোঁসাইকে "হাত" করা যেতে পারে, তখন সুযোগ ও সুবিধামত তার কাছে কেবল স্বীকারোক্তি নয়, তাকে রাজসাক্ষী খাড়া করবার ব্যবস্থা হয়।

১৯০৮ মে ২৯-এ নরেন্দ্র এক পুলিশ কর্ত্তাকে জানায় যে তার বন্ধুরা তাকে প্রতারণা করেছে; সুতরাং অকপটে সে সমস্ত গুপ্ত কথা গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দেবে। মামলায় অপরাধ পাকা করবার জন্য যে সকল তথ্য প্রয়োজন পুলিশ, বলে দিলে নরেন তোতাপাখীর মত সে সকলের পুনরাবৃত্তি করে। আদালতে তার বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হবার ব্যবস্থা করা হ'লো।

রাজদ্রোহ এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রমাণিত হ'লে দীর্ঘ সশ্রম কারাবাস ত আছেই, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হওয়া নিতান্ত ব্যতিক্রম নয়। সে কারণে নরেন ঐ ২৯ তারিখেই বলে যে ভারতকে বিদেশীর হাত থেকে মুক্ত করাই তাদের সমিতির উদ্দেশ্য এবং তার জন্য রাজনৈতিক খুন জখম দ্বারা শাসক সম্প্রদায়কে ভয় দেখিয়ে ভারত ত্যাগ করানোই প্রধান লক্ষ্য। আরও অনেক কথা সে বলে, কিন্তু এতে ত অরবিন্দ সাক্ষাৎভাবে আসছেন না। তাইতে পরে তার উক্তি, অরবিন্দই দলের নেতা এবং তিনিই সমস্ত অর্থ সরবরাহ করতেন।

১৯০৮ জুন ২৩-এ (পলাশীর যুদ্ধের তারিখ) হাকিম বার্লি সাহেব সমস্ত বিষয় সত্য বলবার আশ্বাসে নরেন্দ্রকে অপরাধ মুক্ত (tendered pardon) ঘোষণা করে বাদী অর্থাৎ সরকার পক্ষের সাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

প্রথম দিনের জবানবন্দীতে সে কেবল অরবিন্দ নিয়েই তথ্য পরিবেশন করতে থাকে। অরবিন্দকে সে ভাল রকম চেনে। প্রায়ই (রাজা) সুবোধ মল্লিকের বাড়ী এবং "বন্দে মাতরম"

অফিসে দেখেছে। সমিতির খরচ পত্র বিষয়ে অরবিন্দ তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। পূর্ব্বে গোপন বিবৃতিতে বলেও (যার আইনতঃ সাক্ষ্য হিসাবে কোনো মূল্য নেই) এবার সরকারী সাক্ষী হিসাবে বলেছিল যে রংপুরে ডাকাতি করবার জন্য অরবিন্দ খরচ ও কার্ত্তুজ দিয়েছিলেন, ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে অপর আসামীদেরও জড়িয়ে যাচ্ছে। নাচের পুতুল, তারে যেমন টান পড়ছে, সেই রকম নাচছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিবৃতি চলছে। জুন ২৪ ও ২৯ গেল; জুলাইয়ের ৩-রা এলো।

নরেন্দ্র সমানে এজেহার দিয়ে চলেছে। প্রথমে বল্লে, অরবিন্দর হাতের লেখা চেনে না। পরে, বল্লে ঠিক চেনে না। তারপর, চিনলেও চিনতে পারে; আর তার পর মুহূর্ত্তেই যখন কতকগুলো কাগজ চিঠি দেখিয়ে সরকারী কৌঁসুলী প্রশ্ন করলেন "কার এ হস্তাক্ষর?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর "অরবিন্দর।"

বেশ কথা। কিন্তু সরকারী নথি-পত্রের মধ্যে একটা চিঠি আছে যা আজও "sweets letter" বলে ঐতিহাসিকদের নিকট পরিচিত—সেখানে "sweet" অর্থাৎ মিষ্টান্ন কথাটার একটা সদর্থ করা দরকার—কারণ অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও বোমা একসঙ্গে জড়িয়ে পড়বে—অরবিন্দর নিষ্কৃতি নাস্তি। চিঠিটার বয়ান এই—

"Bengal Camp Near Ajit's

20th December 1908

Dear Brother,

Now is the time. Please try and make them meet for our conference. We must have sweets all over India ready made for emergencies. I wait here for your answer.

Yours affectionately,

Barindra Kumar Ghosh"

এই "sweets" এর ব্যাখ্যা জুলাই ৩-রা পুলিশ নরেনকে দিয়ে করিয়ে নেয়। নরেন বলছে "আমাদের সমিতিতে "সুইট" (মিষ্টান্ন) মানে বোমা বোঝাত; বোমাকে আমরা 'রসগোল্লা'ও বলতাম।"

এই দিনের পর নরেন জুলাই ১৩ ই. ২৯-এ এবং আগষ্ট ১৪ ই এজেহার দেয়। বুঝতে কষ্ট হয় না এ কয়দিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে যা বলেছে তাতে ফাঁসি থেকে "কালাপানি" হওয়ার নিশ্চয়তা প্রায় ষোলো আনা।

এই "মিষ্টি চিঠি" খানি, যদি নরেন্দ্র জীবিত থেকে জেরার দাপট কাটিয়ে উঠতো তা হলে অরবিন্দর মুক্তির কোনো সম্ভাবনা থাকতো না। অরবিন্দর ভাগ্য-দেবতা এমন কলকাঠি নাড়লেন যে সত্যেন-কানাইকে "নিমিত্ত মাত্র" খাড়া করে অসংখ্য ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়ে দিলেন, "আমি আটক থাকবো না, নিশ্চয়ই মুক্তি পাবো।"

চিঠিখানা যে কত বড় শয়তানীর পরিচয় তা আর বলবার নয়। তখন দুই ভাইই এক সঙ্গে সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত। দেখা শোনা ইচ্ছা মাত্রেই করা যায়, কোনো বাধা নেই। সম্বোধন ভাগ "প্রিয় ভাই"। চিত্তরঞ্জন দাশ সওয়ালেতে বলেছিলেন যে বাঙলা দেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখতে হলে,— কয়েকজন বড় ভাইদের মধ্যে লিখে থাকে— 'প্রিয় মেজদা, সেজদা'। ছোট ভাই পুরো নাম লিখে চিঠি শেষ করে না, যে চিঠির এত গুরুত্ব, তাকে সঙ্গে করে কেউ বেড়ায় না, কাছেও রাখে না। জজ বীচক্রফ্‌ট শেষ পর্য্যন্ত চিঠিটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দেন। অরবিন্দ রক্ষা পেয়ে যান।

অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। বিশ্রাম নেই, সভাসমিতিতে যোগ দান, বক্তৃতা করা এবং সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। ইংরাজি, কর্ম্মযোগিন্ আর বাঙলা

"ধর্ম্ম"। দুবার ফসকে গেছে বলে পুলিশ নিরুৎসাহ হয়নি। ওঁত পেতে বসে আছে কখন ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়বে।

খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯০৯ ডিসেম্বর ২৫-এ কর্ম্মযোগিন্ পত্রিকায় "আমার দেশবাসীর প্রতি" ("To my Countrymen") প্রবন্ধ ছাপা হবার পর গভর্ণমেণ্ট তাতে রাজদ্রোহের গন্ধ আবিষ্কার করে তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ফাঁদ পেতেছিল, যাতে আসামী উধাও হতে না পারে।

তাঁর কাছে এ সংবাদ পৌঁছুতে তিনি পত্রিকায় "My Will and Testament" (আমার শেষ ইচ্ছা সঘলিত দলিল) বলে ছাপিয়ে দেন। পরে তিনি সংবাদ পান যে তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ("It had served its purpose"—Aurobindo on himself : p 94). কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে রকম কিছুই হয়নি। গভর্ণমেণ্টের মত যথা পূর্ব্বং সেই রকমই আছে ; অরবিন্দ জেলের বাইরে থাকলেই গোলমাল পাকিয়ে উঠবে।

যখন অবস্থা বেশ ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে, তখন অরবিন্দর অন্তর্য্যামী তাঁকে চন্দননগরে যেতে আদেশ করলেন। তিনি আর কোনো দিকে মন না-দিয়ে, অযথা কালক্ষেপ না করে মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে নৌকাযোগে চন্দননগর চলে যান ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১৫ ই। চন্দননগরে তাঁর অবস্থান কাল মার্চ্চ ৩১-এ পর্য্যন্ত। শ্রীমতী উষা মুখার্জ্জি ১৯১০ এপ্রিল ১৭ ই তারিখের এক পুলিশ রিপোর্ট উদ্ধৃত করে (Pebple's Path, September 1968. p. 55) বলেছেন যে মার্চ্চ ৩১-এ অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ মিত্র এবং তাঁর সহচর বিজয় নাগ বি. সি. ভৌমিক বলে ছদ্মনামে পুলিশকে বোকা বানিয়ে ডুপ্লে জাহাজে পণ্ডিচেরীর পথে রওনা হন। তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌঁছানর তারিখ (১৯১০) এপ্রিল ৪-ঠা বলে জানা গেছে।

ফরাসী রাজ্যে গিয়েও তিনি নিস্তার পাননি। শ্রীসুধীর কুমার সরকার আলিপুর বোমার মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী আবার শ্রী অরবিন্দর সঙ্গে পণ্ডিচেরী আশ্রমে কালযাপন করেছেন। তিনি নানা তথ্য উল্লেখ করে বলছেন বারে বারে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কখনও তা সফল হয় নি। সুধীরদা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেগুলি পাঠে প্রকৃত অভিসন্ধি প্রকাশ পাবে। তৎপূর্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের সদাশয়তার একটু নমুনা চাটনির মত নিতান্ত মন্দ লাগবে না।

শ্রীঅরবিন্দ মাস ছয়েক পণ্ডিচেরী বাসের পর ভারত সরকার বোধ হয় বুঝলে যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনমার্গে চলেছেন। তাঁর নিকট হতে আর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। ১৯১০ নভেম্বর ২১-এ গভর্নমেণ্ট এক ইস্তাহার জারি করে। তার মূল কথা ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৮৭ ও ৮৮ ধারা অনুযায়ী অরবিন্দর বিপক্ষে কর্ম্মযোগিন্-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে রাজদ্রোহের অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হচ্ছে এবং প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকাভুক্ত আসামীর যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা আছে সে সব তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হচ্ছে।

এই বার সুধীরদা যা লিখেছেন তার কথা বলা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌঁছবার পর কিছু দিন বাদে জাহাজে মাল সরবরাহকারী (stevedore) এক ফরাসী শ্রীঅরবিন্দকে ফরাসী জাহাজে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সে লোক যে ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রেরিত সেটা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। যখন কথাটা বেশ জানাজানি হয়ে পড়ে তখন সাথীরা তাঁকে অন্য একটা বাসায় চলে যেতে পরামর্শ দেন। আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। বিপদও আর কিছু ঘটে নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ বেধেছে : চারিদিকে হৈ চৈ। শ্রীঅরবিন্দর যতটুকু সীমিত স্বাধীনতা আছে সেটাও ইংরেজ রাজশক্তি ভয়ের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করে এবং তাঁকে

নিজেদের সম্পূর্ণ এক্তিয়ারের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়। সেই মহযুদ্ধেশ্যে ভারতে ইংরাজ সরকার উচ্চপদস্থ এক বিশেষ বার্তাবহ পাঠিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে দার্জিলিঙে "রাজার হালে" রাখবার লোভ দেখান। বলা বাহুল্য, ইংরেজের সে চেষ্টাও ফলবতী হয়নি।

এততেও যখন হলো না, তখন কূটবুদ্ধি ইংরেজ মিত্রশক্তি ফরাসীকে বিশেষ জিদ ধরে এবং অরবিন্দকে পণ্ডিচেরী থেকে নিষ্ক্রান্ত করে দিতে বলে। তারা বলে ভারতবর্ষ থেকে বাইরে ফরাসী অধিকৃত যে কোনো অঞ্চলে সরিয়ে না দিলে যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। ফরাসী সরকার এ নীচ বৃত্তি অবলম্বন না করে কিছুটা আত্মসম্মানের পরিচয় দিয়েছিল।

যদিও বিপ্লবের দর্শন, ইতিহাস, গতি, প্রকাশ ভঙ্গী নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখছিলেন বেশ কিছু দিন আগে থেকে, কিন্তু ১৯০৬-এর আগে তিনি হিংসাত্মক আন্দোলন কেন, কোনো রাজনীতিতেই অংশ গ্রহণ করেন নি। তিনি ব্রিটিশভারত ত্যাগ করলেন ১৯১০-এর এপ্রিলে। এই স্বল্পকালের মধ্যে দেশকে যে নাড়া দিয়ে গেলেন, জাতির সম্বিত এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন যে যুবকের দল সকল নির্য্যাতন উপেক্ষা করে প্রায়ই শূন্য হাতেই প্রচণ্ড যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ গৌরব আর কোনো নেতার ভাগ্যে জোটেনি, এ দেশেত নয়ই, বিদেশেও এর নজির পাওয়া কঠিন।

তাঁর উত্তরকালের আধ্যাত্মিক জীবন বর্তমানে আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এ ক্ষেত্রেও তাঁর যে বিরাট, অবদান তা বোঝবার জন্য ভবিষ্যৎ মানবকে অভিনিবেশ সহকারে চর্চা করতে হবে।

অতীত ভারতের শ্রেষ্ঠ ঋষিদের পথে যে নূতন যোজনা করে গেছেন সেটা তাঁর মত ক্ষণজন্মা মানবের পক্ষেই সম্ভব।

## পরিশিষ্ট

শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ লেখার সুযোগ আমার জীবনে আর হবে বলে মনে হয় না। অতএব, কষ্টে অর্জিত শ্রীঅরবিন্দ লিখিত একখানি পত্রের অনুলিপি এখানে মুদ্রিত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না যে এমন নিপুণ আত্মবিশ্লেষণ কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তদ্ব্যতিরেকে ভ্রাতা বারীন্দ্রের যে চরিত্র চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন সেটা তাঁর তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয়। ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গী এত যে গূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত অনুবাদ করতে গিয়ে তার সৌন্দর্য্য বহুলাংশে বিঘ্নিত হবে বলে আশঙ্কা আছে। দুই ভ্রাতার পরিচয় সম্বলিত অংশ ইংরেজি ভাষাতেই দিলাম। যাঁরা ঐ ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরা হয়ত বুঝবেন এ ভাষা শিখে রাখতে পারলে হিন্দীর চেয়ে বৃহৎক্ষেত্রের জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করতে পারা যাবে। পত্রটি এইরূপ :—

"Calcutta, June 8th 1906.

'My dear Father-in-law,

* * * *

I am afraid I shall never be god for much in the way of domestic virtues. I have tried very ineffectively to do some part of my duty as a son, a brother and a husband, but there is something too strong in me to subordinate everything else to it. Of course, that is no excuse for my culpability in not writing letters, a fault I am afraid I shall always be quicker to admit than to reform. I can easily understand that to others it may seem as to spring from a lack of the most ordinary affection. It was not so in the case of my father from

whom I seem to inherit the defect. In all my fourteen years in England, I hardly got a dozen letters from him, and yet I cannot doubt his affection for me, since it was the false report of my death which killed him. I fear you must take me as I am with all my imperfections on my head.

* * *

"Barin has again fallen ill and I have asked him to go out to some healthier place for a short visit.....If he goes (to you) I am sure you will take good care of him for the short time he may be there. You will find him, I am afraid, rather wilful and erratic, the family failing. He is especially fond of knocking about himself in a spasmodic and irregular fashion when he ought to be sitting at home and nursing his delicate health. But I have learnt not to interfere with him in this respect; if checked, he is likely to go off at a tangent and make things worse.

* * * *

Your affectionate
son-in-law
Aurobindo Ghose"


## অনিল রায়ের

## সময়োপযোগী দুইটি বই

**সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০**

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০**

( তৃতীয় সংস্করণ )

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।**

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপরে স্বদেশ সত্য

তাহার উপরে নাই

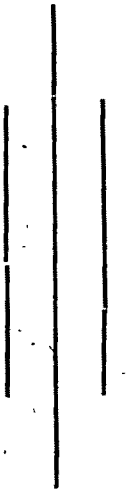

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

কলিকাতা-৯

যে কোনো
উপলক্ষে
অনবদ্য উপহার

# ইউবিআই গিফ্‌ট চেক

শুভ পরিণয়, জন্মদিন, নববর্ষ, শারদীয়া পূজা, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ কি অন্য যে কোনো উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন **ইউবিআই** গিফ্‌ট চেক। দেখতে ভারি সুন্দর —চেক ও চেকের ফোল্ডার দুটিই নজর কেড়ে নেবে।

ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকলেও চেকে আপনি সই করতে পারবেন।

এবার থেকে উপহার দিন **ইউবিআই** গিফ্‌ট চেক।

## ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস :
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি কলিকাতা-১

naa/UBI/9-69 Ben

# বিদেশী ঋণের পরিশোধ ঃ জাতীয় সম্মানের একটি প্রশ্ন

ধীরেশ ভট্টাচার্য

সকলেই জানেন আর্থিক উন্নতি-ভাবনার সঙ্গে ঋণের প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে জড়িত। কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, কি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, কি সমগ্র দেশের পটভূমিকায়, যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যাক না কেন সাধারণতঃ আর্থিক অগ্রগমনের জন্যে ঋণের সহায়তা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। ঋণ দান করবার ক্ষমতা এবং ঋণ গ্রহণ করবার স্পৃহা ও উদ্যোগ, এই উভয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে আর্থিক প্রগতির বনিয়াদ। যাঁদের উদ্বৃত্ত নিষ্ক্রিয় এবং উদ্যোগবিমুখ, তাঁরা অন্যান্য উদ্যোগী অথচ নিঃসম্বল কর্ম্মবীরদের সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে যেটুকু আর্থিক উন্নতি এতাবৎ সম্ভব হয়েছে তাও প্রতিকূল পরিবেশে অকালেই বিলীন হয়ে যেত। এই পারস্পরিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে যে-রকম সত্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পর্কেও আজ তার চেয়ে কম সত্য নয়। সমৃদ্ধ দেশের উদ্বৃত্ত তার নিজের দেশেই শুধু ব্যবহৃত হবে, অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ অথচ আর্থিক উন্নতির প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হবে না, এমন কথা আজকাল আর ভাবা যায় না। বিদেশী ঋণ গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করুক, ঋণদাতা এবং ঋণ-গ্রহীতার সম্পর্ক সাধারণ ব্যাবসায়িক লেন-দেনের স্বাভাবিকত্ব অর্জন করুক, দেশে দেশে মূলধনের সচলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে পশ্চাৎপদ দেশগুলির সম্পদ আহরণের বাধাসমূহ বিদূরিত হোক—এই ধরণের কামনাই বিশুদ্ধ আন্তর্জাতিক অর্থবিদের আগামীকালের স্বপ্ন। ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে-সব সীমানা টানা হয়ে থাকে, আর্থিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহায়তার বেলায় সেই সীমানার কৃত্রিমতা সকলের কাছে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এবং এই ভাবেই সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির সমস্যাগুলি একযোগে বিবেচিত হবে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের ( United Nations ) সনদ তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

এই কল্পিত আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের গরমিল অবশ্যই রয়েছে। প্রথমতঃ সমৃদ্ধ দেশগুলি সবক্ষেত্রেই অন্য দেশের আর্থিক প্রয়োজনের বিষয় চিন্তা করে ঋণ বা সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে এ কথা সত্য নয়। বিভিন্ন সাহায্য প্রার্থী দেশের মধ্যে কোন্ দেশের আর্থিক সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল, এর পরিমাপ করা সহজ তো নয়ই, এর পরিমাপের কথা নিয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলি খুব বেশী মাথা ঘামিয়েছে এমন কোনো প্রমাণও বড় একটা নেই। বরঞ্চ সমৃদ্ধ দেশগুলির প্রধান বিচার্য্য, সাহায্যের ফাঁদ পেতে অন্যান্য দেশকে নিজের গোষ্ঠীভুক্ত করা সম্ভবপর কিনা। রাজনৈতিক আদর্শগত বিরোধিতা সত্ত্বেও সমৃদ্ধ দেশ কোনো পশ্চাৎপদ দেশকে কেবলমাত্র তার আর্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে চলেছে এমন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী ঋণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ দেশের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পশ্চাৎপদ দেশের শিল্পে, বাণিজ্যে এমন কি রাজনৈতিক কর্ম্মসূচীতে পর্য্যন্ত অশুভ

প্রভাব বিস্তার করতে পরাঙ্মুখ হন নি, এর নানা দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই সব অশুভ প্রভাবের সমাবেশেই অতীতে "আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের" উদ্ভব হয়েছিল, বিদেশী ঋণের লেন-দেনকে "ধনতন্ত্রী শোষণের" অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে গণ্য করতে এমন কি আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতন্ত্রীরাও কসুর করেন নি। বিদেশী আর্থিক সহায়তা যে পৃথিবীব্যাপী সমৃদ্ধির বিস্তারে কি বিরাট দায়িত্বভার বহন করতে পারে সেই ধারণা শোষণের ধারণার আড়ালে ছাই-চাপা হয়ে পড়েছিল বহুকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে অবশ্য বিদেশী অর্থের আগমন নির্গমন যে শুধু ধনতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে তা' নয়, সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিও পরস্পরের সাহায্যার্থে ঋণের আদান-প্রদান করেছে। সমাজতন্ত্রী চীনের প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার আর্থিক সাহায্য এককালে যথেষ্ট পরিমাণেই প্রসারিত হয়েছিল। সুতরাং বিদেশী মূলধন ধনতন্ত্রী শোষক শ্রেণীর শোষণ পদ্ধতির অন্য এক রকম-ফের, এই ধারণার অবসান হতে চলেছে। অবশ্য বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিদেশী ঋণকে শোষণমূলক বলা হবে কিনা তা' নির্ভর করবে সেই ঋণের সঙ্গে সংশিষ্ট বিভিন্ন সর্ত্ত ও বিধিনিষেধের উপর। শোষণ না করেও বিদেশী ঋণ দেশের আর্থিক উন্নতির পোষকতার জন্যে মোটামুটি সহজলভ্য এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সংগৃহীতব্য হবে। এই ধারণাটির উদ্ভব কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালেরই ঘটনা। তার আগে বিদেশী ঋণ মাত্রেই শোষণমূলক এই ধারণারই প্রাধান্য ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বিদেশী ঋণের সাধারণ নিয়ম ছিল এক দেশের ধনিক-গোষ্ঠী অন্য দেশের উঠ্‌তি ধনিক-গোষ্ঠীকে এই ঋণ দিয়ে সহায়তা করত। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ধরণের লেন-দেনের বড় একটা সংযোগ ছিল না। মনে হতে পারে যে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা উভয়েই যখন ধনিক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং তারা পরস্পর আলোচনার মাধ্যমেই ঋণের সর্ত্তাবলী ঠিক করে নিত, তখন এর মধ্যে শোষণের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু বিভিন্ন ধনিক-গোষ্ঠী ঠিক সমপর্য্যায়ের বা সমান ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিলেন না বলেই এই সব ক্ষেত্রে অতি সহজেই শোষণমূলক সর্ত্তাবলী আরোপিত হতে পারত। বর্ত্তমানে আন্তর্দেশীয় ঋণদান-রীতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন ঋণদাতা সাধারণতঃ সমৃদ্ধ দেশের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এবং ঋণগ্রহীতা পশ্চাৎপদ দেশের কোনো সরকারী বিভাগ বা সংস্থা। এই ধরণের লেন-দেনে শোষণমূলক সর্ত্তাবলী আরোপিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম, যদিও সর্ত্তাবলী সব ক্ষেত্রেই সমান উদার কিংবা সমান সহজসাধ্য হবে এমন সম্ভাবনাও কম। সব বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ (standard) বিধিনিষেধ মেনে চলতেই হবে, এমন কোনো সর্বজনগ্রাহ্য রীতিনীতির উদ্ভব এখনও বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রে হয় নি। কাজেই প্রত্যেক দেশকেই সতর্ক থাকতে হয় যাতে তার আর্থিক কিংবা রাজনৈতিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্তমর্ণ রাষ্ট্র তার উপর শোষণমূলক সর্ত্তাবলী চাপিয়ে না দেয়। বিভিন্ন ঋণের জন্যে বিভিন্ন রকমের বোঝাপড়ার প্রয়োজন হয় বলে অযথা সময় এবং শাসনশক্তির অপচয় ঘটে। কতকগুলি সাধারণ নিয়ম (code) প্রচলন করতে পারলে এই অপচয় দূর করা যেত। এর অন্য একটি সুফল হত যে ঋণের মাধ্যমে এক দেশ অপর দেশকে শোষণ করতে পারে এই ধারণার মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হত। যদিও আজ বিশ বৎসরেরও অধিক কাল নানা সমৃদ্ধ দেশ অন্যান্য দেশকে ঋণ দিয়ে চলেছে, তারা কিন্তু ঋণের সর্ত্তাবলী সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করে নি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুবিধা বুঝে বিভিন্ন রকমের সর্ত্ত আরোপ করে চলেছে।

## দুই

ভারত বিদেশ থেকে ইদানীন্তন কালে যে সব ঋণ গ্রহণ করেছে, সর্ত্তের তারতম্য অনুসারে তাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর ঋণ বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধনীয় এবং সাধারণতঃ এই ধরণের ঋণে সুদের হার প্রচলিত বাজার-অনুযায়ী সুদের চেয়ে খুব কম নয়। ঋণ-গ্রহণের পর এবং পরিশোধের কিস্তি সুরু হবার আগে খুব বেশী সময় দেওয়া হয় না যাতে অধমর্ণ দেশ ঋণ পরিশোধের সুব্যবস্থা করতে পারে। অবশ্য এই ধরণের অপেক্ষাকৃত কঠোর সর্ত্ত আরোপিত হয়েছে বলেই ঋণের মধ্যে শোষণের আভাস রয়েছে এমন সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হবে না। যদি ঋণ গ্রহণের প্রায় অব্যবহিত পরেই ঋণ গ্রহীতা দেশ আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে প্রচুর উন্নতি লাভ করে, তবে ঋণের সর্ত্তাবলী মেনে চলা তার পক্ষে শক্ত হবে না। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই ধরণের ঋণ থেকে প্রকৃতপক্ষে সুবিধার বদলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে বেশী। ঋণের পরিশোধ-ক্ষমতা গড়ে উঠবার আগেই পূর্ব্ব আরোপিত সর্ত্ত অনুযায়ী পরিশোধের দায়িত্ব এসে পড়েছে আমাদের উপর। এই ধরণের ঋণ গ্রহণ করবার আগে আরও পরিষ্কার ভাবে ভেবে দেখা দরকার ঋণ পরিশোধ করবার ক্ষমতা গড়ে উঠবার বাধা ও অসুবিধাগুলি সব দূর হয়েছে কিনা।

দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর ঋণ আমাদের দেশে এসেছে যা' বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে না; উত্তমর্ণ-দেশ ভারতীয় মুদ্রা গ্রহণ করতেই সম্মত থাকবে। এই ধরণের ঋণে সুদের হারও অপেক্ষাকৃত অল্প। পরিশোধের ব্যাপারে আরও কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা সাধারণতঃ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋণে পাওয়া গিয়ে থাকে। তা উত্তমর্ণ দেশ ভারতীয় মুদ্রা নিজের হাতে পাবার পর তা' দিয়ে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করে নিজের দেশে পাঠাতে পারে নিংবা ভারতীয় ব্যাঙ্কে নিজের তহবিল গড়ে তুলতে পারে। যদি পণ্যের চাহিদা বাড়ে তবে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বটে, কিন্তু যে-পণ্যের বিদেশী চাহিদা এইভাবে বেড়ে গেল দেশে তার মূল্যস্তর স্থির থাকবে না সহজেই এ-কথা অনুমেয়। সুতরাং যদিও ঋণ পরিশোধের জন্য আমাদের দেশকে বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করতে হল না, তবু দেশের পণ্যের বাজারে যাতে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি না হয় তার জন্যে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়া পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বহন করা যে কোনো ব্যবস্থাতেই কষ্টকর হতে বাধ্য। ঋণ বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধনীয় বলেই তা' অতিরিক্ত কষ্টকর এবং ভারতীয় মুদ্রায় শোধ করা গেলেই কম কষ্টকর হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আবার উত্তমর্ণ দেশ যদি ভারতে সঞ্চিত তহবিল থেকে ভারতেই নানাভাবে অর্থ ব্যয় করতে থাকে তাতেও সমস্যার সুরাহা নেই। এই অতিরিক্ত ব্যয় এমন আকারে এবং এমন সময়ে হতে পারে যে তা থেকে দেশে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় অবস্থার উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। ধরা যাক, আমেরিকা তার সঞ্চিত তহবিল থেকে টাকা খরচ করে ভারতের নানা অঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র খুলে দিল। সেই সমস্ত কেন্দ্রে শিক্ষাসূচী প্রবর্তিত হবে আমেরিকার প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এবং দেশের অবশিষ্ট অংশের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে এর গরমিল থাকার দরুণ নানা সমস্যা ও অসংগতির সৃষ্টি হবে। সুতরাং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে সুবিধাজনক মনে হলেও তার মধ্যে যে অবাঞ্ছনীয় উপাদান একেবারেই থাকবে না, এমন কথা বলা যায় না।

তৃতীয় একশ্রেণীর বিদেশী ঋণ আমরা পেয়েছি যার পরিশোধের সর্ত্তাবলী বাস্তবিকই লোভনীয়। ঋণ গ্রহণের ত্রিশ থেকে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধের কথা ভাববার প্রয়োজন হয় না। সুদ-ও নামমাত্র এবং কিস্তি খেলাপ হলেও উদ্বেগের কোনো কারণ ঘটে না। এমন সুবিধাজনক

সর্তে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ এখনও পর্য্যন্ত খুবই অকিঞ্চিৎকর। যদি ভবিষ্যতে এই সর্তে আরও বেশী ঋণ দেবার সুব্যবস্থা হয় তা হলে বিদেশী ঋণের পরিশোধ-সমস্যাকে এখনকার মত আর এত দুরূহ বলে মনে হবে না। অবশ্য এই ধরণের সহজ সর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক কোনো তহবিলের মাধ্যমেই হতে পারে; আবার অতিরিক্ত সহজ সর্তে ঋণ পেয়ে কোনো কোনো দেশ ঋণের টাকার অপব্যবহার করবে এমন আশঙ্কাও সম্পূর্ণ অমূলক নয়। কিন্তু সর্তের কঠোরতা দিয়েও ঋণের অপব্যবহারকে পুরোপুরি বন্ধ করা যায় নি, এর অজস্র দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে দেখানো যেতে পারে।

## তিন

১৯৫১ খৃস্টাব্দে ভারত সরকারের পরিশোধনীয় বিদেশী ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেই ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় ৫০ শত কোটি টাকা। পনেরো বৎসরে বিদেশী ঋণের শতগুণ বৃদ্ধি এ-যুগের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা। এর ফলে একথা আজ-কাল মাঠে-ঘাটে শোনা যায় যে দেনার দায়ে ভারত সরকারের মাথার চুল বিকিয়ে যাচ্ছে, কিংবা ভারতের সব সম্পদ বিদেশীদের আয়ত্তে চলে গেল বলে, অথবা দেউলিয়ার দলে ভারত সরকারকে শীঘ্রই নাম লেখাতে হবে। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই ধরণের ধারণাগুলি ভ্রমাত্মক। প্রথমতঃ ভারত সরকারের বিদেশী ঋণের পরিমাণ যেমন বেড়েছে তার সমান্তরালে সরকারী সম্পত্তির পরিমাণও বেড়ে চলেছে, সুতরাং দায় (liabilities) এবং সম্পত্তির (assets) তুলনামূলক হিসাবটুকুই যদি শুধু নেওয়া যায়, তা' হলে সরকারের অবস্থার শোচনীয় অধঃপতনের কোনো চিত্র চোখে ভেসে উঠবে না, বরঞ্চ নানা জাতের সরকারী শিল্প-সংস্থা বা পরিবহন-সংস্থা গড়ে উঠেছে দেখে আশাবাদীদের মনে উল্লাস জাগাও অস্বাভাবিক নয়। মনে রাখতে হবে যে এই আশাবাদেরও কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। সাধারণতঃ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে' বিদেশী ঋণ শোধ দেওয়া সম্ভব হয় না, সম্পত্তি থেকে যে আয় অর্জিত হয় তা' উপযুক্ত পরিমাণে এবং প্রয়োজনীয় আকারে পাওয়া গেলে তবেই বিদেশী ঋণ পরিশোধ করা সহজ হতে পারে। বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে ভারতে যে সব সংস্থা গড়ে উঠেছে তাদের অর্জিত আয় ঋণ পরিশোধের কাজে কতটা সহায়তা করবে মূল বিবেচ্য হ'ল তাই।

বিদেশী ঋণ নিয়ে দেশের সম্পত্তির উপর বিদেশীদের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যেও যুক্তির ফাঁকি রয়েছে। সময়মত ঋণ পরিশোধ করা না গেলে বিদেশীরা নীলামের পরওয়ানা নিয়ে দেশের দুয়ারে হাজির হবে, এমন কোনো ব্যবস্থা আন্তর্দেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। ঋণ পরিশোধ করা হয় নি বলে উত্তমর্ণ রাষ্ট্র অধমর্ণকে অধিকার করতে এসেছে, এর দৃষ্টান্ত একেবারে দুষ্প্রাপ্য না হলেও অতীব বিরল। আর সেই অধিকার অবশ্যই অস্ত্রের জোরের অধিকার। যে-দেশ অস্ত্রের জোরে অন্য দেশ দখল করতে এগিয়ে যায় সাধারণতঃ তার অজুহাতের অভাব হয় না। অধমর্ণ দেশ সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে পারে নি বলেই অস্ত্রের জোরে তাকে দখল করবার অধিকার উত্তমর্ণ দেশকে কোনো আন্তর্জাতিক আইন দিয়ে রাখে নি। যদি কোনো দেশ বাস্তবিকই অস্ত্রের জোর দেখিয়ে অন্য দেশ অধিকার করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা রাখে, তবে আরও অনেক অজুহাতই সে দেখাতে পারে।

ফল কথা, বিদেশী ঋণের জন্যে কোনো দেশকে তার ঋণদাতার কাছে বাঁধা থাকতে হয় না। আন্তর্দেশীয় ঋণ নিতান্তই পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্প্রীতির সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঋণ পরিশোধের দায়িত্বের মধ্যেও বাধ্যবাধকতার বিশেষ বালাই নেই। বিদেশী ঋণ পরিশোধ

করতে অপারগ হয়ে ভারত যদি আজ ঋণের সর্ত্তাবলী ভঙ্গ করে, কিংবা চরম অসামর্থ্যের কথা ঘোষণা করে ঋণ পরিশোধ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসে, তা হলে অন্যান্য দেশ তাকে দেউলিয়া বলে জানলেও ভারতের সম্পত্তির উপর বিদেশীদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে দেউলিয়া ব্যক্তিকে যেমন তার সব সম্পত্তি পরিত্যাগ করে পাওনাদারদের দাবী যতদূর সম্ভব মিটিয়ে দিতে বাধ্য করা যায়, কোনো অধমর্ণ দেশকে ঠিক সেই অর্থে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা যায় না।

তা হলে বিদেশী ঋণের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বলে দুশ্চিন্তার হেতু কি? বিদেশী ঋণ পরিশোধ করতে হয় কেবলমাত্র এই কারণেই যে পরিশোধের সর্ত্তাবলী মেনে না চললে ভবিষ্যতে নূতন করে বিদেশী ঋণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদেশী ঋণের উপর আমাদের বেশ খানিকটা প্রত্যাশা এখনও রয়েছে—কেন না, বিদেশী ঋণ একেবারেই না নিয়ে আর্থিক বনিয়াদকে শক্ত করা পুরোপুরি অসম্ভব না হলেও অতীব দুরূহ—সেই হেতু পরিশোধের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করে আমাদের যেতেই হবে। এই দায়িত্বকে নানাভাবে লঘুতর করার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে; ঋণের পূর্ব্বারোপিত সর্ত্তাবলী যদি পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ করে নেওয়া যায় তা হলে কোনো পক্ষের গায়েই আঁচ লাগবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই ধরণের সংশোধন বা সংস্কার যদি উত্তমর্ণ দেশের মনঃপূত না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে অধমর্ণ দেশকে বিনা প্রতিবাদে পূর্ব্বের সর্ত্ত মেনে চলতেই হবে। আমাদের দেশের বিদেশী ঋণ পরিশোধের সমস্যা এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্বের সর্ত্ত অনুযায়ী বিদেশী ঋণের কিস্তি সুদসমেত শোধ করতে গিয়ে আমাদের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে এবং আগামী কয়েক বৎসর এই ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়েই যেতে থাকবে। নূতন বিদেশী ঋণ সংগ্রহ করে আমরা একদিকে বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার ভরে তোলবার চেষ্টা করছি, অন্যদিকে পুরোনো ঋণ শোধ করবার চেষ্টায় সেই ভাণ্ডারের উপর টান পড়ছে। সুতরাং বর্ত্তমানে আমরা বিদেশ থেকে ঋণ হিসাবে যে-পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারছি, তার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ আবার বিদেশীদেরই হাতে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। ঋণ পরিশোধের জন্যে আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হয় নি বলেই এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশ থেকে নূতন ঋণ করে আমাদের পুরোনো দেনার জের মেটাতে হচ্ছে। ₹ 36,089

এই অবস্থাকে এক অর্থে অস্বাভাবিক বোধ হলেও বেশ দীর্ঘদিন ধরেই একে আমাদের মেনে চলতে হবে বলে মনে হয়। বিদেশী ঋণ পরিশোধ করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আমরা স্বকীয়ভাবে কবে অর্জন করতে পারব, সেই প্রশ্ন এখন আমাদের জাতীয় সম্মানের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে ১৯৭৯-৮০ খৃস্টাব্দে আমাদের "স্ব-নির্ভর অগ্রগতি"র পথে পদচারণা সুরু হবে। এই আশা ফলবতী হবে কি না পরিকল্পনার সফল ও সামগ্রিক রূপায়নের উপর তা' নির্ভর করবে। তবে একমাত্র খাদ্য ও জনসংখ্যার সমস্যার পরেই যদি কোনো সমস্যাকে আমাদের পরিকল্পনার অগ্রাধিকার দিতে হয় তবে বিদেশী ঋণ পরিশোধের প্রশ্নটি বোধহয় সেই অগ্রাধিকার দাবী করতে পারে। কেন না, জাতীয় অবমাননার এই প্রশ্নটিকে বেশী দিন উপেক্ষা করা চলে না।

## ভারতের বৈদেশিক ঋণ

মোট সরকারী ঋণেরপরিমাণ

১৯৬৯-৭০ : ১৩,৩৭৭·৩৩ কোটি টাকা

১৯৭০-৭১ : ১৪,৪২২ ৫৩ কোটি টাকা

| | | |
|---|---|---|
| বৈদেশিক ঋণ | ১৯৬৫-৬৬ | ২৫৯০ কোটি টাকা |
| | ১৯৬৯-৭০ | ৬,১৪০ ,, |
| | ১৯৭০-৭১ | ৬৬৫৯-৩৭ ,, |

অর্থাৎ এক বছরে ৫০০ কোটি টাকার উপর বৃদ্ধি পাবে

## বৈদেশিক ঋণের দেশ-ওয়ারী পরিমাণ

১৯৭০-৭১-এর শেষে

| | | | |
|---|---|---|---|
| আমেরিকা : | ৩৬৩৪·৬ | কোটি | টাকা |
| রাশিয়া | ৩৫৪·৭৫ | ,, | ,, |
| পশ্চিম জার্মানী | ৩৭৬·৪১ | ,, | ,, |
| ব্রিটেন | ৫৫৭.৮৯ | ,, | ,, |
| জাপান | ২২৫.৫৫ | ,, | ,, |

## জয়শ্রীর নিয়মাবলী

### গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

### লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়**

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রে ড
পোঃ নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

[ অষ্টম পৃষ্ঠার পর ]

একজন পুলিশ ও নক্সালপন্থী বলে বর্ণিত একব্যক্তি নিহত হয়েছে। প্রবল দলীয় সংঘর্ষের ঘটনাও আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ গত ৫ই মে তারিখে নারকেল-ডাঙ্গায় সি, পি, এম—ফরওয়ার্ড ব্লকের এবং গত ২০শে মে ২৪-পরগণার খড়দহে সি, পি, এম-এর সমর্থকদের সঙ্গে নক্সালপন্থীদের সশস্ত্র সংঘাতের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-ছাড়াও দুইজন নক্সালপন্থী যুবকের আগড়পাড়ায় মুখোসধারী আক্রমণকারীদের গুলিতে এবং বোমার আঘাতে যাদবপুর এলাকায় সি, পি, এম সমর্থকের মৃত্যুর ঘটনা রয়েছে। গত ১৯শে মে তারিখে মেদিনীপুরের কেশারী গ্রামের নিকট এক জোতদার ধারালো অস্ত্রের পৌনঃপুনিক আঘাতে খুন হয়েছে।

শুধু পশ্চিম বাংলার নয়, বিহারে এই হিংস্রতার উদ্দাম ঢেউ আলোড়ন তুলেছে। আসাম ও উড়িষ্যায় বহু ঘটনা ঘটে গেছে, যার সঙ্গে নক্সালপন্থী বলে বর্ণিতদের যোগাযোগ নির্দিষ্ট হয়েছে। সবচাইতে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম বাংলা-বিহারের সীমান্তে ঘাটশিলার নিকট মোসাবণী-জাদুগুদা এলাকার ঘন জঙ্গলে। গত ২৬ শে মে ঘাটশিলায় এক পুলিশ ইনস্পেক্টরের বাড়ীর ওপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একদল আক্রমণ করার পর ঐ ঘন জঙ্গলে আক্রমণকারীদের সন্ধান পাওয়া যায়। আক্রমণ-কারীরা জল পানের অছিলায় ইনস্পেকটরের বাড়ীর সামনে বাস থেকে গুলি ও বোমা ছুঁড়ে সেই বাসেই পলায়ন করার পর জাদুগুদার ঘন জঙ্গলে পুলিশ ঘেরাও করে তল্লাসী চালিয়ে মেরী টাইলর নাম্নী একজন ব্রিটিশ তরুণী, কল্পনা ঘোষ নাম্নী একটি বাঙ্গালী তরুণীসহ ৫২ জন উগ্রপন্থীকে ঐ জঙ্গল থেকে গ্রেপ্তার করেছে। অস্ত্রশস্ত্র, রিভলবার বোমা তৈরীর উপাদান মাও-সাহিত্য, ডিনামাইট, ষ্টেনগান, রাইফেলের গুলি, বারুদ, ফিউজ ইত্যাদি তাদের কাছে পাওয়া গেছে। উড়িষ্যা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ-এর সীমান্তে এই জঙ্গল। যেমন নক্সালবাড়ীও নেপাল, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। এদের কাছে গেরিলা যুদ্ধের সকল উপাদানই পাওয়া গেছে। প্রত্যেকের কাছেই একটি ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র, মাও-এর ব্যাজ, চার্ট, ম্যাপ এবং আন্দাজ কয়েকদিনের খাদ্য পাওয়া গেছে। সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত রাইফেলের গুলি, প্রবল বিস্ফোরক, কম্পাস ইত্যাদি ছাড়াও প্রচুর টাকা পাওয়া গেছে। নোটগুলির নম্বর এলোপাথারি নয়। পর পর নম্বর সাজানো,—মোট ২০,০০০ টাকার নোট পাওয়া গেছে। রাইফেল পাওয়া গেছে ৬৩ টি এবং বন্দুকের কার্তুজ ২৬টি।

জাদুগুদার জঙ্গলে উগ্রপন্থীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের পর গেরিলাযুদ্ধের মহড়ার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, এরপরও এদের অন্তিম উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামে নক্সালপন্থীরা ভিয়েৎনামে চীনপন্থীদের ভূমিকা নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে পূর্বাঞ্চলের এই চারটি রাজ্যে চীনাপন্থী ঘাঁটি তৈরী করছে। এই প্রস্তুতির মুখে চীনের সামরিক সংঘাত পূর্বাঞ্চল ভারতের সীমান্তে যদি কোনো তথাকথিত "মুক্তাঞ্চলের" সূচীমুখ তৈরী করতে পারে, তাহোলে অনিবার্যভাবে ভিয়েৎনাম-লাওস-কাম্বোডিয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে এই এলাকা বৃহৎ শক্তিবর্গের সংঘাতের এলাকায় পরিণত হবে। গত কয়েক-বছর যাবৎ পূর্বাঞ্চল ভারতে এই পরিস্থিতির অস্ফুট আভাস দিগন্তের আলোর মত মূর্ত হয়ে উঠছে।

এই অনিবার্য পরিণতির মুখে পশ্চিম বাংলার যারা যুক্তফ্রন্টের শরিক ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা মার্ক্সবাদী, তাদের কেউ কেউ যেমন এই পরিণতির পোষকতা করে এসেছেন, আবার অবশিষ্টরা এই পরিণতিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। এই পরিণতি রোধ করবার জন্য যে ব্যাপক

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিলো সেদিকে তারা অগ্রসর হন নাই। যুক্তফ্রন্টের অপর শরিকেরা এই পরিণতিরসহায় দর্শকের ভূমিকায় বালহরণ করে বর্তমানে তাদের পরোক্ষ আশ্রয়ে লালিত এই বৈদেশিক আনুগত্যসম্পন্ন বিধ্বংসী শক্তির অশুভ সম্ভাবনায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এই ধ্বংসাত্মক পরিণতির বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলায় তের মাসের শাসনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যারিকেড সৃষ্টির যে সুযোগ ছিল, সে সুযোগ তারাও যেমন গ্রহণ করে নাই, কেন্দ্রীয় সরকারও বিশ-বছরের কংগ্রেসী শাসনের আবর্জনায় দেশের যুবকদের মনে প্রবল হতাশা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে বৈদেশিক অনুচরদের প্রচারণার প্রভাবে তাদের ঠেলে দিয়ে যে গুরুতর জাতীয় অপরাধ করেছে, সেই অমার্জনীয় অপরাধ স্খালনের জন্য পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময়োপোগী উদ্যম গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে এদেশে চীনা আনুগত্যের ভিত্তিভূমি প্রশস্ততর করেছেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চতম পর্যায়ের আমলারা এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আরও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনী পশ্চিম বাংলায় আমদানীর, পশ্চিম বাংলা ও কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগে নূতন লোক নিয়োগ করে এই দুইটি বিভাগকে শক্তিশালী করবার এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তাই যথেষ্ট নয়। প্রশাসনিক প্রয়োগের পাশাপাশি দুর্নিবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপে পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক বনিয়াদে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। এ-পথে যদি রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তার প্রবল বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে পশ্চিম বাংলার জাতীয়তাবাদী মানুষকে নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগের বীর্যবান আহ্বান এই জাতীয় সঙ্কট উত্তরণের একমাত্র পথ। অন্যথায় পূর্বাঞ্চল ভারতে ভিয়েৎনামের পুনরাবৃত্তি অনিবার্যরূপে দেখা দেবে।

## চিকিৎসকদের লাঞ্ছনা

যুক্তফ্রন্টের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে অধস্তন কর্মচারীদের কিম্বা জনসাধারণের হাতে ডাক্তারদের লাঞ্ছনার বহু সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকেরা কিছুদিনের কর্ম-বিরতির আশ্রয় নিয়েছেন। গত ৩০শে এপ্রিল দক্ষিণ কলিকাতার রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে একটি চুরির ঘটনা উপলক্ষ করে বাইরের লোকদের সঙ্গে নিয়ে অধস্তন কর্মচারীরা ডাক্তারদের আক্রমণ করে। ছয়জন ডাক্তার গুরুতররূপে আহত হন এবং চিকিৎসকেরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে কাজ করতে অস্বীকার করলে হাসপাতাল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসকদের অভিযোগ, একবছর পূর্বে একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে হাসপাতালের সকল শ্রেণীর কর্মীদের নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগে চিকিৎসক এবং নার্সরা সায় না দেবার পর থেকেই ডাক্তারদের সঙ্গে অধস্তন কর্মচারীদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারই পরিণতিতে ৩০শে এপ্রিলের ঘটনা। বাংলা দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের আয়োজন কতটা ছড়িয়েছে রামকৃষ্ণ সেবাপ্রতিষ্ঠানের ঘটনা তার একটি উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত।

## রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বহাল

গত ১০ই মে পাঁচ-সদস্য বিশিষ্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিমণ্ডলী, রাষ্ট্রপতি গিরির নির্বাচন অবৈধ ঘোষণার জন্য যে দরখাস্ত করা হয়েছিল তা নাকচ করে শ্রীগিরির নির্বাচন বহাল রেখেছেন। ছুটির পর কোর্ট খুললে

শেষাংশ ৬৯ পৃষ্ঠায়

# কবি-কাহিনী

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

নক্ষত্রগণের মাঝে হেরি যবে শশী ;
মনে হয় আচার্যের কাছে আছি বসি।
রবিসম তেজ যাঁর, শশীসম জ্যোতি
কত স্নেহ তাঁর তুচ্ছ আমাদেরো প্রতি।
প্রত্যূষে জাগান তিনি শোনাইয়া গান,
নিদ্রা যাই তাঁরি মুখে শুনি উপাখ্যান।
সকালে সকলে কার তাঁরি কাছে ক্লাস,
ঘণ্টাভোর পড়ি তবু মেটে না যে আশ।
পড়া সেকি ? মনোহারি সে কি উপকথা ?
সে-পড়ার তরে প্রাণে কত আকুলতা !

চন্দ্রালোকে তাঁর সাথে প্রান্তরে বা বনে,
ভ্রমি মোরা গাহি গান পুলকিত মনে।
তার পর জাগে যবে কাল বৈশাখী,
ভেঙেচুরে, আশ্রমের যত শাখা, শাখী,
গুরু ছুটে বাহিরয়, সঙ্গে শিষ্যগণ,
প্রলয় তাণ্ডব সহ প্রচণ্ড বর্ষণ—
তারি সাথে গুরু শিষ্য কণ্ঠে বর্ষে গান,
অমৃতের স্পর্শ লভি' করি' ধারাস্নান !

আজি যবে মুগ্ধচিত্তে কহি সে-বারতা
শুনে সবে সবিস্ময়ে যেন রূপকথা !
সত্য বলে অনেকেই করে না বিশ্বাস,
কল্পিত কাহিনী ভাবি করে উপহাস !

অখ্যাত পল্লীতে গড়ে তপোবন কবি,
কল্পনার চক্ষে হেরি সে-যুগের ছবি !
গুটিকয় শিশু নিয়ে কাটায় জীবন।
"কবির খেয়াল"—ইহা ভাবে বন্ধুগণ।
হাসে কেহ, নিন্দে কেহ, করে তিরস্কার।
হেনকালে—"জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার,
পেয়েছেন মহাকবি"—আসিল সন্দেশ !
অখ্যাত সে-পল্লীমাঝে ভেঙে পড়ে দেশ।

কবি ধীর ! অচঞ্চল। আশ্চর্য এ কথা।
পূর্ববৎ বৃক্ষতলে, চলে শিক্ষকতা।

## দে বী প্র সা দ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

### একদিন আমায় আমার অগোচরে নিয়ে গেছ

একদিন আমায় আমার অগোচরে নিয়ে গেছঃ যে জীবন
জমা আছে তোমার ভিতরে, একই সাথে বাহিরের
দৃশ্যে দৃশ্যে, একদিন সেই সম্মোহের ইন্দ্রজাল
টাঙিয়ে রেখেছো তুমি শুধু ওই শাণের রোয়াকে।
তুমি কি পণ্যের চেয়ে স্পৃশ্য নও? তবে কেন দ্রুত
নিজেকে আড়াল করো যুবতীর চোলির আড়ালে?
শুধু পুকুরের ঢেউ, ডুমুর পাতার প্রদোষিকা
আমার দেরাজে পুরে রেখে গেছ। টাকার বদলে
শব্দ করে বাজে শুধু লঘুভার, অথচ দুর্ভার
জীবনের নানাবিধ ত্রিকোণ চতুষ্ক রূপরেখা।
কী জানি তাদের ভাষা কতখানি অভিব্যক্তিবাদী।
আমি শুধু জীবন-জীবন-ভেবে তাদের বদলে
অস্পৃশ্য রহস্য দিয়ে জুড়েছি সমস্ত ঘরখানা।
আলাদা পা রাখি এতটুকুও প্রহর বাকি নেই।

### এক রাত্রি ঘুম

সূর্য ডুবে যায় প্রত্ন দিগন্তরেখায়, তার কাছে
লহমা সুখের জন্য হাতে পেতে নিয়েছি আগুন।
সারা শীত রাত্রি ধরে মৃত্যু পোহাবার ব্রত। ভোর
হাট করে এসেছি: নীল মাটির অমর দেহ থেকে
প্রাণ ছেনে নিয়ে ইষ্টদেবতার বিগ্রহ বানাতে।

সবাই অনন্ত প্রাণ আশীষ পেয়েছে : ওই নভ,
ওই নদীজল, ওই কাম ও দিব্যতা। শুধু আমি
সারাদিন সারা রাত বিনিদ্র প্রাণের তাড়া খেয়ে
কুকুরের মতো এক পাড়া থেকে আরেক পল্লীতে
ঘুরে বেড়িয়েছি। সব মুখগুলি সুন্দরীর মুখ—
সব পথ পার্শ্ব জুড়ে সুফলা বৃক্ষের লোভ—তারা
সর্বাঙ্গে জীবন জ্বেলে আমার স্পর্শের বাইরে শুধু
বেঁচে থাকে অনন্ত প্রহর, আর দু-হাতে আমার
তুলে দিয়ে যায় শুধু একরাত ঘুমের বরাভয়।

## এক আঁজলা জলের জন্যে

এক আঁজলা জলের জন্যে ঠায় বসে আছি—বেলা যায়,
সাথে সাথে সব রোদ গলে ঝরে যায় অকাতরে।
মাটির তলায় চলে সুতোর ধারায় জ্যোৎস্না-ঢালা
নিভৃত নিষুতি। টের পাই যেন কাঁধে কাঁধে জমে
উঠেছে বিপুল রাকা দুর্ভার সৌন্দর্যে স্তূপ হয়ে ···
এত ঘুম বিবশ ঘুমের মধ্যে নড়ে চড়ে ওঠে :
অতর্কিতে রক্তে রক্তে দুরন্ত রক্তিম ব্যভিচার
জাগিয়ে তুলতে চায়।···আর সেই নিভৃত সুখের
সুমুখে শরীরী হয়ে জেগে ওঠে অপরূপা পাপ।
রক্তের অতলে বয়ে চলে এক সুতোর ধারানি ;
সবার-সবার অগোচরে এক জলচঞ্চলতা
বুকে কেঁপে ওঠে : যেন ইঁদারার গভীরে হঠাৎ
দূর মুখচ্ছায়া ভেঙে-চুরে গেছে—যারা এসেছিল
এক আঁজলা জলের জন্যে, ফিরে গেছে আমায় লুকিয়ে···

## গাছের প্রতীক

যে সব সুষমা আমি একদিন দেখেছি তোমার
চারিধার বহ্নিপ্লুত করে আছে, যে সব সুষমা
দেখেছি মেঘাঢ্য দিনে তারাদৃপ্ত রাতে তোমাকেই
প্রদক্ষিণ করে ঘোরে, যে সব সুষমা হাতে হাতে
শব্দে শব্দে সঙ্কলন করে নিতে গিয়েছি একদিন,
আজ তারা সব সমাহৃত হয়ে আছে শুধু ওই
গাছের প্রতীকে। 'বৃক্ষ, তুমি কার?'—বৃক্ষ নয় কারো।
তবু ধরে ফুলভার নিয়মিত ঋতুর নির্দেশে।
তার রক্তক্ষরণের মধ্যে আমি জ্বলন্ত বাসনা
মগুন করে নি। ঊর্ধ্বে বৃক্ষশিরে নভ পা ছোঁয়ায়
যেখানে, সেথায় তন্ন তন্ন করে খুঁজি, লুপ্ত সুখ
যদি এক তিল তার গুণ্ঠন ঘুচিয়ে দেখা দেয়।
সবাই-সবাই-চেনে ঠিক সুষমাটি তার। শুধু
আমারই পথের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ পরুষ কুয়াশা।

## পুরোনো মানুষদের ভূত

দিয়েছ হত্যার অস্ত্র হাতে তুলে, সেই অধিকারে
মুড়িয়ে নিয়েছি সব আভরণ রাত্রির গা থেকে।
আমি চোখে দেখতে পাইনে, শুধু হৃৎপিণ্ডে আঁধার
বেজে যায়। আমাদের গ্রাম জ্বলে গেছে, খামারের
সব শস্য লুটে নিয়ে গেছে এক অজানা ফেরারী!
তারপর, হে পাথুরে স্রষ্টা, তুমি দীর্ণ পাথরের
রন্ধ্র উচ্ছ্বসিত করে শতোৎসার ইচ্ছের ফোয়ারা

হয়ে উঠে এলে : সব পুরোনো মানুষদের ভূত
পথে পথে ঘোরে, সারা রাস্তা জুড়ে অবাধ মস্করা
লিখে যেতে থাকে। 'তুমি কোন্ গাঁ-র ?'—প্রশ্ন করে শুধু
হাতে হাতে ফিরে পাই এক ফালি তুলোট কাগজের
উচ্চারণ : 'আমরা বৃষ্টির রাতে চাঁদের আলোর
গল্প বুনে হারিয়ে গিয়েছি সেই বৃষ্টিরই ভিতরে
একদিন, আজ উঠে এলাম তোমারই ছায়া হয়ে !'

## দেখেছি রুপোবাহিনী নদীজলে

দেখেছি রুপোবাহিনী নদীজলে পানসিছুট তমিস্রা একদিন
গাঢ় রাত্রিবেলা এক শষ্প-ছাওয়া গ্রাম্য তীর ঘেঁষে
নামিয়ে দিয়েছে সব গুরুভার মনস্তাপগুলি।
বৃষ্টির কণার সাথে ভেসে আসে গতাসু সময়।
পোড়া স্মৃতিখণ্ডগুলি আলেয়ার মতো কাঁপে। কেবলই অতীত
স্তূপ হয়ে জমে ওঠে আমাদের ভাষার ভাণ্ডারে।
কারো ভারসাম্য নেই—নদী-নভ-গিরি-বৃক্ষ-কারো, তবু
বেঁচে আছে, যেমন দেহের মধ্যে আমরা এখনো
অনায়াসে বেঁচে—শুধু মাঝে মাঝে রতি ও বাখরে
গাঁজিয়ে তুলেছি শতরঞ্জী আলো। কারোকে চিনি না,
চিনি বিছানার তাত, চিনি খাঁ-খাঁ মাঝরাত্রিবেলা—
যখন একলা উঠে যেতে পারি নিজেকে ছাড়িয়ে !
সবই ডুবে গেছে ওই তমিস্রায় বদলে আমায়
হাতে দিয়ে গেছে অফুরন্ত দাহ—রূপকে শমিত।

## একদিন আমাদেরও

নিটোল স্তনের মতো স্ফীত মেঘ জ্যৈষ্ঠ পার হয়ে
চলে গেছে দিগন্তের কাছাকাছি : সম্বৃত রেখেছে
সমস্ত বর্ষণধারা শুধু তার নিজের ভিতরে।
মাথা নুয়ে আসে : সূর্য এত ভার কোষে কোষে জ্বলে
দগ্ধ স্মৃতি, ভালোবাসারিক্ত এক বিশাল বিস্তার!
একদিন আমাদেরও সময়রহিত সবুজাভা
আঙুল ডুবোনো ঘন শ্যাওলার মতন ফলেছিল।
আজ সেই গ্রাম্য কিংবদন্তী—যারা ডেক জানে—ওস্তাদ সাত্ত্বিক—
তাদেরই একান্ত অধিকারে। তারা আমাদেরও কৃপা
দিতে চেয়েছিল, শুধু পুণ্যার্থিনী তরুণীদলের
পুজোর স্তূপের মধ্যে আমরা বিলীন হয়ে গেছি!
মিনতি করিনে : 'ডাকো আমাদেরও একবার ডাকো!'
আমাদের ডেকে গেছে অগ্নিগর্ভ মেঘ : সেই ডাকে
শুধু দগ্ধ হয়ে যাবো বলে আজও জীয়ন্ত রয়েছি।

# Surround yourself with sandalwood luxury

## Moloy Sandal Soap and Talc is the winning combination to keep you exquisitely fragrant all day.

The soap—cool, creamy, gentle. So good for your skin. The talc so soft and refreshing. Together they keep you feeling fresh and lovely, right through a hot and humid day. With the incomparable luxury of Sandalwood.

Products of The Calcutta Chemical Company Limited

# বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র : ৯

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

যুবনাশ্বের পটলডাঙার বস্তিজীবন নিয়ে লেখা গল্পগুলি 'কল্লোলে' প্রকাশেরও অন্তত ছ বছর আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'পাঁক' উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তখন তিনি ইস্কুলের ছাত্র। কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে অনেকের বিরূপ মন্তব্যের চাপে উপন্যাসটি অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে দেন। সে সময় তাঁদের ঘরোয়া পাঠচক্র 'সচল সঙ্ঘে'র সভায় তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; প্রবন্ধটিতে কোনও মার্কিন শিল্পপতির দানশীলতা সম্বন্ধে বলেছিলেন, যে-ব্যবস্থায় একজনের হাতে দান করার মতো উদ্বৃত্ত বিত্ত সঞ্চিত হয় সে-ব্যবস্থাটাই খারাপ। এর থেকে স্পষ্ট হবে যে তখনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে আদর্শায়িত মানবিকতাবাদের উন্মেষ হয়েছিল, জীবন ও সমাজের প্রতি তখনই তাঁর চেতনা ছিল সজাগ ও সন্ধানী। উদীয়মান সাহিত্যিকরূপে স্বীকৃতি লাভের পরে তিনি 'পাঁক' লেখা শেষ করেন, ফলে উপন্যাসটির শেষাংশে স্বভাবজ মানবিকতাবাদের উপরে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধীয় অধীত জ্ঞানের ছাপ পড়েছে। ১৯২২-৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ গোপালদাল সান্যাল সম্পাদিত 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় 'ফুটপাথ' নামে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি নাটকও লেখেন; শহুরে জীবনের একেবারে নীচুতলার অন্ধকারাচ্ছন্ন অভিশপ্ত মানুষদের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে দৃষ্টিপাত করাটা সেকালে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকদের কাছেও যে কতটা নিন্দনীয় ও ধিক্কার্য ছিল তার চিত্র 'পাঁকে'ই মিলবে এবং এবিষয়ে যুবনাশ্ব ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাগ্য ছিল একই সূত্রে বাঁধা: যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালী' গ্রন্থাকারে বেরোয় মাত্র ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ও 'ফুটপাথে' আজও বেরোয়নি, তবে 'পাঁক' গ্রন্থাকারে বেরো তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠায় পরে। ঠেকে ও দে প্রায় একই সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র দুটি সত্য হৃদয়ঙ্গম করলে এক, নিম্নশ্রেণীর প্রতি আগ্রহকে সারস্বত সমাজ প্রসন্নদৃষ্টি দেখতে রাজি নয় এবং এই আগ্রহকে আঁকড়ে থাকলে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমটাই রুদ্ধ হয়ে যাবে; দুই, এটাই শিল্প পক্ষে সবচেয়ে জরুরি উপলব্ধি, অন্তরঙ্গভাবে চেনা-জ সমাজ, যার সঙ্গে শিল্পীর শুধু সহানুভূতির নয়, সমানুভূ সম্পর্ক, সেই সমাজেরই একজন তাৎপর্যময় চিত্রকর পারলেই আসবে তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতা। সোজা কথ নিজের আবহ ও সামর্থ্য বুঝে প্রেমেন্দ্র মিত্র আপন সাধ ক্ষেত্র ও তার পরিধি নির্ধারণ করলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাধ ছিল পরাভূত, প্রবঞ্চিত, নিপী জনসাধারণের বা শ্রমিক শ্রেণীর কবি হওয়ার, কিন্তু কোনও কারণেই হোক, তা তাঁর সাধ্যে কুলোল না। কাল ও পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সাধ ও সাধ্যের এই ব্য যেমন বৈষয়িক বিচারে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে তেমনই শিল্পের বি শিল্পীর প্রকটিত আত্মদ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত। এই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য-সাধনাকে অনেক সময় লক্ষ মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কোনও ধ্রুব নির্ধারণের ক্রমাগত প্রয়াসে এবং অনিশ্চয়তা ও অসন্তো তাড়নায় অস্থির পদপাতে নানাচারী, আবার একই স

সাহিত্যসাধনা শিল্পের নিগূঢ় স্বাশ্রয়ী ব্যঞ্জনায় এক সুদূর-প্রয়াসী অর্থময়তায় সুগভীর ও সুসংহত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরাট যে-অংশের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক মর্যাদা নেই বা থাকলেও নগণ্য, যাদের অন্নসংস্থানের ও সাংসারিক নিরাপত্তার প্রশ্ন সাধারণত সর্বদাই উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত, অথচ স্নায়ুতে তন্তুতে শহুরে জটিলতা অব্যর্থ রূপে প্রবিষ্ট হলেও যাদের মধ্যে 'পুন্নাম' গল্পের ললিতের মতো সৎ মূল্য-বোধগুলি দুর্মর কীটের মতো সক্রিয় তাদেরই জীবন-ভাষ্য রচনা করেছেন তিনি। প্রেমেন্দ্র শুধু মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রকর নন, ভাষ্যকারও, একাধারে দুই ই।

পরিচিত মহলে 'পাঁক' ও 'ফুটপাথের' প্রতিক্রিয়ায় প্রেমেন্দ্র মিত্র বুঝি বা নিজের সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ডাক্তার হওয়ার দুরাশায় বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েছিলেন। এ সময় 'শুধু কেরানি' আর 'গোপনচারিণী' নামে দুটি গল্প তখনকার শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে সম্পূর্ণ নতুন লেখকের লেখা আর যে-ই ছাপাক, 'প্রবাসী' ছাপাবে না। কিন্তু বিড়ালের ভাগে শিকে ছেঁড়ার মতোই পরপর দুটি সংখ্যায় গল্পদুটি প্রকাশিত হয়ে প্রেমেন্দ্রকে রাতারাতি দিগ্বিজয়ী বানিয়ে ফেলল; গল্পদুটি পরে যথাক্রমে "বেনামী বন্দর" আর "পঞ্চশর" গ্রন্থে সংকলিত হয়। "তখন পাখিদের নীড় বাঁধবার সময়," এই বলে শুরু হয়েছে 'শুধু কেরানি' আর 'গোপনচারিণী'র প্রথম বাক্য হলো, "মনে আছে সেটা আকাশপ্রদীপ দেওয়ার মাস।" দুটি গল্পের একেবারে শুরুতেই বছরের কোন্ সময়টাতে বর্ণনীয় কাহিনী ঘটছে তা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। সময় বিশেষ সম্বন্ধে এই চেতনা সম্যক হলেই দেশ ও পাত্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে ও সে-সম্পর্কের মধ্যে সমস্যা থাকলে সে-সমস্যাকে মূর্ত রূপে অনুধাবন করা সম্ভব। উক্ত অনুধাবনার জন্যে আগ্রহ গল্প দুটিতে বর্তমান, কিন্তু তার সুষ্ঠু প্রকাশ বা সংগত স্ফুরণ হয়নি, কেননা জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা তখনও অপরিণত। তবু দুটি ছোটগল্পেই সময়-চেতনার সঙ্গে বিষয়বস্তুর যে-মিলন ঘটানো হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় যে ছোটগল্পের শিল্পরূপ সম্বন্ধে এমন একটা বোধ নিয়ে এই নবীন লেখক বাংলাসাহিত্যে প্রবেশ করেছেন যা অকালপক্কতারই নামান্তর।

বছরের যে-সময়টাতে পাখিরা নীড় বাঁধে সে-সময়ে 'শুধু কেরানি' গল্পের শুরু: পাখির নীড় মানে একটা অস্থায়ী পলকা বাসা, দু মাস পরেই কালবৈশাখীর ঝড়ে তাদের বাসা ভেঙে উড়ে যায় অর্থাৎ এ-গল্পের সূচনাতেই নিহিত আছে পরিণামের ইঙ্গিত। আবার 'গোপনচারিণী' গল্পের ঋতু হলো সেই হেমন্ত, যখন দিনের উজ্জ্বলতা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেতে শুরু করে, কুহেলির গুণ্ঠনে গোধূলি আসে রহস্যময়ী হয়ে, যখন নক্ষত্রের স্বপ্নলোকের দিকে বাংলার গ্রামে গ্রামে আকাশপ্রদীপ তুলে ধরা হয়, যেন তা মর্তেরই স্বপ্নের প্রতীক। কোনও স্বপ্নই স্থায়ী হয় না, আকাশপ্রদীপও বারো মাস তুলে ধরা হয় না, হেমন্তের ধূসর কুহকও মিলিয়ে যায়, আবার বাস্তবের প্রখরতায় মানুষ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে, তবু মনের কোনও সুদূর কোণে স্বপ্নের ভালোলাগা আর রহস্য লেগে থাকে। সেই ভালোলাগা আর রহস্য বুঝি মানুষ একই জীবনে একাধিকবার আবিষ্কার করতেও পারে, সেই গোপনচারিণীকে যে আবার তেলেনাপোতায় কি অন্য কোনখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না তা-ই বা কে বলতে পারে! আকাশপ্রদীপের মতোই সে শুধু স্বপ্নে ভরা নক্ষত্রলোকের জন্যে মানুষের চিরন্তন এক পিপাসার প্রতীক।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে 'প্রবাসী'তে সেই প্রথম আত্মপ্রকাশেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যে একটি অটল স্থান করে নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন। দুটি গল্পেই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিণতির সন্ধানও পাওয়া যায়। 'শুধু কেরানি' মাত্র দুটি

চরিত্রকে নিয় লেখা গল্প, চরিত্র দুটির কোনও সত্যিকার সামাজিক মর্যাদা নেই, তবু ঐ নগণ্য কেরানি দম্পতী পরিপূর্ণ সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে, সে-স্বপ্ন অকালে ভেঙেও যায় আর্থিক ক্ষয়ের টানে, বৌটি উৎকণ্ঠায় জর্জরিত স্বামীকে মিথ্যেই আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে এবং গল্পের শেষে এতদিন ধরে স্বামীকে আশ্বাস দেওয়ার মিথ্যে করুণ ছলনাও ভেঙে যায়। গল্পটি শুরু হয়েছে গড়ে তোলার অন্তে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক আকুলতা নিয়ে, শেষ হয়েছে একে একে সমস্তই ভেঙে যাওয়ার কাহিনীতে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরবর্তীকালের অধিকাংশ গল্পেই দেখি ব্যক্তির যোজনা ও স্বপ্নের তলায় তলায় বৈনাশিক প্রতিবেশ বা প্রতিচরিত্রের স্রোত এবং তার ফলে মানুষের জীবন অজস্র চোরা সুড়ঙ্গের উপরে বিপজ্জনক ভাবে চলাফেরা করে। দুটি মাত্র মানুষেরই কাহিনী 'গোপনচারিণী'ও, কিন্তু একটি চরিত্র সারাক্ষণ অস্পষ্টতার অন্তরালে প্রায় অশরীরী অবস্থায় থেকেছে, অথচ নেপথ্যে তার উপস্থিতিও সর্বদা বোঝা গেছে এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় যে গল্পটি ঘটেছে সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে আর সে-অন্ধকারে প্রদীপের অনতিস্ফুট ক্ষীণ আলো হয়ে উঠেছে এক অব্যর্থ রহস্যের মূর্ত রূপ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ গল্পগুলির বেশীরভাগেই চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সাক্ষাৎ বা সংঘর্ষ হয়েছে অন্ধকারে এবং অন্ধকারেই জীবনের গূঢ়তম রহস্যের উপরে পটক্ষেপন হয়েছে।

অপরাহত বস্তুলোকের কঠিন নিষ্ঠুর বিধ্বংসী পরাক্রমের মুখে সামান্য মানুষের ভাষাহীন নিরুপায় আর্তি আর ওই সামান্য মানুষেরই আপন নৈমিত্তিক সীমা থেকে বের হয়ে কল্পলোকের উদ্দেশে যাত্রার গভীর আনন্দ—এ দুটোই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পগুলির মৌল বোধ যা অপূর্ব সাংকেতিকতায় পুনঃ পুনঃ অভিব্যক্ত। 'শুধু কেরানি' ও 'গোপনচারিণী'র উক্ত বোধ দুটি ক্রমশ একান্তর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আরও অজস্র মাধ্যমিক বোধে, মানবচরিত্রের বহু অজ্ঞাত, প্রান্তিক ও লুক্কায়িত কোণে লেখকের নিরন্তর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিসম্পাতের প্রতিফলিত আলোতে। "পঞ্চশর" গ্রন্থের প্রথম গল্পটির নায়িকা চিত্রার চরিত্রে উদ্ভূত অহঙ্কারই অসাধ্য বাধা হয়ে উঠেছে তার একান্ত সমর্পণের, 'সাগর সঙ্গমে' সংস্কার ও রুচির নীরেট নির্দেশের উপরে জয়ী হয়েছে দাক্ষায়ণীর অকপট মাতৃহৃদয়, আবার 'স্টোভ' গল্পটিতে স্বামীর পূর্বপ্রণয়িনীর প্রতি বাসন্তীর আক্রোশ যখনই গর্জন্ত স্টোভটার মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে তখনই তার মধ্যে শুরু হয়েছে সে-আক্রোশকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখার মরীয়া সংগ্রাম। প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়ের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিসত্তার বিরোধ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সর্বদা আকৃষ্ট করে এবং মানুষের চরিত্রমাত্রেই তাঁর কাছে অপার রহস্যের খনি। তাঁর ছোট গল্পগুলির শুরুতে এক-একটি চরিত্র যে-রূপে উপস্থাপিত হয় সেটা পাঠকের কাছে প্রথমে চরিত্রের সম্পূর্ণ স্বরূপ বলেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রেমেন্দ্র জানেন যে জলে ভাসমান বরফখণ্ডের যেমন ন ভাগের এক ভাগ জলের উপরে বাকি আট ভাগ জলের নিচে থাকে তেমনই মানুষের চরিত্রের বেলাতেও যেটুকু গুণ সাদা চোখে ধরা পড়ে সেটুকু সম্পূর্ণের তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ আর বেশীটাই থাকে গুপ্ত। তাই তাঁর ছোটগল্পের শুরুতে চরিত্রের যে-প্রাথমিক গুণ প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে অতিক্রম করে অন্য কোনও গুণ, যা প্রায়শই বিপরীত গুণ, কাহিনীর অগ্রগতিতে ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে: চরিত্রের নতুন নতুন গুণ বা রূপের তথা ঘনত্বের প্রকাশ এমন সূক্ষ্ম অথচ অনিবার্যভাবে, এমন অলক্ষে ঘটে যে প্রথম পাঠে এই প্রকাশের সূচনামুহূর্তটা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগই পাঠকের জন্যে থাকে না এবং এই সুযোগ-হরণে প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বদাই অত্যন্ত যত্নপর।

প্রকৃতপক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্র যেভাবে তাঁর সার্থক ছোটগল্প-গুলিতে এক-একটি চরিত্রের নিগূঢ় রহস্যকে উদ্ঘাটন করেন তাতে মনে হয় না যে গল্প-রচনায় তাঁর কোনও কর্তার ভূমিকা

আছে, মনে হয় তিনি যেন শুধু নিমিত্তমাত্র, কেননা এই অধ্যাস তিনি নিপুণভাবেই সৃষ্টি করেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে লেখক-নিরপেক্ষ রূপে চরিত্রগুলি ঘটনার বা পরিস্থিতির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় আপনা থেকে সম্যক দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ সমেত আত্মপ্রকাশ করে। অরণ্যের অন্ধকারে পুরন্দর ও সুনন্দা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শহরে ফেরার পথে যখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চাঁদ উঠল তখন ওই অন্তরঙ্গতার মোহ কেটে গেল, "যে চাঁদ রহস্যময় করে তোলে পৃথিবীকে, সেই চাঁদই তাদের পৃথক করে দিল।" জ্যোৎস্নার এই বিপরীত ক্রিয়াই যেন মানবচরিত্রের আপাতসংগতির অন্তরালে নিহিত দুর্বোধ্য জটিলতা ও বিরোধিতার প্রতি অভ্রান্ত ইঙ্গিত। তাই 'অরণ্য-স্বপ্ন' গল্পটির পরিসমাপ্তিতে নিষ্ক্রিয় দর্শক রূপে রঙ্গালয় থেকে বের হতে হতে মন্তব্য করার ভঙ্গিতে পুরন্দরের চরিত্র সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, "তার প্রকৃতি অদ্ভুত, যে অনুশাসনের বিরুদ্ধে তার মন বিদ্রোহ করে তাই সে না মেনে পারে না। সে অরণ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে যায় কিন্তু সভ্যতার অভ্যাস পরিত্যাগ করে না।" আরও তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই প্রকৃতি পুরন্দর নামক কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়, পুরন্দর যে-শ্রেণীর অন্তর্গত সাধারণ ভাবে এটা সেই শ্রেণীরই সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। ব্যষ্টি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে সমষ্টি চরিত্রের উপরে প্রক্ষিপ্ত আলোক প্রসারণে প্রেমেন্দ্রর অনেক গল্পই ব্যাপক সাঙ্কেতিকতায় আবৃত হয়েছে।

আমাদের মনের ভিতরে কোথায় কোন্ কামনা, কোন্ বেদনা ও বিদ্বেষ, কোন্ স্নেহ ও প্রেম, কোন্ মমতা বা করুণা আত্মগোপন করে থাকে তা আমরা নিজেরাও নিশ্চিতভাবে জানিনে; যখন বিশেষ ঘটনার পটে ওসব বোধবৃত্তিগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অব্যর্থ পরীক্ষা হয় শুধু তখনই জানতে পাই। অর্থাৎ বিভিন্ন বোধবৃত্তির কোনটি কার চরিত্রে কী পরিমাণে আছে সে-সম্বন্ধে অনুমান ও সংশয় মানুষের চরিত্র-জিজ্ঞাসার একেবারে মূল কথা। একারণেই প্রেমেন্দ্রের রচনায় 'বুঝি', 'বোধহয়', 'হয়ত' ইত্যাকার অনুমান-বা-সংশয়-জ্ঞাপক শব্দের আবার সেসঙ্গে মানব-চরিত্রের অন্তর্নিহিত জটিলতাবোধক ব্যাকরণিক কূট-বাক্যের প্রাদুর্ভাব। প্রথম যৌবনের একটি কবিতায় তিনি দাবি করেছিলেন, "মানুষের মানে চাই, গোটা মানুষের মানে"; সেই মানে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'প্রতিবোধবিদিত সত্য,' সেটাকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বারবার খুঁজেছেন। তিনি দেখেছেন যে মানুষের মধ্যে বহু বিচিত্র ও বিবাদী বৃত্তি ও গূঢ়ৈষা সহ-অবস্থান করে এবং এর ফলে মনুষ্যচরিত্র শুধু জটিল নয়, অত্যন্ত বর্ণসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়ও হয়ে উঠেছে।

তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলি একদিকে যেমন মানুষ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার সীমাকে প্রতিপদে প্রশস্ত করে তোলে তেমনই অন্যদিকে তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণের শিক্ষা দেয়। তাঁর কোনও চরিত্রই আগাগোড়া পুণ্য বা ঘৃণ্য নয়। 'সত্য মিথ্যা'র নায়ক অপূর্ব একজন ঘোর মিথ্যেবাদী, নিষিদ্ধ পণ্যের চোরাচালানদার এবং দারুণ প্রতারক; তার পক্ষপাতী হওয়া কঠিন হলেও তার কথাবার্তায় এমন একটা জীবন্ত ভাব আছে যা লেখকের সঙ্গেসঙ্গে পাঠকেরও মন টানে এবং তার সম্বন্ধে সব কথা জানার পরেও একটি পরিচয় জানা বাকি থাকে—সেটা হচ্ছে কন্যাপ্রাণ পিতা হিসেবে অপূর্বের পরিচয়। অথচ অপূর্বের অন্যান্য সমস্ত পরিচয়ের অন্তরালেই তার এই পরিচয়টা আত্মগোপন করে থেকেছে পূর্বাপর, গল্পের মধ্যে কখনও কখনও এই পরিচয়টা এমন সাবধানে উঁকিঝুঁকি মেরেছে যে অসতর্ক বা ব্যস্ত পাঠকের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ার কথাই নয়, তবু গল্পের অন্তিম ফলশ্রুতিতে তার অন্য সব পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছে পিতা হিসেবে তার পরিচয়। তখন বোঝা গেল যে যা ছিল অস্পষ্ট আসলে তা অভ্রান্ত, যা ছিল ক্ষীণ সেটাই সবচেয়ে তীব্র এবং আর সব পরিচয়ের সঙ্গে এই অভ্রান্ত ও তীব্র পরিচয়কে মিলিয়েই মানুষ হিসেবে অপূর্বের পরিচয় সম্পূর্ণ। গোটা মানুষের

মানেই তো প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্বিষ্ট। এজন্যে তাঁর অধিকাংশ গল্পেই মানুষের সম্বন্ধে পাঠকের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ও ধারণার সঙ্গে অন্তিম অভিজ্ঞতা ও ধারণার অসংগতি চোখে পড়ে; ঘটনার বা চরিত্রের যে-দিকটা চোখের সম্মুখে আছে সেটার সঙ্গে যে-দিকটা চোখের আড়ালে আছে সেদিকটাকে মিলিয়ে মানুষের মূল্যায়নেই তাঁর শিল্পশক্তি।

সংসারে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত ব্যাপার হামেশাই ঘটে: নীচ প্রকৃতির মানুষ হঠাৎ মহত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়, অত্যন্ত উদার মানুষ তুচ্ছ প্রসঙ্গে দারুণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়, নিতান্ত নির্বিরোধ মানুষ হঠাৎ ভয়ংকর হিংস্র হয়ে ওঠে কিন্তু এজাতীয় ঘটনা দৈনিক সংবাদপত্রপাঠকদেরই উপযুক্ত খোরাক। বাস্তবে যা ঘটে তাকেই শিল্পরূপ দেওয়া সোজা নয়, কেননা বাস্তবের যথাযথ বিবরণের সঙ্গে শিল্পের কোনও সম্পর্কই নেই: বাস্তবের প্রতিচিত্রণ নয়, শিল্পের দায় হলো বাস্তবের যাথার্থ্য অন্বেষণ। প্রতিচিত্রণে বড়ো জোর সাংবাদিকতা সম্ভব, পক্ষান্তরে বাস্তবের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন না করা পর্যন্ত কোনও প্রয়াসই শিল্প বলে আখ্যাত হবার যোগ্য নয়। যদি কোনও প্রেমমুগ্ধ দম্পতীর মধ্যে অকস্মাৎ প্রেমের চাইতে শূন্যতা বা বিরক্তি প্রকাশ পায় তাহলে শিল্পীকে এই পরিবর্তনের প্রতিবেদন দিলেই হবে না, তাদের সম্পর্ক কোন ধারাতে প্রবাহিত হয়ে, কোন কোন স্তরে পরিশ্রুত হয়ে এই পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে।

'যাত্রাপথ' গল্পের শেষে মলিনার মনে হয়েছে, "কোথায় সে নিদারুণ ভাবে আঘাত পাইয়াছে তাহা সে নিজেও বুঝাইতে পারিবে না, কিন্তু হঠাৎ তাহার সমস্ত জীবন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে," আর অজয়ের মনে হয়েছে, "এই নিতান্ত সাধারণ মেয়েটিকে চিরজীবনের বোঝারূপে বহন করায় কোন উন্মাদনাই নাই।" হাওড়া স্টেশন থেকে পরস্পরের প্রতি গভীর মোহে শুরু হয়েছিল তাদের যাত্রা, কিন্তু পাটনা স্টেশনে পৌঁছোবার আগেই কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাদের সে-মোহ একেবারে কেটে গেল: ঘটনাগুলির কোনটিই তেমন উল্লেখযোগ্য বা বিচ্ছিন্ন ভাবে তাদের কারও জন্যেই অবশ্যই নয়; কিন্তু নিতান্ত উপেক্ষণীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির সমষ্টিফল তাদের জীবনের ভিত্তিতে ভয়ংকর কাটল ধরিয়ে দিয়েছে। আসলে ঘটনাগুলির কোনটিই তুচ্ছ নয়, দূর অর্থবোধক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মানুষের চরিত্রের এক-একটি অব্যর্থ দিক নির্দেশক এবং এগুলির নির্বাচনে ও সংস্থাপনে অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম-শিল্প-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। অজয় ও মলিনার দাম্পত্য সম্পর্কের এক রূপ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত রূপে যেভাবে পাঠককে টেনে নিয়ে গেছেন লেখক তাতে এক মুহূর্তের জন্যেও এই দাম্পত্য সম্পর্কের বিপর্যয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে পাঠকচিত্তে সংশয় জাগে না।

দাম্পত্য সম্পর্কের বিপর্যয় আরও ভয়ংকর ও শোচনীয় রূপ পেয়েছে 'শৃঙ্খল' গল্পটিতে। 'হয়ত' গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের অস্বাভাবিকতার উপরে মহিমের বংশধারা ও রহস্যপুরীর আবহের প্রভাব কাজ করেছে। গল্পটির শ্বাসরোধকারী পরিবেশকে বৈপরীত্যে প্রকট করে তুলেছে মাধুরী চরিত্রের প্রখর উজ্জ্বলতা। গল্পের শুরুতেই দুর্যোগের রাত্রিকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে এক দারুণ পরাক্রান্ত চিত্রকল্পে: "নির্জন পথের যেখানে যেখানে গ্যাসের আলো পড়িয়াছে, সেখানে মাটি আর চোখে পড়ে না—শুধু বৃষ্টিধারাহত জল চিকচিক করিতেছে দেখা যায়। পথের ধারের গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায় অসহায় বন্দীর মত মাটির শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।" বর্ণনার সংযম, শব্দের পরিমিত যথাযথ প্রয়োগ এবং অর্থপূর্ণ অলঙ্কারের সুচিন্তিত নির্বাচন লক্ষণীয়; পরিবেশের দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে আকুল মহিম-লাবণ্যের এবং চিকচিক জলের সঙ্গে মাধুরীর একটা উপমাও এখানে সংগোপনে প্রচ্ছন্ন আছে। মহিম ও লাবণ্যের সঙ্গে পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ হলো দুর্যোগের

রাত্রিতে একটা অর্ধসমাপ্ত সেতুর উপরে এবং নদীর দু পারের মধ্যে মিলনের সেতুটা যে অসমাপ্ত এটাও তাদের অপূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্কেরই ব্যঞ্জনা; এই দাম্পত্য সম্পর্ক আগা-গোড়াই অত্যন্ত অস্বাভাবিক—একটা অপ্রতিকার্য অবক্ষয়ের সংক্রামে কলুষিত ও বিকৃত। প্রকাণ্ড সাত মহলা দালানের ভগ্নাবশেষ, পিসিমার বীভৎস জরামূর্তি, তার বিপুল গোপন সম্পদ ইত্যাদি একটা যুগ ও শ্রেণীর ক্রমাবসীনতার কতক-গুলি ইতস্তত চিহ্নমাত্র হলেও গল্পের শরীরে এমন নিপুণ ও নিবিড়ভাবে যুক্ত যে প্রত্যেকটিই হয়ে উঠেছে অশেষ অর্থময় প্রতীক। 'হয়তো' গল্পটিতে লেখকের কল্পনাশক্তি ও প্রতীক প্রয়োগের রীতি যে-উচ্চতায় উন্নীত 'শৃঙ্খলে' তা হয়নি, হবার সুযোগও ছিল না; কিন্তু প্রত্যক্ষ জীবনের অভ্যন্তরে যে-জীবন কুটিল আবর্তে প্রবাহিত তার স্রোতে 'শৃঙ্খলে'র লেখক অবতীর্ণ। গল্পের শেষে ভূপতি ও বিনতির দাম্পত্য সম্পর্ককে প্রেমেন্দ্র মিত্র নির্ধারণ করেছেন, "তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল—জীবনের কি আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।" দাম্পত্য সম্পর্কের এই পরিণতি যেমন মর্মান্তিক তেমনই ভয়ঙ্কর এবং এই পরিণতি সম্বন্ধে লেখকের অনুধাবনা একটা দুঃসাহসিক মনস্তাত্ত্বিক সাফল্য; জীবনের অতল স্রোতে অবতরণের দুঃসাহস যদি বা কোনও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হয় তবু কোনও দম্পতী-জীবনের এই অন্তর্গূঢ় স্বরূপকে আলাপে আচরণে পরিস্ফুট করার জন্যে চাই অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা এবং এগল্পটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র তারই পরিচয় দিয়েছেন। 'হয়তো' গল্পে অকুস্থলের রহস্যময় পরিমণ্ডল থেকে অর্থাৎ বহুলাংশে বুদ্ধি-ও-দৃষ্টি-গ্রাহ্য সূত্র অবলম্বনে লাবণ্য ও মহিমর অস্বাভাবিক সম্পর্ক কল্পনা করার সুযোগ লেখক পেয়েছিলেন, কিন্তু 'শৃঙ্খলে' কোনও বাহ্য অবলম্বন নেই, এখানে প্রেমেন্দ্রর একমাত্র সম্বল মানব-চরিত্রের গহনে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি: প্রথমটি উদ্ভাবনে পরেরটি অনুধাবনে দুটি বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি।

পৃথিবীর যে-দিকটা চার প্রহর আলোকিত থাকে সে-দিকটার মতো উল্টো দিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপটাও সত্য আর মানবচরিত্রের সেই অদৃশ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপের কথা প্রকাশ করেই প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পের ধারাকে অপ্রত্যাশিত পথে চালনা করেন—তাঁর এই ছোটগল্পগুলিতে আছে লক্ষ্যের একাগ্রতার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতের চমক। অথচ এমন নয় যে চরিত্রের নিজস্ব বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে আকস্মিকভাবে অস্বাভাবিক পথে ঘুরিয়ে দেন জোর করে। একই সঙ্গে পৃথিবীর সব দিক আলো পায় না এবং এই আলো-অন্ধকারের রহস্য যেমন সামগ্রিকভাবে তেমনই প্রাতিস্বিকভাবে মানুষের জীবনেও বর্তমান, তাই যখন প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি চরিত্রের প্রকাশিত দিক থেকে তার অপ্রকাশিত দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং একটা অব্যাহত অনিবার্যতার সঙ্গেই করেন, তখনই নতুন অভিজ্ঞার উদ্দীপনে পাঠকের চিত্তে চমক সৃষ্টি হয়। মোপাসাঁ, ও হেনরি প্রমুখ পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ছোটগল্পকারই কোনও একটা তথ্যকে পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে যতক্ষণ রাখা সম্ভব ততক্ষণ রেখে শেষ মুহূর্তে ফাঁস করে অভিপ্রেত চমক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র শেষ মুহূর্তে আস্তিনের ফাঁক থেকে তাস বের করে পাঠককে তাক লাগাবার রীতিকে উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশল বলে মনে করেননি। তাঁর পক্ষপাত চরিত্রের অপ্রকাশিত দিকে, জীবনের রহস্যময় কুহকভরা অন্ধকারের দিকে: অন্ধকারেই আমাদের সত্তার জাগরণ যেমন হয়েছে 'একটি রাত্রি'র নায়ক সুব্রতের, আবার সেই অন্ধকারেই 'সহস্রাধিক দুই'য়ের সুনন্দের মতো আমাদের সত্তার পতন, কিংবা কলকাতার আরব্য রজনী: পরলা চোরের কেচ্ছা'র নীলাম্বরের মতো

সেখানেই আমরা স্বয়ং ভগবান হবার জন্যে প্রলুব্ধ চোরের দুর্লভ দর্শন পাই। এটা স্পষ্ট করেই বলা উচিত যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলিতে অপ্রত্যাশিতের অনবদ্য চমক থাকলেও আকস্মিকতার কোনও যথার্থ স্থান নেই।

পরিসমাপ্তির অনেক আগে থেকে তো বটেই, কোনও ক্ষেত্রে গল্পের একেবারে আরম্ভ থেকে, এবং অধিকাংশ সময়ে অনভিজ্ঞ পাঠকের অজ্ঞাতেই, অন্তিম চমকের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র সযত্ন প্রস্তুতি শুরু করেন—শুরুতে টের না পাওয়া গেলেও গল্পের শেষে অভিপ্রেত চমকের আঘাতে সচেতন পাঠকের পশ্চাদ্দৃষ্টিক্ষেপে সে-প্রস্তুতির ইতিহাস ধরা পড়ে: 'যাত্রাপথে'র মতো গল্পে সে-প্রস্তুতি প্রকাশ্যে আর 'পলাতকা'র মতো গল্পে রহস্যের আবরণে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু যেভাবেই হোক প্রস্তুতি-পর্ব একটা আছেই। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' আর 'কুয়াশায়' বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির অন্যতম —দুটির গল্পেরই পরিণতিতে চূড়ান্ত হতাশার একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং এই প্রতিক্রিয়া অথবা বেগুন ও সরমার সমস্যার সমাধান যেমন মর্মান্তিক তেমনই চমকপ্রদ, এবং গল্পদুটির পরিণামের মূলে বেগুন ও সরমার ব্যক্তিত্বের জটিলতার চাইতে তাদের স্ব-স্ব জাগতিক পরিস্থিতিরই অবদান প্রধান, দুজনেই অপর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ দেখেই সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে সম্পূর্ণ নিরুপায় ভাবে আপন আপন পরিস্থিতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, নতি স্বীকার করেছে এবং একটু গভীরে নেমে বিচার করলেই স্পষ্ট হবে যে এখানে পরিস্থিত আর পরিণাম শব্দ দুটি আসলে একই সত্যের প্রার্থী। চরিত্রের অনন্যোপায় আত্মসমর্পণ থেকেও যে ছোটগল্পের চমক সৃষ্টি করা সম্ভব এটা প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমাণ করেছেন। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী চরিত্রকে উপস্থাপন করে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তাতে মানুষের কোন কোন স্বভাব ও স্বরূপ প্রকাশ পায়; অর্থাৎ এটাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপলব্ধি যে মানুষের মানে জানতে হলে, তার যথার্থ স্বভাব ও স্বরূপকে জানতে হলে তাকে ফেলতে হবে একটা কোনও চূড়ান্ত পরীক্ষায়, যেটাকে অক্ষরার্থে না বললেও ভাবার্থে বলা যায়, জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা। তাঁর 'নীলকণ্ঠ' নামক কবিতাটি এখানে স্মর্তব্য যার শেষে তিনি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছেন, "মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার আর শিব নীলকণ্ঠ।"

জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষায় নীলকণ্ঠের মতো কেউ উত্তীর্ণ হয়, কেউ পরাস্ত হয়। দার্শনিকের কাছে দুয়ের মূল্যবিচার দুরকমই হবার কথা, কিন্তু মর্মজ্ঞ শিল্পীর কাছে সফল আর বিফল দুজনেই সমান, কিংবা সমস্যাটা প্রকৃতই আরও অনেক দুরূহ। ছোটবেলার সহপাঠী বুদ্ধিশুদ্ধিতে প্রায় নীরেট অহিভূষণ বলেছে লেখককে, "কে ভণ্ড কে ভালো চিনব, আমার সে বুদ্ধি কি আছে?" এই অহিভূষণের মতোই প্রেমেন্দ্র মিত্রও যেন তাঁর ছোটগল্পগুলির সারমর্মে বলতে চেয়েছেন, কে যে সফল আর কে-ই বিফল তা বিচার করার শক্তি কি সাধারণ মানুষের সবসময় থাকে। 'পলাতকা'য় কমল, বাসব আর রমা তিনজনেই গল্পের শেষে জীবনবঞ্চনার একই ঘাটের একই পৈঠায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের এই সামান্য দশার কথা স্পষ্ট হয়েছে রমা সম্বন্ধে কমলের উক্তিতে: "আমরা কেউ তাকে চিনিনি। সে নিজেও নিজেকে চেনেনি এই হ'ল আমাদের সকলের সব দুঃখের মূল। নিজেও সে তাই সুখী হয়নি, কাউকে সুখী করতেও পারেনি।" পক্ষান্তরে বাসবের মনে হয়েছে, "হয়ত সমস্ত কথাই কমলের বানানো। হয়ত রমার মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী। তবু তারার আলোয় অস্পষ্ট উদাস এই প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে কথাগুলো কেমন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয়।" সাধারণ মানুষ নিজেকে অল্পই জানে, অল্পই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ঘটনাপ্রবাহকে অল্পই ঈপ্সিত খাতে চালনা করতে পারে, পুরুষকারেও তাদের অল্পই

অধিকার, এমন কি নিজের পরাভবকেও অল্পই ধারণা করতে পারে, অথচ তার আত্মাভিমানও কারও চাইতে কম নয়, নিজেরই প্রশ্নবাণে নিজেকে সে ক্ষতবিক্ষত করে, যে জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াতে কেউ কেউ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায় সেই জ্বালাযন্ত্রণার আগুনে ইন্ধন জোগায়, যে-ক্রুশে তাকে বিদ্ধ হতে হয় সেই ক্রুশ সে নিজেই বহন করে।

'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ' গল্পটি এমনই এক মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনী, কিন্তু তার নায়ক প্রশান্ত এই পরিণতিকে কিছুতেই অন্তর থেকে স্বীকার করে নিতে পারেনি বা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারেনি, ফলে জিজ্ঞাসার অবিশ্রান্ত ইন্ধনে তার ব্যর্থতার আগুন ক্রমাগত তীব্র হয়ে উঠেছে, তার দুর্দান্ত দাহকে সহ্য করেও প্রকৃতিস্থ থেকেছে গ্রীক নাটকের ভবিতব্যে পর্যুদস্ত নায়কের মতো। গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে শুরুতেই জানানো সমীচীন যে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত এই ছোটগল্প শিল্পকৌশলে একটি অতুলনীয় কীর্তি। প্রশান্তের চেতনা-প্রবাহে সমগ্র কাহিনীটির বিস্তার হয়েছে চোখের সামনে শেলফের উপরে রাখা সাধারণ অতীতের অভিজ্ঞান রূপে একটা বাতিল থার্মোফ্লাস্ক ও পুরাঘটিত বর্তমানের প্রতীক দৈনিক পত্রিকায় চীনের উপর জাপানের বর্বর আক্রমণের বিবরণের অনুষঙ্গে—যেখানেই প্রশান্তের চেতনা ক্লান্ত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে চেয়েছে সেখানেই বাতিল ফ্লাস্ক বা টাটকা খবরের সূত্র দুটির কোনও একটি তাকে পুনরায় স্মৃতিচারণায় প্রণোদিত করেছে। 'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ' গল্পটি আগাগোড়া সূত্র ও স্মৃতির মধ্যে অত্যন্ত অনায়াস ও সাবলীল পর্যায়-ক্রমিক প্রসরণের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো কঠোর বাক্‌সংযম ও ভাব-প্রবণতার আমূল বর্জন, প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহারে নিষ্ঠুর মিতব্যয়িতা ও চিত্রকল্পের নিখুঁত যথাযথ বিন্যাস, প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তরের মধ্যে অমোঘ শৃঙ্খলা বিধান, যেন এক একটি ছোটগল্পে এক একটি মহাকাব্যকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা আছে, তাই তাঁর উৎকৃষ্ট ছোটগল্পগুলিতে পাঠক বা লেখক কারও পক্ষেই কণামাত্র অন্যমনস্কতা, ক্লান্তি ও শৈথিল্যের প্রশ্রয় নেই, সেগুলি প্রত্যেকটি মুহূর্তের জন্যে পরিশ্রমী, সজাগ, সতর্ক তন্ময় অভিনিবেশ দাবি করে। 'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ' এজাতীয় বহু ছোটগল্পের একটি।

ছোটগল্প কাকে বলা যায় সে-সম্বন্ধে 'অফুরন্তে'র শুরুতে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, "গল্প চলে বহুবর্ষ স্রোতের মত অবিশ্রান্ত বয়ে; তার মাঝের খানিকটা ধার মাত্র,—এই ঘাট থেকে আর এক ঘাট। ব্যস, এই পর্যন্ত।" সাধারণভাবে ছোটগল্পের শুরু ও সারা সম্বন্ধে এই মন্তব্য আপত্তিকর হয় কিন্তু মন্তব্যটির নিদর্শন দিতে গিয়ে তিনি 'অফুরন্ত' গল্পটি শুরু করেছেন এভাবে: "বনমালী ঘোষ পুরনো রঙচটা দোশা গায়ে দিয়ে ভাঙা দেউড়ি দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ার-ধর গল্পের আরম্ভ।" আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত নিরীহ নিরুত্তাপ এই বর্ণনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখি: দোশা গায়ে দিয়েছে যখন তখন বনমালী ঘোষ নিশ্চয়ই বিত্তবা কিন্তু দোশালাটি পুরনো ও রঙচটা দেখে অনুমান হয় যে ও বিত্ত বর্তমানের নয়, অতীতের আর এ-অনুমান দৃঢ় দেউড়িটা ভাঙা জানার পরে। তার মানে বনমালী ঘো বংশ একদা বিশেষ বিত্তবান ছিল, এখন তার পতিত দ সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে গড়ে ওঠে বাংলার এক প্রা বিত্তবান সামন্ত বংশের পতনের দীর্ঘ কাহিনী। পাঠক আলাদা ভাবে ইতিহাস-সচেতন হয় তাহলে সে কালের ধারায় কেমন করে সামন্ত শ্রেণী নতুন ধনিক শ্রেণী পথ ছেড়ে দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিলীন হয়ে সেকথাও স্মরণ করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই থেকে আর এক ঘাটে যাওয়ার কাহিনী নিয়েই ছো বলা সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই যে-কোন ঘাট থেকে যে-কোন ঘাটে যেতে রাজি নন, কোন্ বিশেষ ঘাট কোন্ অপর বিশেষ ঘাটে যাওয়া যায় সেবিষয়ে বিচারশী

পক্ষপাতী। অর্থাৎ এমন ঘাট থেকেই তিনি যাত্রা শুরু করেন যেখান থেকে স্রোত একটা বাঁক নিয়েছে এবং যে-বাঁক থেকে পেছনে উৎসের দিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় এবং তাঁর ছোটগল্পগুলির সমাপ্তি বিশ্লেষণে এটাও ধরা পড়বে যে এমন ঘাটেই তিনি যাত্রা সারা করেন যেখান থেকে সামনে মোহানার দিকে বহুদূর পর্যন্ত চোখ চলে।

'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ' গল্পটির প্রসঙ্গে 'অফুরন্তে'র প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণ একথাটাকেই বোঝানো যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প প্রথম থেকেই সাবধানে আস্তে আস্তে বুঝে বুঝে পড়া নিতান্তই জরুরি। দিনের অন্য কোনও সময় অথবা প্রশান্তের কাজকর্মের মধ্যে থেকে শুরু না করে তার ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর থেকেই গল্পটি শুরু করেছেন। এ জাগরণ তার কাছে উপভোগ্য। কেন? "বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজেকে যেন সে আবিষ্কার করতে থাকে সবিস্ময়ে—এক এক করে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তারপর অত্যন্ত কাছের আবেষ্টন, তারপর আরও জটিল, আরও বহুদূর প্রসারিত, বহু সম্পর্কে জড়িত সত্তা।" এখানে প্রশান্তের ঘুম শুধু স্নায়বিক প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ অবস্থা নয়, তা চৈতন্যের নিষ্ক্রিয় বা সত্তার বিস্মৃত অবস্থাও বটে, এবং এই ঘুম ভাঙা মানেই বিস্মৃতির থেকে ঘটমান বর্তমান কালে প্রত্যাবর্তন তথা চেতনার সেই প্রক্রিয়ার শামিল হওয়া যাতে মানুষ আপন অস্তিত্বের স্বরূপ জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত হয়; এরপরেই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সাধারণ অতীতের অনুষঙ্গে: "ঘাড় ফিরিয়ে এতক্ষণ সে শেল্‌ফের উপর চটা-ওঠা তোবড়ান থার্মোফ্লাস্কটার দিকে চেয়েছিল বুঝে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। সেদিন পর্যন্ত এরকম ত সে কখনও করেনি। চোখ গিয়ে পড়লেও সে ইচ্ছে করে ফিরিয়ে নিয়েছে। মনের এদিকের কপাট সে সযত্নে রেখেছে বন্ধ করে—প্লাবনের জল রুদ্ধ করে রাখবার জন্যে এ যেন তার অবচেতন মনের বাঁধ। কিন্তু আজ হঠাৎ কি হল।" এরপরে স্বভাবতই থার্মো-ফ্লাস্কটার সঙ্গে প্রশান্তের সম্পর্কটা জানার জন্যে পাঠকের কৌতূহল জাগে। সে-কৌতূহলকে নিবৃত্ত না করে সাধারণ অতীত থেকে ফিরে এসেছেন পুরাঘটিত বর্তমানে: "চীনের ওপর জাপানের অত্যাচার সম্বন্ধে ছাপার হরফের তীব্র আর্তনাদ সেখানে সমস্ত কাগজটার ওপর এমনভাবে বিস্তৃত যে লক্ষ না করে উপায় নেই।"

যে-দুটি সূত্র থেকে প্রশান্তের আত্মজিজ্ঞাসা জেগে ওঠে সে-দুটিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পশুরুতেই পাঠকের সামনে পেতে রেখেছেন, তৃতীয় কোন সূত্র গোপন রাখেননি যেটাকে গল্পশেষে আকস্মিকভাবে উত্থাপন করে অপ্রত্যাশিতের চমক সৃষ্টি করা সম্ভব। তারপর থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধের প্রসঙ্গ থেকে পর্যায়ক্রমে খুব হিসেব করে প্রশান্ত, মায়া ও অরুণের কাহিনীকে প্রশান্তেরই প্রবহমান চেতনায় ধীর ও দৃঢ় ভাবে গড়ে তুলেছেন। প্রশান্ত বার বার তার সম্বন্ধে স্ত্রীর প্রকৃত মনোভাবকে জানতে চেয়েছিল, কিন্তু তার ভালোবাসার বদলে মায়ার ভালোবাসা সে পেয়েছে কি পায়নি জানতে পারার আগেই "নিষ্ঠুর যবনিকা এল নেমে, তবু উত্তর মিলল না রক্তাক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রশ্নের—বিষাক্ত কীটের মত যা তার বুক ভেদ করে বেরিয়েছে। মায়া অনেক দিন থেকেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল, এবারে সরে গেল একেবারে, সমস্ত জিজ্ঞাসার বাইরে, যেন সাগ্রহে স্বেচ্ছায়।" তিন জনের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোথাও উগ্র বা স্পষ্ট আগ্রহ বা বিরাগ কোনটাই ছিল না অথচ তিন জনেই তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা ভয়ংকর অসংগতি ও বাহ্য নৈকট্য সত্ত্বেও একটা অনতিক্রম্য ব্যবধানকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, তার দরুণ তাদের কথোপকথনে মধ্যে মধ্যে বারুদের গন্ধ পাওয়া গেছে। মায়ার মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও প্রশান্ত সেই বারুদে আগুন দিয়ে সব আবরণকে দীর্ণ করে সত্যকে স্পষ্টভাবে জানার চেষ্টায় মিথ্যে করে বলেছে, "মায়া, অরুণবাবু এসেছেন দেখতে, অরুণ···তাঁকে ডাকব?"

কিন্তু মায়ার চেতনার বারুদে আগুন ধরল না, কারণ সে তখন আবার তলিয়ে গেছে অচেতনতায়, হারিয়ে ফেলেছে বাক্‌শক্তি। "হঠাৎ আচ্ছন্নতার ভেতরে নিজে থেকেই সে বলে উঠল—আমায় তুমি ভুল বুঝ না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি……। চেতনার শেষ স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারকে চমকিত করেই মিলিয়ে গেল। কাকে বলছ মায়া? কাকে? —প্রশান্তর আর্তকণ্ঠ ঘরের বাইরে থেকেও বুঝি শোনা গেল। তখন অনন্ত স্তব্ধতা নেমেছে।" গল্পটি এখানেই উত্তরহীন প্রশ্নে শেষ হতে পারত, পাঠকের জন্যেও উত্তর অনুমানের অবকাশ থাকত। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে কোনও ব্যক্তিগত বা কালচ্ছিন্ন ব্যর্থ প্রেমের বোধকে রূপ দিতে চাননি, সেই রূপের ব্যঞ্জনায় এক গভীরতর ও ব্যাপকতর, যে-সত্য প্রতিবোধবিদিত, যে-সত্য শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং তাকেই এখানে সহৃদয়হৃদয়সংবাদী অর্থধ্বনিতে উচ্চারণ করেছেন: তাই গল্পটির শেষে চীনের যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার বিশদ বিবরণ দিয়ে যোগ করেছেন, "জীবনের দেবতার এরকম পাইকিরী ট্র্যাজিডির কারবার এই প্রথম নয়। যুগে যুগে পৃথিবীময় ছড়ানো ধ্বংসস্তূপের আবর্জনায় একটা রঙচটা টোলখাওয়া ধার্মোফ্লাস্ক, আর একটা বুকচেরা প্রশ্ন।" শেষ বাক্যটিতে প্রগাঢ়তার প্রয়োজনে ক্রিয়াপদ পর্যন্ত বর্জিত হয়েছে।

প্রশান্ত ও মায়ার সম্পর্কের মধ্যে ব্যবহারিক অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও মনস্তাত্ত্বিক যে-বিচ্ছিন্নতা বোধের জন্ম হয়েছিল তার মূল বিস্তৃত ছিল অরুণ ও মায়ার সম্পর্কে। প্রেমের বাঞ্ছিত পরিণাম হিসেবে অরুণ ও মায়ার মিলন হয়নি। তাদের মিলনের পথে কোন বাধা ছিল তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'দেখা' গল্পটিতে অপরেশ ও সুপর্ণার মিলন না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন "ইতিহাস অবশ্য সেই মামুলি। তাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ অপরেশের বাড়ির লোকের সায় পায়নি" এবং অরুণ ও মায়ার বেলাতেও একই জাতের ইতিহাস থাকা সম্ভব। কিন্তু তাদের মিলনের বাধা যাই থাক সেজন্য যে প্রশান্তের কণামাত্র দায়িত্ব ছিল না সেটা স্পষ্ট, অথচ অরুণ ও মায়ার প্রেমের ব্যর্থতা প্রশান্তের দাম্পত্য জীবনকেও ব্যর্থ করে দিল। বিবাহপূর্ব প্রণয় থেকে উদ্ভূত বিবাহোত্তর জীবনের জটিলতা প্রেমেন্দ্রের একটি অত্যন্ত প্রিয় প্রসঙ্গ এবং পারিবারিক তথা সামাজিক অর্থাৎ দেশ-কাল-গত বাধাকে ভেঙে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের নজির তাঁর সমগ্র রচনাবলীতেই বিরল; আরও লক্ষণীয় যে অপরিণত বয়সের সরলচিত্ত নায়কনায়িকার আবেগে অন্ধ উচ্ছ্বসিত বিবেচনাহীন বন্ধনজয়ী প্রণয়ের উপাখ্যান রচনাতেও তিনি বিমুখ। পরিপার্শ্বের উত্তাপে পরিপক্ক, ঔপনিবেশিক অথবা অনগ্রসর সমাজের আধা-মধ্যযুগীয় আধা-আধুনিক নিয়মবিচার ও রীতিনীতির জালে আবদ্ধ যে চরিত্র অর্থাৎ যার ব্যক্তিত্বে শ্রেণিসত্তা প্রকট রূপ লাভ করেছে তারই অনিবার্য জটিলতা, দ্বিধাগ্রস্ততা ও সমস্যার তাৎপর্য অন্বেষণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সর্বাধিক আগ্রহ।

'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'র নায়ক ও করুণার বিচ্ছেদের মূলে করুণার পরিবারের মর্যাদার প্রশ্ন ছিল; সে-মর্যাদাকে পেছনে ফেলে উদ্দাম আকর্ষণে করুণা ছুটে এসেছিল তার প্রণয়ীর কাছে আশ্রয়ের জন্যে, কিন্তু ছাপোষা মধ্যবিত্ত সন্তান তখন আপন আর্থিক অনিশ্চয়তায় করুণাকে আশ্রয় দেওয়ার সাহস পায়নি। কয়েক বছর পরে যখন তাদের অকস্মাৎ দেখা হলো তখন দুজনেই নিজের নিজের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নায়ক তখন তার পূর্ব অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করতে উৎসুক: করুণার মনে সে জায়গাতে চেয়েছে প্রথম প্রেমের উন্মাদনা। এবার করুণা তাকে নিরস্ত করে, কেননা সে এখন বিমলবাবুর সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী। অভিমানে নায়ক বিমল-করুণার আতিথ্য অস্বীকার করে বিদায় নেয়, এমন সময় সহসা করুণা এসে আবার মোড়ক

ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায় তার সঙ্গে। নায়কের পক্ষে প্রচণ্ড উল্লসিত হবার মতোই প্রস্তাব, কিন্তু উল্টে সে বিব্রত হয়ে অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করল করুণার প্রতি—সে-উপদেশ যে অত্যন্ত মূল্যবান ও নায়কের গভীর বিবেচনা-প্রসূত তাতে কোনও দ্বিমত ও সংশয়ের অবকাশ নেই, কিন্তু একই সঙ্গে উদ্ঘাটিত হলো বিচক্ষণ নায়কের নিপাট কাপুরুষতা ও ভণ্ডামি এবং এই উদ্ঘাটন উগ্র হয়েছে তখনই যখন করুণার বিদ্রূপের মুখে নায়ক স্বয়ং আপন আচরণের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে। প্রকৃতপক্ষে এই কাপুরুষতা এই ভণ্ডামি আধুনিক অভিহিত সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত অক্ষম খণ্ডিত দুর্বল ধ্বজভঙ্গ ব্যক্তিস্বরূপেরই সুসংহত ও সার্থক ভাষ্য।

( নবম পরিচ্ছেদ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

: উপন্যাস

উত্তরখণ্ড

# কত্তরা ব্রিজ

মিহির মুখোপাধ্যায়

## ষোল

মামুদ জাফরের গল্প শেষ হ'ল। তখন বেলা দুপুর। বৈশাখের রোদদুর মাথায় নিয়ে হাটছিল ভারতচন্দ্র। গোন্দলপাড়ায় রামেশ্বর মুখুজ্জের বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিল।

শিবদাস একবার বলেছিল—এত বেলায় আর নিজে রান্না করে খাবে কেন, বরং আমার বাড়িতে চলো, তোমার মেজদি'ও বলে দিয়েছিল—

সব কথা তখন ভারতের কানে ঢোকেনি। তখনও মামুদ জাফরের গল্প শেষ হয়নি। একবার শুধু মনে হয়েছিল, রঘু অপেক্ষা করে থাকবে।

রামধনের কাছ থেকে বরাদ্দমত চাল-ডাল-তেল-মশলার সিধে এনে সব গোছগাছ করে রাখবে রঘুনাথ। মশলা বাটবে, তরকারী কুটবে, চালডাল ধুয়ে এনে উনুনে কাঠ-সাজিয়ে বসে থাকবে।

ছোটকর্তা ফিরে এসে রান্না করবেন।

কিন্তু এত বেলা হয়ে যাবে বুঝতে পারেনি ভারতচন্দ্র। শিবদাসের কোন কথার জবাবও ভালভাবে দিতে পারেনি। মাথার মধ্যে তখন মামুদ জাফরের গল্পের ঘটনাবলী ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সেই সূত্র ধরে আরো নানা চিন্তা। কী বীভৎস নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনতে হ'ল।

বাংলাদেশে আজকাল মানুষের প্রাণের মূল্য একটা কাণা কড়িও নয়।

কথায় কথায় মানুষ খুন হতে পারে, গুম হতে পারে, ঘর-দোরে আগুন লাগতে পারে, মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হতে পারে। এই অনিশ্চিত নিয়তির হাতে ধনী-দরিদ্র, শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ কারো নিস্তার নেই। গত দু'তিন বছর ধরে ক্রমাগত বর্গীর হাঙ্গামার জন্য বাঙলা দেশের এই অবস্থা হয়েছে।

শুধু বাংলা মুলুক নয়, তামাম হিন্দুস্তান জুড়েই এই অরাজকতা, অনিশ্চিত অস্থিরতা চলছে। প্রত্যেকটি সুবার শাসনে অনিয়ম অনিশ্চয়তার জন্য ক্রমাগত ওলটপালট হচ্ছে।

রাজনীতির জটিল আবর্ত্ত মন্থন করে হিংসা বিদ্বেষের হলাহল উঠছে। যার ফলে সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম যেমন ঘোরতর বিপদগ্রস্থ, তেমনি সমাজ-জীবনের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ন্যায় অন্যায় বিচার বুদ্ধি, ধর্মচেতনা, সুস্থচিন্তা, সমস্ত মূল্যবোধ বিপর্যস্ত।

আলমগীর বাদশাহর মৃত্যুর পর থেকে দিল্লীর শাসন যতই দুর্বল হচ্ছে, ততই বিশৃঙ্খলা বাড়ছে। তথাপি বলা যায়, মুর্শিদকুলির আমলে সুবে বাংলায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

সেই আইনের শাসন আলিবর্দীর আমল পর্য্যন্ত কোনরকমে টিকে আছে। কিন্তু ওই বুড়ো যেদিন চোখ বুজবে সেদিন থেকেই চরম অরাজকতা শুরু হবে।

মামুদ জাফরের গল্পের মধ্যে সেই সর্বনাশের সূচনা যেন টের পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রদীপ নিবে যাবার আগে যেমন দপদপিয়ে ওঠে, তেমনি বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খাঁন যেন শেষ বারের মত জ্বলে উঠেছেন। ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে এতজন মারাঠা সর্দারকে খতম করেছেন। কিন্তু এর পর কি হবে? এখানেই কি সমস্ত বিরোধ মিটে যাবে, সব অত্যাচারের ইতি হবে? বর্গীরা কি এত সহজে হার মেনে নেবে? ভাস্কর পণ্ডিতের প্রভু রঘুজী ভোঁসলা কি এত সহজে রেহাই দেবেন? সব কাজেরই ভালমন্দ ফলাফল আছে। ভাল কাজের ভাল ফল, মন্দ কাজের মন্দ। বর্গী বদমাশরা তাদের কর্মফল ভোগ করেছে। তারা নিঃসন্দেহে নির্মম অত্যাচারী। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মনের কোনে কোথায় যেন একটা সামান্যতম দুর্বলতার স্মৃতি লুকিয়ে আছে। তার ঘোর বিপদের দিনে, সে যখন নিরুপায় নিরাশ্রয় অবস্থায় মেদিনীপুরের বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, সেই দুঃসময়ে বর্গীদলের সর্দার শিবভট্ট তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পুরীধামে তাঁর নিরাপদ বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মারাঠা-নায়ক শিবভট্টের সেই অনুগ্রহের কথা সে চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

মানকরার ময়দানে যারা খুন হয়েছেন, সেই সর্দারের মধ্যে শিবভট্ট ছিলেন কি না সঠিক বলতে পারলো না মামুদ জাফর। সকল নায়কের নাম সে জানতে পারেনি।

যোদ্ধার জীবন-মৃত্যু বোধহয় ঈশ্বরের নিকটও অনিশ্চিত। কোন নিদারুণ লড়াই থেকে কে অক্ষত দেহে ফিরে আসবে আর সামান্য সংঘর্ষে কেইবা প্রাণ হারাবে কেউ নিশ্চিত বলতে পারে না। শিবভট্ট যদি প্রাণ দিয়ে থাকেন, তবে সমবেত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এ নিয়ে এখন আর আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই।

আর একটি খবর দিয়েছে মামুদ জাফর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাকি মুক্তি পেয়ে কৃষ্ণনগর ফিরে এসেছেন। আরো যে কয়জন জমিদার-তালুকদার বাকি খাজনার দায়ে কয়েদ ছিলেন সকলকেই নাকি খালাস করে দিয়েছেন নবাব বাহাদুর।

এবার কৃষ্ণনগর যাবার আয়োজন করতে হবে। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের অনুমতি নেয়া দরকার। রামেশ্বর মুখুজ্জের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। শিবদাস, যমুনা সকলের সঙ্গেই কথা বলবে। কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে একবার শ্বশুরবাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে। সেই দশদিনের শিশুটি এখন প্রায় দেড়মাসের হয়েছে। শিশু কোলে রাধার জননী-মূর্তিটি মনে মনে কল্পনার চেষ্টা করল ভারতচন্দ্র।

কেমন আছে ওরা? এই বেশী বয়সের প্রথম সন্তানকে কি ভাবে যত্ন করছে রাধা। কেমন করে মানুষ করছে। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। চলমান দৃশ্যাবলীর মত একটার পর একটা ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে, পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। মানকরার হত্যাকাণ্ড, কটকে শিবভট্টর শিবিরের স্মৃতি, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি, তারপরেই শিশুকোলে রাধার লাজুক হাসিভরা মুখখানি।

মনের গতি বড় বিচিত্র। নির্মম হত্যাকাণ্ডের বীভৎস দৃশ্যচিন্তার পরক্ষণেই নতুন জন্ম, নতুন জননীর কল্পনা। ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল ভারতচন্দ্র। শেষ বৈশাখের দুপুর; তপ্ত হাওয়ার হাহাকারে শুক্‌নো পাতা উড়ছে, ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে।

ওদিকে তখন রামেশ্বর মুখুজ্জের বাড়ির অতিথিশালার ভাড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রামধনকে লক্ষ্য করে বলছিল রঘুনাথ —ও পরামাণিক মশাই, আমারে একটু ঘি আরেকটু গরম মশল্লা দিবেন—ভাঁড়ার ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। ধামায় করে চাল মাপছিল রামধন। রোয়াকে বসে বড় বড় কয়েকটা কুমড়ো কাটছিল ভগীরথ। হঠাৎ বেশী বেলায় একদল লোক এসেছে হুগলী থেকে।

এদের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একেই মেজাজ

খারাপ ছিল রামধনের। তারপর এই পরামাণিক সম্বোধন শুনে হাড়ে হাড়ে চটে গেল। প্রায় মাসখানেক আগে এই দুশমন চেহারার লোকটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। দুইবেলা হাতির খোরাক টানছে। আর মুখে সবসময় ছোটকর্তার কথা। কোন সুবাদে ছোটকর্তা, কোথাকার ছোটকর্তা কিছুই জানতো না রামধন। ওর মুখেই শুনেছে, ভারতপণ্ডিতমশাই নাকি ভুরশুট রাজবাড়ির ছোটছেলে।

তা, রাজবাড়ির ছেলে এখানে এমন পরের দোরে টুলো পণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে কেন, ভগবান জানেন। এই লোকটা তাকে সব সময় আগলে রাখে। নিরিবিলি একটু বিয়ের পরামর্শ করার সুযোগ পায় না রামধন। লোকটার কথাবার্তার ধরণ ভাল নয়। কেমন কাটা-কাটা। কথার মধ্যে কিছু বাঙাল টান আছে। বাঙালেরা গোঁয়ার ধরণের হয়। বাঙালের গোঁ বড় সাংঘাতিক। আর এই ছোকরার চেহারাও ষণ্ডামার্কা। মজবুত গড়নের। নানা কারণে প্রথম থেকেই রঘুনাথের প্রতি অপ্রসন্ন রামধন।

এখন চাল মাপতে মাপতে গম্ভীর মুখে বললো—আমি পরামাণিক নই, আমরা মেদিনীপুরের মাহিষ্য, প্রামাণিক, তোমার মত নাপিত নই আমি—

খোঁচাটা গায়ে মাখল না রঘুনাথ, হাসতে হাসতে বললো—ঠিকই বলিছেন, আমি নাপিত, আমার বাবা নাপিত, আমার চৌদ্দপুরুষ নাপিত, কিন্তু নাপিতের কাম জানিনা, ছোটকাল থিকা লাঠি ধরতি শিখছি, সেদিনতো দেখিছেন—

কথাটা মিথ্যে নয়, সেদিন সত্যিই আশ্চর্য কাণ্ড দেখেছিল রামধন। আরো অনেকে দেখেছে।

ভগীরথ হরকালী সরকার, শিবদাস মুখুজ্জে, পাঠশালার ছেলেরা আর ভারতচন্দ্র। দেখিয়েছিল বটে রঘুনাথ। ভোজপুরী পালোয়ান মিশিরজী লাঠি খেলতে নেমেছিল। রঘুনাথ তার প্রিয় বাঁশের লাঠিটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রঘুনাথের চেয়ে মাথায় লম্বা, আকারেও বিশাল মিশিরজী কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতেই পারলো না। সামান্য কিছু সময় পরেই তার হাতের লাঠি ছুটে বেরিয়ে গেল।

কেমন বোকার মত তাকিয়েছিল সে আর হো হো করে হেসে উঠেছিল রঘুনাথ। সেই হাসি শুনে আঁতে ঘা লেগেছিল মিশিরজীর। হঠাৎ দুইহাত দু'পাশে ছড়িয়ে—আয় শালা কুস্তি লড়েগা—বলে এগিয়ে এসেছিল। অতবড় কুস্তিগীর মিশিরজী যদি একবার রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরতে পারত, তাহ'লে ধৃতরাষ্ট্রের লোহার ভীম গুড়া করার মত একটা ব্যাপার ঘটে যেত। কিন্তু বাঙাল নাপিতের ব্যাটা বনবন্ করে এমন লাঠি ঘোরাতে লাগল যে ভোজপুরী পালোয়ান প্রভুনন্দন মিশির তার কাছাকাছিই যেতে পারলো না। শিবদাস মুখুজ্জে খুব তারিফ করে বলেছিলেন—ভারতভায়া, ছোঁড়া বেশ লাঠি ধরতে জানে, পাকা খেলোয়াড়, বড়দাদাকে বলে ওকে আমি কুঠির পাইকের কাজে বহাল করাতে পারি—

তারপর রঘুকে লক্ষ্য করে—কিরে চাকরি করবি এখানে—

সোজাসুজি কোন জবাব দেয়নি রঘুনাথ। শিবদাসের পায়ের ধুলো নিয়ে নম্র হাসিমুখে চুপ করেছিল। সেদিন থেকেই রঘুনাথকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে রামধন। অন্যদের উপর অভ্যাসমত হম্বিতম্বি করলেও রঘুর সঙ্গে সহসা কোন কথাবার্তার মধ্যে যায় না।

এখন মনে মনে চটলেও, তেমন মেজাজ দেখাল না রামধন। যতটা সম্ভব শান্তগলায় গম্ভীর মুখেই বললো—এত বেলায় ঘি গরম মশলা দিয়ে কি হবে—

—আমি একটা এঁচোড় এনিছি, ছোটকর্তার শালী যমুনাদিদি দিলেন, ওদের গাছের জিনিস, ছোটকর্তা এঁচোড়ের ডালনা খেতি ভালবাসেন, রাঁধেনও চমৎকার, ঠিক মাংসের মতন—

—গরম মশলা, দিতে পারি, ঘি নেই—

—কেন, ওই তো ওই জালার মধ্যে ঘি আছে—

—ওই ঘি বামুনপণ্ডিতদের জন্য, তোমার জন্য নয়—

—ছোটকর্তাও বামুন পণ্ডিত, তার জন্যই চাচ্ছি—

—তোমার ছোটকর্তা এসে চাইলে পরে দেব—

—ছোটকর্তা কারো কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারেন না, আপনার দিতি হয়, আমার হাতে দিন—

—তোমার হাতে ঘি দেব—এবার মুখ ফিরিয়ে কটমট করে তাকাল রামধন—ছোটকর্তার নাম করে নিজে খাবার জন্য আইঢাই করছ, সে কি আর আমি বুঝি না বাপু, আমাকে বেশী বকিও না, ওই ঘি তোমার পেটে সইবে না, বুঝলে, সকলের পেটে ঘি সয় না—

আর যাবে কোথায়। মার মার করে উঠল রঘুনাথ— শালা তুমি আমারে কুকুর বলিছ, শালা কোথাকার মাহিষ্য ভূত—

—এই চোপরও, মুখ ভেঙে দেব—রামধন হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রঘুনাথ। রামধনের কাঁধের গামছাখানাই তার গলায় জড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর হিড়হিড় করে টেনে বাইরের রোয়াকে নিয়ে এল। হাত-পা ছুঁড়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল রামধন—বাবারে, মারে মেরে ফেললে গো, বাঁচাও বাঁচাও—

রঘুনাথ ততক্ষণে দুঃশাসনের রক্তপানের মত রামধনের বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে। দুই হাতে গলা টিপে ধরেছে। হাহা করে উঠে এল ভগীরথ। সেরেস্তা থেকে আমলা-কর্মচারী কয়েকজন। প্রভুনন্দন ছুটে এসে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিল। রঘুনাথকে ঠেলে ঠেলে যতটা সম্ভব তফাতে সরিয়ে নিল। রামধনকে তুলে বসাল ভগীরথ। মারামারির খবর শুনে অন্দরমহল থেকে রামেশ্বর মুখুজ্জেমশাই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ আগে তিনি ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বৈঠকখানা থেকে মামুদ জাফরের গল্প শুনে ফিরে এসেছেন। এখন স্নানে যাবার উদ্যোগ করছিলেন।

খাটো তেল-ধুতি পরণে, গায়ে গামছা জড়িয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসেছেন মুখুজ্জেমশাই কি ব্যাপার, কি হয়েছে, মারামারি কি জন্য—

ঠিক এই মুহূর্তে এসে উপস্থিত হ'ল ভারতচন্দ্র। বিচিত্র চিন্তার মধ্যে উদভ্রান্তের মত অনেকটা এলোমেলো পথ ঘুরে এসেছে। দুই পায়ে ধুলো। সারা মুখে, সমস্ত শরীরে ঘাম, ক্লান্তি আর প্রবল রৌদ্রের তপ্ত গন্ধ।

রামেশ্বর মুখুজ্জের কাছে তখন ইনিয়ে বিনিয়ে নালিশ করছিল রামধন—এঁচোড়ের ডালনা রাঁধবে বলে আমার কাছে এসে ঘি চাইল, আমি বললুম বামুন পণ্ডিতদের জন্য ঘি রাখা হয়েছে, তোমার হাতে দেব না, তা' শুনে আমাকে কি গালাগালি, আমি বললুম, তোমার ছোটকর্তা আসুন, তাকে বলবো, তারপর দেখুন আমার কি অবস্থা করেছে—

হাত পা ছড়ে গেছে রামধনের, দরজার চৌকাঠে কপাল ঠুকে ফুলে গেছে। শুনতে শুনতে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল ভারতচন্দ্রের। বৈশাখের সমস্ত উত্তাপ যেন মাথায় উঠে গেল।

রঘুনাথকে লক্ষ্য করে রামেশ্বর বললেন —তুমি ভেবেছ কিহে ছোকরা, আমার বাড়িটা কি গুণ্ডামি করার জায়গা, তুমি আমার লোকজনদের এইভাবে মারধোর করবে—

রামধনের পরিপাটি বক্তব্যের জবাবে কিছুই গুছিয়ে বলতে পারলো না রঘুনাথ, ক্রুদ্ধ মহিষের মত ফোঁস ফোঁস করে বললো—সব মিছে কথা বলতিছে, মোরে—

আর সহ্য হ'ল না ভারতের, কথা শেষ হবার আগেই ঠাস করে এক চড় মেরে বললো—সবাই মিথ্যে কথা বলে আর তুমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, বেরো এখান থেকে, আপদ কোথাকার, দূর হয়ে যা, সারাজীবন জ্বালাচ্ছে—

সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বরও বললেন—তুমি এখুনি বেরিয়ে যাও, প্রভুনন্দন এই গুণ্ডাটাকে ঘাড় ধরে বার করে দাও—তারপর চারপাশে তাকিয়ে বললেন—তোমরা আর এখানে কেউ ভীড় ক'রো না, যে যার কাজে যাও, অনেক বেলা হয়ে গেছে—হুকুমজারি করে অন্দরে চলে গেলেন রামেশ্বর। প্রভুনন্দন মিশিরকে আর ঘাড় ধরে বের করে দেবার ঝামেলা পোয়াতে

হ'ল না। নিজেই চলে গেল রঘুনাথ। নিজের সামান্য কাপড়ের পুটুলিটা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে বাঁশের লাঠিটি হাতে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে এসে ঢক ঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে তক্তাপোষের উপর গা এলিয়ে দিল ভারতচন্দ্র। অসম্ভব গরম। হাত পাখা নেড়ে নেড়ে হাত ব্যথা হয়ে গেল। উপরে খড়ের ছাউনি।

দক্ষিণের খাড়া রোদে পাতলা ইটের দেয়াল তেতে আগুন হয়ে আছে। বাইরে তপ্ত বাতাস, কিন্তু দরজা বন্ধ করার উপায় নেই। একটিমাত্র ছোট্ট জানালাটা দিয়ে আলোবাতাস তেমন কিছুই আসে না। দরজা বন্ধ করলে ভেতরটা ভ্যাপসা গুমোট হয়ে উঠবে।

খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শেষে মেজের মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল ভারত।

তোষকের বিছানা থেকে স্যাঁতসেতে মেজেতে বরং কিছুটা স্বস্তি।

হুগলী থেকে অসময়ে যারা এসেছে, সেই পাঁচজনের দলটি গঙ্গার ঘাট থেকে স্নান করে ফিরেছে। পাশের ঘরে তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সামনের রোয়াক দিয়ে ওরা হাঁটাহাঁটি করছিল। ওপাশে রান্নার চালায় রান্নার আয়োজন হয়েছে। ভগীরথ সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

ওদের কিছু কিছু কথাবার্তা কানে আসছিল ভারতের। এরা তাঁতী-চাষী শ্রেণীর লোক। চুঁচুড়ার ডাচকুঠির সঙ্গে কাজ-কারবার আছে। আদায় উসুলের কোন সমস্যা নিয়ে এরা ডাচকুঠির দেওয়ান রামেশ্বর মুখুজ্জের কাছে দরবার করতে এসেছে। নাটমন্দির আর অতিথিশালার মধ্যে ফাঁকা জায়গাটার একপাশে ছোট একটি তুলসীমঞ্চ রয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে শুয়ে শুয়েই দেখতে পেল ভারতচন্দ্র।

এই দলের যিনি মোড়ল সবচেয়ে প্রবীণ সেই ব্যক্তিটি ভেজা কাপড়েই তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করছেন। হাতে জলভরা পেতলের ঘটি। এক এক পাক ঘুরে এসে ঘটি থেকে তুলসী-গাছের মাথায় অল্প অল্প জল ঢালছেন, আবার বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘুরছেন।

মানুষটির ময়লা রঙ, পাকানো শরীর, মাথার কদমছাঁট চুল ধপধপে শাদা। ঝুনো নারকেলের মত শুকনো মুখে ঠিক নাকের ডান পাশে উঁচু একটা কালো তিল। বিড় বিড় করে কি যে বলে চলেছেন এতটা দূর থেকে শুনতে পাবার কথা নয়, তবে ঠোঁট নাড়া দেখতে পাচ্ছে ভারত।

ধর্ম আচরণের, ভক্তি নিবেদনের কত বিভিন্ন পদ্ধতি। এই কয়েকমাসে এই নাটমন্দিরে, এই অতিথিশালায় কত রকমের সাধুসন্ন্যাসী, অতিথি-অভ্যাগতের ধর্মানুষ্ঠানের কত যে বিচিত্র প্রক্রিয়া দেখেছে ভারত, তার আর ইয়ত্তা নেই। ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এসেছিল।

সামান্য তন্দ্রার মত। হঠাৎ পায়ের শব্দে ঘোর কেটে গেল। তাকিয়ে দেখল আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকেছে ভগীরথ। চাপা গলায় বলল—পণ্ডিতমশাই, আপনি রান্না করবেন না—

—না ভগীরথ, এবেলা আর কিছু খাবো না, ভালো লাগছে না—

—তা'তো ঠিকই, এরকম একটা ব্যাপার হলে কারো কি আর কিছু ভালো লাগে না কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করে, তবে কি জানেন—বলতে বলতে চট করে বাইরের দিকে একবার উঁকি মেরে দেখল ভগীরথ। বোধহয় রামধন কাছাকাছি কোথাও আছে কিনা দেখে নিল। তারপর আরো কাছে এসে আরো চাপা গলায় বললো—দোষ একা রঘুনাথের নয়, এক হাতে কখনো তালি বাজে না, নায়েব মশাইর বাড়ি থেকে আপনার জন্য একটা এঁচোড় পাঠিয়ে দিয়েছে, রঘুই হাতে করে এনেছিল আর সেইজন্যই ঘি, গরম মশলা চেয়েছিল, তা'তে রামধন ঘি তো দিলই না, উলটে শুনিয়ে দিল, সকলের পেটে ঘি সয় না, আমি নিজের কানে শুনলাম, এতে কুকুর বলা হ'ল কিনা আপনি বুঝে দেখুন,

আমরা তো জানি কুকুরের পেটে ঘি সয় না, আপনিই বলুন—

—আমি কিছু বলতে চাই না ভগীরথ, ওসব কথা আর আমার ভাল লাগছে না—

ভারতের জবাব শুনে আমতা আমতা করে আবার বললো ভগীরথ, তা'হলে আপনি কিছুই মুখে দেবেন না, এতবড় একটা এঁচোড় এটা কি হবে—

তক্তাপোষের নিচে ছিল এঁচোড়টা। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি ভারতচন্দ্র। ভগীরথের কথার জবাবে বললো—ওটা তুমি নিয়ে যাও, রান্না করে খেও, এখন যাও, দরজাটা একটু টেনে দিয়ে যেও—আর কথা বাড়াল না ভগীরথ। অভাবিতভাবে একটি কচি কাঁঠাল উপহার পেয়ে প্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করল। যাবার আগে দরজার একটা পাল্লা টেনে অর্ধেকটা ভেজিয়ে রেখে গেল। আর সেই আবছায়া অন্ধকার ঘরে গুমোট গরমের মধ্যে স্যাঁতসেতে মেজেয় মাদুরে শুয়ে হাত-পাখা নাড়তে নাড়তে ক্লান্ত, বিষণ্ণ, অভুক্ত ভারতচন্দ্র একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

( ক্রমশঃ )


## খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

| | |
|---|---|
| শ্রীগীতা | ৭·৫০ |
| শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম | ৭·০০ |
| ভারত-আত্মার বাণী | ৫·০০ |
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১·৫০ |
| কর্মবাণী | ১·২৫ |
| Soul of India Speaks | 5·00 |

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসাগর | ২·২৫ |
| মানুষের মত মানুষ | ·৭৫ |
| শিশু রামায়ণ | ·৬২ |
| শিশু মহাভারত | ·৭৫ |

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

| | |
|---|---|
| বাংলার ঋষি | ৩·০০ |
| বাংলার মনীষী | ১·৩০ |
| বাংলার বিদুষী | ২·০০ |
| বীরত্বে বাঙালা | ১·৫০ |
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২·০০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ৪·০০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১·৫০ |
| রবীন্দ্রনাথ | ১·২৫ |
| যুগাচার্য বিবেকানন্দ | ১·৫০ |
| আচার্য জগদীশচন্দ্র | ২·৫০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১·৫০ |

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

# সাহিত্যের লক্ষ্যহীন যাত্রা

বিজয় কুমার দত্ত

সমাজ-ব্যবস্থা যখন সুস্পষ্ট ভাঙন ও বিপর্যয়ের মুখে, তখন সাহিত্যের ছবি সেই ভাঙনের চরিত্র যে তুলে ধরবে তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ভাঙন মূলতঃ ও মুখ্যতঃ মধ্যবিত্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, ফলে বর্তমান সাহিত্যে সেই বিপর্যয়ের ছবিকেই তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, এখনো আমাদের সাহিত্যে মধ্যবিত্ত আদর্শের প্রতিধ্বনি বহুশ্রুত। ফলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক চরিত্রের বিপর্যয়ের চিত্র, এই বহুঘোষিত সাহিত্যমানসে উজ্জ্বল নয়।

বাংলাদেশে সাক্ষরের শতকরা হার এখনো তিরিশের নীচে। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য, পূর্ববঙ্গে যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে, তাও নয়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের পাঠকের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে অল্প। এর সঙ্গে যদি সাহিত্য-সম্পর্কে উদাসীন জনসমাজকে ধরতে হয়, তাহ'লে এই ১৯৭০ সালে, —স্বাধীনতালাভের তেইশ বছর পরেও—বাংলাসাহিত্যকে যে বদ্ধতা, যে সঙ্কীর্ণ পরিবেশে আপন অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তার সামান্য মূল্যায়ন করা হয়তো সম্ভবপর হতে পারে।

হয়ত, কেউ কেউ বলতে পারেন বাংলা দেশে সাক্ষর-সংখ্যা একদা আরো অনেক কম ছিল, সাহিত্যপ্রিয় মানুষের সংখ্যা ছিল আরো সীমিত, তখন তো বাংলা সাহিত্যকে সঙ্কীর্ণ ঘেরাটোপে বদ্ধ করা যায়নি,—বরং আত্মবিকাশের ফল-শ্রুতিতে বাংলা সাহিত্য দেশকাল সীমানা অতিক্রম করে গেছে। বর্তমানে সঙ্কীর্ণতার ভয় অমূলক। হয়তো এই বক্তব্য অসার নয়, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে বদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা সংখ্যাধিক্য বা স্থানমাহাত্ম্যে রোধ করা যায় না. তার মৌল চরিত্র, সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই নির্ধারিত হ'য়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে যে বদ্ধতা ও অন্ধতা, তা জীবনসম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতায়।

এ যুগে জীবনসম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কর্মচঞ্চল, তা রাজনীতিপ্রসূত—অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাসঞ্জাত। এই ধ্যান-ধারণা যদি সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করার ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করত, তা অত্যন্ত সুখের হত, কিন্তু এই দ্বন্দ্বমুখর জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় তা সম্ভবপর নয়। ফলে সমাজমানস একটা দোদুল্যমান অবস্থায় কখনো বিক্ষিপ্ত, কখনো অশান্ত, আবার কখনো ক্ষিপ্ত। বর্তমান বাংলা সাহিত্য এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে নিজের পথ খোঁজার চেষ্টা করছে, সে কথা বলা বাহুল্য।

কথাসাহিত্যের মধ্যে এই আন্দোলিত অবস্থা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। তার প্রভাবশালী অংশের মধ্যে যৌনমতবাদের মুখর প্রবক্তাদের উচ্চকিত কণ্ঠ আজো বহুশ্রুত। ভঙ্গুর সমাজ-ব্যবস্থায় এ ধরণের প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়। এবং অবান্তর যৌনমিলনের বর্ণনার আসক্তি ক্ষমতাশালী লেখকদেরও মোহগ্রস্ত করে, এবং "সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে, যখন মানুষ আপনার কলঙ্কের ওপর স্পর্ধার সঙ্গে আলো ফেলে"—তখন সেই স্পর্ধা আর্টের উৎকর্ষের দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুদিন ধরে আর্টের এই স্বেচ্ছা-নির্বাচিত অভিভাবকদের, সাহিত্যের নামে আত্মঘোষণার কথা, সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকার

পাতায় পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের জৈবধর্ম যে আলোকাভিসারী,—অন্ধ আবেগের তাড়নায় একটা নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে বন্দী নয়—সে কথা এই সব অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন-দার্শনিকদের উপলব্ধি করানো কঠিন, কারণ অর্থ ক্ষমতা-প্রতিপত্তির বলে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব অনস্বীকার্য। এছাড়া যৌনদর্শনকে ভিত্তি করে একাধিক পত্র-পত্রিকা বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে, এবং সে সব পত্র-পত্রিকায় সেই ধরণের গল্প উপন্যাসই প্রকাশিত হচ্ছে, যা জীবন সম্পর্কে নর-নারীর সুস্থ ও বৈধ সম্পর্কস্থাপনের পরিপন্থী। শরীর নিয়ে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করার হাস্যকর প্রবণতা ছাড়া এ ধরণের কথাসাহিত্যে অন্য কিছু লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু কথাসাহিত্যের এবংবিধ অবস্থা যদি ওইসব পত্র-পত্রিকার সীমাবদ্ধ থাকত', তাহলে ভাবনার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তার ঢেউ এখন প্রায় সর্বত্রসঞ্চারী হ'তে চলেছে, এবং অধিকাংশ লেখকই (প্রবীণ ও নবীন) এ যুগে ভাবতে শুরু করেছেন যে প্রায় প্রতি প্যারাগ্রাফে রমণীদেহের নিরাবরণ অবস্থার বর্ণনা না দিতে পারলে লেখকের "কস্তির জোর" প্রমাণিত হবেনা। এই হাস্যকর, অথবা উপহাসেরও অযোগ্য মনোভাব, ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস নামধেয় কাহিনী বর্ণনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসের পাতায়, ব্যভিচার এবং কারণে অকারণে রমণীর বিড়ম্বিত জীবনকে একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলা পরিবেশ ছাড়া,—এই সব ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকরা আর কিছু খুঁজে পাননি। সঙ্গত কারণেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাসংঘাতের আবর্তে ভাসমান বিভিন্ন যুগকে উপেক্ষা করে এঁরা মোগল যুগকেই বেছে নিয়েছেন। ভিক্টোরীয় নীতিবোধের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় আচ্ছন্ন মানসিকতা এদেশের মানসভূমিতে কয়েকটি আগাছার সৃষ্টি করেছে মাত্র—ফলে-ফুলে শোভিত মহীরুহের সৃষ্টি হয়নি। আর, সেই বহুউদ্ধৃত সংস্কৃতবচনটির অর্থ কে না জানে—"বৃক্ষহীনঃ দেশে এড়ণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

না, কয়েকটি অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নয়। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা পুরোপুরি বৈষ্ণ মনোভাবে আচ্ছন্ন। এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে সাহিত্যকে বিভিন্ন অংশে টুকরো করে, এক এক অংশের একচেটিয়া ব্যবসা বিভিন্ন গোষ্ঠীর করতলগত হয়েছে। তাঁদের বিশেষ বিশেষ "ট্রেড মার্কের" দ্বারাই সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার হচ্ছে। সাধারণ পাঠকসমাজের ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন যে আছে, এ কথা এখন মনেই হচ্ছেনা।

বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আন্দোলন ঘটেছে। বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে এ ধরণের সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মের উপযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। এবং সংগ্রামী মনোভাব ছাড়া সাহিত্যের কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে কোন সফল আন্দোলন করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকথিত বামপন্থী রাজনীতি আজ বহুধাবিভক্ত, আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। যাঁরা এতকাল সরবে ঘোষণা করে এসেছেন যে, প্রগতি একমাত্র তাঁদের প্রদর্শিত পথেই আসতে বাধ্য—নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পথের বাঁকে এসে তাঁরা বিভিন্ন পথের পথিক হবার অভিলাষী। এই অবস্থার ফলশ্রুতি এই যে সমাজ-মানস আজ বিচিত্র অবস্থার মধ্যে আন্দোলিত হয়ে রাজনীতিকে উপদ্রবরূপে ভাবতে শুরু করেছে। এই অবস্থা, বাংলা-দেশেই স্বাতন্ত্র্য-মনোভাবে আচ্ছন্ন চিন্তাধারার অবধারিত ফলশ্রুতি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অবস্থার প্রতিফলন কেমনভাবে প্রভাবিত হবে, এ প্রশ্ন সাহিত্যপাঠকদের কাছে এই মুহূর্তে খুব জরুরী না হলেও, আগামী ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে সে ঔৎসুক্য থাকবেই।

আবেগপ্রবণ হিসেবে বাঙালীর খ্যাতি বা অখ্যাতি বহুদিনের। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন সাহিত্যবোধের মধ্যে

আবেগের প্রাবল্য ছিল অত্যধিক (এখনো যে নেই, তা নয়)। আসলে যুক্তি ও স্বচ্ছ চিন্তাধারা বাঙালী-চরিত্রে বড় একটা স্থিতিলাভ করেনি। ফলে, রাজনৈতিক মতবাদ-ভিত্তিক প্রচুর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু বৃহত্তর পাঠকসমাজের চেতনার মূল ধরে নাড়া দেবার শক্তি এখনো তাদের করায়ত্ত হয়নি। আসলে যে গোষ্ঠীবদ্ধতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, সেই গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকেই এই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উদ্ভব, এবং প্রায় সব গোষ্ঠীর মৌল বক্তব্য, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মত—"সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" কিছুদিন আগে বাংলা দেশের অতি প্রভাবশালী একটি বামপন্থী পত্রিকার গতবছরের শারদীয় সংখ্যা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটি প্রবন্ধে বর্তমান সাহিত্য-আলোচনার ধারা দেখে আমাকে নিরাশ হতে হল। ওই প্রগতিবাদী সাহিত্য আলোচনায়, একটি বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকার লেখকদের বিস্তৃত বিবরণই লেখকের উপজীব্য। এ ধরণের লেখাকে এঁরা অপসংস্কৃতি বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু সেইসব লেখাই এঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বেশী। অথচ বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক সংগ্রামী কবি-গল্পলেখক আছেন, যাঁরা তাঁদের কবিতায় ও গল্পে আধুনিক সংগ্রামী মানুষদের অভীপ্সা, যন্ত্রণা এবং অমৃত্যু প্রতিরোধের কথা বলে এসেছেন, এখনো বলছেন—তাঁদের সম্পর্কে এঁরা আশ্চর্য নীরব। স্বেচ্ছা-নির্বাচিত, এই সব প্রগতিবাদের অভিভাবকেরা,—দারিদ্র্যে পীড়িত, অবসন্ন, হতাশাচ্ছন্ন প্রতিভাবান লেখকদের সংগ্রামী ও প্রতিশ্রুতি-বান সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশে যদি উদ্যোগী হতেন, তাহলে সংগ্রামী সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা প্রমাণিত হত।

* * *

শহর অথবা শহরতলীর যে কোন পত্র-পত্রিকার ষ্টলে দাঁড়ালে দেখা যায় বিচিত্র, পত্র-পত্রিকার সমাহার। সেগুলি সমাজ-মানসের বিশেষ বিশেষ প্রবণতাকে লোকচক্ষে উন্মোচিত করতে চাইছে। এগুলির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায় সেগুলির মধ্যে নির্ভেজাল সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। এদের মধ্যে বৃহৎ সংবাদপত্রের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট কয়েকটি পত্র-পত্রিকা, সিনেমা-সংবাদভিত্তিক কয়েকটি সচিত্র পত্রিকা, যৌন-আদর্শ প্রচারে ব্রতী কয়েকটি পত্রিকা, —মোটামুটি পত্র-পত্রিকার শ্রেণীবিভাগকে প্রায় সম্পূর্ণ করে। এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে সম্প্রতিকালে প্রকাশিত রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ পত্রিকাগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতাপত্রিকা, রহস্য-কাহিনীভিত্তিক পত্রিকা এবং নানাবিধ বিষয়সমন্বিত অনিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকা, সন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবেনা বলেই আমার বিশ্বাস। এত বিচিত্র ধরণের পত্রিকার বিষয়বস্তু থেকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির চিন্তাধারার একটা আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। তার বাইরে যে বিরাট জনসমাজ অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কারের গহ্বরে পড়ে আছে, তার পরিচয় পাওয়া দুরূহ। অথচ জাতীয় মানসের সর্বাঙ্গীন চিত্র পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতনামা সাহিত্যরথিবৃন্দ এ সমস্ত জরুরী সমস্যা সম্বন্ধে মোটেই বিচলিত নন। বাংলাদেশের সাহিত্য এখনো মধ্যবিত্ত সংস্কারের বাইরে জীবনকে দেখতে ও দেখাতে খুব একটা আগ্রহী নয়। তাই উচ্চবিত্ত সমাজের হতাশা-নিঃসঙ্গতা—আশা-আকাঙ্খার প্রতি সে এখনো লুব্ধ। সাহিত্যিকরা ব্যক্তিগতভাবে সম্ভবতঃ সেই সমাজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের প্রতি চাতক পাখীর মত উর্ধ্বদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। সমাজের পতন-উত্থানের পটভূমিকায় যখন মূল্যবোধের বিপর্যয় সাধিক হয়ে ওঠে, তখন অপসাহিত্যের মুখর প্রবক্তারা সমাজের উচ্চমঞ্চে আসীন মানুষদের সর্বাঙ্গীন ব্যভিচারের রূপ পরিস্ফুট করার মধ্যেই তাঁদের সাহিত্যের মোক্ষ রূপে মনে করে থাকেন, এবং ফলে সাহিত্যের আজ যে সৌখীন রূপ বহু বিঘোষিত বিশেষ

বিশেষ পত্র-পত্রিকায়, তাতে, রবীন্দ্রনাথ কথিত সাহিত্যের সেই অবস্থার সম্মুখীন হতে আমরা বাধ্য হই, যখন—"কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব এবং টেনিসনের আসনে কিপ্লিঙের আবির্ভাব হয়"। আর, এই "কৌশল" ও "গর্ব"কে মহত্ত্বদান করার জন্য সবযুগেই কিছু ভাড়াটে সমালোচকদের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু নগদ-বিদায়ের আশায়,—লেখকরূপে বৃহৎপত্রিকাভুক্ত হবার দুরাকাঙ্খায়, এই সব ব্যভিচারী সাহিত্যের গুণকীর্তনে উন্মাদ হয়ে ওঠেন।

সাহিত্যের প্রভাবশালী অংশের প্রায় সবটুকুই আজ সংবাদপত্রের কুক্ষিগত। এই সংবাদ পত্রের পক্ষপুটে আশ্রিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই আজ সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হচ্ছে। অর্থ-ক্ষমতা—বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে প্রচার, এই সব পত্র-পত্রিকার সাহিত্য-মূলধন। এঁদের ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ প্রভাবে সাহিত্য আজ পণ্যদ্রব্যের সামিল হয়ে উঠেছে, এবং এই পত্র-পত্রিকার কর্মকর্তা ও মুষ্টিমেয় লেখকেরাই সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছেন। তাঁদের প্রসন্নদৃষ্টির কৃপায় কারো ভাগ্যে বৃহস্পতির দশা ঘটছে,—তাঁদের অপ্রসন্ন মনোভাবে কোন কোন হতভাগ্য লেখক যশোপ্রার্থীর শনির দশা ঘটছে। এ অবস্থায় যে সব চতুর লেখক উন্নতিকামী, তাঁরা সাহিত্য-সাধনার মোক্ষ হিসেবে এই সব কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জন করতেই অধিকতর আগ্রহী। সরকারী-বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে যেমন উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের তুষ্ট করার মধ্যেই উন্নতির বীজ নিহিত থাকে, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই নিয়মই প্রচলিত হয়ে উঠেছে। তাই বাংলাসাহিত্যে স্বাধীনচেতা, তেজোদীপ্ত এবং সাহসী সাহিত্যিকবৃন্দের সংখ্যা সীমিত হয়ে উঠেছে। ফলে সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের খুব দ্রুত মিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে, এবং অতি সম্প্রতিকালে সাংবাদিকতার মধ্যে জনতাকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপক চাতুর্য ও চিত্তচমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও, এই প্রসঙ্গে অস্কার ওয়াইল্ডের ব্যাঙ্গোক্তিটি স্মরণীয়: "The difference between journalism and literature is that journalism is unreadable and literature is not read."

* * *

যে কথা আগেই বলা হয়েছে, সে কথায় ফিরে আসি। বাংলা সাহিত্যে আজ যে সমস্যা অত্যন্ত জরুরী তা হলো কথা-সাহিত্যে, নাটকে, কবিতায় মধ্যবিত্ত মানসিকতার জড়ত্ব থেকে মুক্তি এবং শিক্ষার, তথা উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার। অক্ষরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত অগণিত জনসাধারণের একটা অংশও যদি সাহিত্যপাঠক এবং লেখকরূপে গণ্য হ'ত, তাহলে বাংলাসাহিত্যের একটা লক্ষ্যণীয় বৈচিত্র দেখা দিত। উচ্চবিত্ত সমাজের অর্থহীন ফ্যাশানের অনুকরণ করতে করতে এ যুগের সাহিত্য ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত। মধ্যবিত্ত মানসের যে হতাশা ও আর্তনাদ আঁকা হয়ে থাকে, তা ওই উচ্চবিত্ত সমাজের স্বাচ্ছন্দ্যের স্বভাবজনিত। অতি নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রামকে যাঁরা ভাষায় রূপ দান করলেন, তাঁদের প্রতি আমাদের তেমন দৃষ্টি নেই, কারণ সাহিত্যের যে প্রভাবশালী অংশ সমগ্র সাহিত্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁরা সুখী ও স্বচ্ছন্দ জীবনের বাইরে অন্য কিছু ভাবতে অভ্যস্ত নন। তার ফলে যাঁরা জীবন ও ঘটনা সংঘাতের আবর্তে ভাসমান, আহত ও বিপর্যস্ত মানবিকতাকে সাহস এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপ দিতে চান, তাঁরা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ন। এবং রাজনৈতিক দলগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু ক্ষমতা দখলের জটিল আবর্ত, সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণা নয়—সুতরাং এক্ষেত্রেও দলবিশেষের স্তোত্র রচনা করা, কিংবা দলনেতাদের মনোরঞ্জন করার বাইরে সাহিত্যশিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী একদা রুদ্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নেতাদের

মনোরঞ্জনে ব্যর্থকাম শিল্পীরা প্রতিক্রিয়াশীল এই অপবাদে চিহ্নিত হতে বাধ্য হন।

সাহিত্যশিল্পীর তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি খুব আস্থাবান নই। আমার স্থির বিশ্বাস সাহিত্যিক স্বয়ং এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য, সামাজিক উত্থান-পতনের অংশীদার। সমাজ-ব্যবস্থা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তিনি আন্দোলিত হতে বাধ্য এবং তাঁর চেতন-মনের প্রকাশ, সেই আন্দোলনের বিকাশ, অগ্রগতি এবং ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তথাকথিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার রূপে তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির যে বিকাশ, সে সম্পর্কে আমি ততটা স্থির বিশ্বাসী নই। পৃথিবীর ইতিহাস এ কথা প্রমাণিত করেছে, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ আত্মক্ষমতা দখলে যে পরিমাণ শ্রম-শক্তি-ক্ষমতা প্রয়োগে উগ্র হ'য়ে ওঠেন, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণে তাঁদের সে পরিমাণ মাথা-ব্যথা থাকে না। এ যুগের রাজনীতি, ইতিহাসের ব্যতিক্রম রূপে চিহ্নিত থাকবে কি না, সে বিচারের ভার আগামী যুগের হাতে; কিন্তু জনসমষ্টির ব্যাপক ঊর্ধ্বগতি যেহেতু এ যুগের সব সমাজেই গোষ্ঠীবদ্ধতা, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, এবং বাইরে থেকে প্রযুক্ত প্রভাব-এর পরিণতির কারণস্বরূপ, সাহিত্য শিল্পীরা ক্ষমতাবানদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জনে সমর্থ হবেন, সে বিশ্বাসে আস্থা রাখা কঠিন। এ অবস্থায় সমাজে সৃষ্টিশীল সত্তারূপে তাঁদের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির যে সুযোগ, তাঁর পূর্বসূরীরা এতকাল পেয়ে এসেছেন, সেই সুবিধা বর্তমানে ও আগামী যুগে করায়ত্ত করা ক্রমশঃই তাঁদের পক্ষে কঠিন হবে। ফলে রাজতন্ত্রের আমলে রাষ্ট্রশক্তির আরাধনা করা যেমন আপন অস্তিত্বরক্ষার একমাত্র উপায়রূপে গণ্য করা শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্রত ছিল, সাহিত্য সেই প্রাচীন যুগে প্রত্যাবর্তনে ক্রমশঃ বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে। এই বিচিত্র বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে সাহিত্যের শরীর-মন-আত্মা, কেমন অবয়ব ধারণ করবে, তার গবেষণার ভার, আগামী যুগের সমালোচকদের বিচার-বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দেওয়াই, বর্তমানের অব্যবস্থিত-চিত্ত পরিবেশে, মঙ্গলজনক বলেই আমার বিশ্বাস।

# গরমে চলুন হালকা পায়ে

বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া খেলতে পারে, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ। সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি। পরলেই ভালো লেগে যাবে চমৎকার নমনীয় আপার। সুঠাম তালি চলার ছন্দ হালকা ও সাবলীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয় বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যান্ডাল ও চপ্পলের যেন মেলা ব'সে গেছে—এখানে তার মাত্র কয়েকটি নকশাই দেখছেন। আসুন না, একবার প'রে দেখুন।

জীবন ৯.৫০
সাইজ ৪—১০

ধীরা ৬.৪০
সাইজ ১—৭

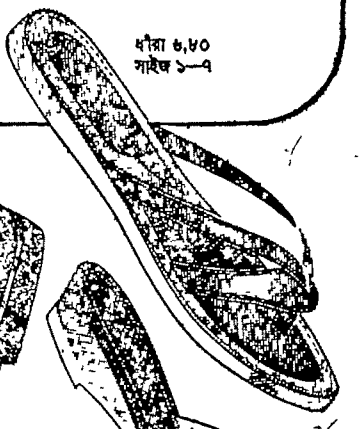

খোকন ৮.৯৫
সাইজ ২—৫

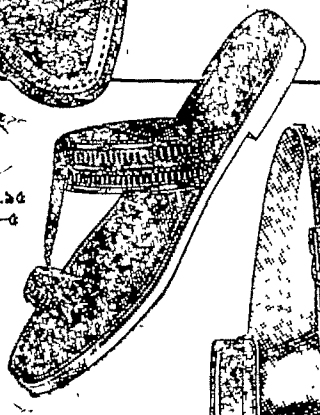

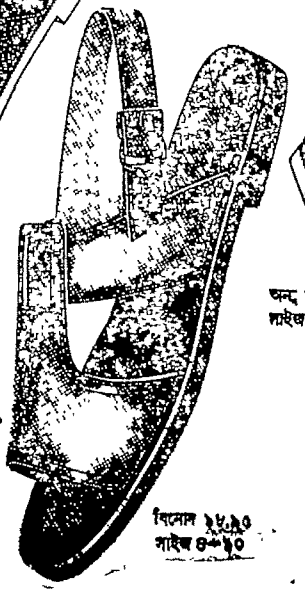

অনু ১৪.৫০
সাইজ ২—৭

Bata

বিনোদ ১৮.৯৫
সাইজ ৪—১০

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

# জাপানের দিনগুলি

## বারীন বর্দ্ধন

সে বছরের জুলাই মাসের ঘটনা বার বার মনে পড়ছে। এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই জীবনে হয়ে থাকে। কিন্তু ঘটনাটির চেয়েও বড় হয়ে রয়েছে জাপানী জীবনের একদিক। মাত্র স্যাঙ্কুকা থেকে ফিরেছি। পল্লীগ্রাম পরিক্রমার ধকল তখনও একেবারে মুছে যায়নি।

গেট দিয়ে ঢুকতেই সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করল—আপনি যাচ্ছেন তো?

অনেকটা আকাশ থেকে পড়ার মত আমার অবস্থা। বললাম—মাত্র তো দু'দিন বেড়িয়ে আজ ফিরছি। আবার কোথায় যাব?

—সেকি! নোটিশ দেখে যাননি? হোষ্টেল থেকে আমরা সবাই যাচ্ছি ফুজিয়ামা পাহাড় চড়তে। পরশু ভোরে আমরা সব রওয়না হচ্ছি। তোড়ের মুখে খবর দিয়ে গেল চৌধুরী।

ডাক্তার ধর, ডাক্তার আগরওয়াল আর চৌধুরী—ভাষা বৃত্তিধারীর সবাই যাবে। তাই নাকি ঠিক হয়েছে। শুধু আমার অপেক্ষা। ডাক্তার ধর বয়সে প্রবীণ না হলেও মনে প্রবীণতার ছাপ পড়েছে। একটু গম্ভীর হয়েই বললেন—দেখুন, আমার হয়ত শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া নাও হতে পারে। তবে আপনাদের যাতে সাফল্যজনক ভাবে আরোহণ পর্ব সমাধান হয় তার জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।—ডাক্তার ধর ছিলেন সংস্কৃতের ছাত্র।

বুঝলাম আলোচনাটা বেশ এগিয়ে গিয়েছে আমার অবর্ত্তমানে। পর্বতারোহণ শাস্ত্রে শিশুর মতই অনভিজ্ঞ আমরা। আর তাছাড়া ফুজিয়ামার কথা ভূগোলে পড়েছিলাম আগ্নেয়গিরির কুলীনদের মধ্যে একটি বলে। তাই চৌধুরীকে জিজ্ঞেসা করলাম—আপনি কোনদিন পাহাড়ে উঠেছেন কি?

উত্তর দিতে গিয়ে শুধুই মাথা নাড়াল চৌধুরী।

টের পেতে দেরী হলনা যে এরা সবাই আমার সমগোত্রীয়।

তাই আবার জিজ্ঞেসা করলাম—হোষ্টেল থেকে যদি সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় তবে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো সম্বন্ধে তো ওদের আগে থেকেই বলা উচিত। তাছাড়া শুনেছি ফুজিয়ামার চুড়োর বরফ কখনই গলে না! তার মানে ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা সেখানে অসম্ভব রকমের।

এবার ডাক্তার আগরওয়াল বলল যে কাল রাতে একটা মিটিং হবে এবং হোষ্টেলের পরিচালকদের কয়েকজন এ সম্বন্ধে সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন।

—তবে তো কোন কথাই নেই। আপনারা যাচ্ছেন তো?

সবাই উৎসুক যাওয়ার জন্য। এ্যাড্‌ভেঞ্চারের আসল বয়সটা পেরিয়ে গেলেও এ্যাড্‌ভেঞ্চারের স্বাদ পেয়ে বয়সটা যেন কমে গিয়েছে বছর দশেক। সে রাতের মত আমাদের

নিজস্ব আলোচনা সভা ভেঙে গেল। সবাই রাজী। শুধু ডাক্তার ধরেরই একটু দ্বিমুখী মন।

পরদিন যথাসময়েই আমরা সবাই উপস্থিত হলাম লেক্‌চার হলে। যাবার জন্য প্রায় জনত্রিশেককে খুবই উৎসাহী মনে হল। হোষ্টেলের যে দু'জন জাপানী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে যাবেন তাদেরই একজন কিছু জাপানী আর ইংরেজী মিশিয়ে নানা রকম উপদেশ দিয়ে গেলেন। পোষাক কি রকম হবে, দু'দিনের খাবারের কি ব্যবস্থা করব—এ জাতীয় অনেক প্রয়োজনীয় উপদেশ পেলাম। প্রথমে পর্বতারোহণ ব্যাপারটা যত অভাবনীয় মনে হয়েছিল সব শুনে মনে হল কার্য্যত ব্যাপারটা কঠিন নয়। চেষ্টা করলে তেনজিং না হতে পারি; কিন্তু আমিই বা কম কিসে? নূতন এ্যাড্‌ভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে সাত তাড়াতাড়ি সবাই মিলে ছোটখাট জিনিষপত্রের লিষ্ট তৈরী করতে বসে গেলাম। একদিনের উত্তেজনার খোরাক মিটাতে বেশী খরচ করার ইচ্ছে ছিল না। তাই প্রথম খোঁজ করতে সুরু করলাম আমাদের কেউ এর আগে ফুজিয়ামা আরোহণ করেছে কি না। ভাগ্যক্রমে এই রকম একজনকে পাওয়া গেল। তারই কাছ থেকে জোগাড় করলাম নাপ্‌স্যাক, জলের বোতল আর ওয়াটারপ্রুফ টুপী।

উপদেশ দিতে গিয়ে জাপানী ভদ্রলোক বলেছিলেন—এ যাত্রায় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ হল খাদ্য। পাহাড়ের গায়ে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত চটি আছে সেগুলোতে ঘুমাবার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু খাবার ব্যবস্থা—নৈব নৈব চ। তাই এ জাতীয় এ্যাড্‌ভেঞ্চারের প্রথম কথা হল টিনের খাবার।

বেরিয়ে পড়লাম আমি আর চৌধুরী। টিনের মাছ, কিছু পাউরুটি, গোটা কয়েক আপেল এক টিন জেলি ইত্যাদি কিনতে। ছোটখাট সব জিনিষ কেনা হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ দু'জনেরই মাথায় এল পায়ে কি পরে যাব? বাটার এ্যাম্‌বেসেডর বা ফ্লেক্স কোম্পানীর সু—পাহাড়ের গায়ে এ সব একেবারে অচল। ডাক্তার দু'জন আলাদা এ্যাপার্টমেণ্টে থাকেন। ভাবলাম তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই যা হোক ঠিক করব। মেঘ না চাইতেই জল—দরজা খুলে ডাক্তার দু'জনই ঘরে ঢুকে পড়ল। একই সমস্যায় মনে হল দু'জনে বিব্রত।

যাক, কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা করলাম—তা হলে কখন আমরা বেরোচ্ছি জিনিষপত্র কিনতে?

চৌধুরী লাফিয়ে উঠে বলল—এক্ষুণি যাওয়া যাক না কেন? বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে জামা পড়তে সুরু করল।

কিন্তু ডাক্তার ধর হয়ে রইলেন ফুজিসানের মতই অচল অটল।

সেই চিরাচরিত গাম্ভীর্য্য টেনে বললেন—দেখুন, আমার ব্যাপারটা ছেড়ে দিন। এখনও ঠিক করিনি যাব কি না!

—সেকি! সবই তো কাল ঠিক হয়ে গেল। একদিনের ব্যাপার। দেশে ফিরে এ এ্যাড্‌ভেঞ্চার পাবেন কোথায়? তার চেয়ে চলুন জীবনটাকে নিয়ে একটু ট্রাপিজের খেলা খেলে নিই।

বিরক্তির সঙ্গে উৎসাহ মিশিয়ে আমি বললাম।

জাপানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় এই ফুজিয়ামা। উচ্চতা প্রায় ১৩,০০০ ফিট। আমাদের চেষ্টা হয়ত কাগজে ছেপে বেরোবার মত খবর নয় কিন্তু যে জাপানীরা আমাদের দেশে গিয়ে একটার পর একটা শৃঙ্গ জয় করছে প্রত্যুত্তরে এ ছাড়া ওদের আর কি দেওয়া যেতে পারে?

কথাটা বোধহয় মনে ধরল ডাক্তার ধরের। আর প্রতিবাদ না করে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন কেনাকাটা করতে। টিনের খাবার, পাউরুটি, কাপড়ের বুট্‌জুতো—সব কিনে যখন হোষ্টেলে ফিরে এলাম রাত তখন প্রায় দশটা।

পরদিন ভোরে রওয়ানা হব। ডাইনিং হল থেকে প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ হয়েছে আধ সের চাল। তাছাড়া সকালের ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ শেষ করেই আমরা বেরোব এবং লাঞ্চের জন্য হোষ্টেল থেকেই দেবে পাতলা কাঠের বাক্সে ভাত আর শুকনো মাংস। কাজেই খাওয়াদাওয়ার দিকটা বেশ তৃপ্তিদায়ক বলেই মনে হল।

সকাল আটটা নাগাদ ডাক্তার দু' জন কাঁধে জলের বোতল ঝুলিয়ে আর পিঠে ক্যাপস্যাক বেঁধে হোষ্টেলে এসে উপস্থিত হলেন। ঠিক তেনজিঙি কায়দা। ডাক্তার ধরের আবার ক্যাপস্যাকের বদলে ছিল বড় গামছায় জড়ান খাবারের প্যাকেট ইত্যাদি। মথুরা কি বৃন্দাবনের তীর্থযাত্রীর চেহারা।

খুব ভোর থেকেই হোষ্টেল গরম হয়ে উঠেছে। সঙ্গে আবার হোষ্টেলের মেয়েরা ছাড়াও রয়েছেন অফিসের দু'তিনজন মহিলা। দলটা পাঁচমেশালী আর জমজমাট। সবাই হাজির হয়েছে ডাইনিং হলে ব্রেকফাষ্ট্‌ শেষ করতে। দু'তিন দিন আগে থেকেই রেডিও এবং আবহাওয়া অফিস থেকে খবর নেওয়া হচ্ছে ফুজিসানের আশেপাশের অবস্থা। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ভীষণ বরফের মধ্যে আটকে গিয়েছিল একদল অভিযাত্রী। আগ্নেয়গিরি মানেই ত্রিকোণাকৃতি। পিছলে পড়ার অর্থ হল ১৩০০০ ফিট্‌ নীচে গিয়ে তবে থামতে হবে। এবং তার অনেক আগেই থেমে যাবে হৃদস্পন্দন। প্রতিবছরেই পড়ে গিয়ে অনেকে পর্বত-সমাধি লাভ করে। এবারেও তাই হয়েছে। দু'তিন দিন ধরে খবর জোগাড় হচ্ছিল শুধু সাবধানতার জন্য। ফুজিসানের চূড়ায় উঠে সূর্য্যোদয় দেখা এ্যাডভেঞ্চার, লোভী জাপানীদের জীবনে একটা চরম আকাঙ্খা। স্কুলের ছাত্র, অধ্যাপক— সবাই একবার করে গ্রীষ্মের মরশুমে ফুজিসান আরোহণে গিয়েছে। এ রকম উত্তেজনা যে দেশে, স্কুলের ছেলেমেয়ে থেকে সুরু করে বর্ষীয়ানরাও যেখানে লুব্ধ হয় ফুজিসানের সুচাল চূড়া দূর থেকে দেখে সেখানে আমরা মানে বিদেশীদের হাত গুটিয়ে বসে থাকা মানেই একটা অব্যক্ত অপবাদের বোঝা ঘাড়ে করে রাখা। আমাদের সঙ্গে যে দু'জন জাপানী যাচ্ছিলেন, এ হল তাঁদের তৃতীয় অভিযান। যদিও চলতি কথায় জাপানীরা বলে, যে লোক ফুজিসান চড়েছে সে বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। সব কিছু মিশিয়ে তাই সকাল থেকেই দেহমনে উত্তেজনার স্পন্দন টের পাচ্ছিলাম।

তখন আটটা বেজেছে। মাইক দিয়ে সবাইকে ডাকা হল গেটের সামনে জড় হবার জন্য। ক্যাপস্যাকের মধ্যে খাবার, পোষাক এবং আরও খুঁটিনাটি জিনিষ ভরে আমি, চৌধুরী, এবং ডাক্তার দু'জন এসে জড় হলাম গেটের সামনে। আকাশের অবস্থা দেখে কেউই আশান্বিত ছিলাম না। তবুও, বেরিয়ে যখন পড়েছি তখন থামলে তো আর চলবে না— তাই প্রায় জনত্রিশেক ছেলে মেয়ে অভিজ্ঞ পর্বতারোহণ-কারীর শক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। প্রয়োজনীয় সবই নেওয়া হয়েছে। আর নেওয়া হয়েছে ক্যামেরা। ঠক্‌ ঠক্‌ করে রাস্তা ধরে সবাই চলেছি। এমনি ভাবে যেন হোষ্টেলের দরজা থেকেই সুরু হয়েছে পাহাড়ী পথ। ঐরকম করে ঝুঁকে রাস্তা চলতে গিয়ে একঘেয়েমী এসে যায়। তাই নানারকম হাসিঠাট্টার মধ্যেই পথ চলাটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

শিনজুকু ষ্টেশন থেকে ট্রেনে যাব ফুজিসানের পাদদেশে এবং সেখান থেকে যতটা বাস চলে ততদূর অবধি যাব বাসে। তীর্থের কাকের মতই আমরা বসে আছি ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে। কখন ট্রেন আসবে সে আশায়। ছোট বড় মিলে আরও প্রায় পাঁচ ছ'টা দল ঐ করে অপেক্ষা করছে ফুজিসানের গাড়ীর জন্য। একটু পরেই ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ীটা এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। পড়ি কি মরি করে সবাই ছুটে গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লাম। পুরো গাড়ীটা নিমেষে ভরে গেল এই ফুজি অভিযাত্রীদলে। ঘণ্টা তিনেকের পাড়ি।

কাজেই কাঁধ থেকে ঝোলাঝুলি খুলে বেখে বেশ হাত পা ছড়িয়ে মুখোমুখি আমরা বসে পড়লাম। গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হল দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধরণের গান আর হাসিঠাট্টা মেশান খোশগল্প।

ট্রেণে চড়ে টোকিওর আশেপাশে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু ফুজি যাবার রেলবাস্তাব দুধারের মত এত চমৎকার দৃশ্য বড় একটা নজরে পড়েনি। মাইল পঁচিশ যাবার পর সুরু হল সবুজধানের ক্ষেত আর লাল আস্তরণে ঢাকা পাহাড়ের সার। লাল আস্তরণ মানে লাল মাটি বা ম্যাপেল্ পাতায় ঢাকা পাহাড়। এ সব পাহাড় জুড়ে রয়েছে কমলার গাছ। তাতে ফলছে হাজারো কমলা। জাপানীরা কমলাকে বলে মিকান। সেই থেকে পাহাড়ের নাম হয়েছে মিকানের পাহাড়। ট্রেণটা ছিল এক্সপ্রেস্। বেশ ছুটে চলেছে আর পাঁচ সাত মিনিট পরই মনে হচ্ছে যেন দু'পাশের পাহাড় সব ট্রেনকে গিলে খাবার জন্ত সরু হয়ে এগিয়ে আসছে। সুড়ঙ্গ আসার সঙ্গে সঙ্গেই মন হল এ গহ্বর থেকে ট্রেণ আর বেরোতে পারবেনা। পুরো ট্রেণটি ঢুকে গিয়েছে গহ্বরের মধ্যে। হুস্ করে একসময় আবার ট্রেণ গহ্বর থেকে বেরিয়ে নুতন হাওয়া পেয়ে ছুটতে লাগল পুরণো দম নিয়ে। পাহাড়ের সার চলে গেল দূরে। আর কাছে এবার এগিয়ে এল পাহাড়ের পরিবর্তে সব লেক্। বিলাতে যাইনি কোনদিন। তবে শুনেছিলাম স্কটল্যাণ্ডের লেক ডিষ্ট্রীক্টের কথা। এও সেরকম ফুজি লেক ডিষ্ট্রিক্ট। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল। তাতে নানা বয়সের ছেলেমেয়েরা নৌকো বাইছে। সেরকম একটা লেকের ধারে ছোট্ট একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াল।

এক্স্প্রেস্ বলে নামতে ভরসা পেলাম না। তবু ও এক নজরেই দেখে নিলাম লেক্ আর তার পরিবেশ। যে দিকটায় ষ্টেশন সেদিকেই পাহাড়টা দূরে। আর তিন-দিকেই পাহাড় ঘিরে রয়েছে এই লেকটিকে। সবুজ কার্পেট মোড়া পাহাড়ের শ্রেণী। দু' এক জায়গায় আবার কোথেকে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ঐ লেকে। একটু ক্ষণের জন্ত রোদ্দুরের ঝিলিক খেলে গেল পাহাড়, লেক, ষ্টেশন—সবার উপর দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের জন্ত জীবন্ত হয়ে উঠল আমার পরিবেশ। ষ্টেশনের গায়েই রয়েছে ে টি ছোট সরাইখানা। বছরের সব সময় এ অঞ্চলটাতে বেশ ভীড় হয় অ্যাড্ভেঞ্চর উন্মুখ জনসাধারণের—দেশী, বিদেশী, সব রকম লোক এসে জড় হয় এখানে। দারুণ গ্রীষ্মে ফিয়াঁসেদের সঙ্গে করে নৌকো বাইবার জন্ত ফুজি লেকগুলোতে বিরাজ করছে চিরবসন্ত। টোকিওর ঝামেলা থেকে নির্জন পরিবেশে নূতন কর্মশক্তি সঞ্চয়ের জন্ত সবাই আসে এখানে। আবার প্রচণ্ড শীতে যখন লেকের জল জমে কঠিন বরফ হয়ে পড়ে তখন সব স্কুলকলেজ থেকে ছেলে-মেয়েরা আসে লেকের বুকে স্কি করতে। কি গ্রীষ্ম কি শীত —কোন সময়েই জনসমাগমের শেষ নেই।

ঘড়ির কাঁটা প্রায় একের কোঠায় গিয়ে পড়েছে। জাপানী ভদ্রলোক দু'জন তাই সবাইকে বললেন লাঞ্চ্ শেষ করতে। ট্রেন নাকি দেড়টা নাগাদ ফুজির নীচে পৌঁছুবে। খিদের চেয়ে ট্রেনের দোলনাতে ঘুমটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। লাঞ্চ্ শেষ করার দায়িত্ব এবার ঘাড়ে পড়ায় খিদের দিকটাই প্রবলতর হয়ে উঠল। ঝোলা থেকে শুকনো ভাত আর মাংস বের করে খেয়ে ফেললাম।

দেখতে দেখতে লেক ডিষ্ট্রীক্টকে পিছনে ফেলে গাড়ী ছুটে চলল আরও আগে ফুজির দিকে। ধানক্ষেতের পরিমাণ এবং বিস্তৃতি কমে এসেছে। জমিটাও যেন আর সমতল বোধ হচ্ছেনা। পাহাড়গুলো আর পাহাড় মনে হচ্ছেনা। মাথায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। সময় বুঝে ফুজিসানও আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা সুরু করল। ট্রেনের সর্পিল গতির জন্ত ফুজিসানের সাদা চুড়ো একবার নজরে পড়ছে। জাপানী ভদ্রলোকেরা আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন। আর অমনি

অভিযাত্রীর দল ট্রেনের এধার থেকে ওধার মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে। ফুজিসান হয়ত ছিল ডানদিকে। পরক্ষণেই চলে এল বাঁ দিকে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদেরও চলল ছুটোছুটি। বয়োবৃদ্ধেরা সাধারণত ছোটদের কাছে উচ্ছ্বাস চাপতে চেষ্টা করেন আত্মসম্মান লাঘবের ভয়ে। কিন্তু যেখানে সবাই একই দলের সেখানে আত্মসম্মানের কোন প্রশ্ন উঠে না। বরং সাধারণ স্কুলকলেজের ছেলেরা আমাদের হৈ হুল্লোড়েই যেন দমে গেল।

জাপানে দেখেছি দূরগামী ট্রেনগুলিতে লোক এসে দিয়ে যায় প্লাস্টিকের থলে আবর্জনা ফেলবার জন্য। ট্রেন চলার আগে আমরাও পেলাম ঐ রকম থলে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঐ থলেতে আবর্জনা ঢেলে ফেললাম। কাউকে কোনদিন দেখিনি চলন্ত ট্রেন থেকে নোংরা বাক্স কি আর কিছু দূরে মাঠে ছুঁড়ে ফেলেছে। সবাই নোংরা অত্ত করে রাখে থলের মধ্যে নয়ত সীটের নীচে। ট্রেন সাইডিং এ পরিষ্কার করতে গিয়ে লোকেরা ঐগুলো তুলে নেয়। একটু পরেই জাপানী ভদ্রলোক দু'জন এসে জানিয়ে গেলেন ট্রেন এখনই টামিনাসে পৌঁছুবে এবং এখান থেকেই হবে যাত্রার সুরু। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সবাই তৈরী হয়ে পড়লাম আসল এ্যাড্‌ভেঞ্চারের চেহারা দেখতে।

বেলা তখন দু'টো। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সবাই গিয়ে পড়লাম খোলা মাঠে। মাঠটা ফুজিগামী বাসে ভরে গিয়েছে। একের পর এক ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের বাস্ আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল। কাজেই সবাই মিলে ধীরে সুস্থে কাছেই একটা সরাইখানায় ঢুকে পড়লাম। আমাদের দলটাই ছিল অন্যদের চেয়ে সংখ্যায় ভারী। সরাইখানার লোকেরাও এতগুলো বিদেশীকে এক সঙ্গে দেখে তদারকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ট্রেনে পুরো লাঞ্চ খেয়েছিলাম। কিন্তু নড়াচড়ার ফাঁকে কখন যে সে খাদ্য মিলিয়ে গিয়েছে তা টেরই পাইনি। এ যাত্রা শক্ত কিছু না খেয়ে শুধু অরেঞ্জ স্কোয়াস দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিলাম।

এখান থেকেই কিনতে হল পর্বতারোহণের লাঠি। সামনে ঝুঁকে পিঠে বোঝা নিয়ে যখন ক্রমেই চড়াই ভাঙতে সুরু করব তখনকার ক্লান্তি ঠেকাবার জন্যেই এই লাঠির ব্যবস্থা। সবাইর সঙ্গে আমরাও এক একটি লাঠি কিনে নিলাম এবং লাঠির গায়ে কাল রং দিয়ে লিখিয়ে নিলাম নাম, তারিখ ইত্যাদি যাতে ভবিষ্যতে একে রাখা যায় স্মারক হিসাবে। এখান থেকেই সঙ্গী জাপানী ভদ্রলোক দুজন গাইড্ ঠিক করলেন—কাগামীসান্ এবং কাশীওয়াগীসান। বেঁটে শক্ত গঠন আর পাহাড় বেয়ে বেয়ে এরা হয়ে গিয়েছে পাহাড়ী ইঁদুর। বরং সমতলে চলতেই এদের অসুবিধা। বছরে মাত্র গরমের এই কয়েক মাস চারদিক থেকে আসে ফুজিসান অভিযাত্রীর দল। ফুজিসানের মাথা থেকে পা অবধি জমজমাট। কাজেই কাগামীসান্ বা কাশীওয়াগীসান —কেউই সারা বছর পাহাড়ে ওঠানামা করেনা।

একটু পরেই বাস ছাড়ল এবং কতক্ষণ একটানা সমতল দিয়ে চলার পর সুরু হল চড়াই। প্রতিমুহূর্তেই উঠে যাচ্ছে দু' থেকে তিন ফিট্। পাহাড়ে কাঁচা রাস্তা। দু'ধারে পাইন ফারের ছড়াছড়ি। মাঝখান দিয়ে সেকেণ্ড্ গিয়ারের গর্জন ছেড়ে বাস চলছে ধীর গতিতে। কত সাঁকো, পাহাড়ে ক্ষুদে নদী বাস পেরিয়ে গেল এই করে। এখানকার চড়াই বাসের পক্ষে হয়ে এল অনুপযোগী। বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার সামনের ড্রাইভার আর আমি এক সমতলে নেই। এক নাগাড়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর একটা পাহাড়ে ষ্টেশনে এসে বাসটা দাঁড়াল। কথা ছিল এই বাসে করেই যতটুকু সম্ভব আমরা এগিয়ে যাব। কিন্তু এখানে এসে শুনলাম আমাদের আরেকটা আরও শক্তিশালী বাসে চাপতে হবে। সবাই মিলে তাই আরেকটা অপেক্ষমান বাসে উঠে পড়লাম।

এবারকার রাস্তা আরও খাড়া, মাটিও এঁটেল নয়। কাজেই কখন যে চাকা ফসকে বাস চলে যাবে পাতালে কেউই জানেনা। দু'ধারে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে সমস্ত নির্জনতা ভেঙে ঘর্ঘর শব্দ করে চলেছে আমাদের বাস। কিন্তু এ চলাও স্থায়ী হল না বেশীক্ষণ। তাছাড়া বাসে আর ট্রেনে চড়ে হাত পা-গুলো অবশ হবার উপক্রম। ভাবছিলাম বাসেই যদি এতটা পথ চলতে হয় তবে আসল অ্যাড্‌ভেঞ্চার যে অনেকটা মাটি হয়ে গেল। কেবলই ইচ্ছা হচ্ছে ঐ লাঠি হাতে কাঁধে বোঝা নিয়ে তিব্বতীদের মত চলতে। কিন্তু ঐ চলা যে সুখকর নয় এবং সমতলের লোকেদের কাছে প্রাণান্তকর সে ধারণা ছিলনা কারুরই। সন্ধ্যার তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকী। এমনি সময়ে আমরা এক চটিতে পৌঁছুলাম। এখান থেকেই সুরু হবে পদযাত্রা 'মহাপ্রস্থানের পথে।' প্রতি চটিতেই আছে লাঠির মধ্যে আগুন দিয়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা। গরম সিলমোহর দিয়ে লিখে দিচ্ছে চটির নাম, উচ্চতা এবং তারিখ। পদযাত্রার সুরুতে সবাইর একটা গ্রুপ্ ফটো তুলে নিলাম।

লাঠির গায়ে ছিল ঘুঙুর বাঁধা। প্রথম ঘণ্টাখানেক রাস্তার চড়াই খুব বেশী ছিলনা। টুং টুং করে আওয়াজ বেরোচ্ছে ত্রিশটি লাঠি থেকে। থেকে থেকে তার প্রতিধ্বনি উঠছে পাহাড়ের গা বেয়ে। রাস্তা প্রায় পাঁচ ছ' ফিট্ চওড়া। একদিকে ফুজিসান উঠে গিয়েছে নির্ভাবনায়। কোন বাধা নেই কোথাও। আর অন্যদিকে বহু নীচে ঘন সবুজ গাছপালা দেখে মনে হচ্ছে কে যেন এক পোঁচ কালি মেখে রেখেছে। হঠাৎ সমস্ত দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করে দিয়ে কোত্থেকে ছুটে এল বিরাটকায় মেঘের টুকরো। দু'হাত দূরের সঙ্গীরাও হয়ে পড়ল দৃষ্টির ওপারের কোন প্রাণী। ঘন মেঘের ধোঁয়াতে শুধুই মনে হচ্ছে অস্পষ্ট কে সব নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে। কানে আসছে তাদেরই নৃত্যছন্দ ঝম্, ঝম্, ঝম্। দু'মিনিট। তারপরই আবার সব পরিষ্কার হয়ে এল। উড়ন্ত মেঘপুঞ্জ গিয়ে দূরে আটকে রইল পাহাড়ের গায়—ন যযৌঃ, ন তস্থৌঃ।

আমরা এবার হয়ে পড়েছি মেঘলোকের জীব। ঝুঁকে চলেছি আমরা ত্রিশজন। পিছনে কাগামীসান আর সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে কাশীওয়াগীসান্। যদিও পাহাড়ের গায়ে কোন টাউন প্ল্যানারের হাতের ছাপ পাওয়া যাবেনা তবুও গলি গলি বলতে অনেক কিছুই আছে। বিশেষ করে মাঝামাঝি উচ্চতা অবধি এদিক ওদিক গ্রামের দিকেও সরু রাস্তা চলে গিয়েছে। অভিযাত্রীর কেউ যাতে ভুল পথে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে না পড়ে তারই জন্য কাগামীসান্ রয়ে গিয়েছে লাইনের পিছনে।

(ক্রমশঃ)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

# জাতীয়তার রূপায়ন

দীপঙ্কর

বিবেকানন্দ বাংলার বাঙালী, ভারতবর্ষের নাগরিক এবং বিশাল বিশ্বের মুক্তিমন্ত্রের প্রচারক। তিনি ছিলেন মুক্তি-কামী নাগরিক। তিনি ক্ষুদ্রতার গণ্ডিতে আবদ্ধ, সীমিত ঘরের অধিবাসী নন; তাঁহার বড় ঘর বড় মন। তিনি আমাদের দেশের মুক্তির কথা বলিয়াছেন, সমগ্র বিশ্বের মুক্তির কথা বলিয়াছেন। আমাদের দেশের যে-মুক্তির কথা বলিয়াছেন উহা রাজনৈতিক মুক্তির অর্থেও প্রযোজ্য হইতে পারে কারণ স্বামীজী যখন উহা বলিয়াছেন তখন ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। কিন্তু যখন বিশ্বের মুক্তির কথা বলিয়াছেন তখন অন্য কোন রাজশক্তির অধীনতা হইতে নিজেকে স্বাধীন ও মুক্ত করিবার কথা বলেন নাই, বলিয়াছেন সমগ্র বিশ্বের আত্মিক মুক্তির কথা। তাই তিনি বেদান্তের আলো এবং বাণী প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। স্বামীজী অন্য আর একটি মহান উপদেশও দিয়াছেন, "We have to bear in mind that we are all debtors to the world and the world does not owe us anything. It is a great privilege for all of us to be allowed to do anything for the world. For helping the world we really help ourselves.

[ Thus Spake Vivekananda : P-66 ]

স্বামীজী এখানে পরিপূর্ণ বিশ্বপথিক এবং বিশ্বপ্রেমিক। আমাদের ক্ষুদ্র দেশ। কালের গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া মন, প্রাণ এবং কর্মোদ্যম নিয়া বিশ্বকল্যাণে নিযুক্ত। মুক্ত পুরুষের চিন্তাধারা মুক্তির পথেই প্রবাহিত। এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব এবং স্বামীজীর জীবন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাঁহারা মনে, বনে এবং কোণে সন্ন্যাসী ছিলেন না,—সমাজে বাস করিয়াও প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন। সুতরাং শক্তি সাধনা বা ভগবৎ চিন্তায় উপার্জিত ধন, অন্তর্লোকের উপলব্ধির অমূল্য সম্পদ সমাজ কল্যাণের জন্য কথোপকথনের মাধ্যমে এবং ছোট-বড় সভাসমিতিতে অমৃতময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবাসীর সমাজ-জীবনে এই উপদেশমালা ধর্মসাহিত্যের স্তর অতিক্রম করিয়া মহামূল্য ধর্মগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ভারতবাসী এই উপদেশমালা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনের গতিপথে উহাকে চরম ও পরম পাথেয় রূপে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছে। এই গ্রহণ এমন মর্মে মর্মে যে, ভারতের রাজনৈতিক আকাশে বিভিন্ন দলীয় মতবাদের সংঘাত এবং ঝড়ঝঞ্ঝা বর্তমান থাকিলেও সে-মতবাদ কখনও পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে যে, ভারতভূমিকে ধরিয়া রাখিয়াছে ধর্ম। যাহা ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান অন্বেষণ, আহরণ এবং সঞ্চয়ন করা দরকার। সুতরাং একমুখী মন, একাগ্র চিত্ত এবং একদিকে দৃষ্টি এই তিন শক্তির সমষ্টিতে শক্তিশালী হইলেই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব। বলা যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পান করিয়া এবং উহার ধারা-বাহকরূপে স্বামীজী স্বীয় জীবনের শেষদিন

পর্যন্ত দেশ পরিক্রমা করিয়া জনগণমনকে ঐ অমৃত পান করাইবার দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। তখন ভারতবর্ষের অবস্থা অনেকটা ঠিক একই পথে চালিত। প্রাদেশিক ভাব ও ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মানুষের অন্তরে অন্তরে মন্দাকিনীর ধারা রূপে একই ভাবের ভাবধারা, একই মন্ত্রে সকলে দণ্ডায়মান। অভিনয় কি হইবে তাহা তখনও অজ্ঞাত। অবশ্য অভিনয়ের নাটকখানি যে মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে তাহা বিবেকানন্দের বক্তৃতার সারাংশ উপলব্ধি করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ তিনি বলিয়াছেন, "একটি সামান্যতম মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত। এই প্রচণ্ড আত্মত্যাগের প্রেরণা তাঁর অকৃত্রিম দেশ প্রেম ও ঘুমন্তজাতিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য আকুল আহ্বান দেশটীকে সেদিন প্রবলভাবে দোলা দিয়েছিল। নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ নারীও সেই জাগরণে সাড়া দেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল"।

[ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত পৃঃ-৯ ]

তাহা হইলে যে চিত্রটী পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে তাহা হইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষ একটি মঞ্চ এবং অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ভারতীয় নারীগণও পশ্চাতে পড়িয়া ছিল না। এই মঞ্চ তৈয়ারী করিতে নিঃসন্দেহে বাংলার অবদান ভারতের অন্য অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। সংক্ষেপে তাঁহাদের পবিত্র নামগুলি স্মরণ করিলে বলিতে হয়, রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিশ্ববিজয়ী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার।

এখানে একান্ত উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে অভিনয়ের পূর্বে একটা বন্দনাগান গীত হইয়া থাকে।—উহা দেবী বন্দনা। এখানেও সে-পবিত্র সংগীত গীত হইয়াছে। সে-মহাসংগীত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতৃকার বন্দনা,—"বন্দে মাতরম্"। ইহা শুধু গান নহে, ইহা জাতীয় জীবনে মহামন্ত্র। এই মন্ত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কর্ণে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন আনন্দমঠের মাধ্যমে। ইহার ভাব, ভাষা এবং মূলসুর তদানীন্তন ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পূর্ববর্তী মহাজনদের জাতীয় ঐক্য গড়িবার প্রয়াসকে বহুলাংশে সাহায্য করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অবদানকে ভুলিলে চলিবে না—জাতি তাই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অশেষ ঋণী। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দও এ-ঋণের কথা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সাধক-ধ্যানী শ্রীঅরবিন্দ। তিনি তাঁহার ধ্যাননেত্রে আমাদের সুজলা সুফলা দেশকে মাতৃমূর্তিতে দেখিয়াছেন,—"অরবিন্দের ধ্যান নেত্রে দেশ ও দেবী মাতৃমূর্তিতে প্রকাশিত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বন্দে-মাতরম্-এর মন্ত্রদ্রষ্টারূপে অন্তর হইতে শ্রদ্ধা করিতেন। শিবাজীর ভবানীদেবী তাঁহার আরাধ্যা। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ হইতেই ধর্ম ও রাজনীতি তিনি মিশাইয়া লইলেন।"

[ ভারতে জাতীয় আন্দোলন : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১০৫ ]

ভারত সাম্রাজ্যের শাসক ইংরাজগণ সুচতুর ও নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সর্বদাই জাগ্রত ছিল। ভারতীয় জনজীবনের ধারা কোন্ পথে কখন, কি ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা তাহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল। বাংলার রামমোহন হইতে ঠাকুর পরিবার এবং বিবেকানন্দের অবদানে এখানকার ঘন ভূমি উর্বরা শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া এমন পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছিল যে, শাসক ইংরাজকুল বাংলাদেশ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইয়াছিল। তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষের শাসক হইলেও বাংলাপ্রদেশটীই তখন তাহাদের নিকট গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লর্ড কার্জন তখন বড়লাট। এ-দেশ হইতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রেরণ এবং সে-দেশ হইতে উহার অনুমোদন লাভ সবই

এ-দেশবাসীর অজ্ঞাতে, যবনিকার অন্তরালে লর্ড কার্জনের নির্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই জানা গেল যে, ইংরাজ সরকার, বৃটিশ পার্লামেণ্টে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বিলটীকে পাশ করিয়াছেন। ইহার কয়েকমাস পরে ১৬ই অক্টোবর বাংলার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বঙ্গভঙ্গের মত নিষ্ঠুর পর্বের সমাধা হয়।

বাংলামায়ের বুকে এই আঘাতে বঙ্গজননীর অঙ্গচ্ছেদ করা হইল। এই অপমানে সন্তানের বুকে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। অপমানের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া সিংহের মত গর্জন করিয়া উঠিলেন রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: "We shall unsettle the settled fact." গর্জন করিলেও আইনানুগ পথেই তিনি তাহা বর্ষণ করিলেন। এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি অগ্রণী হইয়া হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া আবেদন জানাইলেন কিন্তু কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের নিকট সে-আবেদন-নিবেদন স্থান পাইল না। সে-আবেদন ব্যর্থ, সে-নিবেদন নিষ্ফলতার আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত।

ইংরাজদের এই রাজনৈতিক ঘুঁটি চালনার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরাজ সরকারকে বলিয়াছিলেন, "হে রাজন আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহিনা, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিও না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিও না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।

[ বঙ্গবিভাগ রবীন্দ্ররচনাবলী: দশমখণ্ড ৮৬১৩-১৯ ]
২০৩-০৪

বঙ্গবিভাগের জ্বালা, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা এবং রবীন্দ্রনাথের এই জন জাগরণের ভাষার প্রভাবে বাংলার দিকে দিকে প্রবল উত্তেজনা এবং আন্দোলনের ঢেউ উত্থিত হইল। বাংলার জল, বাংলার বায়ু এবং বাংলার মানুষ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথ মহামন্ত্রে গান বাঁধিলেন,

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান ॥

শুধু গান বাঁধিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশপ্রেমের কর্তব্য শেষ করেন নাই। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে বাংলার রাজধানী কলিকাতা শহরে যে বিশাল মিছিল বাহির হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার পুরোভাগে থাকিয়াও জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবার জন্য গান ধরিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সে-দিন যুক্ত হইয়াছিল সেই বিশাল মিছিলের সহস্র সহস্র কণ্ঠ:

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে ॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে ॥

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তখন অফুরন্ত গান, মনে শুধু বাংলার সংহতি, সকলকে এক সূত্রে বাঁধবার একান্ত প্রয়াস।

উপরোক্ত গান, সহস্র সহস্র কণ্ঠের সম্মিলিত সুরে গীত হওয়ার পরেই শুরু হইল নূতন সংগীত :

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমনি অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান ॥
চিরদিন টানবে পিছে চিরদিন রাখবে নীচে
এতবল নাইরে তোমার, রবে না সেই টান ॥
শাসনে যতই ঘের' আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান ॥
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবিনে রে
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান ॥

দেশের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীগণ তখন ইংরাজদের প্রতি ঘৃণায় বিদেশী জিনিষ বর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং দেশের সর্বস্তরের মানুষ যাহাতে স্বদেশে উৎপন্ন সব জিনিষ ক্রয় করে তাহার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই আন্দোলনই আমাদের জাতীয় জীবনে স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত। তখন দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একস্থানে সংহত করিবার জন্য কর্তব্যবুদ্ধি স্থির করিবার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা।..... ঝগড়া করিতে গেলে সেনাপতি চাই।....."

[ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ :
নেপাল মজুমদার পৃঃ ২৫২ ]

জাতীয়তাবোধের বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিবার খল উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ। সুতরাং উহার বিরুদ্ধে যে জনজাগরণ এবং স্বদেশী আন্দোলন ইহা বাঙালীর কাছে ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈ-কি। তখনকার পরিবেশে সে-আন্দোলনের গতি ছিল দুর্বার। মুহূর্তে আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কলিকাতা হইতে দাবানলে পরিণত হইয়া বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই যুদ্ধে কেহই পশ্চাতে ছিলেন না। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একমুখী হইয়া ইহাকে বাধাদান করিল। দেশের কবিগণের অবদানও অবশ্য স্মরণীয়। জাতীয় আন্দোলনের ঠিক পাশে পাশেই আমাদের দেশীয় কবিগণ উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের দান কবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন, রঙ্গলাল, গোবিন্দ্রচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আন্দোলনকে অনেকাংশে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ইহাছাড়া বাংলামায়ের পল্লী অঞ্চলের কত অজ্ঞাত-অখ্যাত কবি-বাউলের এক একটি গানের কলি এই আন্দোলনকে যে কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে তাহার হিসাবও নগণ্য নহে। 'পলাশীর যুদ্ধ' বইখানি পাঠ করিলে মনের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহার অপূর্ব এক ভাব আশ্রিত হয়। একটি কবিতার একটি লাইন 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়' পাঠ করিলে ইহার অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিয়া অন্তরের গভীরতম তলদেশ হইতে বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর বজ্র নিনাদে বাহির হইয়া আসে, না—স্বাধীনতা হীনতায় আমরা কেহই বাঁচিতে চাই না - কেন বাঁচিতে চাহে না। স্বাধীনতাই যদি না থাকিল তবে জীবন ধারণের সার্থকতা কোথায়?— তাহা তো শুধু গ্লানি বহন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। তৎপরে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কবিতার মধ্যে এখানে মাত্র একটি কবিতা উল্লেখ করা যাইতেছে :

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পরদাসখতে সমুদায় দিলে।
পরহাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে
বহ লৌহ বিনির্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন আননরে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।

পরবেশ নিলে, পর দেশ গেলে,
তবু ঠাঁই নাহি মিলে দাস বলে।

কবিতাটি আন্দোলনের পাথেয় সন্দেহ নাই। কিন্তু জোড়াল পাথেয়, সুনির্বাচিত পথ এবং দুর্বার আন্দোলন, কোন কিছুরই অভাব না থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবিভাগ রদ্ করা গেল না—অর্থাৎ বঙ্গবিভাগ নিশ্চিত। বঙ্গ ভঙ্গ রদ্ করিবার এই আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পাইলেও আমাদের দেশের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা যিনি মহাত্মা নামে বাংলার সকলের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন সেই অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় স্বদেশী আন্দোলনের প্রাথমিক দিনেও বঙ্গভঙ্গ রদ্ করিবার মানসে স্থীরপথে কর্মের রথ চালাইয়া যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তাহার 'অশ্বিনী কুমার দত্ত' নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে তিনি দুই একবার বিলাতে স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পর আর তিনি আবেদন ও নিবেদনের থালা নতশিরে বহিতে সম্মত হন নাই। তিনি ছিলেন অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, তাই তিনি মুক্ত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :

অগ্নিময়ী মা গো আজি ডাকি সকলে মা।
জগৎ জোড়া ঐ যে আগুন এক ফিন্‌কি দে তার মা
ঐ আগুনের একটু পেলে,
এই মরা প্রাণ উঠবে জ্বলে
রুদ্র দীপ্ত তেজোহনলে
পুড়ে হবে সোনা।
বিকট ভীষণ দৈত্য-বংশ
ঐ আগুনে মা করব ধ্বংস
পাষণ্ড অসুর হীন নৃশংস
ধরায় রাখব না।
ওগো মা! মা! মা!'

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বঙ্গভঙ্গ কিছুতেই রদ্ করা সম্ভব হইল না অর্থাৎ প্রজাপুঞ্জের উপর রাজশক্তির উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা নিষ্ঠুরতম আঘাত হইয়া আসিল। ইহাতে বাংলা দেশের অঙ্গচ্ছেদের সংগে বাঙালী জাতির সামাজিক ও মানসিক শক্তিকেও চূর্ণবিচূর্ণ করিবার প্রয়াস নিহিত। কিন্তু রাজশক্তির কপট চক্রান্ত ও খল উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে নিহিত থাকিলেও বাঙালী জাতির প্রাণশক্তিও বীর্যবত্তায় শক্তিমান। ইহার সমাজ বাঁধন এমনই অটুট যে বহু দৈব দুর্বিপাক ও জটিল সমস্যা জর্জরিত অনেক সংকটের সম্মুখীন হইয়াও বাংলা আর বাঙালী বাঁচিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত কবিতা 'আমরা'-র প্রত্যেকটী পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলে বাঙালী যে কি, কি তাহার অসীম শক্তি, সাহস বীর্যবত্তা, সংস্কৃতির সাধনা, শিল্পকার্যে নিপুণতা এবং ধর্ম্মোপাসনা তাহার কিয়দংশের পরিচয় প্রদান করা যাইত। শুধু কয়েকটি লাইন এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল :

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি ;
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগের মাথায় নাচি।

* * * *

এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদপ্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

* * * *

কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

* * * *

বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।

সুতরাং বাঙালী সাধারণ নহে। দীর্ঘ দিনের অত্যাচার ও পরাধীনতায়ও বাংলার প্রাণ সজীব। সব কিছু বিপদে উত্তীর্ণ হইয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সকলেই একাগ্রচিত্ত। স্কুলে-কলেজে ইংরাজী শিক্ষাও তাহাদের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক বাধ্যতামূলক হিসাবে পড়ান হইলেও দেশহিতৈষীগণ দেশ ও জাতিগঠনে বহু অমূল্য গ্রন্থের আমদানী করিয়া ছাত্রগণের মনোভূমিতে উপযুক্ত বীজ বপনের চেষ্টা

করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে মহাত্মা অশ্বিনী কুমারের প্রচেষ্টার একটু নিদর্শন এখানে দেওয়া হইতেছে, "নিজের দেশের উন্নতি করিতে হইলে অপর যে সকল পরাধীন দেশ অশেষ বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া অবশেষে স্বাধীনতার দুরারোহ সুবর্ণ-পীঠতলে পূজার অর্ঘ্য পৌঁছাইয়া দিয়াছে, তাহাদের সাধনার পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। অশ্বিনীকুমার এই উদ্দেশ্যেই ব্রজমোহন কলেজের লাইব্রেরীতে ইটালীর ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা-লাভের প্রয়াস-পরিচয়, আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস এবং জাপানের জাগরণ সম্পর্কীয় বহুগ্রন্থ আনাইয়াছিলেন।"

[ অশ্বিনীকুমার দত্ত : সুরেন্দ্রনাথ সেন পৃঃ ৩৮ ]

ছাত্রগণই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। সে-সব কাণ্ডারীদের হুঁশিয়ার করিয়া তাহাদের মানসিক গঠনের জন্য উপরোক্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পর দেশের জনসাধারণকে স্বদেশী জিনিষ ক্রয় করা, স্বদেশী জিনিষ ভালোবাসা, এক কথায় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হইয়া স্বদেশী মনোভাবাপন্ন হইবার জন্য তিনি জীবন এবং মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দ দাসের নাম আজ বাংলার ঘরে ঘরে অমর হইয়া আছে। তাহার গীত স্বদেশী যাত্রার গান, গানের ভার, ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী বাংলার মাঠে-ঘাটে ঘরে-বাইরে এবং জন-জীবনের প্রতিতন্ত্রীতে নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই মুকুন্দ দাসের উৎসাহদাতা ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। অশ্বিনীকুমারের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় মুকুন্দ দাসের মানসিক গঠনও এমন স্তরে গিয়া পৌঁছাইয়াছিল যে, ভয়-ভীতি যে কি তাহা তিনি জানিতেন না; ভয়ই তাহার কাছে ভয় পাইত। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ফুলার সাহেবকে বরিশাল জেলার পক্ষ হইতে তিনি শুনাইয়া দিয়াছিলেন,

"ফুলার আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন তো স্বাধীন নয়।
হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে ধরে না হয় ফাঁসি দেবে
মনকে বাঁধতে পার তোমার এমন শক্তি নয়—
ফুলার এমন শক্তি নয়"

রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায় লিখিয়াছেন,

"মোটা বসন অঙ্গে নেবো
মোটা ভূষণ আভরণ করবো।"

কান্ত কবি রজনী কান্ত সেন লিখিয়াছিলেন,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই॥"

সব শেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথাটী উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,

"পরের ঘরে কিনবো না আর,
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি"

এমন সব কথায় ছড়ায় এবং গানে আর কবিতায় বাংলার দিকে দিকে তখন স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হাজার হাজার যুবক। ইহা বঙ্গভঙ্গের মধ্যেও বাঙালীর হাতে একটা সুফল। বড়লাট কার্জনের জিদ বা গোঁ বঙ্গভঙ্গ করিলেন। বাধা দিতে গিয়া দেখা গেল, বাঙালীর বিচ্ছিন্ন শক্তি সুসংহত অবস্থায় একত্রীভূত, রাজশক্তির বিরুদ্ধে উদ্যত, প্রজাপুঞ্জের নিঃশ্ছিদ্র ঐক্য। মুক্তি-কামী দেশবাসীর আকাঙ্খাপথে ইংরাজ রাজশক্তির জিদ্, অত্যাচার এবং প্রতিপদে বাধাদানে বাংলার জন-সমুদ্রের প্রশস্ত বুকেও তেমনি উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি হইয়াছিল। উহা ইংরাজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুইকূল ছাপাইয়া তাহাদিগকে জলোচ্ছ্বাসে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্য।

বাংলা মায়ের বুকখানি তখন আঘাতের বেদনায় জর্জরিত। বঙ্গভঙ্গ রদ্ করিবার জন্য আবেদন, নিবেদন যখন অরণ্যে রোদনে পরিণত হইল তখন আরম্ভ হইল স্বদেশী আন্দোলন; বিলাতী বর্জন। সে-আন্দোলন সফল এবং বিলাতী বর্জন অভিযানও কার্যকরী হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজ-রাজ বধির, তাহাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হইল না। তখনই আরম্ভ হইল নূতন পথের অনুসন্ধান। পথের সন্ধানও মিলিল। কিন্তু তাহা সরল ও সহজ পথ নহে। দেশের সমগ্র জনগণ সে-পথের পথিক কোন কালেই কোন দেশে হয় নাই। (ক্রমশঃ)

২৪ পৃষ্ঠার পর

বিচারকমণ্ডলী তাদের সিদ্ধান্তের কারণ নির্দেশ করবেন। অপর প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির চারিত্রিক কুৎসা বর্ণনা সম্বলিত একটি প্রচারপত্র বিলি করে রেড্ডীর নির্বাচনের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টির, গিরির পক্ষে ভোটদানের জন্য বিশিষ্টব্যক্তিদের ভোটারদের উপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সকল অভিযোগ অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা দূর করে ক্ষমতার এই শীর্ষকেন্দ্রকে কলুষমুক্ত করেছেন। রাষ্ট্রপতি গিরিও দ্বিধাহীন চিত্তে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যদান করে কোর্টের মর্যাদা ও নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন নিয়ে এই ধরণের বিরোধ নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ালে রাষ্ট্রের পক্ষে সমূহ অকল্যাণকর। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যতে আর যাতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সংশ্লিষ্ট সকলেরই সে-দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

## মহারাষ্ট্রে দাঙ্গা

গত ৭ই মে তারিখে মহারাষ্ট্রের তাঁতকেন্দ্র ভিয়াণ্ডি শহরে শিবাজী জয়ন্তী মিছিল আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে ওঠে। এই দাঙ্গা মোহাদ, জলগাঁও এবং কোলাবা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় দশদিন পর দাঙ্গা বন্ধ হয়। সরকারী মতে এই দাঙ্গায় ১৩০ জন নিহতের সংবাদ থাকলেও বেসরকারী হিসাব অনেক বেশী। ভিয়াণ্ডির ৫০০০ তাঁত কারখানার মধ্যে ১০০০ই ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রায় ৩৫০ বাড়ী, ৬১০টি কুঁড়ে ঘর আগুনে পুড়ে গেছে। ৩৪,০০০ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে, কেবলমাত্র ভিয়াণ্ডিতেই ৫০ লক্ষের ওপর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

ভিয়াণ্ডির গোলোযোগে বাইরের হাত আছে বলে শোনা যাচ্ছে। বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও তারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। ভিয়াণ্ডি দাঙ্গা সারা দেশে চাপা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার স্বাক্ষর বহন করছে। পাকিস্তানী হাইকমিশনের পক্ষ থেকে দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় সংখ্যালঘুদের মৃতের সংখ্যা এবং সম্পত্তি নাশের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য উদ্দেশ্যমূলক আবেদন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহিত বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে। এই দাঙ্গার জন্য দায়ী কে তা খুঁজে বার করবার দায়িত্ব সরকারের। প্রধানমন্ত্রী জনসঙ্ঘকে এ-জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তাতেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব স্খলন হোলো না। যদি তাই হয়ে থাকে আগেই তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন কেন করা হয় নাই সে-কৈফিয়ৎ তাকে দিতে হবে। তাছাড়া একটি সংখ্যালঘু সরকারের ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে দেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ ছড়াচ্ছেন তার দায়িত্ব কতটা তাও নির্ধারিত হওয়া উচিত। লোকসভায়-বসিরহাট উপনির্বাচনে মুসলীম লীগের পুনরভ্যুত্থান মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা বৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

## ভুটানে চীনা সৈন্য

গত মে মাসে ভুটানের অভ্যন্তরে তিনবার চীনা সৈন্য প্রবেশ করেছে, শেষবার ২০মে ডজনখানেক সৈন্য বেশ কিছুটা ভেতর পর্যন্ত এসেছিল। ১৯৬৭-এর পর আবার ভুটানে চীনা সৈন্যের আনাগোনা সুরু হোলো, ভুটানও যথারীতি চীনা দূতাবাসে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ভুটানে ইদানীং রাষ্ট্রপতি গিরি, জেনারেল মানেকশ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীনেশ সিং সফর করে এসেছেন। ভুটান রাষ্ট্রসংঘে যোগ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে এবং এ-বিষয়ে ভারতবর্ষ পূর্ণ সহযোগিতা করবে। ভুটানের এই নূতন কূটনৈতিক মর্যাদালাভের প্রচেষ্টা কি কোনো প্রত্যাসন্ন চীনা

আক্রমণের ইঙ্গিত কি না তা অদূর ভবিষ্যতই বলবে। জেনারেল ম্যানেকসর ভুটান সফরও তাৎপর্যপূর্ণ।

## আট পার্টি

চৌদ্দ পার্টি ভেঙে আট পার্টি তৈরী হয়েছে। এরা একদিকে বলছেন সি, পি, এম যত নষ্টের গোড়া, আবার এদের মধ্যে কেউ বলছেন সি, পি, এম-এর ডানা কেটে আবার চৌদ্দ পার্টির মোর্চা গঠন করতে হবে; আর বলছেন নির্বাচন চাই, যুক্তফ্রন্টের আমলে অর্জিত অধিকার রক্ষা করা চাই। সি, পি, এমও তাই বলছে। চৌদ্দ পার্টির দঙ্গল বাংলা দেশের যে সর্বনাশ করে গেলো, আট পার্টির জোট তা থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করবার কোনো পথ দেখায় নি। মার্ক্সবাদীদের স্বরূপ সম্পর্কে তাদের নূতন যে বোধোদয় হয়েছে, এতোদিন তা ছিলো কোথায় এবং নতুন করে বুঝে থাকলে আবার চৌদ্দ পার্টির দিকে চাতকের মত চেয়ে থাকা কেন? আসলে ক্ষমতা চাই—সে চৌদ্দ পার্টির জোটই হোক কিম্বা আট পার্টির জোটই হোক। এদের পরস্পর-বিরোধিতার নিহিত সংঘাতের দিকে চোখ বুজে থেকে যতদিন সম্ভব ক্ষমতা ভোগ করাই আসলে এদের রাজনীতি।

৩১. ৫. ৯০


**JAYASREE**

Socio-Cultural Bengali Monthly

Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

**Ordinary**

| | |
|---|---|
| Full Page : | Rs. 100·00 |
| Half Page : | Rs. 55·00 |
| Quarter Page : | Rs. 30·00 |

**Cover Page**

| | |
|---|---|
| Second Cover : | Rs. 175·00 |
| Third Cover : | Rs 200·00 |
| Fourth Cover : | Rs. 350·00 |

For Special Position contact *Advt. Manager* Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm. ( 8″ × 6″ )

Contact

Manager, Jayasree

251A/32, Netaji Subhas Chandra Bose Road

Calcutta—47

Phone : 46-4116


২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

# সাময়িক পত্রপত্রিকা

## পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা ● ষাণ্মাসিক—২·০০ টাকা

বার্ষিক—৫ টাকা

## ওয়েস্ট বেঙ্গল

সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা ● ষাণ্মাসিক—৫ টাকা

বার্ষিক—১০ টাকা

গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য

নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—১

পশ্চিমবঙ্গ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ১৪৪১/৭০

GOOD
FOR A
LIFETIME

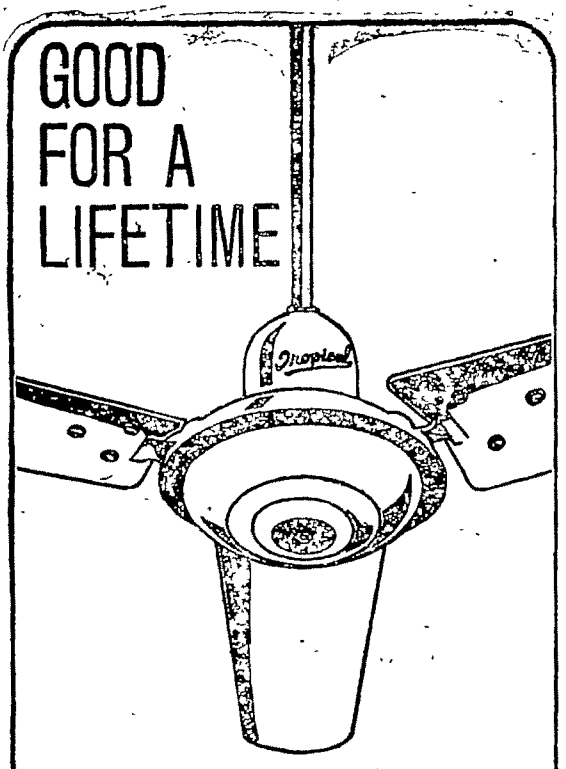


# TROPICAL

DE LUXE **FANS**

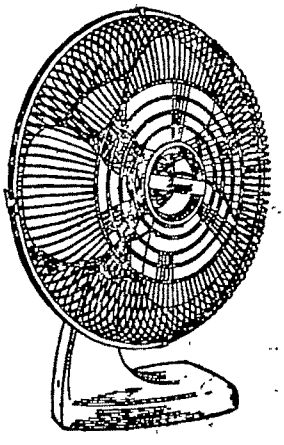

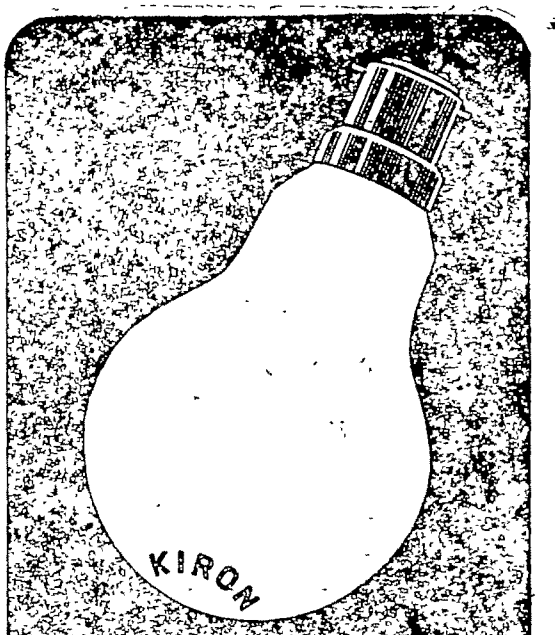


# KIRON

LIGHTS BRIGHTER
LIGHTS LONGER

MANUFACTURED BY

**BHARAT ELECTRICAL INDUSTRIES LTD.**

19, RAJENDRANATH MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-1

AGENTS:

**THE ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD.**

CALCUTTA . BOMBAY . MADRAS .
DELHI . KANPUR

# সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

মতামত

সুভাষচন্দ্র প্রথম খণ্ড পড়ে ভাল লাগলো। অন্যান্য জীবনী থেকে এর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনার পরিচয় দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন লেখক। এই পরিকল্পনা যথার্থ বলে মনে হয়। সুভাষচন্দ্র কবি, দার্শনিক বা ধর্মগুরু নন। তিনি দেশনেতা। তাই দেশের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর নেতৃত্বের বনিয়াদ গড়েছে। সুতরাং তাঁকে জানতে হলে দেশ ও কালকেও জানা চাই। কবি এবং দার্শনিককে তাঁদের জীবনের মধ্যেই জানা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অসামান্য দানের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বিস্তৃত জীবনীই তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারে।

এই প্রথম খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ জীবনীর যে আভাস পাওয়া গেল তা আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। দেশ ও কালের প্রভাব কিভাবে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে লেখক তা সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে "শিবচেতনার জাগরণ" অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনারীতি বিষয় বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ছাপা বাঁধাই সুরুচিসম্মত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'জাতীয় গ্রন্থাগার'

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

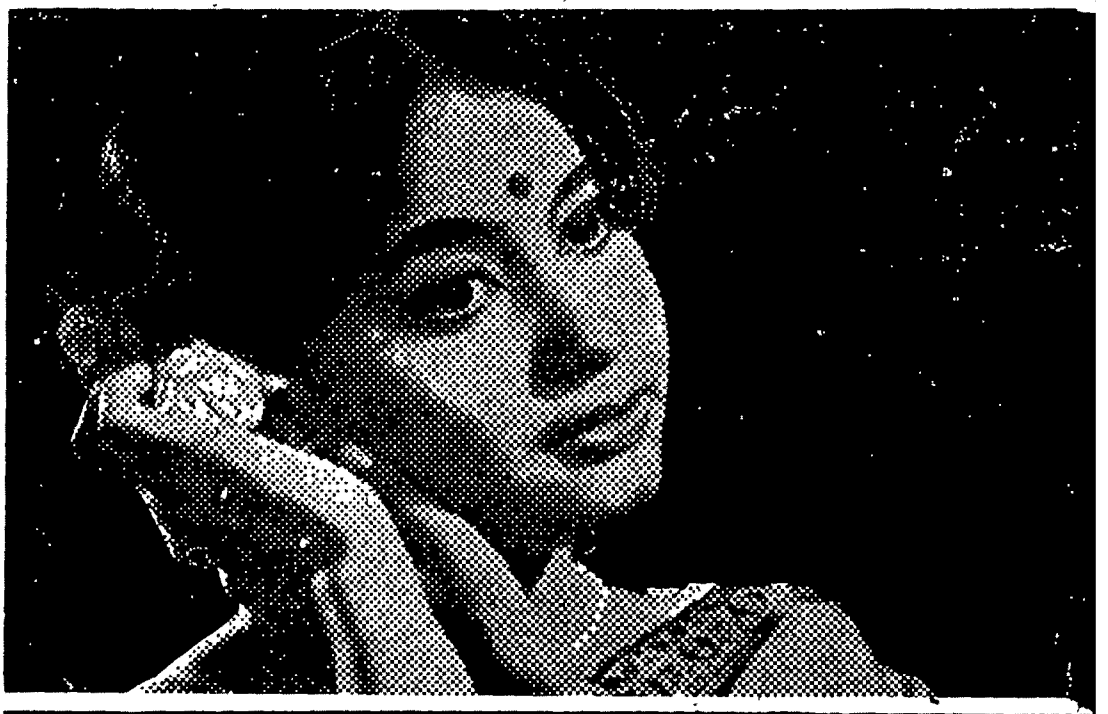

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৩

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

23 JUN 1970
SBC-1/65


Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·7
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-4

৩৩৭৭

জ্যৈষ্ঠ

# ভ্রমণী

প্রতিষ্ঠাত্রী
সম্পাদিকা :
লীলা রায়

## সূচীপত্র

জয়শ্রী : জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| দীপ নিভে গেছে | সুনীল দাস | ৭১ |
| বিস্ফোরণ | কালীচরণ ঘোষ | ৭৯ |
| ( ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ ) | | |
| বাংলা ছোট গল্পের মানচিত্র : ৯ | | |
| ( ধারাবাহিক আলোচনা ) | সুরজিৎ দাশগুপ্ত | ৮৭ |
| অবেলার সিঁড়ি ( উপন্যাস ) | বাসুদেব দেব | ৯৭ |
| জাপানের দিনগুলি | বারীন বর্ধন | ১০৫ |
| ( ভ্রমণকাহিনী ) | | |
| জাতীয়তার রূপায়ন | দীপংকর | ১১১ |
| ( ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) | | |
| শোক প্রস্তাব | | ১১৭ |
| সম্পাদকীয় | | ১১৮ |



সম্পাদক : সুনীল দাস


## জয়শ্রীর নিয়মাবলী

### গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

### লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়**


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
পো: নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

## জয়শ্রী প্রকাশন কর্তৃক প্রচারিত কয়েকটি বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| NETAJI THROUGH GERMAN LENS a new discovery | : | Nanda Mookerjee | 3·00 |
| WHAT NETAJI STANDS FOR | : | Anil Roy | 0·50 |
| REVOLUTION WHAT IT IS | : | Subhas Ch. Bose | 0·25 |
| **ROLL OF HONOUR an anecdote of Indian Martyrs** | | Kalicharan Ghosh | Rs. 30 00 |
| বিপ্লব কি ? | | সুভাষচন্দ্র বসু | ০·২০ |
| নেতাজীর বাণী | | সংকলন | ০·২০ |
| ভূমি-সমস্যা | | সুনীল দাস | ০·২০ |
| এ আমরা সইব না | | লীলা রায় | ০·২০ |
| মাতৃমন্ত্র ( দেশাত্মবোধক গানের সংকলন ) | | কালীচরণ ঘোষ | ১·৫০ |
| সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং | | শঙ্করীপ্রসাদ বসু | ৬·০০ |

### প্রাপ্তিস্থান ঃ

Jayasree Prakashan
20A, Prince Golam Md. Road,
Calcutta-26.

Jatiya Sahitya Prakashan
18A, Tamer Lane,
Calcutta-9.

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

# জয়শ্রী

৩৫ বর্ষ ০ দ্বিতীয় সংখ্যা ০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

## দীপ নিভে গেছে

দীপ নিভে গেছে। যে দীপশিখা ১৯৩১-এ 'জয়শ্রী'র প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে তাকে আলোকিত

করে রেখেছিল, তা আজ নিভে গেছে। যে অনুপম ব্যক্তিত্ব বাংলার জনজীবনে প্রায় পঞ্চাশ বছর তেজ ও মাধুর্যের সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়েছিলেন, তিনি আজ আর নেই। যিনি গত পঁয়তাল্লিশ বছরের দুর্গম যাত্রায় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন, চরম দুর্যোগও যার কাছে হার মেনেছে, প্রতিকূল পরিবেশকে মনের ঐশ্বর্য দিয়ে সূর্যালোকিত করবার স্বভাবজ ক্ষমতার যিনি অধিকারী ছিলেন, যিনি ছিলেন আমাদের সকল কর্মোদ্যমের উৎস, আমাদের আনন্দের নির্ঝর, আমাদের অমূল্য সম্পদ, আমাদের সেই পরমশ্রদ্ধেয়া দিদি আজ মহাপ্রয়াণে অস্তমিত হয়েছেন।

দিদি চলে গেছেন। তাঁর প্রবল ও মাধুর্যময় ব্যক্তিত্ব, প্রখর প্রতিভা, বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি, বেগবান কর্মোদ্যম এবং সর্বোপরি তাঁর অপূর্ব মানবিকতা, তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে যে উষ্ণ পরিবেশ রচনা করেছিলো, বাংলাদেশের কয়েক সহস্র নারী-পুরুষ কোনো না কোনো সময়ে সেই পরিবেশের উষ্ণতায় সিঞ্চিত হয়ে উদ্দীপিত হয়েছেন। শুধু বাংলাদেশ কেন, বাংলাদেশের বাইরেও এমন বহু মানুষ আছেন, এই পরিবেশের উষ্ণতার স্পর্শে যাদের প্রাণে নবজীবন সঞ্চারিত হয়েছে। তাদেরই মধ্যে পরিচিত-অপরিচিত এবং আরও অনেক—তাঁর অনুরাগী, অনুসারী, গুণমুগ্ধ, সহকর্মী, সতীর্থ, আত্মীয়—অগুণতি বেদনার্ত মানুষ গত ১২ই জুন ছুটে এসেছিলেন পি, জি, হাসপাতালে শেষদর্শনের কিম্বা শেষযাত্রায় যোগ দেবার জন্য। আমাদের জীবনে আর একটি দুর্যোগ ভেঙে পড়েছিল আঠার বছর পূর্বে, স্মৃতির তীব্রতা সে-দিন সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলো। ১৯৫২-এর ৭ই জানুয়ারী আর একটি দীপশিখা অকস্মাৎ নির্বাপিত হয়ে আমাদের দিগন্ত বিষাদময় করে তুলেছিলো। সেদিন আমাদের দাদার—৺ অনিল রায়—শেষযাত্রায় এমনি অগুণতি মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ভেঙ্গে পড়েছিলো।

আড়াই বছর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দিদি হাসপাতালের রোগশয্যায় শায়িতা ছিলেন। তারও পূর্বে কয়েকটি বছর কেটেছে নানা শারীরিক অপটুতার সঙ্গে দুর্ধর্ষ সংগ্রামে। শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে বার বার রোগের আক্রমণে কিন্তু অপরাজেয় মনোবল নিয়ে কর্তব্যসাধনে দিদি তৎপর ছিলেন। ১৯৫৫ সালে প্রথম হৃদরোগের প্রবল আক্রমণ, ১৯৫৯ সালে তার মৃদু পুনরাবৃত্তি, ১৯৬০ সালে প্রথম মস্তিষ্কে মৃদু রক্তক্ষরণ, তারপর ১৯৬৭র প্রবলতর আক্রমণে তিনদিন সংজ্ঞাহীন, মাসাধিককাল শয্যাশায়ী, আবার প্রাত্যহিক কর্তব্যে প্রত্যাবর্তন; এরই মাঝে ১৯৬৬-র অক্টোবরে বাঁ উরুর হাড় ভেঙ্গে মাস দুই শয্যাশায়ী। ১৯৬৮-র ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দুরন্ত সেরিব্রেল আক্রমণে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাড়ী থেকে তাঁর শেষযাত্রা। সেদিন ঘর ছেড়ে তাঁকে অগস্ত্যযাত্রায় বার হতে হবে ১৯৬৮-র ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সেই সকালবেলা তার মনেও কোনো আলোছায়ার রেখাপাত করেনি। সে-সময় ১৯৬৭র ডিসেম্বরে ডান উরুর হাড় ভাঙার ফলে প্ল্যাষ্টারে তিনি শয্যাশায়ী। সেই অবস্থায় প্রতিদিন ভোর সাড়ে চারটায় জেগে উঠে দিনের নৈমিত্তিক

কাজের জন্য তৈরী হয়ে নিতেন সকাল ছটা-সাড়ে ছটার মধ্যে। সেদিনও প্রসন্ন মন নিয়ে লেখা-পড়া সুরু করবার অল্পকালের মধ্যেই রোগের দুরন্ত আঘাত এলো। তিনি অচৈতন্য হয়ে পি, জি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেন।

হাসপাতালে অচৈতন্য স্তব্ধতায় যেন সমাধিলীন ছিলেন। তাঁর নিমীলিত চোখে, শান্ত সমাহিত মূর্তিতে রোগ যন্ত্রণার ছাপ নেই বেশীর ভাগ সময়। চৈতন্যের গভীরে যে শক্তির উৎস, সংজ্ঞাহীন অবস্থার মধ্যেও যেন সেই শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁকে জ্যোতির্ময় করে তুলেছে। যারা তাঁকে রোগশয্যায় দেখতে গেছেন তাদের মনে হয়েছে যেন সবেমাত্র নিদ্রামগ্ন হয়েছেন। দিদির মধ্যে যে শক্তি নিহিত ছিল, জীবনের উপান্তে পৌছে সে-শক্তি যেন আপন পথ খুঁজে পেলো। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি মানুষের মনে শক্তি সঞ্চারিত করে থাকে। দিদির জীবনে আত্মপ্রত্যয়ের গভীরতা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে তাঁকে অটল মানসিকতার স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, তেমনি সময়ের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে আত্মনিবেদনের প্রশান্তি সঞ্চারিত হয়ে, তাঁকে আর এক জগতে পৌছে দিয়েছে। বিধাতা-পুরুষের কাছে সর্বস্ব-সমর্পণের এবং আত্মনিবেদনের এই প্রশান্তি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে তাঁকে অন্তর্মুখীন করে তুলেছিলো। তাই শেষের বছরগুলিতে আমরা যারা কাছের মানুষ, আমরাও দেখেছি দিদি কোনো কিছুতে মগ্ন থাকা অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলে দূরান্তের মানুষের দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে প্রথমটা তাকাতেন। তারপরই প্রসন্ন মুখে কাছের মানুষের মতই কথাবার্তা সুরু করতেন। দিদির এই তন্ময়তার অন্তরালে শক্তির উদ্বোধন চলেছিল। যে শক্তি তাঁকে রোগভার বহনে সামর্থ দিয়েছে, জীবনের উপান্তে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও স্থৈর্যের অটলতা দান করেছে। সংজ্ঞাহীন হবার পূর্ব পর্যন্ত শেষের সাত বছরের শক্তি-সাধনার দুর্জ্ঞেয় ইতিহাস যদি কোনোদিন অবারিত হয়, বিস্ময়-বিমুগ্ধ পৃথিবী সেদিন জানতে পারবে কোন অবিশ্বাস্য সাধনায় দিদি নিয়োজিত ছিলেন! এই সাধনার মধ্যে প্রতিটি তেইশে জানুয়ারী তাঁকে চঞ্চল করে তুলতো, যেন কোনো দেবতার মন্দিরে অর্ঘদানের সমাগত লগ্নে অর্ঘ নিবেদনের শশব্যস্ত আয়োজন তাঁর রাত্রির ঘুম দিনের বিশ্রাম কেড়ে নিয়ে তাঁকে নিয়োজিত করেছে। এই সাধনার উদ্বোধনে তাঁরই ভাষায়ঃ "এক অত্যাশ্চর্য সত্য উদ্ঘাটিত হোলো। অভাবনীয় তার সম্ভাবনা, অচিন্ত্যনীয় তার আনুসঙ্গিক সব কিছু। আমার অনুভূতিকে বিশ্লেষণ বা ভাষা দিতে চেষ্টা করবো না। কেবল বলবো "হে অঘটন ঘটন পটিয়সী দেবতা" আবার দেখলামঃ

"অকস্মাৎ কোথায় কি ঘটে
চির অসম্ভব আসে চির সম্ভবের বেশে"

এই সত্য উদ্ঘাটনের সময়কাল চিহ্নিত করে গেছেনঃ ৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ সাল।

এই শক্তি-সাধনার অঙ্কুর দেখেছি দিদির মধ্যে তাঁর কর্মযজ্ঞের সুরুতে। ১৯২১ সালে দিদিকে যখন প্রথম দেখি খুব নিকট থেকে, সে-সময়ই দেখেছি তাঁর প্রকৃতিতে তেজ ও মাধুর্যের অপূর্ব সমাহার। ঢাকার উয়ারী পল্লীতে আমার মাতামহের বাড়ীতে দীপালী সঙ্ঘের উয়ারী শাখার উদ্বোধন হবে। আমার উপর ভার পড়েছিলো মঞ্চ তৈরীর কাজে সহায়তার। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র আমি। আমার সেই ষোল বছর বয়সের সেদিনকার দিদিকে দেখার স্মৃতি আজও বিস্মিত দৃষ্টির বিহ্বলতা নিয়ে জেগে আছে। তখন লীলা নাগের নাম শুনেছি, কিন্তু এতো নিকট থেকে তো তাঁকে ইতিপূর্বে দেখি নাই! বিস্মিত ও ত্রস্ত মন নিয়ে দিদির হুকুম তামিল করে গেছি একটার পর একটা: 'দঁড়ি আনো, বাঁশটা নিয়ে এসো, সতরঞ্চিটা এখানে বিছাও' এমনি আরও কত কি ফরমায়েশ, যেগুলি রুদ্ধশ্বাস ব্যস্ততার সঙ্গে পালন করে গেছি। দিদির মুখাবয়বে সেদিন যে তেজ দেখেছি, তার দহন ছিলনা, প্রখর দীপ্তি ছিল; মাধুর্যের স্নিগ্ধতা সে-প্রখর দীপ্তিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কার সাধ্য আছে তাঁকে অগ্রাহ্য করে! অন্যভাবে বলতে হয় তাঁর নির্দেশ পালনের আনন্দ আস্বাদনের বঞ্চনাটাই দুর্ভাগ্য। সেদিন কেবলই মনে হয়েছিল দিদির কাজ করে দেওয়া, তাঁকে মেনে চলা এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সে সময় দিদির মনের ঐশ্বর্য তাঁর মুখভাবে, তাঁর অবয়বে, তাঁর চলায়, বলায় উচছে পড়ছিল। আমার চোখের বিমুগ্ধ দৃষ্টি সেখানে উপস্থিত ছোট-বড় সকলের চোখেই ভেসে উঠেছিলো। কোনো অতিশয্য নেই, কোন আড়ম্বর নেই; একটি মনের আভিজাত্য তাঁর ব্যক্তিত্বের মানসিক আভিজাত্যে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র পরিবেশে আভিজাত্যের সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছিল। উৎকর্ণ মন, দ্রব অনুভূতি, বিস্ময়ের আকস্মিকতা, ভক্তির আবেগ, প্রীতির রোমাঞ্চ এবং সান্নিধ্যের পুলক—সব মিলিয়ে দমকা হাওয়ার রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলির মত সেদিনকার অপরাহ্ন কেটেছিল। দিদিকে সেই প্রথম দেখার ছবি চিরস্থায়ী হয়ে আছে স্মৃতিতে।

সেই ছবির রূপান্তর দেখেছি। ধীরে ধীরে প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে দিদি নিজেকে আদর্শের উদযাপনে আহুতি দিয়ে গেছেন। প্রায়ই বলতেন "আমি নিজেকে বার বার ভেঙে-চুরে নূতন করে গড়ে তুলেছি।" এ-ভেঙে-চুরে গড়া হতাশার আত্মসমর্পণ নয়—সাধকের আত্মনিবেদন। জীবনের প্রথম পর্যায়ের তেজ ও মাধুর্যের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্ত হোলো ত্যাগ। প্রথমবার কয়েক বছরের কারাবাসের পর যে জীবনযাত্রা শুরু করলেন, কৃচ্ছ্রতা ও ত্যাগ সে জীবনের অনুষঙ্গ ছিল কিন্তু তেজ ও মাধুর্যের দীপ্তিও তেমনি প্রখর ছিল। প্রথম জীবনে যে প্রাচুর্যের ছোঁয়াচ ছিল, এবারকার পর্যায়ে প্রাণের প্রাচুর্য ছাড়া প্রাচুর্যের আর সব উপকরণই দিদি বর্জন করেছেন। এই রূপান্তরে ক্লেশ ছিল, বেদনাও হয়তো ছিল, কিন্তু নিজের জীবনকে ভেঙে-গড়বার ক্ষমতা দিয়ে বিধাতা যাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এই ক্লেশ ও বেদনার উত্তরণ অনায়াসসাধ্য ছিল। বিপ্লবীর ঝড়-ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উত্তাল জীবনের কৃচ্ছ্রতা

ও কাঠিন্যের নিত্যসঙ্গী হবার প্রস্তুতি যাঁর, তাঁর এই ত্যাগব্রতী নিরাভরণ জীবনযাত্রা যাদের আহত করেছে, তাদের উদ্দেশ্য করেই দিদি এক সময় বলেছিলেন :

"আর দশজন লোকের মত আমি চলি না। সেটা ভাল কি খারাপ সেটা প্রশ্ন নয়, আমি চলি না এটাই fact। জীবনে অতি অল্প বয়স থেকেই কতকগুলো নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে নিজের জীবনে সেগুলো আচরণ করবার চেষ্টা করে থাকি। তা বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে ভাল বা খারাপ হতে পারে তাতে আমার এসে যায় না। নিজের নীতিতে অবিচলিত থাকবার মত দৃঢ়তা আমার আছে এবং শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।" এই ত্যাগের পরিণতিতে আত্মনিবেদনের পরিপূর্ণতা দিদির জীবনে মূর্ত হতে দেখেছি।

দিদি নিজেকে রেণু রেণু করে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে। তাঁর কর্মজীবনে কত অজস্র লোকই না কম বেশী সাহায্য পেয়ে গেছে, তাদের দুঃখের দিনগুলি সহনীয় করবার জন্য। অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সাহস দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, কর্ম-সংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়ে—অজস্র ধারায় দিদির সহায়ক হস্ত প্রসারিত হয়েছে, অক্ষমদের জন্য, দুর্গতদের জন্য, সমাজে যারা অনগ্রসর তাদের জন্য। বিপ্লবীর জীবন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা আছে, তারা আচরণে নির্দয় হবেন, রূঢ় হবেন এবং অপরের দুঃখ-ক্লেশ তাদের অভিভূত করবে না বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে দিদির ধারণা ছিল একেবারে ভিন্নতর, মানুষকে ভালবাসার মধ্যে যার চরম সার্থকতা। তিনি নিজেই বলেছেন : "চির বিপ্লবীর জীবনই চাই, মানুষকে ভালবাসি, চিরদিন বেসেছি, আমার সকল কাজের উৎসাহ তাই, কিন্তু ভালবাসা আমার বন্ধন নয়, প্রেরণা ও আনন্দ।" মানুষকে ভালবাসার অফুরন্ত নিদর্শন দেখেছি। এ ভালবাসা পোষাকী ভালবাসা নয়, অন্তরের আবেগ দিয়ে পরকে আপন করে নেবার ভালবাসা, নিজেকে উজার করে দিয়ে ভালবাসা। বিপন্ন অসহায় যে মানুষ তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানের সুযোগ পেয়েছে। অজস্র ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। এক বৃদ্ধা উদ্বাস্তু দুটি নাবালক নিয়ে তার বাড়ীতে এসেছেন,—১৯৫০-এর দাঙ্গার পর, যেমন সংখ্যাতীত স্ত্রী-পুরুষ-শিশু তাঁর সহায়তা পেয়েছে সে সময়। তার ছেলে অর্থাৎ নাবালক দুটির পিতা যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, ওদের মা নেই। কয়েক বছর পর্যন্ত বৃদ্ধার, নাবালকদের এবং সেই রোগগ্রস্ত পুত্রের তত্ত্বাবধান দিদির নৈমিত্তিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ ধরণের আরও অজস্র ঘটনা তাঁর হৃদয়বত্তার, মানুষকে ভালবাসার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

আনুগত্য—'লয়ালটি'—দিদির কাছে মানবচরিত্রের একটি অনন্য সম্পদরূপে মূল্য পেয়েছে। এ আনুগত্য কোনো অন্ধ যান্ত্রিক কিম্বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থসন্ধ আনুগত্য নয়। এই আনুগত্যে আদর্শের ছোঁয়াচ রয়েছে, এই আনুগত্যের আবেগ মানুষকে বিপদের ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করে, ক্ষতি স্বীকারে

নিয়োজিত করে এবং বঞ্চনাবরণে এগিয়ে দেয়। এই loyalty দিদিকে অভিভূত করেছে, তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের স্তরে স্তরে। কখনও সহকর্মী ৺রেণু সেনের কথা উঠলে তাঁকে দেখেছি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলতেন "রেণুর loyalty আমাকে অদ্ভুতভাবে স্পর্শ করেছে।" আরও বলতেন "যাদেরই মধ্যে এই loyalty দেখবো like a rock তাদের পাশে দাঁড়াবো।" Loyaltyর প্রতি অটল আবেগ, যে কোনো মূল্যে আনুগত্য-সম্পন্ন সহকর্মী, সহযোগী, বন্ধু কিম্বা সাধারণ মানুষের পাশে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের রক্ষা করবার অতুলনীয় মহত্ব দিদির মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী মূর্ত হয়ে উঠেছে। পর্বতের শক্তি নিয়ে দিদি এগিয়ে গেছেন আনুগত্যের মূল্য দিতে; 'like a rock' কথাটি যে কথার কথা নয় তাঁর জীবনে, তার অনেক পরীক্ষা হয়ে গেছে। ক'লকাতার দাঙ্গায় জীবন সংশয় করে সহকর্মী ও সুহৃদ আসরাফউদ্দিন আমেদ চৌধুরীকে পার্ক সার্কাস অঞ্চল থেকে উদ্ধার করে এনে নিজেদের ঘরে কয়েকদিন আশ্রয় দিয়ে প্রায় ছয়মাস কাল তাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই আদর্শেরই অনুপ্রেরণায়। ঠিক তেমনি, দিনাজপুর জেলের যে ওয়ার্ডারটি বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দিদির চিঠিপত্র আদান-প্রদানের বাহন ছিল, গোপন তথ্য পুলিশের হস্তগত হবার ফলে সে চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়ে কারাবাসের পর বাইরে এলে সেই ওয়ার্ডারটিকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে তার 'লয়ালটি'র মর্যাদা দিয়েছিলেন। কয়েক বছর নিজের বাড়ীতে রেখে 'জয়শ্রী' পত্রিকার পিওনের চাকুরী দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। তারপর তার আরও অর্থাগমের ব্যবস্থাও দিদির আনুকূল্যেই সম্ভব হয়েছিলো। যাদেরই 'লয়ালটি' তাঁকে স্পর্শ করেছে, তারাই তাদের প্রাত্যহিক জীবনের খাওয়া-পড়া-থাকা-বিশ্রামে তাঁর স্নেহের সিঞ্চনে সিক্ত হয়েছেন। সহকর্মীদের সম্পর্কে তাঁর ব্যাকুলতা প্রায় প্রবাদ বাক্য হয়ে রয়েছে। তাদের অসুখে-বিসুখে এতো চঞ্চল হয়ে পড়তেন, যে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, চিকিৎসার তত্ত্বাবধান, প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর রেখে তাদের নিরাময় করে তোলা তাঁর অবশ্য করণীয় কর্তব্যের মধ্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। শুধু সহকর্মী কেন, পরিচিতদের, পরিজনদের অসুখে এই তৎপরতা তাঁর স্বভাবের নিয়মই ছিল। সহকর্মীদের জন্য ব্যাকুলতা মানুষকে ভালবাসার আর এক রূপ।

দুর্জয় সঙ্কল্পের স্বাক্ষরে আকীর্ণ হয়ে আছে দিদির জীবনের গতিপথ। সপ্তদর্শী কন্যা যেদিন পিতাকে লিখেছিলেন "আমার উদ্দেশ্য নয় পৃথিবীতে লোকের প্রিয় হওয়া কিন্তু এই পৃথিবীতে খাঁটি হওয়া," সেদিনই তাঁর দুর্জয় সঙ্কল্পের চকিত প্রতিফলন দেখা গেছে। তারপর স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্জয় সঙ্কল্পের রেখাঙ্কন ক্রমে ক্রমে অবারিত হয়েছে। দীপালি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ, এমন কি 'জয়শ্রীর' প্রতিষ্ঠাও সেই দুর্জয় সঙ্কল্পের স্বাক্ষরে চিহ্নিত হয়ে আছে। সঙ্কল্প ও তার প্রয়োগের মধ্যে সময়ের অতিক্রমণের শৈথিল্য দিদি কোনোদিনই বরদাস্ত

করেন নি। তাই যেমন সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাজে রূপ দিয়ে গেছেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত, দ্রুত প্রয়োগ তাঁর স্বভাবে যেন গাঁথা হয়েছিলো। তাই অনেক সময় সহযোগীরা তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে কঠোর তিরস্কারের সম্মুখীন হয়েছেন। এই শৈথিল্য তাঁকে বিভিন্ন সময়ে অসহিষ্ণু করে তুলেছে. কিন্তু সে আর কতক্ষণ! পাছে তাঁর তিরস্কারে কিম্বা অসহিষ্ণুতায় কেউ আহত বোধ করে, তাই তার অল্পকাল পরেই সহকর্মীদের সঙ্গে কৌতুক করে পরিবেশ মেঘমুক্ত করতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কেউ আহত বোধ করলে, সেই আঘাত তাঁকেই বেদনাহত করে তুলতো বেশী! এমনও ঘটনা ঘটেছে, তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে না পারবার ফলে কঠিন তিরস্কারে কোনো সহকর্মীকে জর্জরিত করে তাকে বিদায় দেবার পর গাড়ী করে তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে হাল্কা না করে আসা পর্যন্ত অস্থির হয়ে রয়েছেন। কঠিনে-কোমলে তাঁর এই প্রকৃতি কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় নাই। অন্যায় যেমন ধিক্কারে প্রতিহত হয়েছে তেমনি অন্যায়কারী ক্ষমা চেয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা পেয়ে তার সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে, এমন ঘটনাও রয়েছে প্রচুর। দুর্জয় সঙ্কল্পের সঙ্গে দুর্জয় সাহস তাঁকে বার বার অপরাজেয় করে তুলেছে, বিশেষভাবে ঘোর বিপদের মধ্যে তার দুঃসাহসিক অভিযানগুলির কথা মনে পড়ে। প্রথমবার গ্রেপ্তারের পূর্বে দলের নেতৃত্ব ভার নিয়ে বৈপ্লবিক কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে সঙ্কল্প ও সাহসের দ্বৈতরূপ তাঁর ব্যক্তিত্বের আর একটি স্তর উন্মোচিত করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলিতে বিপন্নদের উদ্ধারে তারই আর একরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর চোখে-মুখে দুর্জয় সঙ্কল্পের ও দুর্ধর্ষ নির্ভীকতার ঝলকে তাঁর পরিবেশ উচ্চকিত হতে দেখেছি। ১৯৪৬ সালে কলকাতার ও নোয়াখালির দাঙ্গায় তার অমিত শক্তিজাত তেজের বিচ্ছুরণ দেখেছি। প্রতিদিন দাদা ও দিদি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার কাজে বার হয়ে ময়দানে মিলিটারী ক্যাম্প থেকে একজন রিভলভারধারী প্রহরী নিয়ে দুর্গম বিপদসঙ্কুল এলাকায় গেছেন বিপন্নদের উদ্ধার করতে। আমিও সঙ্গে থেকেছি। প্রথম দিন একটি গোরা সৈন্য রিভলবার নিয়ে গাড়ীতে বসলো। দ্বিতীয় দিন ক্যাপ্টেন বললো: 'সশস্ত্র প্রহরী নেই, দিতে পারবে না।' দিদি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে এই বলে রওয়ানা হলেন 'We will go inside the danger zones. If anything happens to us, the responsibility will be entirely yours." গাড়ীতে ফিরে এসেছেন, গাড়ীর মালিক-চালক গাড়ী স্টার্ট দিয়েছে, ছুটতে ছুটতে ক্যাপ্টেন এসে একজন প্রহরী বহাল করে গেলেন। নোয়াখালীতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, সেখানেও ভারপ্রাপ্ত সামরিক ক্যাপ্টেনকে একই উত্তর দিয়ে বিনা প্রহরায় একদিন রামনগরের উপদ্রুত অঞ্চলে দিদি এবং দাদা অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে অপহৃত মেয়েদের উদ্ধার করেছিলেন।

বাংলাদেশের আর এক দুর্যোগময় মুহূর্তে তাঁর সীমাহীন নির্ভীকতা স্মরণীয় হয়ে আছে। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধে বর্মার পতনের অব্যবহিত পূর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীদের ফ্যাসিষ্ট, জাপানের চর ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করে সাম্রাজ্যবাদীদের সংবাদপত্র ষ্টেটসম্যানে সরকারকে প্রকাশ্যে প্ররোচিত করে সম্পাদকীয় বার হোলো "Shoot them", ঃ এদের গুলি করে মারো। এই প্ররোচনার মুখে নেতাজী-পন্থীরা ভীত-সন্ত্রস্ত্র-স্তব্ধ হয়ে গেছে। দিদির চোখে ঘুম নেই। বার বার বলছেন এই সন্ত্রাসের, এই অপপ্রচারের, এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে। কয়েক রাত জেগে জবাব লিখলেন "We shall not stand it" এবং হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করে শান্ত হলেন। তারপরও ষ্টেটসম্যানের হিংস্র আক্রমণ চলেছে দিদির এবং অন্যান্য নেতাজীপন্থীদের উপর। কিন্তু তারা দিদির ঐ প্রত্যুত্তরের পর সম্বিৎ ও সাহস ফিরে পেয়েছেন। সে-সময় বহু নেতাজীপন্থী জেলে, দাদাও কয়েকমাস পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ছিলেন।

দেশবিভাগের পরিণতিতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের লাঞ্ছনা ও পীড়ন, মনুষ্যত্বের অবমাননা দিদিকে বার বার বিচলিত করেছে ; তার যন্ত্রণা-কাতর মন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। নারীর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মনের অস্ফুট আর্তনাদের প্রতিধ্বনি, সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার বিরুদ্ধে ধিক্কার, বেদনার্ত ভাষা পেয়েছে ঃ "এই কি প্রতিকার"। তারপরেই এদের সাহায্য ও সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে শরীর তার অপটু হয়ে গেছে, কায়িক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়, উত্তেজনা অত্যন্ত হানিকর। তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিত মানুষ যখন আশ্রয়ের আশায় পশ্চিম বঙ্গে ঠাঁই নিতে থাকলো, দিদি অধীর হয়ে গেলেন। কিছু একটা করা চাই এই দুঃসহ যন্ত্রণার প্রতিকার চাই। সহকর্মীদের বল্লেন 'কি হবে এই জীবন রক্ষা করে সরকারী ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করবো'। কারো নিষেধ না মেনে সহস্রাধিক নারীপুরুষকে সঙ্গে নিয়ে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে কারাবরণ করেছিলেন। 'মানুষকে ভালবাসা'র চরম মূল্য দিতে দিদি কখনও দ্বিধা করেন নাই।

দুই শতাব্দীর মাঝখানে দিদির জন্মলগ্ন। তাই দিদি একদিকে যেমন উনবিংশ শতাব্দীর উদার সার্বিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে 'মানুষকে ভালবাসা'র মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তেমনি বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব সাধনাকে তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। এই বিপ্লব-সাধনা তাকে আত্মনিবেদনে পরিপূর্ণতা দিয়ে শক্তি-সাধনার পথে এগিয়ে দিয়েছিলো। আত্ম-পরিচয় দিয়ে দিদি তাই বলে গেছেন "আমি আত্ম-নিবেদিত বিপ্লবী পেছুটান আমি রাখি নি।" সাধারণের সমতলে দাঁড়িয়েও দিদির মানবপ্রেমের এবং আত্মনিবেদনের এই দ্বৈত পরিচয় গিরিশৃঙ্গের মত মাথা উঁচু করে দিদির অন্যন্য ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করছে।

দিদি পরিণত বয়সে মহাপ্রয়াণে গেছেন, আড়াই বছরের সংজ্ঞাহীন রোগশয্যা থেকে বিধাতা

[ শেষাংশ ১১৬ পৃষ্ঠায় ]

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস
ধারাবাহিক রচনা

# বিস্ফোরণ

কালীচরণ ঘোষ

**সংক্ষিপ্তসার ঃ**

[ নারিকেল বোমা,—দশম জাট ( 10th Jats ),—যুবক মণ্ডলী, শক্তি সমিতি,—কুষ্টিয়া—( হিকেন বোথাম )—শ্রীহরিণাপাড়া,— চন্দননগর,—বাহ্রা,— নাটোর ডাকলুঠ,— সাটিরপাড়া,— বাজিতপুর-বিষাটি,— মেদিনীপুর,—ভোজেশ্বর,— গোপালপুর,—নারিয়া,— ওভারটুন হল,—রাইটা—মোরেহল,— নির্ব্বাসন,—দেহারগতি,— গুপ্ত হত্যা,— সরকারী অভিমত,— রাজকীয় ঘোষণা,— বন্ধনের নাগপাশ ]।

আলিপুর মামলা আর বিভিন্ন স্থানে বৈপ্লবিক ঘটনা সমানে চলেছে। এখানে তার একটু পরিচয় দেওয়া যাক্।

## ১। নারিকেল বোমা

বোমা প্রস্তুত পদ্ধতি কতকটা সফল হবার পর ১৯০৮ তে কলকাতা ও উপকণ্ঠে কয়েকটি বোমা ফাটানো হয়। এগুলির বিশেষত্ব হ'ল যে বারুদ ভরা হয়েছিল নারকেল খোলের মধ্যে ঃ ধাতব আধার তখনও তৈরী করা সহজসাধ্য হয়নি। যদি বলা যায় বাড়ীতে তৈরী করলে উদ্যোক্তারা যেমন উপযুক্ত সময়ের আগেই আনন্দলাভের জন্য পটকা ফাটায়, এগুলিও তদনুরূপ ঘটনা, তাহলে উপমায় বিশেষ তারতম্য হয় না। পুলিশের মতে তারা "not of a formidable character." মোটেই মারাত্মক নয়। গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী ও ভক্ত অনুগতদের ভয় দেখানই বোধ হয় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথম উৎপাত (১৯০৮) মে ১৫-ই গ্রে স্ট্রীটে ; জন চারেক লোক আহত হয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনার তারিখ জুন ২১-এ ( মধ্যরাত্রি ) কাঁকিনাড়া রেলস্টেশনের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নারকেল ( নারকেল খোলের ) বোমা ফেলা হয়। কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। তৃতীয়, আগষ্ট ১২-ই সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ শ্যামনগরের নিকটবর্ত্তী একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ওপর বোমা পড়ে। তার পর পড়ে নভেম্বর ২৪-এ বেলঘরিয়া ও আগড়পাড়ার মধ্যে বাইরে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে। ডিসেম্বর ২১-এ সোদপুর—খড়দার মাঝামাঝি স্থানে অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

## ২। দশম জাঠের মধ্যে

সেনা বিভাগে আনুগত্য ভঙ্গ করার চেষ্টা অন্যতম বৈপ্লবিক কার্যধারা বলে গৃহীত হয়েছিল। বাঙ্গলায় অবস্থিত দশম জাঠ ( 10th Jats ) সেনাদের মধ্যে বিপ্লবীদের চেষ্টার

ফলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। তবে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। শুরুতেই জানাজানি হওয়ায় একজন হাবিলদার ও একজন সিপাহীর বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে বিচারে দুজনেরই এক বৎসর করে কারাদণ্ড হয়।

এ জাতীয় চেষ্টা অতি সন্তর্পণে চলতে থাকে কিন্তু ফল বিশেষ হয়নি। শেষ ১৯১০-এ চব্বিশজন সিপাহীদের রাতারাতি বদলি করে অন্যত্র পাঠানো হয়।

## ৩। যুবক মণ্ডলী

বাঙলার স্থানে স্থানে বৈপ্লবিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যেতে লাগলো। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল সকল দলগুলি এক সাথে মিলছে না। এই সময় কলকাতায় ১৯০৮ মার্চ্চ মাসে যুবক মণ্ডলী স্থাপিত হয়। তাদের প্রচেষ্টায় প্রতাপাদিত্য উৎসব কিছু ঘটার সহিত পালিত হয়েছিল, অবশ্য বেশী দিন উৎসাহ থাকেনি। তারা একবার সকল ক্ষুদে ক্ষুদে নতুন স্থাপিত দলগুলিকে একত্র করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফল যে কিছু হয়েছিল তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

## ৪। রাণাঘাট শক্তি সমিতি

রাণাঘাট শক্তি সমিতির সভ্য অতুল কুমার পাল নদীয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি বোমাভরা পার্শেল পাঠিয়ে দেয়। বহু অনুসন্ধানে পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করে চালান দেয়। ১৯০৮ সেপ্টেম্বর ১৭-ই দায়রা মামলায় অতুলের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

## ৫। কুষ্টিয়া (হিকেনবোথাম)

প্রতিষ্ঠানগত অবস্থা যাইই হ'ক ছোট ছোট গ্রুপ কাজ শুরু করেছে সে প্রমাণ আগেই পাওয়া গেছে। ওধারে মাণিকতলা বাগান গড়ে উঠছে, এদিকে হিংসাত্মক কাজও কম বেশী চলেছে। তারই কতকগুলি এখানে উল্লেখ করা হ'ল :

গুপ্তচর সন্দেহে আক্রমণ করার দুঃসাহস ক্রমে আত্ম-প্রকাশ করে। কুষ্টিয়ায় (J. Harvey) হিকেনবোথাম নামে পাদ্রী ছেলেদের সঙ্গে খুব মেলা মেশা করতেন এবং আচরণ থেকে মনে হ'ত পরস্পরে একটা প্রীতির সম্বন্ধ আছে। ইতিমধ্যে বিপ্লব আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের মনে সন্দেহ জন্মে যে সাহেব এই মেলা মেশার সুযোগ নিয়ে পুলিশকে গোপনে তথ্য সরবরাহ করেন। ১৯০৮ মার্চ ৪-ঠা রাত্রি সাড়ে দশটার সময় একজন ছাত্রকে তার বাড়ীতে ফেরার সময় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে হিকেনবোথাম যখন মিশনের মাঠের কোণ নাগাদ এসে পৌঁচেছেন তখন হঠাৎ কে বা কারা পিছন দিক থেকে গুলি মেরে সরে পড়ে। মে ৬-ই সন্দেহক্রমে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুজনকে বাদ দিয়ে জুলাই ৩-রা তিনজন আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হলো বটে কিন্তু আগষ্ট ১৭-ই জুরিরা একমতে সকলকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করায় আসামী তিন জনকে মুক্তি দেওয়া হয়।

## ৬। (শিবপুর) শ্রীহরিণাপাড়া

ছোটোখাটো রকমের ডাকাতি চলছিল, টাকা পয়সার দিক থেকে বিশেষ কোন লাভ হচ্ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে তোড়জোড় করতে যা খরচ হয়ে যায়, তাও উশুল হয় না। এই রকম এক কাণ্ড ঘটে ১৯০৮ এপ্রিল ৩-রা হাওড়া শিবপুর থানার এক গণ্ডগ্রাম শ্রীহরিণাপাড়া ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের বাড়ী রাত্রি আড়াইটার সময়। বাড়ীর মালিকের মতে চার শত টাকার মত লুণ্ঠিত হয়েছিল। আসামী কেউ ধরা পড়েনি।

## ৭। চন্দননগর

ফরাসী চন্দননগর ছিল আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র কারণ সেখানে অস্ত্র অধিকার নিষিদ্ধ না থাকায় সাধারণ নাগরিক ফ্রান্স থেকে পিস্তল প্রভৃতি আমদানী করতে পারতো। কতকটা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চাপে পড়ে মেয়র

মঃ তার্দিভেল (Tardivel) বাধা নিষেধ স্থাপনের চেষ্টা করলেন। সেই আক্রোশে ১৯০৮ এপ্রিল ১১-ই রাত্রি ৯টা নাগাদ মেয়রের নৈশ ভোজের সময় তাঁর ঘরে একটা বোমা পড়ে। নিতান্ত 'নিরামিষ' বস্তু। সেটি ফাটেনি মেয়র ও তাঁর পত্নী দুজনেরই সুস্থ শরীরে ছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস যে পরবর্ত্তীকালে আলিপুর বোমার মামলায় অন্যতম আসামী ইন্দুভূষণ রায় এই কাজ করেন। সঙ্গী ছিলেন বারীন আর নরেন গোস্বামী।

## ৮। বাহ্রা

লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ এবং প্রাণহানি দিয়ে বিচার করলে ১৯০৮ জুন ২-রা ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় বাহ্রা গ্রামের ডাকাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৌকা করে এসে মাঝ রাত্রি পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যামিনী মোহন সরকারের বাড়ীতে ৩০।৩১ জন সশস্ত্র লোক হানা দেয়। চিৎকার শব্দে গ্রামবাসী অনেকে এসে বাধা সৃষ্টি করে সুতরাং দ্রুত কার্য্যোদ্ধারে বাধা পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ কিছু পরে এসে হাজির হয়। ইতিমধ্যে গুলির আঘাতে একজন চৌকীদার ও তিনজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছে; লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ও গহনার মূল্য অন্যূন ২৩,০০০ টাকা। সম্মিলিত কারণের ফলে আক্রমণকারীদের নৌকায় ফিরে আসতে প্রায় ভোর হয়ে পড়ে। যাত্রীরা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চলতে থাকে, আর কাতারে লোক নদীর পাড় দিয়ে পিছু ধাওয়া করে। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়ে এবং নৌকা ধরার চেষ্টায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দেয়। মাঝে মাঝে দুই পক্ষে গুলি বিনিময় চলছে পুলিশের গুলিতে নৌকার একস্থানে ফুটো হয় এবং জল প্রবেশ করতে থাকে। এ সময় জল ছেঁচে ফেলে না দিলে নৌকা ডোবে সুতরাং সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ডাকাত দল পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে ইচ্ছামতীতে কয়েকঘণ্টা চলবার পর ধলেশ্বরীতে এসে পড়ে। যখন সাবার থানার সামনে দিয়ে নৌকা যায় তখন ঐ থানার দারোগা বন্দুক ছুড়তে থাকে। ইতিমধ্যে জল সেচ কাজে ব্যস্ত গোপাল সেন নামক এক যুবকের মাথায় গুলি লাগে এবং সে নিহত হয়।

পুলিশ ও অন্যান্য লোক নৌকা নিয়ে তাড়া করে চলেছে, উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে। তথাপি পলায়নপন্থী যুবকরা সাহস হারায়নি; এদিকে বন্দুকের টোটাও নিঃশেষ হয়ে আসছে। সন্ধ্যা সমাগতঃ; ভোর থেকে বারো ঘণ্টার ওপর এই ভাবে চলছে; আহার বিশ্রাম কিছুই নেই, আছে প্রচুর উদ্বেগ। জেলার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট লঞ্চ নিয়ে ইতিমধ্যে পশ্চাদ্ধাবনে যোগ দিয়েছেন। প্রতিমুহূর্ত্তে সঙ্কট ক্রমশঃই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

তখন অশান্ত প্রকৃতি ডাকাতদের সহায় হ'লেন। সন্ধ্যার অন্ধকারকে গাঢ়তর করে এবং প্রবল বর্ষণকে সঙ্গে নিয়ে প্রভঞ্জন নামলেন। অবস্থা গুরুতর। নদীতে তুফান; কাছের বস্তুও আর দেখা যায় না। এই সুযোগে ডাকাতরা প্রাণপণ চেষ্টায় শত্রুর নাগালের বাইরে যেতে সফল হয়। সে অসমযুদ্ধের কাহিনী মনে করতেও রোমাঞ্চ হয়।

গোপালের কথা একটু বলা দরকার। যখন নৌকায় জল উঠতে আরম্ভ করে, তখন সে একখানা সানকি দিয়ে জল ছেঁচতে আরম্ভ করে। এ কাজে তাকে পালাক্রমে দাঁড়াতে এবং ঝুঁকতে হচ্ছিল। অপর সকলে দাঁড়ি মাঝি হিসাবে বসে আছেন, বিপদের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। গোপাল নিজেকে রক্ষার চেষ্টায় কর্ত্তব্যপালন অবহেলা করতে পারেনি। প্রকৃত বিপ্লবীর মত সে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল। নৌকার ভারি নোঙরের সঙ্গে বেঁধে তার দেহ নদীগর্ভে ফেলে দেওয়া হয়। এই গোপাল সেনদের কজন লোক চেনে? কজন মনে রাখে? অথচ এই সকল বীরেরাই

স্বাধীনতার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন। ধলেশ্বরী তাঁর নিভৃত ক্রোড়ে গোপালকে নিয়ে রেখে দিলেন। এরা স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা ভি-আই-পির কেউ নয়। যেখানে গোপালের মরদেহ নোঙর জড়িয়ে পড়েছিল, জলজন্তুর আহার্য্য হয়ে তাদের উপকার করেছিল, সে স্থান নির্দেশের লোক নেই, থাকলেও সেখানে স্মৃতি-সৌধ, স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে ওঠার কথা নেই। শিশু পাঠ্য পুস্তকে এঁদের জীবন চরিত ভাল করে লেখা বাঞ্ছনীয়। ধন, বিদ্যা, বংশ গৌরব না থাকলেও মানুষ চিরস্মরণীয় হতে পারে এ শিক্ষা হওয়া দরকার।

## ৯। নাটোর ডাক লুঠ

সরকারী ডাক লুণ্ঠন করা বহুবার হয়ে গেছে, খুব বেশী তোড়জোড় করতে হ'ত না। নিভৃত স্থান ও সুযোগ বেছে নিতে পারলে অন্যান্য ডাকাতির চেয়ে কাজ সহজ ছিল।

১৯০৮ আগষ্ট ৩-রা নাটোরের সন্নিকটে ডাক-পিয়ন আক্রান্ত হয় এবং কিছু টাকা লুণ্ঠিত হবার কথাও প্রচারিত হয়ে গেল। ধরপাকড় আরম্ভ হ'ল। কালীচরণ ঠাকুর এবং জন পাঁচেককে আসামী খাড়া করে হাইকোর্টে (ফৌজদারী বিভাগ) ১৯০৯ এপ্রিল ২১-শে মামলা রুজু হয়। মে ৫-ই সকলে নির্দোষী বলে মুক্তি লাভ করে।

কিন্তু আসামী কালীচরণ ঠাকুর বন্দী বিচারাধীন অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। জামীনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় কারণ সিভিল সার্জন বল্লেন "জেলখানায় আসামীর অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছু খারাপ নয় ("his case is not worse in jail"). অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হয়ে উঠ'ল। নতুন আবেদনও বিফল হলো।

বৎসরের শেষের দিকে বড়দিন-এর সময় জেলের মধ্যেই কালীচরণ ঠাকুর ইহলোক ত্যাগ করেন। জেলের সঙ্গী পুত্র পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কয়েক ঘণ্টার জন্য শ্মশানে যাবার প্রার্থনা করে। ইংরেজ রাজত্ব উল্টে যাবার ভয়ে পুত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। জেল গেটে মৃত পিতাকে বিদায় দিয়ে তার মনের যা অবস্থা হয় কলম সাহায্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই মামলার জের চলে আরও কিছুদিন। এ সম্পর্কে (১৯০৮) আগষ্ট ৩-রা নাটোর ও রাজসাহীর মধ্যে টেলিগ্রাফ তার কাটার জন্য দুর্লভ মণ্ডলকে আসামী খাড়া করে অতিরিক্ত নাটোর ডাক লুঠ মামলা চালানো হয়। ফলে এপ্রিল ২৯-এ তার দু বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

## ১০। সাটিরপাড়া নৌকা চুরি

পুলিশ রিপোর্ট দিলে যে ১৯০৮ আগষ্ট ১৪-ই নীলমণি জুগাইর নৌকা নিয়ে যারা উধাও হয়েছিল, তাদের নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি ছিল। একজন আসামী শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজ)-র বিবরণ হতে পাওয়া যায় যে এ-ব্যাপারে রাজনীতির বিন্দু বিসর্গও ছিল না। যাই হোক ১৯০৮ অক্টোবর ২০ এ দু জনের পাঁচ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা হিসাবে জরিমানা হয়।

## ১১। বাজিতপুর ও বিঘাটি

মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বহুদূরে অবস্থিত দুই বিভিন্ন জেলায় দুটি ডাকাতি সাধিত হয়। যখন পুলিশে ধরপাকড় আরম্ভ করলো এবং মামলা বিচারের জন্য পাঠানো হ'ল তখন দেখা গেল কয়েকটি আসামী দুই মামলাতেই জড়িত।

প্রথমটি হ'ল ময়মনসিং জেলার বাজিতপুর থানার আটকাপাড়া গ্রামে ১৯০৮ আগষ্ট ১৫-ই রাজেন্দ্র কিশোর দাসের বাড়ীতে। চারজন লোক পুলিশ কর্ম্মচারী বলে বাড়ীতে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়টি হয় হুগলী জেলায় ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত বিঘাটি গ্রামে কিশোরী মোহন রায়ের বাড়ীতে সেপ্টেম্বর

১৬ই রাত্রি ৯টা— ১১টার মধ্যে। এখানে দু'জন লোক ডিটেকটিভ পুলিশ বলে বাড়ীখানা তল্লাসী করে। যাবার সময় যা নিয়ে যেতে পারলো তার জন্য এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় না।

বালিতপুর ডাকাতির আসামী হ'য়েছিলেন দুজন পলাতক গরহাজির বাদে (১) কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, (২) সুরেশচন্দ্র মজুমদার, (৩) ধীরেন ঘোষ, ও (৪) বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। হাই কোর্টে মামলার বিচার আরম্ভ হয় ১৯০৮ ডিসেম্বর ৩-রা।

এর মধ্যে কার্ত্তিক ও সুরেশের সাজা হয়, বিষাটি ডাকাতি সংক্রান্ত অপরাধে। কার্ত্তিকের ছয় ও সুরেশের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেই হিসাবে গভর্ণমেণ্ট থেকে তাদের বিরুদ্ধে বিষাটি মামলার অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়।

আর ধীরেনের আঠারো মাস এবং বসন্তর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় (১৯০৯) এপ্রিল ১৪ ই।

বিষাটি মামলা ১৯০৯ মার্চ ১৫ ই হাইকোর্ট স্পেশাল ট্রাইব্যুন্যালের এজলাসে শুরু হয় এবং ২৯-এ রায় প্রদত্ত হয়। এখানে কার্ত্তিক দত্তর ছয়, সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রত্যেকের পাঁচ এবং পান্নালাল চক্রবর্তীকে সাড়ে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

ঐ সময়েই ১৯০৯ মার্চ্চ ২৯-এ বালিতপুর মামলার অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়।

## ১২। মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র

হঠাৎ গভর্ণমেণ্টের খেয়াল হ'লো মেদিনীপুরে ইংরেজ বিতাড়নের বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে এবং বিস্ফোরক প্রস্তুত হচ্ছে। অযথা কালক্ষেপ না করে, গভর্ণমেণ্ট বেপরোয়া ধরপাকড় আরম্ভ করে দিলে। এর মধ্যে সজ্জন, কৃতবিদ্য, ধনী, বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে হাজতে বন্দী রাখা হয়। বহু চেষ্টায়ও মেদিনীপুরে জামীনে মুক্তি পাওয়া যায় নি, প্রায় প্রত্যেকের জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে হয়েছে।

পুলিশী তাণ্ডব শুরু হয় ১৯০৮ আগষ্ট ৩১-এ; ঘটনা-চক্রে সেইদিন আলিপুর জেলে নরেন গোঁসাই নিহত হয় সত্যেন-কানাই কর্ত্তৃক। হয়ত তার জন্যে পুলিশের আক্রোশ কিছু বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। জামিনে অর্থের পরিমাণ থেকে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে সামান্য অবান্তর হলেও নাম প্রকাশের লোভ সম্বরণ করতে পারা গেল না।

নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ হাইকোর্ট কর্ত্তৃক জামীনে মুক্তি পান সেপ্টেম্বর ২২-এ। আগষ্ট ৩১-এ থেকে তাঁকে হাজত বাস করতে হয়েছে। অক্টোবর ২-রা এঁদের প্রতিজনের জামীনের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টাকা। যামিনী নাথ মল্লিক (শিব বাজার), অবিনাশ মিত্র (কেরাণীতলা), মন্মথ নাথ কর (মিরবাজার) উপেন্দ্র নাথ মাইতি (নতুন বাজার) সকলেই মোটা টাকার জামিনে মুক্ত হন।

দায়রায় মামলা চলতে রইল। বিচারে বিস্ফোরক আইনে (Explosives Substances Act) ১৯০৯ জানুয়ারী ৩০-এ সন্তোষ দাসের দশ বৎসর ও অতিরিক্ত সাত বৎসরের দ্বীপান্তর; সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাত বৎসরের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

ভাগ্য নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন। দুই আসামীই হাইকোর্ট আপীলে (১৯০৯) জুন ১-লা নির্দ্দোষ বলে প্রতিপন্ন হন।

যোগজীবন ঘোষ ষড়যন্ত্রের অপরাধে দশ বৎসর দ্বীপান্তরের দণ্ড প্রাপ্ত হন। হাইকোর্টের আপীলে ১৯১২ আগষ্ট ১৩ ই তিনিও মুক্তি লাভ করেন।

## ১৩। ভোজেশ্বর

ঢাকার ভোজেশ্বর গ্রামে ১৯০৮ অক্টোবর ১৮ ই নিবারণ চন্দ্র পালের বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা হয়। যে কারণেই

হ'ক ডাকাত দলকে কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে হয়। সকালবেলা দেখা গেল বাড়ীর ধারে একটি বাণ্ডিল ( পুঁটলি ) পড়ে আছে এবং তার মধ্যে ছোরা, তরোয়াল, সড়কির ফলা প্রভৃতি রয়েছে। তিন জনের খোঁজখবর চলতে থাকে। দুজনকে মামলায় জড়ালেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হয়। আর একজন পলাতক বলে পুলিশ প্রচার করে; শেষ পর্য্যন্ত আর কিছু দাঁড়ায় নি।

## ১৪। গোপালপুর ( মালদহ )

মালদহ গোপালপুর গ্রামে ( ১৯০৮ ) অক্টোবর ২১-এ রাত্রি দুটো নাগাদ দ্বারিকানাথ তেওয়ারীর বাড়ীর ওপর আন্দাজ ২৫।৩০ জন লোক চড়াও করে। খুব সোরগোল ওঠে এবং ডাকাতরা চলে যেতে বাধ্য হয়। পরে দুজন গ্রেপ্তার হয়। মামলা চললেও শেষ পর্য্যন্ত আসামীরা মুক্তি পায়।

## ১৫। নারিয়া ডাকাতি

ডাকাতির ক্ষেত্র খুবই ছড়িয়ে পড়েছে। এবার কেন্দ্র হ'ল ফরিদপুর জেলা পালঙ থানার অন্তর্ভুক্ত নারিয়া গ্রামে ১৯০৮ অক্টোবর ৩০-এ রাত্রি দশটা নাগাদ। আন্দাজ ত্রিশ পয়ত্রিশ জন লোক ডাকাতির অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে নারিয়া বাজারে হানা দেয়। ষ্টীমার অফিস লুঠ করার পর যশোদা কুণ্ডু, মধু সাহা আর কৃষ্ণ নন্দীর বাড়ীর ওপর চড়াও হয়। লাভ খুব বেশী হয় নি, তবে বাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়াতে স্থানীয় লোকের বেশ ক্ষতি হয়েছিল।

ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল। অন্ততঃ পাঁচ জনকে টেনে এনে আসামী খাড়া করা হ'ল। হাকিমের কাছে হাজির করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হ'লো বেশ কয়েকজনকে। ফরিদপুরের ঘটনা, কিন্তু খুব বেশী ধরা হ'ল ঢাকা জেলার ছেলেদের। ফেব্রুয়ারী ২৪-এ নাগাদ প্রায় সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণাভাবাৎ মামলা খারিজ করে দিতে হয়েছিল।

## ১৬। ওভারটুন হল

ছোট লাট এ্যানড্রু ফ্রেজারকে মারবার অনেক রকম চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁর মৃত্যু লেখা ছিলনা। শেষ চেষ্টা হয় কলকাতায় ওভারটুন (Overtoun) হলে (১৯০৮) নভেম্বর ৭-ই। সন্ধ্যা ৬টায় বক্তৃতার সভাপতিত্ব করবার জন্য ফ্রেজার আসেন; বক্তা তখনও পৌঁছান নি। ফ্রেজার সবে উচ্চ মঞ্চে (platform) বসে অপেক্ষা করতে যাচ্ছেন এমন সময় পাশ থেকে এক যুবক লাটের বুকের একেবারে কাছে রিভলভার এর ঘোড়া দুবার টিপে দিলেন। পাছে ডান হাত কেঁপে গেলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় সে কারণে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত ধরা ছিল। গুলি ছুটলো না, রিভলভার বিকল। তৃতীয় দফায় চেষ্টা করবার সময় আশপাশের লোকেরা আততায়ীকে ধরে ফেলে এবং এ ক্ষেত্রে যা হয়, তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। নাম জানা গেল জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ১৯০৮ নভেম্বর ৭-ই এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে :

এ প্রচেষ্টা এক দুঃসাহসিক ও ঘৃণ্য কাজ ('dastardly and abominable'). নৈরাজ্যবাদীদের দোষাবহ মূর্খতা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে ('the criminal folly of the anarchists has reached its culminating point'), রাজদ্রোহমূলক বিক্ষোভের উন্মাদকারী ফল আধা-পাগলা যুবকদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে ('such has been the maddening effect of the treasonable ferment, which has been working in the minds of a certain class of half-crazy young men'). এতেও Statesman সন্তুষ্ট নয়—এটা 'stupid and

atrocious plot' আর তাদের এই নির্ব্বুদ্ধিতা তাদের নষ্টামির সঙ্গে তুলনার যোগ্য ('they are guilty of folly only equalled by their wickedness').

সঙ্গে সঙ্গে দায়রায় মামলা দায়ের হলো, শুনানী আরম্ভ হয় নভেম্বর ১৫-ই, আর ২৫-এ রায় প্রকাশিত হয়; আসামীর দশ বৎসর সশ্রম কারাবাস।

## ১৭। রাইতা

ব্যাপারটা বড় কিছু নয়, গড়ারনিশু বেশী দূর। হয়েছিল ১৯০৮ এর নভেম্বর ২৯-এ নদীয়া জেলার রাইতা গ্রামে অতিথরাম শাহার বাড়ীতে। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ আন্দাজ হাজার দুই টাকা। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। শীঘ্রই সব চুপচাপ, কিন্তু "টিকটিকি" পুলিশ নিশ্চয়ই একটু বিব্রত বোধ করেছিল।

## ১৮। মোরেহল

হুগলী জেলা কৃষ্ণনগর থানার মোরেহল গ্রামের শশীভূষণ সাহার বাড়ী (১৯০৮) ডিসেম্বর ২ রা রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ এক ডাকাতি হয়। লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়, তবে একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিল। ধরপাকড় আরম্ভ হ'ল এবং পাঁচ জনকে ডাকাতির অভিযোগে দায়রা সোপর্দ করা হয়। মে ১ লা ১৯০৯ চার জনকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পঞ্চম আসামী মন্মথনাথ চৌধুরীর মামলা হাইকোর্টে বিশেষ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। জুলাই ৮-ই (১৯১০) মন্মথর সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

## ১৯। নির্ব্বাসন

বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং যাঁদের কেউ বিপ্লবী ও ননই, বিপ্লবীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও ছিল বলে এ অপবাদ যাঁদের কেউ দেয়নি, সারা বাঙলা থেকে উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত প্রকাশ্য রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন লোককে বিনা বিচারে আটক বন্দী রাখা গভর্ণমেণ্টের আতঙ্কেরই পরিচয় বহন করে।

সেই আমীর চাঁদ প্রভৃতি কয়জন ওয়াহাবি নেতাকে বন্দী করার পর ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের ধারা মতে বিনা বিচারে কয়েদ রাখার ঘটনা ইতিমধ্যে আর ঘটেনি। ১৯০৮ ডিসেম্বর ১৪-ই এই মর্ম্মে কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমে ধরপাকড় শুরু হয়। দেখা যায় আদেশ প্রকাশিত হবার দু'তিন দিন আগে থেকেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছিল।

ধৃত ব্যক্তিদের নামগুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বন্দীজীবন কোথায় কেটেছে তারও উল্লেখ করা হচ্ছে :—

প্রথম হচ্ছেন (রাজা) সুবোধচন্দ্র মল্লিক। কাশীতে তাঁদের বাড়ী ছিল। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে লক্ষ্ণৌ কৈলাবাদ জেলে আটর্ক রাখা হয়।

বরিশাল বানরীপাড়ার মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে নিয়ে যায় ব্রহ্মে, ইনসিন জেলে;

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রথমে চুণার জেল ও পরে ব্রহ্মে থায়েটমিয়ো জেলে স্থানান্তরিত হন;

সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রর সমস্ত বন্ধন দশা আগ্রা জেলে কাটে;

অ্যান্টি-সার্কুলার সোসায়েটী, 'বন্দে মাতরম' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্র প্রসাদ বসু কলকাতা থেকে রাওলপিণ্ডি জেলে আশ্রয় লাভ করেন;

অনুশীলন সমিতির প্রধান পাণ্ডা পুলিন বিহারী দাস পাঞ্জাবের মণ্টগোমেরী জেলে কাটিয়েছেন;

ঢাকার বারোডির ভূপেশচন্দ্র নাগ কাটিয়েছেন যুক্ত প্রদেশের ফতেগড় জেলে;

বরিশালের নেতা দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ জেল হয়ে যান ব্রহ্মের জেলে;

এবং ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বেসিন জেলে বন্দী রাখা হয়।

প্রায় চৌদ্দ মাস আটক রেখে ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ৯ই ও ১০ই দুদিনে সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। এঁদের গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে বহু জল্পনা কল্পনা হয়েছে কিন্তু পুলিন চন্দ্র দাস ছাড়া কাকেও "under personal restraint" এ রাখবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

## ২০। দেহারগতি

বরিশাল বাখরগঞ্জ জেলার দেহারগতি থানা ও গ্রামে ডাকাতি হয়েছিল বড়দিনের সময়। হাজার তিনেক টাকাও লুণ্ঠিত হয় কাকেও ধরপাকড় হয়েছিল বলে কিছু শোনা যায়না।

## ২১। গুপ্ত হত্যা

কয়েকটি হত্যার পরিচয় দেওয়া যাক; বিপ্লবাত্মক কাজের নমুনা পাওয়া যাবে।

প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জি গভর্ণমেণ্টের কাছে যথেষ্ট বাহাদুরী লাভ করেন; মোটা পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা বেশীদিন তাঁর ভোগে লাগে নি কারণ বিপ্লবীরা সরাসরি অন্য পুরস্কার ব্যবস্থা করেছিল।

১৯০৮ এর নভেম্বর মাসে ছুটি কাটাতে ১০০।২, সার্পেন্টাইন লেনে ভাইয়ের বাসায় উঠেছেন। তাঁর কর্মস্থলে ফিরে যাবার সময়ও এগিয়ে এসেছে। (১৯০৮) নভেম্বর ৯ ই সন্ধ্যা ৭টা ৭॥ টার মধ্যে একখানা চিঠি ডাকে দেবার জন্য বাসার বাইরে গেছেন। পূর্ব্ব যে মাসের ১-লা তারিখ থেকে ছ'মাস বাদে জীবনের ভয় খুব খানিকটা কেটে গেছে, তাই নির্ভয়ে বাসা থেকে বেরিয়েছেন। শ'দুই গজ যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক থেকে কে বা কারা এসে পিস্তলের গুলির দ্বারা আঘাত করে। তাতেই তিনি সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েন, কেবল বলে উঠলেন ১০০।২ নং বাড়ীতে যেন তাঁর ভাইকে খবরটা দেওয়া হয়।

এদিকে আততায়ীরা নন্দর মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য তার ভূপতিত দেহে আরও দুতিনটে গুলি বসিয়ে দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে। নন্দর মাথা, পিঠের মাঝখান ও ডানদিকে এবং বাঁকাঁধে মধ্যে গুলি প্রবেশ করে।

সুক্ষ্ম কাজ; কারও কোন সন্ধান মেলেনি; কাজেই মামলাও হয়নি। শ্রীরণেন গাঙ্গুলীকে এ সম্পর্কে বরাবরই সন্দেহ করা হয়েছে। আরও দুজন তাঁদের দাবী তুলেছেন। রণেন গাঙ্গুলী যে অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নন্দর মৃত্যু বিপ্লবীদের লক্ষ্য; সুপরিকল্পিত ভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে কথা চিরতরে থেকে যাবে, অজ্ঞাত বীর স্বাধীনতাকামী বাঙালীর নমস্যই থেকে গেলেন। গোপন যুদ্ধে এ এক পরম গৌরবের অধ্যায়।

বিঘাটি ডাকাতির গূঢ় কথা পুলিশকে দের এইরূপ সন্দেহ করে হাওড়ার কেশব দে কে বন্ধুরা খুন করে পুতে ফেলে। ঢাকা রমণায় অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ গুপ্তভাবে খুন হয়েছিল ১৯০৮ নভেম্বরে। সমিতির কাগজপত্র নিয়ে তার খুড়াকে দেখাতো আর তিনি ছিলেন সি-আই-ডি ইনস্‌পেক্টর।

কেবল ডাকাতি খুন দাঙ্গা হাঙ্গামা নয়, আন্দোলনের ক্ষতি যারা করছে এ রকম সন্দেহে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। এর পূর্বে যে হয়নি তা নয়, ক্রমে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা রায়না অঞ্চলের অধিবাসী সুকুমার চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ একবার গ্রেপ্তার করে। কিছু বোঝাপড়া হয়ে গেলে তার হাজত বাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখন দেখা গেল, পুলিশের সঙ্গে তার গোপন ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছে এবং সে বিপ্লবীদের সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করে। হঠাৎ ১৯০৮ নভেম্বরে একদিন

শেষাংশ ৯৫ পৃষ্ঠায়

# বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র : ৯

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

"একটি রাত্রি" গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসেবে বলেছেন, "এ যুগে আমরা সবাই অল্পবিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।" গল্পটির নায়ক সুব্রতের বাইরের নয়, ভেতরের পরিচয় অর্থাৎ ব্যক্তিস্বরূপেরই পরিচয় দিয়েছেন লেখক। "সে ক্লান্ত—আত্মার দুঃসহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আশা, আদর্শ, প্রেরণার ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে বাস করছে। প্রতিদিনের সূর্যোদয়কে সাগ্রহে অভিনন্দিত করবার উৎসাহ তার মধ্যে নেই।" এখানে লেখক সুব্রতের পরিচয় দেওয়ার ছলে একালের আশুচেতন প্রাতিস্বিকের অর্থহীন সর্বরিক্ত অস্তিত্বের লক্ষণগুলিকে সূচিবদ্ধ করেছেন। সুব্রতের সঙ্গে এক রাত্রে মীরার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। "সাক্ষাৎ নয়, দুটি সত্তার সঙ্গে সে বুঝি সংঘর্ষ। অন্ধকার আকাশের মৃত তারকাপিণ্ডও উঠেছে বহ্নিদীপ্ত হয়ে সে সংঘর্ষে।" এই সাক্ষাতের ফলে সুব্রতের পতিত আত্মা গভীর জড়ত্ব থেকে জেগে উঠেছে। পরদিন সকালে সুব্রত সংকল্প করেছে মীরার সঙ্গে সাক্ষাতের উন্মাদনাকে অক্ষয় করে রাখবে তার জীবনে। অতঃপর গল্পটি লেখক শেষ করেছেন : "মানুষের দুর্বলতার অন্ত নেই জানি, তবু সুব্রতের এই সংকল্পটুকু জেনেই আমরা বিদায় নিলাম।"

সুব্রতের সংকল্প রক্ষিত হবে কি হবে না এ-সম্বন্ধে সংশয়ে গল্পের সমাপ্তি দেখে অনুমান করা যায়, "জনৈক কাপুরুষের কাহিনী"র নায়কের মতোই সুব্রতও সম্ভবত ওই সংকল্প রক্ষায় অক্ষম ও দুর্বল। বিংশ শতাব্দীর মানুষ কোনও কোনও সাক্ষাতে বা ঘটনায় সহসা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তার সে উদ্দীপনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বরং বাস্তবের প্রতিস্পর্ধার মুখে কাপুরুষের মতো পশ্চাদাপসরণই করে; যেখানে সে অপেক্ষাকৃত সাহসী সেখানেও তার হৃদয়ের আগুন আস্তে আস্তে নিবে ছাই হয়ে যায়। যেমন হয়েছে অমরেশ ডাক্তারের ক্ষেত্রে, নিজের অজান্তেই সে কখন অভ্যাসের দাস হয়ে গেছে। প্রেমের এই নিদারুণ করুণ পরিসমাপ্তির কাহিনী "ভস্মশেষ।" "একদিন একটি ছেলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে পরম দুঃসাহসভরে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি।" কিন্তু অমরেশের আহ্বানে সাড়া দিতে দ্বিধা করেছিল সুরমা, সময় চেয়ে নিয়েছিল সে অমরেশ ডাক্তারের কাছে। "অমরেশ ডাক্তার অপেক্ষা করেছে—কিছু দিন, অনেক দিন, বড়ো বেশি দিন অপেক্ষা করেছে।" এর ফলে কি সুরমার স্বামী প্রেমিক-প্রেমিকার পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে? সুরমা আর অমরেশকে হাতেনাতে আটকে ফেলেছে? মোটেই না। তাহলে কী হয়েছে? "ধীরে ধীরে কখন আগুন নিয়েছে নিবে। কখন আর বছরের পাপড়ির মতো সে ম্লান শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে—তারা সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হয়ে গেছে সংসারের ধুলায়।" এই হলো বর্তমান ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত জীবনের

সত্য। দশ বছর আগে, ১৯২৮ সালে লেখা "পুতুল ও প্রতিমা'র অন্তর্গত "লজ্জা" নামক গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, "দেবতার মহত্ত্ব মানুষের নাই, মানুষ পিশাচের মতো নিষ্ঠুরও নয়, মানুষ শুধু নির্বোধ।" মানুষের এই পরিচয় ক্রমশই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে ব্যাপক ও জটিল হতে থাকল, তার বহু সুর ও মাত্রা ধরা পড়তে থাকল; মানুষ মানে কোনও নিরাকার ভাবসত্ত্ব নয়, তাঁর কাছে মানুষের একটা স্পষ্ট বিকাশশীল সামাজিক সাকার রূপ আছে। তাঁর উৎকৃষ্ট ছোটগল্পগুলিতে প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনার অন্তরালেও গভীর অর্থময়তা নিহিত: পরস্পর সংযুক্ত দুটি কি তিনটি চরিত্রের সম্পর্কের প্রতীকে সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রকৃতি উন্মোচিত।

লক্ষণীয় যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে উচ্চশ্রেণীর মানুষ অনুপস্থিত বললেই চলে, যেন ওই শ্রেণীকে তাৎপর্যহীন বলে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। "হয়তো" অথবা "অফুরন্ত"র মতো গল্পে যদি-বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, তবু সেখানেও তাঁর দৃষ্টি নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকের—নির্বিকার ঐতিহাসিকের। এর মধ্যে "অফুরন্ত" লেখকের গভীর কালচেতনার সাক্ষ্যবাহী: এক সমাজব্যবস্থার ভিতর থেকে আর এক সমাজব্যবস্থার, প্রাচীন প্রজন্মের থেকে নবীন প্রজন্মের দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের, মানবেতিহাসের অফুরন্ত প্রবাহের কাহিনী ছোটগল্পের সংকীর্ণ পরিসরে পেয়েছে অসাধারণ ঘনসন্নিবদ্ধ রূপ। নবীন প্রজন্মের সম্পর্কে লেখকের মীমাংসা তাঁর নিবিড় অভিজ্ঞা-জাত: "একই খাতে বয়ে, বহু যুগান্ত পার হয়ে এ ধারা ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। এ স্রোত হয়ত ঘোলাটে, হয়ত অনির্মল; কিন্তু প্রবল, বেগবান। হিংস্র পৃথিবীর লেলিহান ক্ষুধার বিরুদ্ধে এ স্রোত সংগ্রাম করে টিঁকে থাকতে পারবে।" মহাকাব্যের উপযুক্ত কাহিনীকে তিনি চুম্বকে ধারণ করেছেন তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় প্রান্তটিকে গভীর ব্যঞ্জনায় পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন।

স্বচ্ছন্দে নয়, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকে থাকাটাই ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে প্রধান সমস্যা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে এই সমস্যা মধ্যবিত্তের কাছে একটা সংকট। এই সংকটের একটা বিশেষ দিক হলো মূল্যবোধের বিপর্যয়। যুদ্ধকালীন অবস্থার চাপে এই বিপর্যয় কেমন করে বেনো জলের মতো মধ্যবিত্ত জীবনের আনাচেকানাচে ঢুকে পড়ছে, আস্তে আস্তে প্লাবিত করছে তার জনবদ্ধ রূপায়ন ঘটেছে "চুরি" গল্পটিতে। আদর্শবাদী ও সত্যনিষ্ঠ শিক্ষক প্যারীমোহনবাবু গভীর মর্মবেদনায় পান-বিড়ির দোকানীর তাচ্ছিল্য আর প্রাক্তন ছাত্রের অপমান সহ্য করেছেন, কিন্তু তখনও তিনি হাল ছেড়ে দেননি। যখন দেখলেন পরিপার্শ্বের নীতিহীনতা তাঁর পরিবারেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট তখনই ব্যর্থতা হতাশা গ্লানির আকস্মিক আক্রমণে তাঁর দেহ আর সব হয়ে গেল অসাড়—অবশ। লেখক কোনও যুগসত্যের পক্ষ নেননি, গল্পশেষে কোনও ইঙ্গিতময় মন্তব্য করেননি, কোনও মূল্যবিচারের প্রশ্নও উত্থাপন করেননি। নিজেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রেখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের একটি খণ্ড চিত্রকে উপস্থাপন করেছেন সত্যের প্রতি সার্বভৌম আনুগত্যে। কিন্তু এগল্পে বাস্তবের ছোট ছোট কতগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে প্যারীমোহনবাবুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-সূত্রে যেভাবে পারম্পরিক সামঞ্জস্যে গেঁথেছেন তাতেই নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লেখকের অনন্য শিল্পিত্ব। সাম্প্রতিক মূল্যবোধের বিকার আর-এক অসাধারণ শিল্পরূপ পেয়েছে "জ্বর" গল্পটিতে। শারীরিক বিকারের প্রসঙ্গেই গল্পের শুরু: "সন্ধে সাতটায় কম্প দিয়ে জ্বর এল। লেপ কাঁথা যেখানে যা ছিল চাপা দিয়েও সে-কাঁপুনি থামানো যায় না।" দুটি বাক্যের পরেই এই বিকারের দেহাতীত সত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত এসেছে: "একটা প্রচণ্ড উন্মত্ত আলোড়ন শুধু যেন শরীর নয়, সমগ্র সত্তার অন্তঃস্থল থেকে উদ্দাম হিমশীতল তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমস্ত

চেতনা ক্ষণে ক্ষণে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছে।" বিকারের বিস্তার দেহ থেকে অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত জানিয়েও লেখক ক্ষান্ত হননি, কোন্ বিশেষ প্রকরণে গল্পটি পরিবেশিত হতে যাচ্ছে আভাসে তারও পরিচয় দিয়েছেন পরের তিনটি বাক্যে: "এক মুহূর্তে সব কিছু গেল বদলে। কোন ধারাবাহিকতা নেই চেতনার। জীবনের একটি নিটোল চমৎকার দিন যেন টুকরো টুকরো হয়ে, ভেঙে ছড়িয়ে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মিশে।" এই গল্পের সমস্ত রহস্যদ্বারের চাবিকাঠিগুলো পাঠকের সামনে গল্পের শুরুতেই লেখক ফেলে দিয়েছেন, যে-বুদ্ধিমান পাঠক সেগুলো কুড়িয়ে নেবে এগল্পে সে বেশি রস পাবে। পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাতের সুযোগে তার হাতব্যাগ থেকে অভাবের তাড়নায় টাকা সরিয়ে নেওয়ার এই কাহিনীতে একদিকে যেমন মনুষ্যস্বভাবের চরম ব্যুৎক্রমকে প্রকাশ করা হয়েছে তেমনই সে-প্রকাশের প্রক্রিয়াও একান্ত রূপে বিষয়ের অনুসরণে আগাগোড়া সুসংহত অর্থাৎ গল্পটি উক্তি ও উপলব্ধির সিদ্ধ সংযোগে সম্পন্ন।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ বৈষয়িক সাফল্যকেই একমাত্র সাধ্য লক্ষ্য বলে জেনেছে এবং এজন্য মূল্য হিসেবে তার সব কিছুই সমর্পণে প্রস্তুত, ওই সাফল্য-নিরপেক্ষ কোনও একাগ্রতা ও তন্নিষ্ঠা তার কাছে অজ্ঞাতবস্তু। ক্ষণিকের জন্যে বিত্তের অতীত কোনও সত্যের উদ্ভাসন কারও কারও জীবনের বিরল কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে, কিন্তু তাকে অক্ষয় করে তোলা দূরে থাক, দীর্ঘকাল ধরে রাখার শক্তিও এই সমাজব্যবস্থায় নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে একালের মানুষকে অস্থির ও চঞ্চল মনে হলেও তা আর মানুষের নিজস্ব প্রাণপ্রেরিত কিংবা তার স্বাশ্রয়ী চরিত্র থেকে উৎসারিত নয়, সে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য আসলে পুঁজি ও মুনাফার চাকায় বাঁধা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের অংশমাত্র। তাই তেলেনাপোতায় দেখা সেই মেয়েটিকে মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে এসে মনে হয়, "কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনামাত্র।" যে অনুভাবে "একটি রাত্রি"র নায়ক সুব্রত উদ্বুদ্ধ হয় তার বাস্তব উৎস শুকিয়ে গেছে এবং একারণেই তেলেনাপোতা আবিষ্কারও একটা আকস্মিক ও সাময়িক ঘটনা: এরূপ উদ্বোধন সম্বন্ধে তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, "একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।" গল্পটির ক্রিয়াপদগুলো সাধারণ ভবিষ্যৎকালে প্রযুক্ত—এটা গল্প বলার কৌশলকে শুধু অভিনবত্বই দান করেনি, গল্পের তাৎপর্যকে সাধারণীকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর অমোঘতা ও রোমাঞ্চ দান করেছে।

শুধু নিজের বৈষয়িক বা সামাজিক অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুকে, অন্য কোনও প্রেম, স্বপ্ন বা সংকল্পকে, জীবনের কোনও গূঢ়তর সত্যকে, সত্তার কোনও প্রগাঢ় বোধ বা জাগরণকে টিঁকিয়ে রাখার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই একালের মানুষের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলিতে পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত উক্ত মীমাংসা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নয়। তাঁর রচনায় এই শ্রেণী নিজের যে-পরিচয় লাভ করে সে-পরিচয় তার অভিমানকে আহত করে, তাই সে-পরিচয়কে মনে মনে না পারলেও মুখে সে অস্বীকার করতেই চায়। "রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন" গল্পটির নায়িকা নান সুর মতো নিজের অলীক আত্মতৃপ্ত ও আত্মবঞ্চিত কল্পনার জগতেই মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকা, নিজের যথার্থ পরিচয় জানলেই তার বাঁচা মিথ্যে হয়ে যায়। এই শ্রেণীর মনোরঞ্জন করার কোনও প্রয়াস প্রেমেন্দ্র মিত্রের নেই, তাঁর রচনায় নেই এই শ্রেণীর আত্মাভিমানী কল্পিত পৃথিবীর প্রতি ধূর্ত প্রশ্রয়, যা আছে তা হলো অকপট অনুকম্পার সঙ্গে এ শ্রেণীর ব্যক্তিস্বরূপের মর্মভেদী উন্মীলন—এই ব্যক্তিস্বরূপ নির্বোধ, ক্ষুদ্র, ভীরু, কাপুরুষ, ভণ্ড, কীলকবদ্ধ, অস্থিরমতি,

প্রতারক, দ্বিধাগ্রস্ত, খণ্ডিত, দুর্বল, বিধ্বস্ত, পরাজিত, তবু হৃদের প্রশান্তি কামনা করে কৃত্রিম জলাশয়কেই হ্রদ আখ্যা দিয়ে সান্ত্বনা খোঁজে, তবু সমুদ্রের উদ্দাম বিস্তারকে রক্তে অনুভব করার জন্যে ধুলো-জঞ্জাল মেশানো বেলাভূমিতে সমবেত হয়।

শিল্পপ্রধান মহানগর বোম্বাইয়ে নীল অসীমতার নকল করা পরিহাসের মতো সমুদ্রের তীরেই মল্লিকার স্বামী শ্রীপতির সঙ্গে সুবিকাশের প্রথম পরিচয়, সে-সূত্রেই পরে মল্লিকা ও শ্রীপতির দাম্পত্যজীবনে তার প্রবেশ। মল্লিকা একদা শ্রীপতিকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত এবং শ্রীপতিও একদা মল্লিকার ওই মনোভাবের যোগ্য অধিকারী ছিল, তার রুচিও ছিল উঁচুদরের। পরিস্থিতির ফেরে শ্রীপতির চরিত্র পালটায়, তার আচরণ ও প্রয়োজন পালটায়, লোকের কাছে দেনা করাটাই তার পেশা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে বন্ধুবান্ধবের তাকে ত্যাগ করতে থাকে, ক্রমেই সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। স্বামীর এই পরিবর্তন সম্বন্ধে মল্লিকা যতই অবহিত ও সচেতন হয় ততই সে-ও নিজেকে গুটিয়ে ফেলে আপনার মধ্যে, স্বামী সম্বন্ধে তার ভূতপূর্ব মনোভাব অন্তর্হিত হয় এবং উন্মাদনাময় সরল সুসংগত দাম্পত্য সম্পর্ক হয়ে ওঠে অনুবর্তিতায় যান্ত্রিক, অভ্যাসের ও অভিনয়ের পৌনঃপুনিকতায় তিক্ত, বিকৃতি গোপনের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় অস্বাভাবিক ও রহস্যপূর্ণ। অবশেষে এই কৃত্রিম দাম্পত্য সম্পর্কের শৃঙ্খল ছিন্ন করে মল্লিকা জীবনের নতুন দিগন্ত অন্বেষণের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু শ্রীপতির ঘর ছেড়ে যাত্রার শেষ মুহূর্তে মল্লিকা উপলব্ধি করে যে এই নতুন জীবনের আস্পৃহা আসলে মরীচিকার পেছনে ছোটারই নামান্তর এবং সবদিক থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন শ্রীপতির সংসারের সীমানার মধ্যেই তার আপন অবধারিত গতি। মল্লিকার মতোই প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেও মধ্যবিত্তের চরিত্রকে গভীর ও নিবিড়রূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবনের ফলে এই শ্রেণীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ, বিরক্ত, বিরূপ; মোহভঙ্গের হতাশায় এই শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদনে উৎসুক; আবার মল্লিকার মতোই নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েও পেছিয়ে আসেন, কেননা শ্রেণী-ত্যাগের কল্পনাটা দুঃসাহসিক হলেও তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত দুঃসহ ঠেকে। মধ্যবিত্তের স্খলন-পতন, দুর্বলতা-ভীরুতা, শঠতা-নীচতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেতনায় যতই বিরাগ জাগাক-না কেন, এর প্রতি তাঁর অনুরাগও সমান প্রবল, কিন্তু তা কোথাও উচ্চকিত নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলি ভাবার্দ্রতা বর্জিত হলেও নিপট হার্দ্য গুণে সম্পন্ন, তাই তাঁর রচনায় নিশ্চিতরূপে ঘৃণ্য অপরাধের আসামীও যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে পাঠকের কাছে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পায়। কাউকে যখন প্রথাসিদ্ধ নিয়মবিধি ভঙ্গের জন্যে অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া হয় তখন বিচারটা সর্বদাই হয় প্রথাসিদ্ধ বা পুঁথিবদ্ধ নিয়মবিধির পক্ষ থেকে, অতএব সে-বিচার পক্ষপাতমূলক হতে বাধ্য, তখন ভুলে যাওয়া হয় যে ওই মানদণ্ড অপরাধ বিচারের মানদণ্ড হলেও মানুষকে বিচারের পক্ষে শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অনুপযুক্তও বটে। প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষ বিচারের জন্য আইন বা অনুশাসন আশ্রয়ী পূর্বধৃত ভাবসত্ত্বকে তথা মূল্যবোধকে অতিক্রম করে হৃদয়ের মানদণ্ডে বিচার করে দেখিয়েছেন যে নানারূপ অবস্থার চাপে বা ফাঁদে পড়ে মানুষ এমন অনেক আচরণে বাধ্য হয় যার জন্যে ব্যক্তি হিসেবে তার দায়িত্ব নেই বা থাকলেও নগণ্য। অর্থাৎ ব্যক্তির অতীত শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্তে নিরুপায় ভাবে নিমজ্জিত মধ্যবিত্তের প্রাতিস্বিক স্বরূপকেই তিনি অনুধাবন করতে এবং সে অনুধাবনাকে পাঠকের চেতনায় সঞ্চার করতে চেয়েছেন। এর মধ্যে "সাগরসঙ্গমে"র দাক্ষায়ণী বা "জীবনসীমারে"র মাধবের মতো কেউ কেউ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বহিরাশ্রয়ী জীবনের ভিত্তি হিসেবে প্রান্ত মূল্যবোধগুলির অসারতা উপলব্ধি করে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে ১৯৬৩তে লেখা "দেখা"

গল্পটিতে বর্ণিত ট্রেনে খোয়া যাওয়া লাগেজের পেছনে ছুটতে গিয়ে রাজধানীর ভিড়ে সুপর্ণাকে হারিয়ে ফেলার মতো আধুনিক সমাজ বিত্তসত্যের অন্ধ অন্বেষণে চিত্তসত্যকে অনায়াসে হারিয়ে যেতে দিয়েছে এবং যখন সেই চিত্তসত্যের কথা মনে পড়েছে তখন কোনও দিকেই আর তার নিশানা পাচ্ছে না।

সাম্প্রতিক কালের আত্মচেতন মানুষের সংকটে আক্রান্ত যে-অস্তিত্ব সেটাই এক যথাযথ ও শক্তিশালী চিত্রকল্প লাভ করেছে "কচিৎ কখনো"র নাম-গল্পটিতে। মফস্বলের লোক্যাল ট্রেন ফেল করে লেখককে ঘণ্টাখানেকের জন্যে নগণ্য এক স্টেশনে আটকে পড়তে হয়, সেখানেই তিনি গোপীনাথ বাবুকে জীবনে প্রথম দেখেন, দুজনের মধ্যে কিছু বাক্যবিনিময়ে প্রকাশ পায় যে দেশের কোনও অগ্রণী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার হিসেবে গোপীনাথবাবু নিজেকে কল্পনা ও তদনুযায়ী আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে সকলের প্রতি আচরণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্কিজোফ্রেনিয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরে স্থানীয় একজন রেলকর্মচারীর কাছে লেখক জানতে পান যে গোপীনাথবাবু ওই অঞ্চলে প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একদা দেবীপদ গুহ নামে বন্ধুর চরম বিপদে তাকে বাঁচিয়েছিলেন নিজের ভদ্রাসনটুকু রেখে সর্বস্ব বিক্রি করে; তারপর সেই বন্ধু অদৃশ্য হয়ে যায়, গোপীনাথ-বাবুর স্ত্রীকেও আর পাওয়া যায়নি; কিন্তু গোপীনাথবাবু বিশ্বাস করেন, দেবীপদ একদিন আসবেই আর তাকে নেওয়ার জন্যে তিনি প্রতিদিন প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে নিয়মিত স্টেশনে আসেন। গল্পটি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত বেদনাদায়ক এক নাটকের অপরূপ কুক্ষিকা: প্রথম অঙ্কে লেখক তাঁর লক্ষ্যাভিমুখী ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন; দ্বিতীয় অঙ্কে গোপীনাথবাবুর প্রতি সরকারী চাকুরিহেতু এই মফস্বল শহরে সদ্য আগত নবীন স্টেশন মাস্টারের উদ্ধত ব্যবহার ও প্রত্যুত্তরে গোপীনাথবাবুর উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য; তৃতীয় অঙ্কে লেখকের সঙ্গে গোপীনাথবাবুর অপ্রকৃতিস্থ মানসিকতা থেকে উৎসারিত সংলাপ; চতুর্থ অঙ্কে নিম্নস্তরের রেলকর্মচারী প্রবীণ ভৈরব কর্তৃক লেখকের কাছে গোপীনাথবাবুর অতীত জীবনের উন্মোচন; পঞ্চম অঙ্কে বিকেলের ট্রেনে লেখকের বিদায় ও গোপীনাথবাবুর আরও একটি দিনের ব্যর্থতা।

গল্পটি শুরু হয়েছে ট্রেন ফেল করার দরুন লেখকের ব্যর্থতার প্রসঙ্গে, কিন্তু গল্পের মধ্যে গোপীনাথবাবু প্রবেশ করার পরে লেখকের ওই লৌকিক ব্যর্থতা যে কত তুচ্ছ তা স্পষ্ট হতে থাকে, প্রাথমিক ব্যর্থতাটাই গোপীনাথবাবুর প্রসঙ্গে প্রস্তুত হয়ে ক্রমশ উদার ও গভীর হতে হতে অন্তিম চিত্রকল্পে এসে হয়ে উঠেছে সমগ্র আধুনিক সমাজের মোহানার ব্যঞ্জিত। প্রথম অঙ্কটি বিবৃতিসার, দ্বিতীয় অঙ্ক বর্ণনামূলক, তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয়তার সঞ্চার আর চতুর্থ অঙ্ক অতীতের বৃত্তান্তগর্ভ, তারপরেই একটিমাত্র অরোধ্য ও নিশ্চিত আঘাতে এতক্ষণ ধরে অঙ্কে অঙ্কে গোপনে সযত্ন-সঞ্চিত জীবন-ব্যর্থতার সমস্ত সম্ভাবনাকে পাঠকের সম্মুখে অপ্রত্যাশিত তাৎপর্যের প্রচ্ছদে লেখক উন্মোচিত করেছেন: "স্টেশন ছেড়ে যাবার সময় জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম গোপীনাথ-বাবু প্লাটফর্মের ধারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখানে লাইন গেছে পুবে-পশ্চিমে। সূর্য অস্ত যাবার পথে পশ্চিমে অনেকখানি হেলেছে। সমস্ত আকাশে যেন আগুনের হলকা। সেই অগ্নিবর্ণ আকাশের পশ্চাৎপটে মনে হল গোপীনাথবাবু নয়, যেন এ যুগের মানুষেরই লাঞ্ছিত বিপন্ন আত্মমর্যাদাবোধ আর বিশ্বাস করুণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে উদয়-দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে।" প্রতিটি শব্দ যেমন সুচিন্তিত ও সুপ্রযুক্ত তেমনই সেগুলির সামগ্রিক বিন্যাসও বাক্যের দৃঢ়তায় সুপরিকল্পিত ও সাংকেতিকতায় সুসমৃদ্ধ; গোটা বর্ণনার কোথাও বাহুল্য বা শৈথিল্য নেই, আগাগোড়াই তা শব্দসমূহের অটল তন্নিষ্ঠ পারম্পর্যে নির্বিকার, এবং অন্তিম বাক্যটি অভিধার সম্পন্নতায় নিশ্ছিদ্র নীরেট অথচ প্রাঞ্জল

বাক্যবন্ধনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাভাবিক ক্ষমতার একটি সহজ নিদর্শন। সময়টা সূর্যাস্তের, লাইনটাও গেছে পুবে পশ্চিমে মানে উদয় থেকে অস্তের দিকে, কিন্তু গোপীনাথবাবুর দৃষ্টি সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার দিকে নয়, উদয়দিগন্তের দিকেই নিবদ্ধ এবং এটা খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার। ব্যষ্টির ব্যর্থতার দর্পণে সমষ্টির ব্যর্থতাকে প্রতিফলিত করার দুর্লভ সামর্থ্যের পরিচয় প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুবার দিয়েছেন, কিন্তু এখানে গোপীনাথবাবু সমগ্র আধুনিক মানুষের নয়, সমষ্টির নয়, মানুষের ভিতরকার বোধ-বিশ্বাসের প্রতীক এবং সেজন্যে উদয় দিগন্তের দিকেই তাঁর দৃষ্টি।

যেমন "ক্বচিৎ কখনো" গল্পটিতে ট্রেন ফেল করার মতো ছোট ব্যর্থতা ঘটনাস্রোতের বাঁকে বাঁকে ঘুরে ও একই খাতে বয়ে লাভ করেছে অতল ও সার্বিক ব্যর্থতার তাৎপর্য তেমনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত উৎকৃষ্ট ছোটগল্পে এক-একটি অভিজ্ঞতা বা অন্বীক্ষা প্রসঙ্গের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একই প্রণালীতে অনবচ্ছিন্ন রূপে প্রবাহিত হয়ে ক্রমাগত বিস্তৃত ও প্রগাঢ় অর্থময়তার উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাঁর সমস্ত রচনাতেই আকর্ষণীয় আড়ম্বর, উজ্জ্বলতা ও ক্ষিপ্রতার বিলক্ষণ অনটন চোখে পড়ে যেহেতু শব্দের অপব্যয় বা অনর্থক ব্যবহার তাঁর ধাতে একেবারে অসহ্য এবং উচ্চারিত শব্দসমূহের কিংবা বর্ণিত ঘটনার তাৎকালিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বক্তব্যের অতীত এক ব্যঞ্জনা বহনের গুরু ভারে তাঁর ভাষা গম্ভীর, মন্থর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংহতির অপূর্ব দৃষ্টান্ত। "সংসার সীমান্তে"র শেষে বলেছেন, "ডিবিয়ার ধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চয় বিগতযৌবনা রূপহীনা রজনী এক রাত্রের অতিথির জন্য হতাশনয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।" এই ব্যাকরণ-স্বচ্ছন্দ বহুলাঙ্গ বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া দুটির সংস্থাপন এমন সুকৌশলে সম্পন্ন যে তাদের অস্তিত্ব এবং বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণ এমন নিপুণ সন্নিবন্ধে প্রযুক্ত যে তাদের আস্রবর্ণ সহজে চোখে পড়ে না; ব্যাকারণিক বিশ্লেষণের কূট-ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে শুধু মর্ম-বিশ্লেষণেও ধরা পড়ে যে এই একটি বাক্যে রজনীর জীবনের সমস্ত দৈন্য, ক্ষয়, অকৃতার্থতা ও অন্তহীন প্রতীক্ষা নিত্যবৃত্ত বর্তমানে সংবৃত। আবার স্বভাবনিগ্রন্থ বাংলা ভাষায় "মহানগর" গল্পটির মুখবন্ধে গুরু-লঘু, দেশী-বিদেশী শব্দের পাশাপাশি বিভিন্ন গুণবাচক শব্দের সমাবেশে সাধিত অব্যর্থ সংবদ্ধতা ও সামঞ্জস্য, গাম্ভীর্য ও দার্ঢ্য পাঠকের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে।

একথা ঠিক যে ছোটগল্পের ধর্মপালনে মুখবন্ধ রচনার কোনও অবকাশ নেই, এবং সেদিক থেকে "মহানগর" গল্পটি মুখবন্ধ সংবলিত বললে ছোটগল্প হিসেবে তার ত্রুটিই নির্দেশিত হয়; কিন্তু তলিয়ে দেখলে মানতেই হবে যে উক্ত গল্পে চরিত্রের মানে রতনের প্রবেশ থেকে নয়, তার অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ কোনও চরিত্রবর্জিত যে-অংশকে শিথিল-ভাবে মুখবন্ধ বলে মনে হয় সেখান থেকেই ছোটগল্পটি শুরু হয়ে গেছে; চরিত্র-শূন্য বলে প্রথম কয়টি অনুচ্ছেদ মূল গল্পের পক্ষে অনাবশ্যক বা বাহুল্য তো নয়ই, উপরন্তু এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে বিশেষ রূপে এ কালের মহানগরের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য, জটিলতা ও বিশালতা, উত্তেজনা ও অবসাদ, উলঙ্গ বীভৎসতা ও অস্ফুট সৌন্দর্য অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও অন্তর্লীন করুণা, সামাজিক পরাভব ও নিঃসঙ্গ মহিমা, এক কথায় আধুনিক সমাজের প্রধান ঘট্টস্থল যাকে বলা যায় তার সম্পূর্ণ প্রকৃতি-প্রকাশক ওই মুখবন্ধকে ডিঙিয়ে গল্পটি পড়া শুরু করলে "মহানগরের" মূল তাৎপর্য পাঠকের কাছে অনায়ত্তই থেকে যাবে। প্রথম কয়টি অনুচ্ছেদকে গল্পটিতে রতনের প্রবেশের পরের অংশ থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্যে মুখবন্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হলেও দৃঢ় অর্থে শব্দটি গ্রাহ্য নয়। "আমার সঙ্গে চলো মহানগরে—যে-মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো আবার যে-মহানগর

উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার" লিখে গল্পটি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটগল্পের জন্যে আবশ্যিক নির্মাণ-প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ; গল্পটির অন্তিম বাক্য, "মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়", প্রথম বাক্যটির সঙ্গে চিত্রকল্পগুলির অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য প্রবাহের সূত্রে নিবিড় ভাবে গ্রথিত এবং এর ফলেই বৃত্তের পূর্ণতায় গল্পটি এক অখণ্ড, সমগ্র ও সুসমঞ্জস ভাবমণ্ডলে বিকশিত হয়েছে।

"শনি ও মঙ্গলের, মঙ্গলই হবে বোধহয়, যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন," বলে শুরু হয়েছে "তেলেনাপোতা আবিষ্কার" এবং প্রথম বাক্যের আঘাতেই গল্পটির সামগ্রিক ভাবমণ্ডলে প্রবেশের দরজা পাঠকের সম্মুখে খুলে গেছে। শনি ও মঙ্গলবার গ্রামীণ বাংলার তথা সামন্ততান্ত্রিক বাংলার গুহ্য সাধনার দুটি বিশেষ অনুকূল দিন বলে বিবেচিত, ফলে ওই দুটি দিনের অনুষঙ্গে পুরনো সংস্কৃতির সঙ্গে পাঠকের এক রহস্যময় যোগসূত্র গল্পের শুরুতেই গড়ে ওঠে। কিন্তু লেখক নিশ্চিত নন যে কোনটি তেলেনাপোতা আবিষ্কারের পক্ষে অধিক উপযুক্ত দিন, অর্থাৎ তিনি সংস্কারে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু নিষ্ঠাহীন, আধা-ঔপনিবেশিক সংশয়ে ক্লিষ্ট, তাই "বোধহয়" শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। এরপরে স্বভাবতই আশুচেতন পাঠকের মন প্রস্তুত হতে থাকে সাম্প্রতিক জীবনের পল্লবগ্রাহিতার আক্রান্ত, পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত তিন জন শহুরে মধ্যবিত্তের মৎস্য শিকারের মতো তুচ্ছ উদ্দেশ্যে রিক্তমূল সামন্ততান্ত্রিক বাঙালী সংস্কৃতির আবহে আগমন, জীবিকার তাড়নাহীন কয়েকটা দিনযাপন ও মহানগরে প্রত্যাবর্তনের পরে তেলেনাপোতার কথা বিস্মৃত হবার এক অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ কাহিনী পাঠের জন্যে। আবার "মল্লিকা" গল্পের শুরুটা, "শুভ্র স্বপ্ন-বিস্তার নয়, ধুলো অঞ্জাল মেশানো খানিকটা ময়লা বালি ছড়ানো জায়গা। সমুদ্রের সানন্দ দান নয়, মনে হয় পয়সা নিয়ে ফরমাস মতো কেউ বুঝি ঢেলে দিয়ে গেছে। এই চৌপাটি। সমুদ্রও আছে, যেন নীল অসীমতার নকল করা পরিহাস," পড়া মাত্র পাঠক এমন এক পরিবেশে নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হয় যেখানে সমস্ত কিছুই পয়সার মাপকাঠিতে বিচার করা হয় বা পাওয়া যায়, যেখানে সমস্তই পুঁজির যান্ত্রিকতায় কলুষিত, মানুষের নির্বোধ আত্মবঞ্চনায় শোচনীয়, সমস্তই অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। তার পরে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এই পরিবেশের অধীনস্থ মানুষগুলোর জীবনের অস্থিরতা অনির্দেশ্যতা অপ্রকৃতিস্থতা অসহায়তা মূর্ত হয়ে ওঠে এবং সবশেষে যখন "স্টেশন কাঁপিয়ে অজানা দূরের যাত্রী ট্রেনের হুইসিল বাজল" তখন সমস্ত সাম্প্রতিক মানুষের অস্তিত্বের চরম তুচ্ছতাই ভয়ংকর তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে সহসা পাঠকের বুকের ভিতরে বেজে ওঠে।

ছোটগল্প খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদকে ব্যঞ্জিত করে, প্রতীকের মধ্যে প্রকৃতিকে বহন করে। এই ধারণা অনুসারী প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত ছোটগল্পেই তাৎপর্যের দুটি সুস্পষ্ট স্তর বিদ্যমান। একটি স্তরে আগে এক সুসংগত অভিভাবের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে একটিমাত্র প্রসঙ্গের বিশ্বস্ত বিস্তারের অথবা উপস্থাপিত চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের কিংবা কোনও বিশেষ চরিত্রের একটিমাত্র সমস্যার ভিত্তিতে গঠিত আখ্যানের পূর্বানুমিত এক চরম মুহূর্তে উপস্থিত হওয়ার দরুন প্রতিক্রিয়া ; কিন্তু এই অভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া জাগাবার ব্যাপারে কোনও বড়ো আয়োজন তাঁর নেই : জীবন-সংগ্রামের মতো দারুণ একটা কাণ্ডকারখানাকে যারা সম্পূর্ণ নীরবে ও মাননীয়দের অগোচরে সম্পন্ন করে সেই সাধারণ মানুষদের প্রতিদিনের অনুল্লেখ্য তুচ্ছ সব ঘটনাকে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি উদ্ঘাটন করেন। তাঁর অন্তরঙ্গতাই পাঠকের অন্তর্বেধনের প্রথম সোপান ; তবু তাঁর রচনাপাঠে একটা

অস্বস্তি প্রথম থেকেই শুরু হয়ে যায়, বোধির একটা উদ্দীপনা হতে থাকে, কেননা ওই অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও সর্বদাই পাঠক বুঝতে পারে যে লেখক যেন কিছুই ভেঙে বলবেন না বলে বদ্ধপরিকর, সংকেতেই তিনি সহজ, সামান্য আখ্যানের আড়ালে অসামান্য ব্যঞ্জনাকে রক্ষার দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন এবং প্রকৃতই তাঁর ছোটগল্পগুলি সেই লুক্কায়িত কথাটাকেই খুঁজে বের করার জন্যে সহৃদয়হৃদয়সংবাদী পাঠকের প্রতি দুর্মর প্রণোদনা। তাঁর গল্পগুলি শিল্পকৌশলে অদ্বিতীয় ও অভিনব এবং স্বল্পতম পরিসরে বহুতর প্রবর্তনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত: সেখানে নিষ্কর্ষিত অভিজ্ঞতার কোনও প্রবেশ নেই অথচ অপরীক্ষিত দৃষ্টিকোণ নির্বাচনেই তাঁর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এর ফলে তাঁর সার্থক গল্পগুলি হয়ে উঠেছে দারুণ ইঙ্গিতগর্ভ এবং এজন্যেই তাঁর ছোটগল্প পুনর্কথনের পক্ষে একেবারে অযোগ্য আর এই অযোগ্যতা প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রসঙ্গ ও প্রকাশের, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞার আশ্চর্য সমন্বয়ে অদ্বৈত-সিদ্ধিরই অকাট্য প্রমাণ তথা তাবৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পেরই অনিবার্য লক্ষণ।

এখানেই প্রকাশ পায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলির তাৎপর্যের দ্বিতীয় স্তর: দেশ-কাল-পাত্র-গত প্রতীতির অভিঘাতে লেখকের চেতনায় যে আলোড়নের সূত্রপাত তারই অন্তিম পরিশ্রুত পরিণাম দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে অর্থাৎ একালের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত অথবা নিকট অনুবঙ্গী বিভিন্ন চরিত্রকে নিয়ে লেখা তাঁর সার্থক রচনাগুলি শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নয়, সামগ্রিকভাবে উক্ত শ্রেণীর স্বভাবের ও স্বরূপের—ঐকান্তিক প্রকৃতির অনবদ্য শিল্পগুণে সমৃদ্ধ প্রকাশ, ব্যক্তিগত মনীষার মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত মানসের অখণ্ড অমোঘ অবিকল রসাত্মক রূপায়ণ। এই শ্রেণীর বাইরে তিনি ক্বচিৎ কখনও পদক্ষেপ করেছেন; কিন্তু তাঁর পদচারণার ক্ষেত্র সংকীর্ণ বলেই তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টি সর্বদা একাগ্র ও সুতীক্ষ্ণ এবং এই সংকীর্ণ ক্ষেত্র প্রসঙ্গে তাঁর অনুধাবনা সর্বদা আন্তরিক ও যথার্থ; একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের মধ্যেও কত সর্গ-উপসর্গ, কত কৌণিকতা ও ক্রান্তিকতা, কত স্তরভেদ, কত কুটিল স্রোত ও জটিল সুড়ঙ্গ, কত উদাত্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কত গোপন কুটৈষার অলিগলি আছে বা থাকা সম্ভব প্রেমেন্দ্র মিত্র তা পুনঃপুনঃ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ করে তার সাত্ত্বিক মনোভঙ্গির যে-পরিচয় পেয়েছেন সেটাকেই যেভাবে আলোকচিত্রী অন্ধকার ঘরে আপাত সাদা কাগজের উপরে বিভিন্ন রসায়নের পরিমিত প্রয়োগে আস্তে আস্তে আলোকচিত্র ফুটিয়ে তোলেন, তেমনি করে কিন্তু অনতিক্রম্য স্বকীয়তায় পাঠকের সম্মুখে উন্মীলিত করেছেন।

৮৬ পৃষ্ঠার পর

তার খোঁজ পাওয়া গেলনা। তারপরে নভেম্বরে ১২ ই তার গলিত শব ঢাকার রমনার এক নিভৃত স্থানে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

## সরকারী অভিমত

যখন বিপ্লব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছে তখন পুলিশের বড়কর্ত্তা (L. F. Marshead, I. G. of Police) তাণ্ডবের কারণ সম্বন্ধে ১৯০৮ এ নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে যারা ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে জাতীয়তার এক নূতন প্রবল ভাববন্যা এসেছে। পরিতাপের সঙ্গে মোর্সহেড বলেন যে গভর্ণমেণ্টের অমনোযোগিতায় এরা বেড়ে উঠেছে, এবং তার বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। উগ্র-পন্থীদের লক্ষ্য হচ্ছে যে বিদেশীর কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে স্থির থেকে ভদ্রঘরের সন্তানরা খুনখারাপি করতে আর পিছ পাও নয়। তার ওপর সমস্যা ভারতের এক শ্রেণীর শিক্ষিত ও বিত্তবান লোকের এই কার্যধারার ওপর পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে।

## রাষ্ট্রীয় ঘোষণা

নরমপন্থীরা কংগ্রেসকে সম্বল করে রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদের ওপর দাবী বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের জন্য ত বটেই হয় ত উগ্রপন্থীদের উদ্দেশ্যেও যোধপুরে বড়বাট লর্ড মিণ্টো ১৯০৮ নভেম্বর ২ রা নূতন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের বাণী পাঠ করেন। তাতে বলা হয়:

'Steps are are being continually taken towards obliterating distinctions of race as to the test of access to posts of public authority and power"—দাঙ্গাহাঙ্গামার কাজ নেই; বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে আর 'কালা-ধলা'র বিভেদ থাকবে না।

## বন্ধনের নাগপাশ

দাঙ্গা লুঠ খুন প্রভৃতি মিলে গভর্ণমেণ্টকে দস্তুরমত উত্যক্ত করে ফেলা গেছে। গভর্ণমেণ্ট ও নিচেষ্ট রইলনা। এইবার সাধারণ আইনের পরিবর্ত্তন আর নূতন আইন প্রণয়নের পথ গ্রহণ করা হলো।

জুন ৮ ই (১৯০৮) সংবাদ পত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করা হ'ল। আপত্তিকর লেখা ছাপা হলেই সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করার বিধি এলো। মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা, পুলিশ এসে সমস্ত আটক করে উঠিয়ে নিয়ে তাকে আবদ্ধ রাখার শক্তি দান করা হ'ল। সংবাদ পত্র দলনের ব্যাপারে এর চেয়ে আর সুষ্ঠু ব্যবস্থা হতেই পারেনা।

বছরের শেষ দিকটায় (ডিসেম্বর ১২-ই) ফৌজদারী কার্য বিধি আইনের সংশোধন হয়ে গেল। বিচার (ও সাজা) অতি সরল করা হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট, দায়রার প্রয়োজন রইল না; বিশেষ বিচারালয় সে সবের ভারপ্রাপ্ত হ'ল। প্রাথমিক তদন্তের সময় আসামীর অনুপস্থিতি উপেক্ষিত হয়। বে-আইনী কাজে লিপ্ত থাকলে সমিতির উচ্ছেদ প্রভৃতি কার্য্যে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল তাকে একেবারে নাগপাশ বল্লেই চলে।

(ক্রমশঃ)

# আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

## সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

**সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা** কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নবেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-1/69

# অন্বেলার সিঁড়ি

ধারাবাহিক উপন্যাস

বাসুদেব দেব

। এক ।

## ভিজে রুমাল

সিগন্যাল মাথা নীচু করলো। কালো ফুটকির মত দূরের ট্রেন দেখা যাচ্ছে, সামান্য কালো ধোঁয়া। ধূ ধূ মাঠ। কয়েকটা তাল গাছের জটলার ভিতর দিয়ে ঐ সিগন্যাল পোষ্টটা কৈশোরকালীন আশ্চর্যের মত দাঁড়িয়ে থাকে—গ্রামীন পরিবেশকে সামান্য বদলে দেয় রাত্তির হলে লাল সবুজ সঙ্কেতে। নইলে লাল মোরাম বাঁধানো নীচু চত্বর, টিকিট ঘর, ডাকের বিরাট সিন্দুক, দু'জন রোগা কুলি, একটা চায়ের দোকান, কয়েকটা মুড়িমুড়কি মিষ্টির দোকান, ছোট এক ফালি রাস্তা, একটা পুরোনো ইঁদারা, এই সব মিলে মিশে দিনে রাতে পাঁচটি গাড়ির এই অখ্যাত ষ্টেশনটাকে বাবলা শ্যাওড়া আকন্দের ঝোপে ঘিরে অলস ঔদাসীন্যে ভরে রাখে। মাঠের মধ্যে মিলিটারীর ক্যাম্প বসেছিল একসময়, অস্থায়ী এরোড্রাম। সেই সব স্মৃতি এখনো পড়ে আছে বনজঙ্গলে স্টেশনের আশে পাশে। স্টেশনও গড়ে উঠেছিল সেই সময়ে সামরিক প্রয়োজনে, স্বাধীনতার অনেক আগে, সেই যুদ্ধের সময়। ভাঙা পোড়ো ব্যারাক বাড়ি, প্রশস্ত এসফল্টের রাস্তা, ফেলে যাওয়া লোহালক্কর ভাঙা বাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে সেখানে। আশে পাশের পুরোনো গ্রামের ঘুম ভাঙে না ঐ ট্রেনের আওয়াজে—মামলা মোকদ্দমার কি ব্যাবসা পত্তরের জন্য বা শহরের ডাক্তার ডাকতে ইষ্টিশনের কথা মনে পরে, নইলে সারা দুপুর, সারা বিকেল রাত বারোটার শেষ গাড়ি চলে গেলে সারা রাত স্টেশনটা ঐ বুড়ো কুলি ভিখুর মত হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঘুমোয়।

সিগন্যাল মাথা নীচু করতেই ধ্বক করে ওঠে নীলুর বুক। এত তাড়াতাড়ি চলে এল গাড়ি। কতদিন কত লেট হয়। হু হু করে ওঠে বুক। চোখে জল এসে যায়। কেষ্ট সর্দারের গরুর গাড়িটা ইঁদারার কাছে নামানো, গোরু দুটো ঘাস খাচ্ছে, ছাড়া পেয়েছে তিনচার মাইল ধুলো পথ ভেঙে এসে। লাল বেনারসি চেলি চন্দনে নতুন কনে বৌ স্টেশনের সবসময়কার তালা বন্ধ ওয়েটিং রুমের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মিষ্টির হাঁড়ি, শতরঞ্চে ছোলার দড়িতে বাঁধা ঢাউস একটা বিছানা, একটা চকচকে নতুন চামড়ার সুটকেশ, নতুন ট্রাংক, তার ওপর বসে আছে গোটা দুই বাচ্চা, ওরা ফিরে যাবে গোরুর গাড়িতে কৈষ্টোর সঙ্গে। নতুন মেসোর সঙ্গে গল্প করছে বিমল, সেও ফিরে যাবে গ্রামে। উঠিয়ে দিতে এসেছে। ঐ লোকটা—কালো রোগা ঘাড়ে গলায় থাবা থাবা পাউডার, বাদামি রঙের নিউকাট পাম সু, সিল্কের পাঞ্জাবি—হাতে লাল সুতো বাঁধা—ঐ লোকটাই বিমলের নতুন মেসো-মানে দীপার বর। স্বামী। দীপা, না দীপু। কালো বিন্দুটা বড় হতে থাকে, বিমল হাতছানি দিয়ে ডাকে নীলুকে 'এই নীলু, তুই কখন এসেছিস, আয় ইদিকে।'

নীলুর পায়ে ধুলো। ওদের পায়ে জুতো। ওরা গাড়িতে এসেছে। নীলুদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে যখন ওদের গাড়ি যাচ্ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে নীলু বেরিয়ে এসে হাঁটছিল পিছু পিছু। খেলার মাঠ, আমবাগান পেরিয়ে

এসে ভাবলো ; কি লাভ ঐ গাড়ির পিছে পিছে ভিক্ষুকের মত, কাঙালের মত ছুটে ? আবার মনে হলো, এত দূর যখন এসেছে ষ্টেশন পর্যন্তই যাই। আর হয়তো জীবনে কখনো দেখা হবে না। ঘোমটা মাথায় সিঁদুরচাঁদচন্দন পরে কি রকম লাগছে দীপাকে—দেখবার সাধ হয়—কি লাভ দেখে—দীপু তো স্বার্থপর—পর হয়ে গেছে—তবু যখন ট্রেনে উঠবে, চোখাচোখি হবে, একবার দেখা হবে—হয়ত কিছু বলবে, বলতে চাইবে—অন্তত যাবার আগে নীলুর মুখখানা দেখে যেতে পারবে, শেষবার।

'মেশোমশাই, এর নাম নীলকমল। আমাদের ইস্কুলের খুব ভালো ছেলে ছিল। ছোটো মাসি কত পড়া বুঝে নিত। আমাদের গ্রাম থেকে নীলুই লেটার পেয়ে ফার্ষ্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, কলকাতায় কলেজে পড়ে এখন—ছোট মাসির বিয়েতে আসতে পারে নি বলে আলাপ হয় নি আপনার সঙ্গে।

—'তাই নাকি ?' দীপার বর নমস্কার করে মৃদু হেসে।

নমস্কার করতে হয় নীলুকেও। কোন কথা বলা হয় না। ট্রেন সিগনালের কাছে এসে পড়েছে—বিমল ও ওর ছোটো মেসো জিনিস পত্তর তুলবার জন্য কুলিদের তদারক করছে। দুমিনিটও দাঁড়ায় না ট্রেন। দীপাও বেনারসি ঝলমলিয়ে চলে আসে স্টেশনের নীচু প্লাটফরমে—ঘোমটা সরে গেছে—চোখে কাজল লেপ্টে আছে—বড় সিন্দুরের চাঁদটিপ—নীলুকে ডাকলো হাতছানি দিয়ে। নীলুর পা আর সরে না। ট্রেন এসে পড়েছে। এই মালু তোল—দরজাটা খুলুন না—ইস কি ভিড়—দেখবেন যেন হাঁড়িটা না ভাঙে—ওঠ ওঠ

'তুই এলি কেন ?'

নীলু নিরুত্তর। দীপার চোখ ভরে জল বাধা মানে না। 'নীলু ভুলে যাস,' খুব মৃদু। বিশ্ব চরাচরে কেউ শোনে নি এমন মৃদু ভিজে গলায় বল্ল দীপা, টুপ করে বুঝি এককোটা জল ঝরে পড়লো কাঁকর বেছানো ষ্টেশনে। চারদিকে হৈ চৈ, ব্যস্ততা, বিচিত্র আওয়াজ। সামনের সিগন্যালও মাথা নীচু করে, ঢং ঢং করে ঘন্টি বাজে ষ্টেশনে, তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল একটা ছুরির মতন বিঁধে যেতে থাকে নীলুর বুকে, বুকের ভিতর। মাথা নীচু করে শুধু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকা দীপালির ফর্সা পায়ে আলতা, নতুন লাল চটির তলার সামান্য মাটির ঝরে পড়া দেখতে থাকে। ধ্বক ধ্বক ধ্বক " খস খস ·· ঝিক ঝিক কুউউ···ঝিক দীপুর হাত থেকে খসে পড়ে ছোট, এবটা রুমাল। নীলুর পায়ের কাছে। কুড়িয়ে নেয় সে। অগুরুর গন্ধ, ভিজে রুমাল—বুঝি চোখ মুছেছিল দীপা··· তাড়াতাড়িতে উঠতে গিয়ে হাত ফস্‌কে পড়ে গেছে হয়তো কিন্তু এ রুমাল তো নীলু ফিরিয়ে দিতে পারবে না আর কোনদিনও···বা কি ইচ্ছে করেই ভিজে রুমাল ফেলে রেখে গেল দীপা, নীলুর জন্য। হঠাৎ মেঘের মত জলে ভরা—ঐ রুমাল রেখে উড়াল বকের মত চলে গেল গরবিনী।

বিমল এসে কাঁধে হাত দেয়। 'চল, গাড়িতে ফিরবি।' নীলু চলে যেতে থাকা ট্রেনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বল্ল 'চল্'। গোরুর গাড়ি ফিরে চল্ল গ্রামের দিকে, দুপুর গাঢ় হচ্ছে, বাঁশবাগান যেখানে নুয়ে পড়েছে ঠিক গাড়ির ছইয়ের ওপর, ঘুঘুর ডাক যেখানে খুব মন খারাপ করা সেইখানটায় বিমল বলল 'রুমাল নিলেই ছাড়াছাড়ি হয়, জানিস।'

* * *

খেতে বসেই নীলু বলে ফেলে : 'কালকেই সকাল সাতটা ষোলর গাড়িতে কলকাতা যেতে হবে মা।'

'এই তো সবে এলি। ছুটিত তো এখন, এখনি কি যাবি।'

'না মা টিউশনিটা কামাই হচ্ছে, তা ছাড়া ছুটির পরেই যে টেস্ট পরীক্ষা আমার, সব বই তো নেই, বন্ধুদের কাছ থেকে বই এনে লিখে নিতে হবে।'

'যা ভালো বোঝো কর' মা উঠে যান। বোঝা যায় রাগ

করেছেন। শুধু ছোটো ভাইটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

'তুই চলে গেলে মেজদা বাড়িটা খালি খালি লাগে।'

কথাটা অনেকটা ঠিকই। গ্রামের বাড়ি, পুরোনো, পাচিল ঘেরা। নীলু কলকাতা চলে গেলে সুধাময়ী আর ঐ ক্লাস নাইনের পড়ুয়া বছর চৌদ্দর পুলু মানে পুলক কুমার-ঐ দুজনে—বাড়িটা খালি খালি মনে হয়। সাবেক আমলের বাড়ি, সংস্কার হয় না কতদিন, সেই নীলুর বাবা বেঁচে থাকতে একবার, সেও কত বছর হলো। তারপর ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে সুধাময়ীর সংসার—কে কাকে দেখে। আত্মীয় স্বজনেরাই লুটেপুটে নিলে জমি জিরেত। কিছু কি আর বুঝতো সুধাময়ী। না বুঝতো দুলু—বড় ছেলে—তখন বুঝি তার কুড়ি কি একুশ বছর মাত্র বয়েস। ছেলেটাও ছিলো সাদাসিধে হাবাগোবা—কোথায় দলিল দস্তাবেজ পর্চা খতিয়ান মৌজা ম্যাপ নক্সা ডিক্রি ইনজাংসনের নকল—কে কি বোঝাল। ওদের নরুকাকাই দেখাশুনো করছিল উৎসাহ নিয়ে। 'নাবালকের সম্পত্তি তো আর রাখা যায় না রাঙা বৌঠান। গরমেণ্ট যা নতুন আইন পত্র করছে। তা ছাড়া রায়ত বর্গাদারদের সঙ্গে ঝগড়া কালিয়া করা তো আর চাড্ডিখানিক কথা নয়।' একে একে বিক্রি, বন্দক, আগাম চাষ···দুলু একদিন চলে গেল কলকাতা ভটচায্যি বাড়ির সেজকর্তার সঙ্গে, সে নাকি পোষ্ট অফিসের বড় চাকুরে—একটা কাজ করে দেবে। সেই ছেলে কলকাতা গিয়ে কি হয়ে গেল—সুধাময়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস লুকোন। বিয়ে থা করে ঘর সংসারী হয়েছে চেৎলার বাসা নিয়েছে। একবার সুধাময়ী ঘুরে এসেছেন সেখানে। থাকতে মন চায় না। শশুর স্বামীর ভিটে ছেড়ে এই বয়সে আর কোথায় যাবেন। এই তার স্বর্গ। শুধু যে লোকে বলে নিমাই ঠাকুরের মামাবাড়ি বলে এই গ্রামের মাটি সোনার মত, পায়ে মাখলেও পুণ্যি—তাই নয়—এর তুলসীতলায় যে সুধাময়ী রোজ পিদিপ জেলে দেন। দুলু ছেলে বৌ নিয়ে বছরে বার দুয়েক আসে হয়ত, তখন সব ঘরগুলো পরিষ্কার করা হয় জঙ্গল সাফ করা হয়—বাড়িটা জেগে ওঠে—নইলে দিনের বেলায়ও মনে হয় ভূতে পাওয়া। ততদিন বীণারও বিয়ে হয়ে গেছে। নীলু যদ্দিন ইস্কুলে পড়ত, গাঁয়ের পুরোনো ইস্কুলে, তদ্দিন নীলু, নীলুর একদল বন্ধু, পুলু সকলে বাড়ীটাকে জাগিয়ে রাখতো। নীলু কলকাতা পড়তে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে বাড়ি। কত ছেলে তো কেশনগরের কলেজে লেখাপড়া করছে - নীলু লেখাপড়ায় ভালো বলে ইস্কুলের মাষ্টার মশাইরা পাঠিয়ে দিতে বল্লেন কলকাতা—দুলুর বাড়িতেই উঠেছে—পড়াশুনোর কত অসুবিধে—আর ছুটি ছাটা না হলে কি এতদুরের পথ বাড়ি আসা যায়, তাও তো পড়া চালাতে টিউশনি নি য়ছে নীলু—আর বছরখানিক গেলেই নাকি কলকাতার পড়া শেষ হয়। মায়ের মন।

সুধাময়ী বুঝতে পারেন পুত্রর কাছে এখন যেমন তিনি, দুলুর কাছে তেমন নন। দুলুর কাছে তার বৌ, তার ছেলে, চাকুরি—বরং ভট্টাচায্যি বাড়ির মেজ কর্ত্তার বাড়ি নাকি ভবানীপুর, সেখানে মাঝে মাঝে যায়। মার কাছে কি চলে আসতে পারে না শনি রবিবার? অন্তত বাপের ভিটেয়। আর বীণার সংসার এত বড়—সে তার নিজের ঘরদোর স্বামী পুত্র পরিজন নিয়েই ব্যতিব্যস্ত—নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় না। তা ছাড়া বছর বছরই প্রায় ছেলেপুলে। নইলে ঐ মুড়োগাছা থেকে কদিন লাগে একবার মাকে দেখে যেতে? মেয়ের বিয়ে হলেই পর। জামাইও তেমনি। ব্যবসায়ী মানুষ কখনো উনি পছন্দ করতেন না—বেঁচে থাকলে কি ঐখানে বিয়ে দিতে হতো। তখনই বিয়ের বয়স হয়েছিল—কোন সম্বন্ধই আর পছন্দ হচ্ছিল না বীণার বাপের। সুন্দরী মেয়ে। নাইবা জানলো লেখাপড়া গান-বাজনা। ঘরের কাজ কর্মে লক্ষ্মী। ঐ সম্বন্ধ দেখতেই গিয়েছিল মানুষটা শান্তিপুর। না, মেয়ের ষোল বছর হতে

চলল, আর তো ফেলে রাখা যায় না—এতো কলকাতা শহর নয়—বনেদি সেকেলে গ্রাম—পণ্ডিত বামুনদের বাস—এখান থেকে পঞ্জিকা লেখা হয়, সংস্কৃতের পরীক্ষা হয় টোলে টোলে—যে সে কথা। শান্তিপুর থেকেই এক গা জ্বর নিয়ে ফিরলো লোকটা—ইষ্টিশন থেকে প্রায় ক্রোশ পথ হেঁটে এসে দাওয়ায় পড়লো লুটিয়ে, সেদিনের কথা মনে পড়লেও সুধাময়ীর বুকটা কেঁপে ওঠে। তখন নীলুর বয়স কত নয় কি দশ। আর পুলুর বুঝি চার। বীণা ওকে খাওয়াতো, ঘুম পাড়াতো—নীলুর তদারক করতো। বীণা আর নীলু কত ছোট বড়, নীলুর আগের দুটি বাঁচে নি। কত শিকড় বাকড় নিয়েছিল সুধাময়ী—তারপর শ্রাদ্ধশান্তির এক বছরের মধ্যেই বীণাকে বিয়ে দিল। কম করে যা খরচ করতে হয়েছে তাতেই ডাঙগাপাড়ার ক বিঘে ধানীজমি গেছে। সেই বীণা এখন একটা খোঁজও নেয় না। নীলুও কলকাতা চলে যাবার পর যেন দূরে সরে যাচ্ছে সুধাময়ী। হয়ত এ রকমটাই হয়—এই পৃথিবীর নিয়ম। যার প্রয়োজন কমে আসে, বাইরের পৃথিবী তখন তাকে টানে। পিছনের আমবাগান থেকে বাতাসের সরসর শব্দে মনটা খা খা করে ওঠে। সুখে থেকো তোমরা সবাই, ভালো থেকো। আমার আর কদিন।

বীণার বিয়েই এ বাড়ির শেষ উৎসব। প্রায় ন'দশ বছর। আঙুলে গোনেন সুধাময়ী। দুলুর বিয়ে কলকাতায় দিয়ে দিয়েছেন সেজকর্তা, শ্রীনাথ ভট্টচার্য। বড় চাকুরে। কলকাতায় বাড়ি। মায়ের কাছে পোস্টকার্ডে একখানা মামুলি অনুমতি পত্রই যথেষ্ট। কত সাধ ছিল সুধাময়ীর। ঐ যে দিন কয়েক আগে দীপার বিয়েতে যে রকম জাঁক হলো ভবানী মুখুজ্যেদের বাড়িতে—ঐ রকম আনন্দ আহ্লাদে এই ভূতে পাওয়া বাড়ুয্যে বাড়িটাও ডগমগ করবে কবে ভাবছিল সুধাময়ী। নীলু কলেজের পড়াশেষ ফিরলেই একটি ভালো মেয়ে দেখে···

'আমি একটু বেরুচ্ছি মা'

নীলু এমন আনমনা কেন? দুপুরে নাকি বিমলের সঙ্গে ইষ্টিশন পর্যন্ত গিয়েছিল পুলু বল্লু। ছেলেরা বড় হতে থাকলে মায়ের যে এত চিন্তা। বিশেষ করে এ রকমের অভাবের সংসারে। কোথা থেকে যে কি আসে! দুলু কটা টাকাই বা পাঠায়। আর জমির ধানে বছর কাটানোই মুস্কিল। তোরা সব বুঝে নে, আমাকে রেহাই দে। আর পারি নে। পারি নে। সুধাময়ীর বুকের ব্যাথাটা বাড়ে, দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়—পড়ন্ত বিকেলের ছায়া এসে পড়েছে রোয়াকে—উঠতে ইচ্ছে করছে না তবু। পুলু বল খেলতে বেরুচ্ছে। ঘরে যদি একটা মেয়ে থাকতো, একটা বৌ। পাড়া-পড়সীরা এক এক সময় বলে 'তুমিই ভালো আছো বৌঠান, ভাসুর দেওরের সংসারে যে কি অনাসিরিষ্টি, নিত্যি নতুন ঝগড়া কোন্দল। তুমি আছো নিজের মত। ছেলেরা প্রায় দাঁড়িয়ে গেল। একটা মেয়ের বে দিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যিমতী। সুধাময়ীর মনে হয় ঘর থেকে যদি ঘর গমগম লোক থাকতো—না হয় ঝগড়াই হতো বাগানের ফল পাকুর নিয়ে, জমির অংশ নিয়ে বা দুপুর বেলায় কোন কর্তার পাতে মাছের মুড়োটা পড়েছে তাই নিয়ে···মাছের মুড়োর কথা মনে পড়তেই লোকটার চেহারা ভেসে ওঠে। মাছ ধরার বাই ছিল খুব। এক একদিন রাত করে ফিরে আসতো—হাতে ইয়া বড় এক পাকা রুই। ছেলেমেয়েরা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। 'কই গো, দেখোনা কি এনেছি।' মানে আবার বটি আনো, আথায় আগুন দাও। কর্শা খালি গায়ে—ধবধবে পৈতে ঝুলতো। কাঁঠাল কাঠের বড় পিড়ের আসন করে বসতো খেতে। মাছের মুড়োটা এঁটো হবার আগেই ভেঙে রেখে দিতেন জাম বাটিতে। 'বাড়ির বৌকে মাছের মুড়ো খেতে হয় কিছু'

'আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। খেয়ে উঠবার করো। রাত কত হয়েছে খেয়াল আছে?'

'খেয়াল করে আমার কি হবে? আমি কি পরের গোলামি করি? ঐ শালা লালমুখোদের অপিসে দশটার সময় কি আমার হাজিরা দিতে হবে? এ্যাঁ'

এক এক সময় লোকটা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতো। বলতো: এই যে আমি এখন মৎস্য মারছি, যজমান ঠেঙাচ্ছি, ছেলে বৌ নিয়ে ঘর সংসার করে যাচ্ছি, জানো এখন কত লোক পালিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিশের ভয়ে। মেদিনীপুরে কি হয়েছে জানো! কেমন আনমনা হয়ে যেতো লোকটা। কিন্তু খুব বড়ো ব্যাপারের মধ্যে যেতে ভয় পেতো। খুব যে সংসারী ছিল তাও না—তবে কেমন যেন ভীরু স্বভাবের ভালো মানুষ। সুধাময়ীও তাই চেয়েছিল। বাপ মা মরা মেয়ে আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। যদি বিবেগী হয়ে যায় অমন স্বামী—আগলে আগলে রাখতো। কিন্তু মানুষ কতটুকু আর আগলে রাখতে পারে? মৃত্যুর ছায়া লোহার ঘরের মধ্যে পর্যন্ত সাপ হয়ে ঢুকে যায়।

* * * *

দীপাদের দোতলা বাড়ির সামনে এসে পুরোনো অভ্যেস মত থেমে যায় নীলু। আগেরবারও যখন এসেছিল, দোতলার কোণের সেই জানলায় দীপার মুখ। ইসারার কথা। অর্থাৎ দেখা হবে কাল তোমাদের বাড়িতে বা বিমলদের ওখানে। সেই দীপা। এক সঙ্গে একই পাড়ায় বড় হয়ে ওঠা। একে যদি ভালোবাসা বলো তবে তাই। কেউ কোনদিন তেমন করে কিছু বলে নি। কিন্তু দুজনার অস্তিত্ব দু জনার কাছে ছিল রোদ হাওয়া নিঃশাস প্রশ্বাসের মত। প্রায় এক বয়সী। ছেলেবেলায় একসাথে মেলায় গেছে, ঠাকুর বিসর্জন দেখতে গেছে। কতদিন বিকেলে হাতে পড়া বুকে নিয়েছে দীপা—একদিন সন্ধেবেলা দীপার হাত খানা টেনে ঠোঁটে ছুঁইয়েছিল নীলু, সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, দীপু এইটে পড়তো—কি যে হয়েছিল। দীপা ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। দুদিন চোখ তুলে তাকাতে পারে নি।

'তুই খুব দুষ্টু হয়েছিস আজকাল'

'তুই খুব মিষ্টি হয়েছিস আজকাল'

'এ সব ভালো নয় মশাই। গুড বয়, পড়াশুনো করো মন দিয়ে।'

কলেজের ঠিকানায় দীপার চিঠি: 'আমি পর হয়ে যাচ্ছি নীলু। চলে যাচ্ছি পরের ঘরে। ভুলে যাস লক্ষ্মীটি। বড় হওয়া চাই....'

সে-ই শেষ চিঠি। আজ শূন্য জানালা। লালরঙের বাড়িটা হঠাৎ এমন খালি হয়ে গেছে। হঠাৎ এমন খালি হয়ে গেছে গ্রামটা। নীলুর মন আর কিছুতেই বসতে চায় না—যেদিকে তাকায় শুধু দীপার স্মৃতি। ঐ পেয়ারা গাছে উঠে নীলু পেয়ারা ছুড়ে দিতো, জংলাছিটের ফ্রকের কোচড়ে কুড়ুতো দীপা। বড়দের দেখলে ইসারা করে পালিয়ে যেত। ঐ বকুল গাছটার গোড়ায় দোলের দিন দাঁড়িয়ে থাকত দীপা। হুকুম দিল, 'আমাকে রঙ না দিয়ে আর কাউকে রঙ দিতে পারবি না।' ঐ যে কাশিমবাজার মহারাজার কাছারি বাড়ি, ছোট ছোট কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ফুটে থাকতো—দেবদারু গাছের সারি পথে। প্রত্যেকবার ইস্কুলের সরস্বতী পুজোর সময় দীপু আর নীলুর বাঁধা কাজ ছিল দেবদারু পাতা আর সদ্য ফুটতে থাকা কৃষ্ণচূড়া রঞ্জন নিয়ে আসা পুজোর জায়গা সাজাবার জন্য। মর্নিং ইস্কুলে যাবার সময় গন্ধরাজ ফুল তুলে দিতে হতো—তুলে দিতে হতো কাঁঠালি চাঁপা। রক্ষণশীল গ্রাম হলে কি হয়, ইস্কুলে ছিল কো-এডুকেশন। অবশ্য মেয়েদের ইস্কুল গড়বার চেষ্টাও হচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে। রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে দীপা কোন্ গানটা গাইবে, ঠিক করে দিতে হতো নীলুকে। দীপা একবার কলকাতা গিয়ে ওর এক দিদি জামাইবাবুর বাড়িতে, বিমলকে দিয়ে ডাকিয়ে

নিয়েছিল নীলুকে, ওরা তিনজনে কিছুক্ষণ বসেছিল লেকের ধারে, বেশীক্ষণ বসতে পারে নি, জোড়া জোড়া ছেলেমেয়ে বসে গল্প করছে শিস দিচ্ছে কেউ কেউ, বিমল বলেছিল, 'ছোট মাসি, চলো এখানে গল্প করা যায় না—ইতর সব।' বিমল আর দীপা ছিল সমবয়সী বন্ধুর মত। দীপাও প্রকাশ্যে ছেলেমেয়েদের বেহায়াপনা দেখে মরমে মরে যাচ্ছিল। নীলুকে বলছিল—কোলকাতার ছেলেমেয়েরা ভারি অসভ্য। হেসে উঠেছিল নীলু। দীপা বলছিল বিমলকে এড়িয়ে,

'তোমাকে কিন্তু এখানে অন্য রকম লাগে।'

তোমাকে। দীপু যখন দূরের মানুষ হয়ে পড়তো, অন্য পরিবেশে এসে পড়তো—সেই সহজ সহজাত 'তুই' আর বলতে পারতো না। চিনেবাদাম খেতে খেতে অনেকটা পথ হেঁটেছিল ওরা—তারপর হঠাৎ বিমল বলল: নীলু তুই ছোট মাসিকে বাড়ি পৌঁছে দিস্, আমি একটু মণিকাকাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। মা'র হুকুম। দীপাও বুঝতো ওটা বিমলের চালাকি। অন্য কেউ হলে উলটে বরং কাপ্তেনি করতো, বিজ্ঞপতা প্রকাশ করতো—কেইবা চায় তার ছোট মাসি শহরে এসে তার বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিক। বিমল চলে গেলে খুব লজ্জা লাগছিল নীলুর। কি বলবে, কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। নিমপুকুর গ্রামে দীপু অন্য রকম, মাঠের মধ্যে নদী যেমন, দিগন্তের পারে বর্ষার মেঘ যেমন। সেখানে যেন দীপুর দিকে তাকালেই সব বলা হয়। কখনও অন্ধকার সিঁড়িতে হাতখানা বুকে ঠেকালেই যেন বৃষ্টি নামে শরীরের প্রতি রোমকূপে। দীপার শরীর থেকে কি আবছা একটা গন্ধ—স্বপ্নের ভিতরও যেন লেগে থাকে। সেই অনেক আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে খা খা নির্জন দুপুর বেলায় নীলুদের আমবাগানের ঘন ছায়ায় এলোচুল দীপার খুব কাছে দাঁড়িয়ে কোন গাছে পাকা আম আছে খুঁজে দেখার মধ্যে আশ্চর্য একটা মাদকতা লাগতো—শুধু মাত্র দীপার সান্নিধ্যে—কখনো দীপার হাত ছুঁয়েছে খেলাচ্ছলে—তারই মধ্যে বুকের ভিতর তোলপাড় করে উঠতো—সে সব দিন। আর এই শহরে, কি রকম করলে ভালো হয়। কলেজে পড়া তরুণ নীলকমল—নতুন ভ বে দীপাকে আবিষ্কার করে—কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায়। 'চলো একটু চা খাই।'

'রেস্টুরেন্টে কিন্তু কেবিনে বসতে পারবো না, লজ্জা করবে।'

'ধ্যাৎ, লজ্জা কিসের। সবার সামনে বসতেই তো লজ্জা'

'কেন আমরা কি চুরি করছি না ডাকাতি করছি।'

নীলু বোঝাতে পারতো না। কেবিনেই বসতো—চপ ভাঙতে ভাঙতে কথা ফুরিয়ে যেত, দীপু বললো—'এখানে তোমাকে অন্য রকম লাগে'

'কি রকম!'

'পুরুষ পুরুষ'

সদ্য সেলুনে কাটা দাড়ির ওপর হাত বুলুতে বুলুতে বললো নীলু

'মানে,'

দীপুর সেই বিখ্যাত নীরব হাসি। বাসে উঠে যখন কণ্ডাকটারকে দুজনের পয়সা দিয়ে টিকিট নিল, তখন কেমন একটা অধিকার বোধ জাগলো নীলুর, আশ্চর্য। যেন দীপা নীলুরই। নীলু দীপারই। 'জেনানা?'

এক মুহূর্তে দীপু কলকাতায় কেমন জেনানা হয়ে গেল। নীলুর জামাটার একটা টান দিয়ে দীপা বললো! তুমি কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত যাবে না'

কে যেন টান দিল। না শুধু জানালা। ওখানে আর দীপা নেই, থাকবে না—নীলু ফিরে চলে। আর এখানে ভাল লাগছে না, এক মুহূর্তও না। দীপু এখন গৌহাটির পথে, গৌহাটিতে ওর বর কাজ করে, বিমল বলছিল। গৌহাটি কেমন জায়গা? কেমন দীপাদের বাড়ি ঘর? সেখানে নাকি খুব বৃষ্টি হয়। তুমুল বৃষ্টি যখন, জানালার কাছে

দুপুর বেলা সব কাজ শেষ করে এসে দীপু যদি দাঁড়ায় যদি হঠাৎ বৃষ্টির ছাটে ভিজে যায় ওর চোখ মুখ, যদি হঠাৎ ওর বুকের ভিতর থেকে অদ্ভুত অচেনা একটা দুঃখ বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত

'নীলু, নীলু···কেমন আছিস!' গাছগাছালির মাথার ওপর ঝরে যেতে থাকবে বৃষ্টি, অঝোর বৃষ্টি।

* * * *

সন্ধে হয় নি তখনো। সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই চমকে ওঠে নীলু

'মা, মা'

অত উঁচু রোয়াক থেকে একেবারে উঠোনের মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছেন। কেটে গেছে কপালের কাছটা। সান্যালদের বাড়ি থেকে ছুটে এল দু একজন, 'বুকের ব্যাথাটা বেড়েছিল বোধহয়। আজকাল তো রোজই ব্যথা ওঠে রাঙাবৌঠানের।

'জল দাও, চোখে মুখে। রণজিৎ ডাক্তারকে ডাকাও—তার আগে কবরেজ মশাই নাড়িটা দেখুক···'

হৈ চৈ বাড়ে, সামাজিকতা ভদ্রতা। পুলু ফুটবল খেলে ফিরেছে। ঐ অবস্থা দেখে কেঁদে উঠলো হাউ হাউ করে। নীলু পুলুর মাথায় হাত রাখলো—অনেক বড় হয়ে গেছে সে। মাকে পাঁজাকোলে তুললো দাওয়ায়। হাতপাখা নিয়ে মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো। নমী কবরেজ খড়ম চটাস করতে করতে এসে হাজির, হাতে পাশার ছক। 'শুনলুম যে দুলুর মা···কৈ···আচ্ছা দেখি দেখি?' নাড়ি দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। 'একটু মকরধ্বজ দিচ্ছি—গঙ্গাজল দিয়ে খাইয়ে দাও হে। তারা, মা, ব্রহ্মময়ী···'খড়ম চটাস করতে করতে নমী কবরেজ পাশা খেলতে চললেন ভবহরি ভটচাজ্যির চণ্ডিমণ্ডপ কাম টোলে। নীলু কাঁদলো না, মাথা ঠাণ্ডা করে মায়ের সেবা করতে লাগলো—সান্যালবাড়ির মালতী এসে বলল। 'দাও না পাখাটা, আমি হাওয়া করি। এ সব কি পুরুষ মানুষের কাজ!' 'তাই দাও। তুমি বরং মকরধ্বজটা নিয়ে এসো কবরেজের বাড়ি গিয়ে।' পাড়াতুতো ঠানদির উপদেশ। নীলু মালতীর হাতে পাখা দিল। মালতী অস্ফুট স্বরে বলল: 'দীপা থাকলে কি তোমার ভাবতে হতো!'

নীলু পুলুকে বলল: 'ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আয় আমি আছি এখানে। কাঁদিস না বোকা। মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন মা।'

'কথা বলছে না কেন?'

'বলবে, তুই যা।' পুলু বাজার পাড়ায় ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেল। নরহরি বাড়ুয্যে এতক্ষণে এসে হাজির হন। ওদের সংসারের অভিভাবক। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই ঐ ভদ্রলোক যেন কিভাবে বিষয় আসয় তদারকির ভার নিয়ে নেন। বাবার বন্ধু, কিরকম একটা আত্মীয়তাও সত্তায় পাওয়া যাবে। 'কাকাবাবু, আসুন?'

'বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয় বাবা, তুমি তো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ' নীলু নিরুত্তর। 'চিকিৎসা পত্তর তো করতে হবে—তাছাড়া ধরো···না, না আমি সে সব ভাবছি নে—টাকা পয়সা তো চাই, নাকি?''

খুবই নিষ্ঠুর সত্য। নীলু এই কথাটা এতক্ষণ ধরে ভাবছিল। নরুবাবু মাথায় হাত দিয়ে বলেন বুঝি হে, আমি সবই বুঝি। তা এক কাজ করো না, তোমাদের সেই জমিটা, মানে ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার পাশে ঐ খেলার মাঠের পশ্চিম দিকে, ওটা তো প্রায় বেদখল হয়েই আছে, দেবে নাকি ছেড়ে। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। মাসে বৌঠান তো এখনও, বেঁচে আছেন, তা হলে একটা টিপ নিয়ে নেব, তুমি একটা সাক্ষী হবে, ওতেই হবে। বুঝলে না, এ সময় হাজারখানিক টাকা হাতে থাকলে মনে কত জোর হয়। তোমার মনের যা অবস্থা, তাতে···তবে····' নীলু মাথা তুলে বলল: 'ঐটাই আমাদের শেষ জমি, না কাকাবাবু!' গলার স্বরে কি ছিল, নরুবাবু আমতা আমতা করে বলেন:

মানে, তা ঠিক নয়। তবে তোমরা তো কিছুই বাড়াওনি, খরচাই করে এসেছো। আর আজ কাল যা দিনকাল পড়েছে···তা শেষ অব্দি হবে কেন বাবা, ঐ বন্ধক টন্ধকের মত আছে আর কি খুব নিকট জনের মধ্যেই বেশ কয়েক বিঘে, সময় মত টাকা শুধলেই জমি ফিরে আসবে।' বলতেই বললে···'তবে যে, লোকে বলে আমাদের সবজমি বেনামীতে আপনি কিনে নিয়েছেন— দলিল পত্তর যেহাত করেছেন অনেক ···

'ছি ছি ছি। এই সন্ধ্যেবেলা বামুনের ছেলে হয়ে এ তুমি কি বল্লে বাবা নীলকমল। এই জন্যেই হরিদা মারা যাবার পর তুতের বেগার দিয়ে আসছি তোমাদের সংসারের পিছনে। জমি জিরেত কি বাবা কৌটোয় করে কেউ রেখে দিতে পারে। কোর্ট কাছারি, রায়ত প্রজা খাজনা···এসব কে করেছে। বৌঠান আমার হাতে সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ছিলেন, আর তুমি এমন কথা বললে আজ। ঠিক আছে। সংসারে ভালো করতে নেই কারুর। বারো ভূতে তো লুটে খেত এ শর্মা না থাকলে।'

'আপনি রাগ করবেন না কাকাবাবু, এ সময়ে। মা ভালো হয়ে উঠুন, তখন দেখা যাবে।'

'না বাপু, সব বুঝে নাও তোমরা। পরে লোকে আমাকে দুষবে।'

মালতী ডাকে: নীলুদা, এসো তো।

নীলু ছুটে যায়। সুধাময়ী কাঁপা কাঁপা হাতে কাকে খুঁজছেন। নীলু মাথার কাছে গিয়ে বসে: এই যে আমি।

সুধাময়ীর দুচোখ গড়িয়ে জল পড়ে। মালতী উঠে সন্ধ্যা দিতে যায়;

অদ্ভুত ছমছমে মন খারাপ করা অন্ধকার চারদিকে। দেশলাইটা কোথায়? কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে?

'মা, মাগো!' ডুকরে ওঠে নীলু

মালতীর আর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা হয় না।

বাঁশবাগানের ভিতর থেকে এক রাশ নীল জোনাকি আকন্দ ডাট কচুর ঝোপের ভিতর চিরাচরিত প্রথায় খেলা করতে থাকে। আর চোখের পাতায় জমে ওঠা কৈশোরের নরম আবরণ ভেঙে দুঃসহ দুঃখের ভিতর নীলকমলকে কে যেন যৌবনের সিঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে যায়। তার নাম কি শোক? না অভিজ্ঞতা?

(ক্রমশঃ

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

# জাপানের দিনগুলি

## বারীন বর্দ্ধন

লাইন বলছি কারণ রাস্তা ধীরে ধীরে সরু হয়ে এসেছে। একের পিছনে এক না চললে ধাক্কা লেগে যে কেউই অতলে তলিয়ে যেতে পারে। তাই বার বার জাপানী ভদ্রলোক দুজন বলে যাচ্ছিলেন—ইচি রেৎসুনি নারান্দে কুদাসাই বা এক লাইনে সব চলুন।

কি কর্তব্যনিষ্ঠ এই গাইড দুজন। আমরা তবু হাসিঠাট্টা করে চলেছি যাতে ক্লান্তি বা একঘেয়েমি এসে বিপদ না ঘটায়। গাইড্ দু'জন রয়েছে লাইনের দু'ধারে। পিঠে বিরাট বোঝা নিয়ে প্রথম থেকেই তারা চলছে। আর প্রখর দৃষ্টি রাখছে অর্বাচীনদের দিকে। কথা বলার কেউ নেই পাশে। না থাচ্ছে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য সিগারেট বা ঐ জাতীয় কিছু। আমরা তবু রসিকতা করে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু নির্বাক এই গাইড দুজন চলছে দৃঢ় পায়ে।

প্রায় তের হাজার ফিট্ উঁচু ফুজিসান্ মৃত আগ্নেয়গিরি। সারা জাপানে আবার ফুজিসানই সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। তাই আমাদের মত পর্বতারোহণে অনভিজ্ঞ ভারতবাসীর কাছে ফুজিবিজয়ে একটা আনন্দ ছিল। নিজের দেশে ছোট্ট একটা টিলাও এত আনন্দ নিয়ে বেয়ে উঠিনি। আনন্দের অভিব্যক্তি হয় কতদিকে। স্পোর্ট জিনিষটা আছে শুধু জীবনীশক্তি বিকাশের জন্য। হৈ হুল্লোড় বা ঐ জাতীয় উচ্ছ্বাস আমরা বিচার করি চিরাচরিত চল্লিশী মন দিয়ে। যার পাল্লায় পড়ে ছিপ্ নিয়ে পাশের পুকুরে মাছ ধরতে যাওয়া বারণ। অশ্লেষা, মঘা নক্ষত্রে দু'মাইল ঘুরে যেতেও কতবার ভাবতে হয়। পাহাড় বেয়ে উঠা বা চওড়া নদীতে নৌকো করে ঘুরে বেড়ান—শুনলে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। সেই পরিবেশ কাটিয়ে একেবারে 'মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার।' ফুজিসান্ বেয়ে উঠা। আনন্দ, উচ্ছ্বাস, অজানা বিপদের আলিঙ্গন—সব মিলে বয়সটাকে যে কোথায় ঠেলে দিল খুঁজেও পেলাম না।

লাঠি এবার ওয়ার্কিং স্টিকের ভঙ্গীতে সবাই ধরেছে। এতক্ষণ পাহাড়ে চলতে দু'পাই যথেষ্ট মনে হচ্ছিল। কিন্তু পিঠের বোঝা শুদ্ধ উর্দ্ধদেহের ভার ক্রমাগতই পদযুগলকে নিস্তেজ করে দিচ্ছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে তাই সবাই এগোতে লাগলাম। টুং, টুং, টুং। ঘুঙুর বাজছে। ত্রিশটি লাঠি থেকে ত্রিশটি ঘুঙুর তালে তালে কথক নাচের চঙেই বাজছে। কিন্তু সেদিকে আর ভাববার সময় ছিল না। রাস্তা এত সরু হয়ে এসেছে যে দু'পায়ের ক্ষীণতম বিস্তৃতিতেও দু'বার ঠেকে যাচ্ছে। ক্লান্তি, জড়তা সব এসে শরীরকে করে দিয়েছে ভারসাম্যতার হাত থেকে মুক্ত। নিজেই জানি না পা দু'টো কোথায় ফেলছি টেরও পাইনি। সবাই চলেছি মাথা নুইয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে। মাথা উঁচু করে সামনে কি আছে না আছে সেদিকে নজর দেওয়ার ফুরসৎই হয়নি এতক্ষণ। মাথা তুলে হঠাৎ দেখলাম ফুজিসানের রং গিয়েছে পালটে। সারা গা ছড়িয়ে আছে

ধূসর গেরুয়া রংএর পাথরের টুকরো। দু'শ বছর লাভার ধারা শুকিয়ে পাথর হয়ে রয়েছে। কোথাও গাছগাছরার চিহ্ন মাত্র নেই। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের সঙ্গে কবিরা হিমালয়ের তুলনা করেছেন বহুবার। আমি কবি নই। তবুও তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে প্রথমে ঐ উপমাটাই মনে এল।

ক্রমেই এমন অবস্থা হয়ে উঠছে যে আশে পাশে বা উপরের দিকে তাকান মানেই মাথা ঘুরে অধঃপতন। ক্লান্তি শ্রান্তি এবং ঐ জাতীয় শব্দগুলো যেন ষড়যন্ত্র করেই আমার দেহে ঘাঁটি নিয়েছে আর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে করে দিচ্ছে অবশ। শরীরের সর্বাঙ্গই যখন অসহযোগ আন্দোলনে মত্ত —না শরীরের ভার রাখতে নারাজ, শরীর মস্তকের ক্ষীণতম আন্দোলনেও পতনোন্মুখ আর সর্বোপরি সবাই মিলে যখন দাবী জানাচ্ছে বিশ্রামের, তখন সব মিলিয়ে যে আমি, সেই আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম বিশ্বাসের চাহিদা মেটাতে। সামনেই ছিল এস্তোরাদা—ইয়া জোয়ান কলম্বিয়ার এক ছেলে। জাপানে নানা কাজের ফাঁকে 'সুমো' ঢংএর কুস্তি শিখছে। নাক দিয়ে যে হাওয়া যাচ্ছিল দেহের অভ্যন্তরে তা ছিল একেবারেই অপ্রচুর। তাই নাক এবং মুখ—দু'ইই ব্যবহার করছিলাম এই কাজে। আমাকে ঐ ভাবে শ্বাস নিতে দেখে সুমোবীর এস্তোরাদা উপদেশের সুরেই বলল – ঐ রকম হা করে শ্বাস নিলে যে গলা শুকিয়ে উঠবে। তাই শুধু নাক দিয়ে শ্বাস নেবার চেষ্টা করুন।

—ধন্যবাদ। কিন্তু একটা বন্ধ করা তো দূরের কথা। দুটোতেও যে কুলোচ্ছে না। বলে কতক্ষণ সুমোবীরের কথা মেনে চলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হল না কিছুই। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠা মানেই এখন হয়ে পড়েছে 'সিঁড়ি ভাঙার' অঙ্কের মত। তবে অঙ্ক কষতে গিয়ে মাথাতেই শুধু ক্লান্তি আসত। ছাত্রজীবনে বলতাম 'সিঁড়ি ভাঙার' অঙ্ক মানেই মাথা ভাঙার প্রথম সিঁড়ি। কিন্তু এ সিঁড়ি তা নয়। প্রতি পদে যদি চলে আসে আট দশ ইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে অগণিত পাথরের সার তবে কোন গণিতজ্ঞ সে সিঁড়ি অতিক্রমে যত্নবান হবেন?

কে যেন আমাদের মত অর্বাচীনদের জন্য ঐ করে পাথর দিয়ে বেমালুম ইঞ্জিনিয়ারের ভঙ্গীতে সিঁড়ি তৈরী করে রেখেছে। পিঠে বোঁচকা বেঁধে আর হাতে লাঠি নিয়ে চলেছি আমরা ত্রিশ জন মহাপ্রস্থানের পথে। কারুর মুখে আর শব্দ নেই। কোথায় চলে গিয়েছে হাসিঠাট্টা আর স্ফূর্তির আঁক। পাহাড়ের নগ্ন গায়ে ধাক্কা খেয়ে হাওয়া শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাড়ছে আর ক্ষণে ক্ষণে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ উড়ে এসে সারা গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। দেহমনের যখন এই অবস্থা তখন দেখলাম চার নম্বর কুটীরের দরজায় আমরা পৌঁছেছি।

একটু প্রশস্ত সমতল দেখে পাহাড়ের গায়ে করগেট্ টিনে তৈরী হয়েছে এই কুটার। ফুজি অভিযাত্রীদের পক্ষে একদিনে পাহাড়ে উঠা এবং সে দিনই নীচে নেমে আসা একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া, গরমের এই সময়টিতে বৃষ্টি এবং বরফ পালা করে যাত্রীদের উত্যক্ত করে। সেজন্যই তৈরী হয়েছে এই কুটার। রাত কাটানো এবং ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে এই কুটারগুলিই একমাত্র সম্বল। কুটারের আঙ্গিনায় যাত্রীদের জন্য রয়েছে সব কাঠের বেঞ্চ। পুরোপুরি কাঠও নয়। গাছের অক্ষত গুড়ি সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেঞ্চের মত করে। ঐ সমতলে পৌঁছুতে অন্তত আর বিশটা সিঁড়ি ভাঙতে হবে। বসবার জায়গা দেখে ঐ বিশটা সিঁড়ি অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুতগতিতে পার হয়ে হাত পা ছেড়ে বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই আপাদমস্তক অরাজস্তের মত অচল হয়ে পড়ল। তখন প্রায় বেলা পাঁচটা। ছ'টার মধ্যে আট নম্বর কুটীরে পৌঁছুতে না পারলে চারিদিক ঘিরে উঠবে অন্ধকার। পাহাড়ে থাকা তখন বিপজ্জনক।

বসেছি কি না বসেছি। জাপানী দু'জন চেঁচিয়ে বলে উঠল—ৎসুজুইতে কুদাসাই। অর্থাৎ হাঁটা বন্ধ করবেন না। এগিয়ে চলুন।

এবং শুধু যে বলেই ক্ষান্ত হল তা নয়। আমরা কয়েকজন তখনও বসে আছি দেখে নিজেরাই এগিয়ে এল ধরে তুলবার জন্ত। এস্তোরাদা এবং আরও কয়েকজন সুযো যোদ্ধা আরও এগিয়ে পড়েছে। কাজেই কাগামীসান্ কারুর জন্ত অপেক্ষা না করে পুরোভাগে এগিয়ে গেল পথ প্রদর্শক হিসেবে। আর রেখে গেল কাশীওয়াগীসানকে আমাদের মত অনভিজ্ঞদের জন্ত। আমাদের কয়েকজনের জন্ত পুরো যাত্রাটাই পিছিয়ে যাবে। ভাবতেই কেমন মনে হল। উঠে কাশীওয়াগীসানের কাছে প্রথম দফাতেই দিয়ে দিলাম পিঠের বোঝা। শুধু রইল ক্যামেরা আর লাঠি। গাইড্ দুজন বারবারই বলেছে বোঝাটা পাচার করে দিতে। কিন্তু ক্লান্তির চেয়ে পৌরুষই তখন বিপক্ষে থাকায় বোঝাটা পার করে দিতে মন উঠেনি। এবার আর সারা মনপ্রাণ খুঁজে পৌরুষের পাত্তা পেলাম না কোথাও। কাজেই চলার সুরুতেই কাশীওয়াগীসানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম স্যাপস্যাক। অবশ্য আমি বোঝা চাপাবার আগেই কাশীওয়াগীসানের পিঠের বোঝা কাঁধ এবং মাথা ছাড়িয়ে উঠে গিয়েছে। তবু তার চলার ভঙ্গীতে এতটুকু তারতম্য দেখলাম না।

অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছিলাম বোঝা দেওয়া নেওয়া করতে গিয়ে। তাই আমাদের কয়জনকে উৎসাহ দেবার জন্ত গাইড দু'জনে গান ধরল। গানের পদ বলে কিছুই নেই। শুধু আছে তালে তালে কথা আর একটানা সুর। গানের পদও বোধহয় চলতে গিয়েই তৈরী হয়েছিল। তা না হলে আমাদের হোস্টেলের নাম গানের পদে স্থান পেল কি করে। পদটা কয়টা ছিল এই রকমের—

কাগামী তো কাশীওয়াগী,
শিনজুকু নো কাশীওয়াগী,
কোকুসাই পাকু-ইউকাই
ৎসুজুইতে কুদাসাই—হাই, হাই, হাই।

গানটি তর্জমা করলে দাঁড়ায় এই রকম—প্রথম পদে আছে গাইড দু'জনের নাম। দ্বিতীয় পদে ছাত্রাবাসের ঠিকানা। তৃতীয় পদে ছাত্রাবাসের নাম এবং চতুর্থ পদে এগিয়ে যাবার অনুরোধ। পরের তিন শব্দের অর্থ হল হাঁ, হাঁ হাঁ। এবং সে হল আমাদের হয়ে জবাব। আমরা নিশ্চিতই এগিয়ে যাব। সামনে পিছনে কাগামীসান এবং কাশীওয়াগীসান। চেঁচিয়ে দু'জনে গলা ফাটিয়ে দিচ্ছে। গানের একপদ যদি একজন গাইছে অমনি তার জবাবে হয়ত দশ পনর ফিট নীচ থেকে দ্বিতীয় জন পরের পদটি গেয়ে উঠছে। চক্রবাক চক্রবাকীর মতই দু'জন তালে তালে গান গেয়ে যাচ্ছে সমস্ত ক্লান্তি উপেক্ষা করে।

সন্ধ্যা হবার সাথে সাথেই ঠাণ্ডা বরফ মেশান হাওয়া সোজাসুজি এসে ধাক্কা দিতে লাগল। অন্তদিকে পাহাড় থাকায় রক্ষা। তা নইলে হাওয়া রুখতে গিয়েই হয়ত গড়িয়ে পড়তাম। রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে এঁকে বেঁকে উঠে গিয়েছে। শেষ নজরে পড়ছে না। এক একবার সমস্ত বিশ্বাস ছাপিয়ে এই ভাবনাই পেয়ে বসছে যে কেন এলাম 'আদার ব্যাপারী' সমতলের লোক পাহাড়ের খোঁজ নিতে। কি হত। ফুজিসানকে তো রোজই হাত্রাবাসের ঘর থেকে দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে এল জাপানের সেই পুরোনো চলতি কথাটি—ফুজিসান বিজয়ে যে দু'বার যায় সে নেহাৎই বোকা।

যতই নিজের উপর ধিক্কার আসুক না কেন তের হাজার ফিট্ পাহাড় ভাঙতে গিয়ে সাড়ে সাত হাজার ফিট্ এসে চলা বন্ধ করার কোন উপায়ই নেই। এগিয়ে চলেছি ঠিকই। কিন্তু শরীরের সহনশক্তি বোধ হয় প্রতিবাদ জানিয়ে জানিয়ে বিবশ হয়ে গিয়েছে। নিজের উপর কোন আস্থা না রেখেই ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। অনেকেই

এগিয়ে গিয়েছে। পিছনে আমরা কয়েকজন আর কাশীওয়াগীসান। রাস্তা বেঁকে গিয়েছে। যে দিকে খাদ সে দিকে দেওয়া লোহার জাল। জাল কথাটা হয়ত এর আসল পরিচয় প্রকাশ করে না। কারণ জালের ফাঁক দিয়ে আমাদের যে কেউ অনায়াসে গলিয়ে যেতে পারে। প্রতি বাঁকের মুখে এসেই মনে হচ্ছে বাঁক ঘুরলে নিশ্চয়ই পাব অন্তত কয়েক গজ সমতল ভূমি যার উপর পা ফেলে শরীরের তোয়াজ করে নেব। কিন্তু কোথায় কি? আগুনের পাহাড়ে চড়াই বা উৎরাই ছাড়া মাঝামাঝি কোন কথা নেই। নিস্তেজ দেহকে এই করে টেনে নিয়ে পৌঁছুলাম ছ' নম্বর চটিতে। আগের দিন যে সমস্ত অভিযাত্রীর দল উঠে এসেছে তারাই আবার এই পথে নেমে আসছিল।

আর কতদূর?—জিজ্ঞেস করতেই বলল এই আধ ঘণ্টা।

কথাটা যে ঠিক নয় তা আমিও জানি ওরাও জানে। তবু হাসি টেনে বলছে—আতো হানুজিকোন্—আরও আধঘণ্টা।

বললে উৎসাহ দিতে গিয়ে আর নীচে নামতে নামতে আবার জানিয়ে যাচ্ছে তাদের শুভেচ্ছা। কিছু কাণে ঢুকছে আর বেশীর ভাগই হাওয়া উড়িয়ে নিচ্ছে। বিপদের উপর বিপদ। সবাইকে বিব্রত করতে এবার প্রকৃতি দেবী নিজেই হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে এলেন। সুরু হল কণকণে হাওয়া আর সেই সঙ্গে ততোধিক ঠাণ্ডা বৃষ্টির ধারা। ইন্দোনেশীয় একজন আবার সঙ্গে নিয়েছিল চার আনা দামের একটা ক্ষুদে থার্মোমিটার।

সবাইকে তটস্থ করার জন্যই বলে উঠল—এখানকার টেম্পারেচার শূন্যেরও নীচে।

দেশে এই কথা শুনলে টেম্পারেচারের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত চলাচলও ফ্রিজিং পয়েন্টে চলে যেত। কিন্তু ঐ রকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড় ভেঙে ভেঙে শরীর হয়ে উঠেছে কামারশালা। বাইরে যদিও ফ্রিজিং পয়েন্ট, যদিও চলছে হাওয়া আর বৃষ্টির মাতামাতি, ভিতরে কোনই পরিবর্তন টের পেলাম না। এবার মুসলধারে বৃষ্টি সুরু হল। পাহাড় চলা হয়ে উঠল বিপজ্জনক। কোন রকমে সাত নম্বর চটিতে এসে পৌঁছুলাম। জলের বোতল অনেক আগেই খালি হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এর ওর কাছ থেকে জল ধার করছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু মেজার গ্লাসের মত গ্লাসে হিসেব করে জল খেয়ে ঐ পিপাসা মেটান সাধ্যাতীত। তাই সাত নম্বর চটিতে প্রথমেই খোঁজ করলাম পানীয় জল। চটিওয়ালা এক গ্লাস জলের যা দাম চাইল ভেবে দেখলাম জল আর অরেঞ্জ স্কোয়াশের কোনই তফাৎ নেই। অগত্যা পর পর দু'বোতল অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেয়ে ফেললাম।

গাইড্ দু'জন এবং জাপানী ভদ্রলোকেরা আগে থেকেই বোধহয় সাত নম্বর চটিতে বিশ্রামের সময়টা বাড়িয়ে দিয়েছিল। শেওলা ধরা এবরো-খেবরো বেঞ্চিতেই হাতের উপর মাথা রেখে অনেকেই আমরা শুয়ে পড়লাম। আমেজের স্বাদ পেয়ে শরীরও এবার বিগড়ে গেল। যতই 'নরান্দে কুদাসাই' আর 'ওসুজুইতে কুদাসাই' শুনছি ততই শরীর আরও হাল ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ আরামের স্থায়িত্ব স্বল্পকাল। উঠতেই হবে। জাপানী ভদ্রলোকটি আর কাশীওয়াগীসান দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল আমার মত চলৎশক্তিহীন অভিযাত্রীদের জন্য। ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছে তাড়া। চলার কথা জিজ্ঞাসা করতেই বলছে ঐ যে দূরে ঠিক মাথার উপরে। ছোট্ট কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে ঐ-টিই আটনম্বর চটি। এবং আজ রাত কাটাবার ব্যবস্থা ঐ খানেই করা হয়েছে।

কিন্তু এদের কথায় এখন আর তেমন বিশ্বাস হচ্ছে না। বহুবার বলেছে আর মাত্র আধঘণ্টা। তার পরও চলে গিয়েছে একঘণ্টারও বেশী। এখন আবার দেখাচ্ছে দূরের কুটীর। কিন্তু করবার কিছুই ছিল না। সতৃষ্ণ নয়নে শেওলা

ঢাকা গাছের গুড়ির দিকে চাইতে চাইতে আবার পাহাড়ের অসমতল পথে পা বাড়ালাম।

দলের পর দল নেমে যাচ্ছে অভিযানের শেষে। তেমনি আবার আমাদের পথে উঠে আসছে অগণিত নরনারীর দল। দূর থেকে কেউ দেখলে ভাববে দলে দলে পিঁপড়ের ঝাঁক উঠে আসছে।

একমাত্র হাজার তিনেক ফিট বাদ দিলে ফুজিসানের গায়ে শ্যামল কোন আবরণই নেই। শুধু ছড়ান রয়েছে শক্ত ছোট ছোট পাথরের টুকরো যা একদিন ছিল গলিত-লাভা। ধ্বংসলীলার কিছুই এখন আর নজরে পড়বে না। তবে মনে করিয়ে দেয় দু'শ বছর আগেকার শেষ তাণ্ডব-লীলা।

বহুক্ষণ আমরা 'স্নো লাইন' পেরিয়ে এসেছি। তাই আশেপাশে বৃষ্টির জল জমে শক্ত বরফ হয়ে গিয়েছে। চরম সূর্য্যতেজেও গলবে না কোনদিন। প্রথমটায় সাদা ঐরকম আস্তরণ পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুলে রয়েছে দেখে অনেকটা অবাকই হয়েছিলাম। জাপানী একজন বুঝিয়ে বলল—এ হল বরফের চাই। মাটি আঁকড়ে চুপটি করে বসে আছে। আরও শীতে যখন ভার হয়ে উঠবে চতুর্গুণ তখন নিজের ভারেই সব কিছু নিয়ে চলতে সুরু করবে নীচে, মাধ্যাকর্ষণের টানে। সামনে যা কিছু পড়বে সব চূর্ণ বিচূর্ণ করে এই বরফের চাই আপনার পথ তৈরী করে নেবে।

(ক্রমশঃ)


## খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

| | |
|---|---|
| শ্রীগীতা | ৭·৫০ |
| শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম | ৭·০০ |
| ভারত-আত্মার বাণী | ৫·০০ |
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১·৫০ |
| কর্মবাণী | ১·২৫ |
| Soul of India Speaks | 5·00 |

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসাগর | ২·২৫ |
| মানুষের মত মানুষ | ·৭৫ |
| শিশু রামায়ণ | ·৬২ |
| শিশু মহাভারত | ·৭৫ |

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

| | |
|---|---|
| বাংলার ঋষি | ৩·০০ |
| বাংলার মনীষী | ১·৩০ |
| বাংলার বিদুষী | ২·০০ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১·৫০ |
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২·০০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ৪·০০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১·৫০ |
| রবীন্দ্রনাথ | ১·২৫ |
| যুগাচার্য বিবেকানন্দ | ১·৫০ |
| আচার্য জগদীশচন্দ্র | ২·৫০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১·৫০ |

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

# In any language, it's sweet

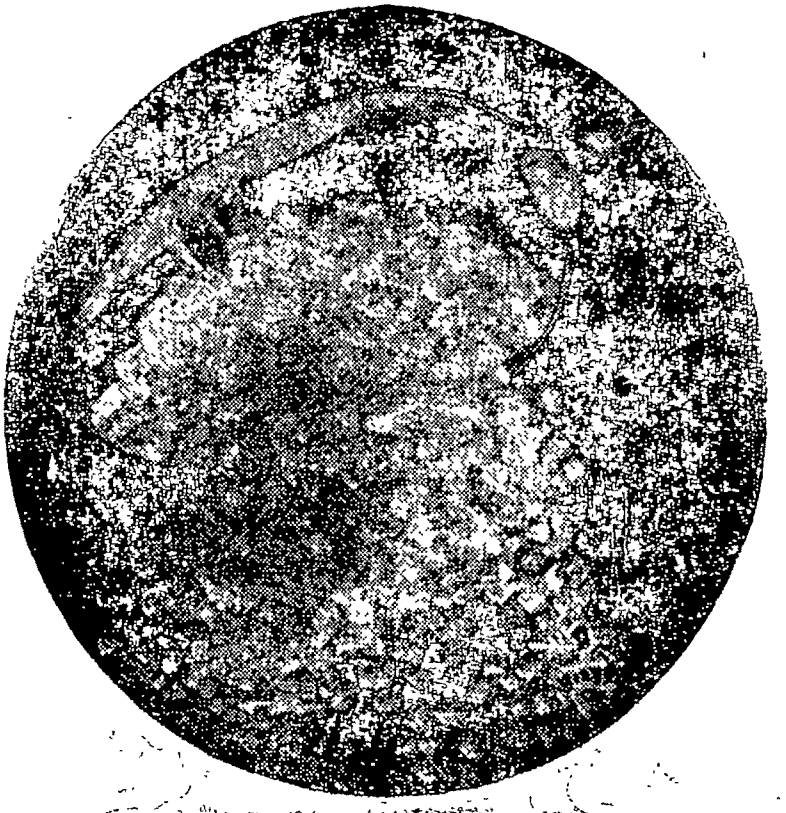

In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek.

One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

*Issued by :*

**UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.**

*Managing Agents :*

**BIRLA BOMBAY PVT. LTD.**

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

পূর্বপ্রকাশিতের পর

# জাতীয়তার রূপায়ন

দীপঙ্কর

সে-পথ গোপন পথ। এ-পথের পথিক হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ পা থাকিলেই চলৎশক্তি থাকে না, মনের অগ্রগতির প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রশ্ন উত্থিত হয়, কাহারা সে-পথের পথিক? উত্তরে বলা যায়, ধর্মে যাহাদের মন কিছু পরিমাণে আকৃষ্ট ছিল তাহাদের মধ্য হইতেই অনেকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঠিক এ-স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যখন প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কথা কল্পনা ও চিন্তা ভাবনা করিয়াছিলেন তখন সারা ভারতের ভৌগলিক সীমা তাহাদের চিন্তারাজ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল, 'এক ধর্মরাজ্য পাশে ছিন্নখণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'। প্রকৃত অর্থে ইহাকে সহজতর করিয়া সংক্ষেপে বলা যায়,—ভারতবর্ষে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্য হইতে এক মন, এক মত এবং এক পথের পথিক রূপে গঠিত একটি সুগঠিত, সুসংহত দল। ইহারা সমাজে থাকিয়াও লোক লোচনের অন্তরালে থাকিতেন। যে-জীবন মুক্তি-কামী সেই জীবনের চিন্তায় তাহারা ছিলেন স্বল্পবাক,—ধ্যানী। তাহাদের আরাধ্যা ছিলেন শক্তিদায়িনী মা। গভীর অরণ্যে অথবা নির্জন-ভগ্ন-চূর্ণ পোড়ো বাড়ীতে তাহারা মিলিত হইতেন। এক হাতে আগ্নেয় অস্ত্র, অন্যহাতে গীতা। শিক্ষানবীশ অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, গভীর অন্ধকারময় অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে পথ চলার অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে হইত। রাত্রের পর রাত অতিবাহিত করিত শ্মশান ভূমির ভীতিপূর্ণ স্থানে। স্থল পথের কথা ছাড়িয়া দিয়া নদীমাতৃক বাংলার উত্তাল তরঙ্গ সংকুল, ভয়ঙ্কর প্রশস্ত নদী সন্তরণ করিয়া অতিক্রম করিতে হইত। অজানা, অজ্ঞাত পথকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্যপথ রূপে নির্দিষ্ট করিয়া অগ্রসর হওয়াই ছিল এই বিপ্লবী দলের প্রাথমিক জীবনের মূল শিক্ষনীয় পাঠ। বিপ্লবীদের মুখে শোনা গিয়াছে তাহাদের বিপ্লবীদলের দীক্ষাগ্রহণের প্রথম পর্বের বর্ণনা। মানুষের চোখের অন্তরালে এক নির্জন স্থান। সম্মুখে উচ্চ বেদীতে অবস্থিত শক্তিরূপিনী মায়ের মূর্ত্তি। দীপের আলোতে মায়ের ভাস্বর মুখ আর দক্ষিণ হাতে বরাভয়। গীতা, চণ্ডী আর আগ্নেয় অস্ত্রের নৈবেদ্য সজ্জিত থাকিত মায়ের পদতলে। সে-পূজায় ফুল আর বিল্বপত্রের প্রয়োজন হইত না। দীক্ষিত যিনি হইতেন, তিনিই দিতেন ফুল,—কানন হইতে সঞ্চয়ন করা কুসুম নহে,—উহা তাহার জীবন কাননে প্রস্ফুটিত শ্রেষ্ঠধন মন-ফুলটি। সুতরাং জীবন উৎসর্গ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ। মন্ত্র শুধু একটি, 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'। দীক্ষার মাধ্যমে মৃত্যু-বরণ। স্বাভাবিকই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে তাহাদের ভীত হইবার কিছুই থাকিত না। অস্বাভাবিক বিপদসংকুল পথের প্রতি তাহাদের অদম্য আকর্ষণ ছিল। ইংরাজের অপমান, পদে পদে তাহাদের বাধাদানের বিপদ, কথায় কথায় রাজরোষের সম্ভাব্য পরিণতি জেল, ফাঁসি—এসব হইতেই তাহারা নূতন নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিপ্লবের সুনির্দ্দিষ্ট

পথে চলিতে প্রয়াসী হইতেন। প্রমাণ করিয়াছেন, দেশের মুক্তি ও সমগ্রজাতির কল্যাণের জন্য জীবন দান করাই যেন তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আনন্দ ছিল। তাহারা ডাকিয়া বলিয়াছেন, জীবনদানে যে এমন অমৃতময় আস্বাদ এ-আস্বাদ তোমরাও গ্রহণ কর। এ-প্রসঙ্গে বিপ্লবের অগ্রপথিক সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই"। [ তরুণের স্বপ্ন : পৃঃ ৩০ ]

উপরোক্ত মন্তব্যে নেতাজীর সঙ্গে টলষ্টয়ের মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে টলষ্টয় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Resurrection-এ বলিয়াছেন, বিপ্লবীগণ চঞ্চল নহেন, সর্বদাই তাহাদের ভাব চিন্তামুক্ত দার্শনিকের মত, উত্তেজনাময় কর্মসম্পাদন করিতে তাহারা ইচ্ছুক এবং আইনের বেষ্টনীদ্বারা বাঁধাধরা পথে চলিতে সর্বদাই ইহারা প্রস্তুত নহে; যখন যেমন প্রয়োজন এবং প্রয়োজনই তাহাদের নিয়ম। কিন্তু তথাপি বিপ্লবী বলিলে বিশেষতঃ বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে উচ্চধারণাই পোষণ করিতে হয় কারণ তাহাদের বিপ্লব জাতীয়তাবোধের সংগে প্রগাঢ় মানবতাবোধে সমৃদ্ধ ছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, বাংলার বিপ্লব-পথ এক পবিত্র সাধন পথেরই নামান্তর। ইহা দেশাত্মবোধের সুসংহত ভাবের একটি রূপান্তরিত নূতন ধারা।

কিন্তু এতদ্দেশীয় পরিভাষায় এই বিপ্লবকে যতই, পূত, পবিত্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া হউক না কেন, শাসক সম্প্রদায়ের চোখে তাহা বিষ-নজরেই ছিল। যাহাকে বলে under-ground অথবা আত্মগোপন করিয়া থাকার প্রণালী ইহাদের এমন সুষ্ঠু ছিল যে কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইত না। প্রত্যেকটী কর্মের সম্পাদনা এমন নির্দিষ্ট পথে সম্পাদিত হইত যে পূর্বাহ্নে কেহ-ই ঘুণাক্ষরে তাহার লেশমাত্র জানিতে পারিত না। অর্থাৎ তাহাদের ক্রিয়া-কর্ম, তাহাদের চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাইলে ইহাই বুঝিতে পারা যাইত যে শিক্ষা ও সাধনা ভিন্ন বিপ্লবীগণ তেমন শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে না। ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তির শিক্ষা এখন যে, গোপন কর্মধারার কথা তাহারা কোন সময়, কোন স্থানে কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, বিপ্লবী কে, কি তাহার পরিচয় এ-সম্বন্ধে জীবনের কোন মুহূর্তে, এমন কি মৃত্যু সময় সমুপস্থিত জানিয়াও নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া, লোকে তাহাকে বিপ্লবী বলিয়া জানুক সে-ইচ্ছার বশবর্তী হন নাই। সেখানে মৃত্যুর সময় তাহারা নিয়ম ভাঙ্গিয়া, অনিয়মের পথে চলিয়া বিপ্লবী। বিপ্লবী জানিয়া, তাহার যথোপযুক্ত সম্মানের জন্য, তাহার মৃত দেহের চির-শীতল নীরব-কণ্ঠে শেষবারের মত ফুলের মালা পরাইয়া, মুখ-মণ্ডল চন্দনে চর্চিত করিয়া, বিউগিলে করুণ, বিদায়ের সুর তুলিয়া শোক জ্ঞাপক মৌন-মিছিলে শব-যাত্রা—এমন 'Red thread of honour' তাহাদের কাম্য ছিল না; বরং কাম্য ছিল unwept, unhonoured এবং unsung অবস্থায় চির বিদায় লওয়া।

কিন্তু শাসকগণ বিপ্লবীদের মর্যাদার চোখে দেখিবে কেন? বিপ্লবী নামটি উচ্চারিত হওয়ার সংগে সংগে আমাদের অন্তরের অন্তস্থল হইতে উন্নত মস্তকও যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসে শাসককুলের হইয়াছিল তাহার বিপরীত মনোভাব। তাহারা বিপ্লবীদের পবিত্র মর্যাদার স্তর হইতে নামাইয়া Anarchist পর্যায়ে অর্থাৎ অরাজকপন্থী হিসাবে গণ্য করিল। অবশ্য তাহাদের শাসন-যন্ত্রের মাধ্যমে তাহারা যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা হইতে তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ইহাদের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা। এই বিপ্লবীদের সম্বন্ধে ইংরাজ রাজত্বের মুকুটমণি সম্রাট পঞ্চম জর্জ বলিয়াছিলেন, "who in their eagerness for political progress have broken the law."

[ বাংলায় বিপ্লববাদ : শ্রীনলিনীকিশোর গুহ পৃঃ ৭ ]

বিপ্লবীদের তখন একমাত্র লক্ষ্য, গতানুগতিক চলমান পথের পরিবর্তন করিয়া জাতীয়জীবনে শুভদিনের প্রতিষ্ঠা করা। যেমনটী প্রচলিত রহিয়াছে তেমনই চলিতে থাকিবে আর রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন হইবে ইহা কদাপি সম্ভব নয়। বিপ্লবীগণ অবশ্য মানবতার দাবী লইয়া ইহা কখনই আশা করিতে পারে নাই যে, ইংরাজগণ স্বেচ্ছায় তাহাদের অতুল সম্পদে সম্পদশালী ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইবে। সুতরাং রাষ্ট্রচালনার ক্ষমতা যাহাদের হাতে তাহাদের মনের স্বাভাবিক পরিবর্তন আশা করা যায় না। উহাদের গতি ফিরাইতে না পারিয়া বাংলার যুবকগণ বাধ্য হইয়াই নিজেদের জীবনের গতি পরিবর্তন করিয়া বিপ্লবের পথে জীবনের রথ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

পথ চলিতে অর্থের প্রয়োজন। অগ্নিমন্ত্রের পথিক বিপ্লবীদের পাথেয় আমাদের দেশের মাটী হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে,—উহা আমাদের গীতা, আমাদের মহাপুরুষদের বাণী এবং বিভিন্ন ঘটনাবলী-মন্থিত শিক্ষা। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষে ময়মনসিংহ জেলার অধীনে কিশোরগঞ্জে একটি পল্লী সমিতির সভায় অরবিন্দ ঘোষ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "Foreign rule can never be for the good of a Nation···Foreign rule is inorganic and therefore, tends to disintegrate the subjects' body politic by destroying its proper organs and Centres of life."

[ শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ: পৃঃ ২৮৩ ]

বৈদেশিক শাসন সম্বন্ধে ইহার অধিক পরিষ্কার করিয়া আর কি সমালোচনা করা যায়। কিশোরগঞ্জের জনসভার এই অভিমত, কথার সঠিক মূল্য দেশের মানুষের মনে মনে ছড়াইয়া পড়িল। শক্তি ব্যঞ্জক ও উদ্যমে উৎসাহী এমন কথা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতেও শোনা গিয়াছে। আদালতে দাঁড়াইয়া তিনি একবার বীরের মত বলিয়াছিলেন যে, যে-শাসন জাতীয় উন্নতির পক্ষে বাধা সৃষ্টিকারী তাহার নিকট কোন বিষয় কোনরূপ কৈফিয়ৎ প্রদানের ইচ্ছা তাহার নাই। এখানে পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত বীর বিপ্লবী মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেনের তেজ-বীর্যের ক্ষুদ্র একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে: সতীন্দ্রনাথ তখন মাদারীপুর জেলে বন্দীজীবন যাপন করিতেছেন। জিলা-পুলিশের প্রধান একদিন উপস্থিত হইল সে-জেলে। কোন কারণবশতঃ সতীন্দ্রনাথকে সেখানে ডাকা হইয়াছিল কিন্তু ব্যবস্থা এমন করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, সতীন্দ্রনাথের জন্য সেখানে বসিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ডাকিয়া আনিয়া সতীন্দ্রনাথকে সোজাপথে অপমান এবং তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করা ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। অপমানের জ্বালায় সতীন্দ্রনাথ স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন কিন্তু বাহ্যিক তাহার কোন প্রকাশ না করিয়া পুলিশ সাহেবের সম্মুখস্থ একটি টেবিলে বসিবার ভঙ্গিতে হাঁটু রাখিলেন, ভাবখানি হইল, অর্দ্ধেক দণ্ডায়মান অবস্থা এবং অর্দ্ধেক বসিয়া থাকা। সতীন্দ্রনাথ তেমন ভঙ্গীতে উপবেশন করিলে পুলিশসুপারের পদমর্যাদায় আঘাত লাগিল। সুপার বলিল, I shall kick you out.

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি! শুনিয়া ক্রোধান্বিত সিংহের গর্জন গর্জিয়া উঠিল সতীন্দ্রনাথের কণ্ঠে, I shall give you three kicks in return.

[ মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন : শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ২৪ ]

ঘটনাটী দ্বারা বিপ্লবীর মনোবল যে কত দৃঢ় তাহা উপলব্ধি করা যায়। অন্য এক বিপ্লবীর এমন দৃঢ়তার একটি উদাহর

এখানে উল্লিখিত করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী তখন রাজরোষে কারার অন্তরালবাসী। পুলিশ সুপার আসিলে পঞ্চানন চক্রবর্তী তাহাকে স্যালিউট জানাইলেন না। সাহেবের হিসাবে ইহা, এক পরাধীন কালা আদমীর তদুপরি জেল-বন্দীর চরম ঔদ্ধত্য। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি। পঞ্চানন চক্রবর্তীকে সজোরে অসংখ্য বেত্রাঘাত করিয়া পৃষ্ঠদেশে রক্ত বাহির করা হইয়াছিল। বেত্রাঘাত যখন বন্ধ হইল তখন তাহার সর্বাঙ্গে রক্তের ধারা। ব্যথাকে ব্যথা মনে না করিয়া, ঠোঁটের কোনে ঠাট্টার হাসি টানিয়া পঞ্চানন চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন, সাহেব! স্যালাম মিলা?

এমন দৃষ্টান্তে যুবকবৃন্দ উদ্দীপ্ত হয়, নূতন শক্তি ও সাহস তাহাদের মনে দানা বাঁধিয়া ওঠে। সেই শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনায় নিজেদেরই মনের অজ্ঞাতে বাংলার যুবকবৃন্দ বিপ্লবের পথে পা দিয়া অগ্নিযুগকে দাবানলে পরিণত করিয়া মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। এ-দাবানলের সাক্ষী সত্য সত্যই বাংলার বহু অরণ্য, অরণ্যের অন্তরস্থিত নির্জন বনভূমি! সেখানেই গোপন সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইত, পরামর্শ, আলোচনার পর স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত সেখানেই।—সাক্ষী বাংলার নির্জন স্থান, সযত্নে রক্ষিত বাগান, কত ভূতের বাড়ী নামে অভিহিত বটগাছের 'ব'-ওঠা পোড়ো বাড়ী! অথচ এমন গভীর গোপন পরামর্শের ফল প্রকাশিত হইত প্রকাশ্য দিবালোকে। তাহারা জানিতেন, রাজা মৃত কিন্তু রাজা দীর্ঘদিন জীবিত থাকে অর্থাৎ একজন ইংরাজ রাজপুরুষ চিরতরে অপসারিত হইলে নূতন একজন সেই শূন্যস্থানে অভিষিক্ত হইবেই। তথাপি বেদনাহত মায়ের ক্রন্দন, অপমানজনিত বুকের জ্বালা, মনের ক্রোধ সব মিশ্রিত হইয়া হত্যাদ্বারা প্রতিহিংসা লওয়ার পথই তাহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশ্য শুধু রাজপুরুষদেরই হত্যা করা হয় নাই, প্রয়োজনবোধে একজন বিপ্লবী অন্য একজন বিপ্লবীকেও হত্যা করিয়াছে এমন দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। তেমন দৃষ্টান্ত অনুষ্ঠিত হইত নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রেই অথবা কেহ দলীয় গোপনতার পরিপন্থী কোন কার্যে লিপ্ত থাকিলে তবেই। নিয়ম বলিতে বুঝাইত বিপ্লবীদের প্রতিজ্ঞা, যেমন কেহ, কখনও দলত্যাগ করিবে না। চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে সর্বদা পূত-পবিত্র রাখিতে হইবে। ইংরাজের অধীনতা হইতে দেশকে যতদিন পর্যন্ত স্বাধীন করিতে পারা না যাইবে ততদিন দলের কেহ গোপনে বা প্রকাশ্যে আরাম-বিলাসে লিপ্ত হইতে পারিবে না। দেশের জন্য ব্যক্তিগত সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। জীবনের কোন অবস্থাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না এবং সর্বোপরি লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করিয়া দলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কার্য করিয়া যাইতে হইবে।

ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত না করিয়াও বলা যায়, উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাগুলি বহু বিপ্লবীদের জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে। Sedition Committee-র Report হইতে জানিতে পারা যায়: In January 1917, a revolutionary was murdered by his comrades at Serajganj....on a charge of immorality.

[ বাংলার বিপ্লববাদ: শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, পৃঃ ৭৮ ]

সিরাজগঞ্জের এই ঘটনাটীর উল্লেখ করিবার একমাত্র কারণ, বিপ্লবীদের মন কি ধাতুতে গঠিত ছিল উহা বুঝাইবার জন্য,—'on a charge of immorality' সুতরাং দলীয় সভ্য বলিয়াও সে ক্ষমা পায় নাই,—চরম শাস্তি তাহাকে পাইতে হইয়াছিল। আর ইংরাজ রাজপুরুষ,—যাহারা মানুষ হইয়াও মানবতাবিরোধী কার্যে এদেশে লিপ্ত ছিল, শাসক হইয়া নিষ্ঠুর শোষক হইয়াছিল, তাহারা যে উহাদের হাতে চরম শাস্তি পাইবে ইহাতে বিচিত্র কি!

তখন ঢাকা জিলার জিলা শাসক ছিল মিঃ অ্যালেন। ১৯০৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর গোয়ালন্দ ষ্টীমার ষ্টেশনে তাহাকে গুলি করা হইয়াছিল। ইহার অনতিকাল পরেই

চন্দননগরের মেয়রের উপর বিপ্লবীদের বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেন বিপ্লবীগণ এ-পথ বাছিয়া নিয়াছিল? কারণস্বরূপ বলা যায়, উহাদের মন নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। জাতির অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যখন জাতির মুক্তির আর কোন পথ তাহাদের সম্মুখে অবারিত ছিল না তখনই তাহারা এ-পথের অনুগামী হয়। গুলি ও বোমা তখন তাহাদের মনের ভাব ও ভাষা প্রকাশের একমাত্র পথ হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহাদের মানসিক অবস্থা কবির ভাষায়:

"বক্ষে আজ জেগেছে মোর
জীবন দানের অভিলাষ।"

এ-প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের একখানি চিঠির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ওয়াশিংটন তাঁহার বাড়ীতে লিখিত একখানি চিঠির একস্থানে লিখিয়াছিলেন, I heard the bullets whistle and believe me, there is something charming in the sound" ইংরাজ রাজত্বের সময় আমাদের দেশের বিপ্লবীদের মুখে এবং ব্যবহারেও তাহারা যে বুলেটের শব্দের মধ্যে জীবনের অপূর্ব সংগীতমধুর সুর শুনিতে পাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণের জলন্ত দৃষ্টান্ত ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। বয়সে তাহারা তখনও যুবক নহে, বলা যায় দুইটি বালক। কিন্তু তেজ-বীর্যে যুবকের মনোবল তাহাদের হাতের মুঠির আয়ত্বে ছিল। তখন ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস। তারিখটা ছিল ৩০শে। মজফঃরপুরে জিলা শাসক মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করাই ছিল তাহাদের প্রতিজ্ঞা এবং লক্ষ্য। কিন্তু লক্ষ্যভেদ না হইয়া হইল লক্ষ্যভ্রিষ্ট। বোমার আঘাতে কিংসফোর্ড ধরাশায়ী হইল না ভুলবশতঃ নিহত হইল মিসেস কেনেডি ও তাহার কন্যা। ধৃত হইলে ফাঁসি নিশ্চিত, তাহার চাইতেও বড় কথা, ধৃত হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যাকেই প্রফুল্ল চাকী শ্রেয় পথরূপে বাছিয়া লইলেন। ক্ষুদিরাম ধৃত হইলেন। ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট তাঁহার ফাঁসি হয়। শোনা যায় যে, ফাঁসির আদেশ শুনিয়া বিপ্লবী বালক ক্ষুদিরামের মুখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসে নাই। আজও বাংলার দিকে দিকে ক্ষুদিরামের ফাঁসিকে কেন্দ্র করিয়া যে করুণ ও বিষাদঘন সংগীত রচিত হইয়াছিল, তাহা মানুষের মুখে মুখে গীত হইতে শোনা যায়। তাহারা গাহিয়া চলিয়াছে:

বিদায় দে মা একবার ঘুরে আসি
হাসি-হাসি গলায় ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।
মেটে বোমা তৈয়ার করে
ফেলেছিলাম গাড়ির পরে
বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ইংলণ্ডবাসী।

অভিরাম যায় দ্বীপচালানে
ক্ষুদিরামের ফাঁসি॥
দশমাস দশদিন পরে
জন্মনেব মাসির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস মা
দেখবি গলায় ফাঁসি॥
ষোল হাজার তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর বেটা-বেটি
বেটা-বেটি কোরো খাঁটি
বউদের কোরো দাসী।
অভিরাম যায় দ্বীপ চালানে
ক্ষুদি রামের ফাঁসি॥

এই সময়ই অনুষ্ঠিত হয় আলিপুরের বম্বকেস্। এই মামলায় ৪৭ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ও ইহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

[ দীপ নিভে গেছে—৭৮ পাতার পর ]

তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। এ সবই সত্য। কিন্তু আমাদের বেদনাহত মথিত মনের কন্দরে কন্দরে ক্রন্দনের কলরোলে মূক ধ্বনি বার বার উচ্চারিত হচ্ছে 'দীপ নিভে গেছে'। আজ কঠোর কর্তব্য আমাদের সম্মুখে ভীড় করে আছে। আমাদের রিক্ত-নিঃস্ব মন নিয়ে কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হবার শক্তি যেন পাই, বিধাতাব কাছে এই প্রার্থনা করি। দিদির আশীর্বাদ নিয়ে আবার আমাদের পথচলা সুরু করবো, যে পথ দিদি আলোকিত করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দিদি আমাদের অমৃতলোক থেকে আশীর্বাদ করুন যেন অবিকম্প পদক্ষেপে সে-পথে চলতে পারি। দুর্গমের দুর্ভেদ্যতা অতিক্রম করে। দিদির অমর আত্মা শান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ॥

সুনীল দাস

## বিজ্ঞপ্তি

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা জয়শ্রী আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার স্মৃতিসংখ্যারূপে প্রকাশিত হবার কথা ছিল। অনিবার্যকারণে তা করা সম্ভব হোলোনা। আষাঢ় সংখ্যা "লীলা রায় স্মৃতিসংখ্যা"রূপে প্রকাশিত হবে। যত শীঘ্র সম্ভব এই সংখ্যাটি প্রকাশ করবার আয়োজন সম্পূর্ণ করা হোচ্ছে।

পরিচালকমণ্ডলী
জয়শ্রী

# শোক প্রস্তাব

"বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের মহাপ্রয়াণে পশ্চিম বাংলার নাগরিকদের এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং ভারতের মুক্তি-সাধনায় সর্ব্বস্ব-নিবেদিতা এই মহাপ্রাণা দেশপ্রেমিকের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। এই সভা তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গ ও সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক তেজস্বী বিপ্লবী নেত্রী রূপে লীলা রায়ের স্থান ছিল অদ্বিতীয়। বৈপ্লবিক নেতৃত্ব, সংগ্রামী নির্ভীকতা এবং ঐকান্তিক ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠার তিনি অগ্নিহোত্রী জীবনের যে মহান ঐতিহ্য রচনা করেছেন তা এক গৌরবময় স্মারণিক রূপে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এক বিশেষ অধ্যায়ে বিপ্লবী লীলা রায়ের জীবনাদর্শ বাংলার তারুণ্য শক্তিকে দুর্ধর্ষ বিপ্লববাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

"শুধু বিপ্লববাদের ক্ষেত্রেই নয়—বাংলার নারী প্রগতির অভিযান, নারী শিক্ষা ও গণ শিক্ষার বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে এবং সাংগঠনিক প্রতিভায় তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীপালি সংঘ এবং নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা মাসিক পত্রিকা জয়শ্রী এবং নেতাজী প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদিকা রূপে তিনি রেখে গেছেন এক উচ্চমানের নিঃশঙ্ক সাংবাদিকতার নিদর্শন।

"চল্লিশ দশকের জাতীয় সংকটের অধ্যায়ে একাধারে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে এবং দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে তিনি পরিচালনা করেছিলেন নির্ভীক আন্দোলন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের রক্ষায় এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রথম জাতীয় গণ-পরিষদের সদস্যরূপে তিনি গৌরবময় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

"স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিমপর্বে নেতাজীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ-সহকর্মীরূপে তিনি যে বিপ্লবী-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের অনুসরণে জীবনের শেষ সজ্ঞান মুহূর্ত্ত পর্যন্ত নেতাজীর জীবনবাণী প্রচার এবং নেতাজীর আদর্শকে ভারতের জাতীয় আদর্শে পরিণত করার স্বপ্ন ও সাধনাকে অনন্য জীবনব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন; জীবনের শেষ অধ্যায়ে নেতাজীর জাতীয় আদর্শই ছিল দেশনেত্রী লীলা রায়ের ধ্যান, জ্ঞান ও স্বাধ্যায়।

"জীবন ও আদর্শের মহতী সমন্বয়ে আত্মনিবেদিত বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের জীবন বাংলার তারুণ্য শক্তির সামনে ত্যাগ, সংগ্রাম ও স্বদেশ প্রেমের এক অনির্বাণ প্রেরণা সঞ্চার করবে।" *

* মহাজাতি সদনে রবিবার ২৮শে জুন, ১৯৭০ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় স্মরণ-সভায় গৃহীত প্রস্তাব।

# সম্পাদকীয়

## স্বাগত 'মহারাজ'

দীর্ঘ বার বছর পর প্রবীণ বিপ্লবী অগ্নিযুগের 'মহারাজ' ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তিন মাসের জন্য ভারতবর্ষে এসেছেন। গত চার বছর যাবৎ ভারতে আসার জন্য পাশপোর্টের আবেদন করে অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর পাকিস্তান সরকার মহারাজকে পাশপোর্ট মঞ্জুর করেছেন। তিরাশি বৎসর বয়স্ক এই প্রবীণ নেতা ত্রিশ বছর ইংরেজের কারাগারে কাটিয়েছেন। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাবাসে কঠোর বন্দীজীবন যাপন করেছেন। তবুও পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসেন নি। ভারতের মাটিতে পৌঁছেই তিনি বলেছেন: "মাতৃভূমি ত্যাগ করে আমি আসিনি, আমার দেশবাসীর শুভেচ্ছা নিয়েই এসেছি। পাকিস্তানের সকলেই ভারত বিদ্বেষী নয়। আমরা সমমর্যাদায় বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করতে চাই।" মহারাজ পাকিস্তানের শুভেচ্ছা নিয়ে ভারতে এসেছেন এবং ভারতের শুভেচ্ছা নিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যাবেন। পাক-ভারত শুভেচ্ছার দূতরূপে মহারাজের বেসরকারী প্রচেষ্টা সফল হউক এই কামনা করি।

মহারাজ ভারতবর্ষে ফিরে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের স্মরণ-সভায় শ্রদ্ধাতর্পণ করেছেন। এক প্রবীণ বিপ্লবী-নেতার আর এক বিপ্লবী দেশনেত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ মহারাজের এই সময়ে ভারতে উপস্থিতি আরও তাৎপর্যময় করে তুলেছে। প্রবীণ বিপ্লবী নেতাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

## ক্যাবিনেটে রদবদল

২৭শে জুন রাষ্ট্রপতি ভবনের ঘোষণার কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের গুরুতর রদবদল হয়েছে। ছয়জন মন্ত্রী পাঁচ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং চারজন উপরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর বদল হয়েছে। গত ২৩ বছরেও ক্যাবিনেটে এতো ব্যাপক পরিবর্তন হয় নাই এবং ক্যাবিনেটের এতগুলি মন্ত্রী দপ্তর-বদলের সম্মুখীন হয় নাই। স্বরাষ্ট্র থেকে অর্থদপ্তরে চ্যবনকে সরিয়ে রাজনীতিতে চ্যবনের স্থান নিঃসংশয়ে প্রধান মন্ত্রী লঘু করে দিয়েছেন যদিও প্রধানমন্ত্রী তাকে সমাজবাদে আত্যন্তিক বিশ্বাসী হিসেবেই অর্থ দপ্তরের ভার দিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছেন। আসলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতে নিয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করাই প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্য। নকশালপন্থীদের দৌরাত্ম, সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, শিবসেনার তাণ্ডব—সব মিলিয়ে স্বরাষ্ট্র বিভাগে চ্যবনের ব্যর্থতার সুযোগও প্রধান মন্ত্রী নিয়েছেন। অপর পক্ষে ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করবার ভাবনাও প্রধান মন্ত্রীর মাথায় ঘুরছে। তার পূর্বে দলের অসপত্ন প্রভুত্ব যেমন তার প্রয়োজন, তেমনি প্রতিপক্ষদের আঘাত হানবারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। আর, এস, এস, শিবসেনা ইত্যাদি সংগঠনগুলির উপর আঘাতের সিদ্ধান্ত নেবার এক্তিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার নিয়ে নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। অন্যান্য বদলের মধ্যে শরণ সিং এবং জগজীবন রাম যথাক্রমে বৈদেশিক মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভার নিয়ে এই দুই দপ্তরে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত পরিচালনার সুযোগ বৃদ্ধি করেছেন। দীনেশ সিং-এর গোঁসা এবং পরবর্তীকালে শিল্পোন্নয়ন বিভাগের ভার নেবার সম্মতি হাসিরই উদ্রেক করেছে। দীনেশ সিং প্রধানমন্ত্রীর পোষ্য-রূপে গণ্য হয়ে, তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রহসন

করে মর্যাদা খুইয়েছেন। শুধু তাই নয় শিল্পোন্নয়ন বিভাগ থেকে শিল্পের লাইসেন্স সংক্রান্ত বিভাগটি সরিয়ে প্রধান মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একটি কমিটির এক্তিয়ারে এনে প্রধান মন্ত্রী একদিকে যেমন দীনেশ সিং-এর নূতন দপ্তরের গুরুত্ব হ্রাস করেছেন আর একদিকে তেমনি তাঁর হাতে আরও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগ হাতে নেবার ফলে ইনটেলিজান্স ব্যুরো এবং সি, বি, আই প্রধান মন্ত্রীর হাতে এলো। এছাড়া ডাইরেক্টরেট অফ ইকনমিক ইনটেলিজেন্সও অর্থ দপ্তর থেকে সি, বি, আই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে এলো। এ-ছাড়া ক্যাবিনেট সেক্রেটারিটের এক্তিয়ারে পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট সৃষ্টি করে স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে আমলাদের চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়গুলি আনা হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রক থেকে সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এ-ছাড়া প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে ইলেকট্রনিকস বিভাগও এই সেক্রেটারিটে যুক্ত হয়ে এই বিভাগগুলি প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তাঁবে আনা হয়েছে।

ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীই সর্বেসর্বা এবং চ্যবন অস্তগামী—এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে-কথাই ঘোষিত হয়েছে। প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে প্রধানমন্ত্রী দলীয় শাসনের নামে প্রায় ব্যক্তিগত শাসন কেন্দ্রে আরোপ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মস্কো-নির্ভরতার যে অভিযোগ রয়েছে, তারই পরিণতিতে এই পরিবর্তন, না উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকের ব্যক্তিক্ষমতা প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা তা এখনই সুস্পষ্টরূপে বলা মুস্কিল। তবে এই পরিবর্তন দেশে গুরুতর পরিবর্তনের পূর্বাভাস বহন করে আনছে, সে-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

## সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট

বহরমপুরে যে মাসে জেলা শাসকের ঘেরাও নিয়ে পুলিসের সঙ্গে সরকারীকর্মচারীদের সংঘর্ষ হয়। তারই প্রতিবাদে বহরমপুরে ধর্মঘট হয়েছে। সরকারী কর্মচারীরা সেই কারণে গত ২৫শে জুন রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট করেছিলেন। এই ধর্মঘট পর্যন্ত বিরোধ পৌঁছাবার পূর্বেই সরকারের পক্ষ থেকে বিভাগীয় তদন্তের পরিবর্তে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয় কমিটিরও দায়িত্ব ছিল কর্মচারীদের মত গ্রহণ করে এগোবার। কারণ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সুরু হয়ে গেছে, পৃথক কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সাধারণভাবে সরকারী কর্মচারীদের একাংশের দলীয় মত কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টার প্রবল বিরোধিতাও দেখা দিয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভের সঙ্গে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের অত্যাচারের এবং বিধান সভা বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের দাবী জুড়ে দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনকে যারা দলীয় আন্দোলনে পরিণত করবার এ যাবৎ চেষ্টা করে এসেছেন, তারাই সরকারী কর্মচারীদের সংহতিতে ভাঙন ধরিয়েছেন। দল-নিরপেক্ষ প্রবল গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব নেবার সময় এসেছে।

## কেরল বিধান সভা বাতিল

কেরল বিধান সভায় উপদলীয় সংঘাত, প্রধানত আই, এস, পি এবং পি, এস, পি'র সংঘাত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেননকে কেরল বিধান সভা ভেঙে দেবার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে বাধ্য করেছে। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আগামী চার মাসের মধ্যে নির্বাচনের কথাও বলেছেন। সংখ্যা-গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টগুলির শরিক দলের লড়াই-এ পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভাও ভেঙে গেছে। বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা পর পর এখানে বিফল হয়েছে। আরও পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করে এখানেও বিধান সভা ভেঙে দেওয়া উচিত। কেরলে যেমন অচ্যুত মেনন মন্ত্রীসভা মার্কসবাদীদের অরাজকতা দমন করে সেখানে কিছুটা আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে

এনেছে, পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসনে বরং তার বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাই কেরলে নির্বাচন চললেও, পশ্চিমবাংলায় এখনই নির্বাচন কাম্য নয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংখ্যালঘিষ্ঠতার পরিণত হবার পূর্বেই অচ্যুত মেনন পদত্যাগ করে রাজনৈতিক সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। নির্বাচনের পূর্বে অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রীসভা পরিচালনার অধিকার তার আছে। তবে সে দায়িত্ব নিলে মেনন এক নূতন নজীর তৈরী করবেন। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংবিধানসম্মত নজীর তৈরী করবার প্রয়োজনে সে দায়িত্ব পালনে দ্বিধাগ্রস্ত হলে তা দায়িত্ব স্খালনের অপরাধরূপে চিহ্নিত হবে।

## সাম্প্রদায়িকতা

১৯৬৭ সাল থেকে গত চার বছর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের হিসাবে দেখাযায় ভারতবর্ষের ৫৬ টি জেলায় একাধিকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। বিহারে বারটি জেলায়, মহারাষ্ট্রে ১১টি জেলায়, পশ্চিম বাংলায় কলিকাতা ছাড়া মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা এবং কুচবিহার, আসামের কয়িমগঞ্জ ও বড়পেটায় এবং উড়িষ্যার কটকে গত চার বছরে একাধিকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকেই অবস্থার অবনতি ঘটছে এবং ১৯৬৯ সালে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে। এ-বছর ৯৬০ টি জেলায় এই বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বর্তমান বছরের প্রথম পাঁচমাসে ৬৫ টি জেলায় দাঙ্গা প্রসারিত হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলানাড়ু এবং নাগাভূমি মোটামুটিভাবে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত।

দেশে রাজনৈতিক অস্থৈর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবার একটি বড় কারণ হোলো এই যে পরিষদীয় রাজনীতিতে সংখ্যাধিক্যলাভের জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তি-গুলিকে বৃহৎদলগুলি প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই অপরাধে কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্টের শরিকদেরও এ-বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। জনসঙ্ঘের দায়িত্ব সম্পর্কেও জনমত প্রবল এবং তারা নিজেদের এ-বিষয়ে সংশয়মুক্ত করতে পারে নাই। তবে শাসক কংগ্রেসের সংখ্যালঘু নির্ভরশীলতা যে সাম্প্রদায়িকতার নূতন গতিবেগ সঞ্চার করেছে সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি শাসক কংগ্রেসের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জনসঙ্ঘের ওপর সকল দোষ চাপিয়ে জনসাধারণের নিকট নিজের ব্যর্থতা চাপবার চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তানের চরেরাও তৎপর হয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে জাতীয় জীবন কলুষিত করছে। জাতীয়তাবাদবিরোধীরা এবং সাম্প্রদায়িকরা এক যোগে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন করবার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে। প্রবল জাতীয়তাবাদী মানসিকতা দিয়ে এই সর্বনাশা পরিণতিকে প্রতিহত করবার সময় এসেছে।

## ইংলণ্ডের নির্বাচন

ব্রিটেনের লেবার পার্টি গত ১৯শে জুনের সাধারণ নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়েছে। লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন তার দলের জয় সম্বন্ধে এতো সুনিশ্চিত ছিল যে অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে জুন মাসটাই নির্বাচনের উপযুক্ত সময় বলে উইলসন বেছে নিয়েছিলেন। নির্বাচনের পূর্বদিন পর্যন্ত লেবার দলের পরিষ্ঠতা ২০ থেকে ১৫০টি আসনের মধ্যে সীমিত থাকার কথা যারা বলেছিলেন তাদের মুখে চুণকালি দিয়ে রক্ষণশীল দল জয়ী হয়েছে। হাউস অফ কমন্সে ৬৩০টি আসনের মধ্যে রক্ষণশীলরা পেয়েছেন ৩৩০টি, লেবার ২৮০টি, লিবারেল ৬টি এবং অন্যান্যরা ৬টি,। রক্ষণশীলরা ৭৫ টি নূতন আসন পেয়ে ৮টি খুইয়েছেন, লেবার দল সত্তরটি আসন খুইয়ে ৬টি নূতন আসন পেয়েছেন। লিবারেলরা সাতটি আসন খুইয়েছেন। সাড়ে পাঁচ বছরের সমাজবাদী শাসনের পর হীথের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দলের প্রত্যাবর্তনের মধ্যে বৃটিশ

নির্বাচকমণ্ডলী সংশয়াতীতরূপে প্রমাণ করে দিয়েছে যে কোনো শাসকদলের পক্ষেই সমর্থন অটল নয়।

রক্ষণশীলদের নির্বাচনে নিক্সনের ভিয়েৎনাম ও কাম্বোডিয় নীতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন পাবে অনুমান করা যায় এবং ন্যাটোর শক্তি বৃদ্ধির ঝোঁকও প্রবল হবে। ইউরোপীয় কমন মার্কেটে প্রবেশের চেষ্টা ইংলণ্ডের দিক থেকে দ্রুততর হবে, কেননা, হীথের নেতৃত্বেই ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের কমন মার্কেটে প্রবেশের আলোচনা জেনারেল দ্য গলের বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। সুয়েজের পূর্বাঞ্চল থেকে ইংলণ্ডের সামরিক শক্তি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অবশ্যি অপরিবর্তিতই থাকবে।

এই নির্বাচনে এনখ্ পাওয়েলের প্রচুর ভোটে বিজয় সাধারণভাবে নূতন সরকারের বৃটিশ পাশপোর্টধারী পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের বৃটেনে প্রবেশ রোধে নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি কিম্বা ইংলণ্ডে বর্ণবৈষম্যের প্রকোপ বৃদ্ধি করবে কিনা সে সম্পর্কে গুরুতর সংশয় দেখা দিয়েছে। বৃটিশ পাশপোর্টধারী পূর্ব আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বৃটিশ সরকারের। পূর্বতন বৃটিশ সরকারও সে-দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে ভারতের উপর সে-বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। এনখ্ পাওয়েলের কেন্দ্রে লেবার-বিরোধী ভোট ও পাওয়েলের সমর্থন বৃদ্ধি বৃটেনে বর্ণবৈষম্যের বিপদ-বৃদ্ধির সঙ্কেত। এ-ছাড়াও নিগ্রোপ্রার্থী ডঃ ডেভিড পীটের সুনিশ্চিত লেবার আসন ওয়াণ্ডস ওয়ার্থ—ক্ল্যাপহামে পরাজয় ইংলণ্ডে বর্ণবৈষম্য বৃদ্ধির আরও একটি নির্দেশক। লেবার দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে দলের বিরোধ, মজুরী স্থগিত নীতি, লেবার দলের বিরুদ্ধে কাজ করেছে কিনা, ধীরে ধীরে সে-তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। তবে লেবার দলের ডেপুটি নেতা পরবাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ব্রাউনের পরাজয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং দলের আভ্যন্তরীণ ঐক্য সম্পর্কে সংশয়-ব্যঞ্জক।


## অনিল রায়ের

### সময়োপযোগী দুইটি বই

**সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০**

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০**

( তৃতীয় সংস্করণ )

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ( ভূমিকা )

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯


২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

## মতামত

সুভাষচন্দ্র প্রথম খণ্ড পড়ে ভাল লাগলো। অন্যান্য জীবনী থেকে এর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনার পরিচয় দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন লেখক। এই পরিকল্পনা যথার্থ বলে মনে হয়। সুভাষচন্দ্র কবি, দার্শনিক বা ধর্মগুরু নন। তিনি দেশনেতা। তাই দেশের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর নেতৃত্বের বনিয়াদ গড়েছে। সুতরাং তাঁকে জানতে হলে দেশ ও কালকেও জানা চাই। কবি এবং দার্শনিককে তাঁদের জীবনের মধ্যেই জানা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অসামান্য দানের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বিস্তৃত জীবনীই তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারে।

এই প্রথম খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ জীবনীর যে আভাস পাওয়া গেল তা আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। দেশ ও কালের প্রভাব কিভাবে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে লেখক তা সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে "শিবচেতনার জাগরণ" অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনারীতি বিষয় বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ছাপা বাধাই সুরুচিসম্মত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'জাতীয় গ্রন্থাগার'

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অবদান

সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৩

22 JUL 1970


Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·70
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

১৩৭৭

শ্রাবণ

# জয়শ্রী

UNIVERSITY

প্রতিষ্ঠাত্রী
সম্পাদিকা :
লীলা রায়

# আমরা যদি একপ্রাণ হই
# সাফল্য অর্জন আমরা ক'রবোই

...কেবল সুদীর্ঘ এবং কঠিন শ্রমের মধ্যে দিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে। বেশি সংখ্যক লোকের জন্য চাকরি এবং দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের বড় ও ছোট কলকারখানাগুলিকে বিনা বাধায় কাজ করতে দিতে হবে। অর্থনীতির সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারে। শিল্পের প্রসার এবং অর্থনীতির অগ্রগতির পথকে যে-কোনভাবে বাধা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দেশের যুবসমাজের ক্ষতি করা, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ বন্ধ করা। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল—চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিপ্লব। আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসাকে সম্বল করে এবং আইন শৃংখলাকে পায়ে মাড়িয়ে এই পরিবর্তন আনা যাবে না। শৃংখলা, সদিচ্ছা ও শান্তিপূর্ণ পথে এই পরিবর্তন আনতে হবে। সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হবে সমস্ত রাজনীতিক দলের উপরে দেশের জনগণ। অফিসে খেটে খাওয়া মানুষ, সুন্দর তরুণী, সুন্দর সুন্দর শিশু, প্রাণোদ্দীপ্ত তরুণ, সদাসতর্কময় বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড বিশেষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এঁরাই হচ্ছেন আমাদের জনগণ। আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই জনগণের স্বার্থকে বিপন্ন করা উচিত নয়। তাঁদের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমানের অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে উঠবার কাজে লাগাতে হবে। পথ বিপদসংকুল, কিন্তু আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, এবং বাংলার অমর ঐতিহ্যের দ্বারা চালিত হই তবে সফল আমরা হবই।

—ইন্দিরা গান্ধী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

# সূচীপত্র

জয়শ্রী : শ্রাবণ : ১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৩৬৭ |
| বিস্ফোরণ ( ধারাবাহিক রচনা ) | কালীচরণ ঘোষ | ৩৭৩ |
| মাকে ভাবতে গেলে যেমন ( কবিতা ) | শান্তি লাহিড়ী | ৩৭৮ |
| বৃষ্টি হ ( কবিতা ) | চিত্ত ঘোষ | ৩৮০ |
| চেতনায় মননের নেই অন্ধকার ( কবিতা ) | জয়ন্ত সাহা | ৩৮১ |
| বাংলা ছোট গল্পের মানচিত্র ( ধারাবাহিক আলোচনা ) | সুরজিৎ দাশগুপ্ত | ৩৮৩ |
| অবেলার সিঁড়ি ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) | বাসুদেব দেব | ৩৯১ |
| কণ্ঠ ভরা বিষ ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) | মিহির কুমার মুখোপাধ্যায় | ৩৯৯ |
| জাপানের দিনগুলি ( ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী ) | বারীন বর্ধন | ৪০৩ |


সম্পাদক : সুনীল দাস

অনিবার্য কারণে শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'দিদি' এ-মাসে ছাপা গেল না। ভাদ্র সংখ্যায় যাবে।

জঃ সঃ


## খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

| | |
|---|---|
| শ্রীগীতা | ৭·৫০ |
| শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম | ৭·০০ |
| ভারত-আত্মার বাণী | ৫·০০ |
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১·৫০ |
| কর্মবাণী | ১·২৫ |
| Soul of India Speaks | 5·00 |

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

| | |
|---|---|
| বাংলার ঋষি | ৩·০০ |
| বাংলার মনীষী | ১·৩০ |
| বাংলার বিদুষী | ২·০০ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১·৫০ |
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২·০০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ৪·০০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১·৫০ |
| রবীন্দ্রনাথ | ১·২৫ |
| যুগাচার্য বিবেকানন্দ | ১·৫০ |
| আচার্য জগদীশচন্দ্র | ২·৫০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১·৫০ |

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসাগর | ২·২৫ |
| মানুষের মত মানুষ | ·৭৫ |
| শিশু রামায়ণ | ·৬২ |
| শিশু মহাভারত | ·৭৫ |

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

## জয়শ্রীর নিয়মাবলী

### গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

### লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়**

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
পোঃ নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

## JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1931

### Advertisement Rate Schedule

**Ordinary**

| | |
|---|---|
| Full Page : | Rs. 100·00 |
| Half Page : | Rs. 60·00 |
| Quarter Page : | Rs. 35·00 |

**Cover Page**

| | |
|---|---|
| Second Cover : | Rs. 175·00 |
| Third Cover : | Rs. 200·00 |
| Fourth Cover : | Rs. 350·00 |

For Special Position contact *Advt. Manager* Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm.
( 8″ × 6″ )

Contact
Manager, Jayasree
251A/32, Netaji Subhas Chandra Bose Road
Calcutta—47
Phone : 46-4116

# GOBIND SUGAR MILLS LTD.

## AIRA ESTATE

*Dist.* LAKHINPUR KHERI. (U. P.)

*Manufacturers of*

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

CALCUTTA UNIVERSITY

# জয়ন্তী

৩৫ বর্ষ ০ চতুর্থ সংখ্যা ০ শ্রাবণ ১৩৭৭

## সম্পাদকীয়

### নেতাজী অনুসন্ধান কমিটি

তদানীন্তন লোক সভার সদস্য এবং নেতাজীর সহকর্মী শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে ৺নেহেরু নেতাজী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির চ্যায়ারম্যান মে: জে: শাহনাওয়াজ এবং অপর সদস্য শ্রীশংকর মৈত্র যুক্তভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে তাইহোকো বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর জীবনাবসান ঘটেছে। কিন্তু তৃতীয় সদস্য এবং নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু একটি বিরোধী রিপোর্টের এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ফরমোজার কথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। দেশবাসী শাহনাওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নি। গত বার বছর অগণিত জন সভায় নেতাজী সম্বন্ধে নতুন অনুসন্ধানের দাবী জানানো হয়। কিন্তু ভারত সরকার এতদিন সেই দাবী স্বীকার করেন নি।

এবারের লোকসভায় নেতাজী সম্বন্ধে নতুন অনুসন্ধানের দাবী তোলেন নেতাজীর আরেক অনুগামী এবং ৩৫০ জনের অধিক সংসদ সদস্য এক স্মারক লিপিতে এই দাবীকে সমর্থন করেন। ভারতীয় পার্লামেন্টের ইতিহাসে এত অধিক সংখ্যক সদস্য আর কোন সময়ে, অন্য কোনও বিষয়ে এরূপ সম্মিলিত দাবী পেশ করেনি,—যেমন করে দাবী তোলা হয়েছে নেতাজী সম্বন্ধে পুনরায় অনুসন্ধানের জন্য। দীর্ঘ চার বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পরে ১৯৭০ সালে ভারত সরকার তথা ৺নেহেরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী জনগণের এই দাবী স্বীকার করে নিয়েছেন।

নেতাজী সম্বন্ধে নতুন অনুসন্ধানের দাবীকে অনেকেই একটি অসম্ভব প্রস্তাব বলে মনে করেছিলেন। ৺লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই দাবী অগ্রাহ্য করেন। ১৯৬৭ সালে ৺রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের স্মারকলিপির দাবী গ্রহণে অক্ষমতা জানান। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে সংসদ সদস্যদের নিরন্তর সংগ্রামের ফলে শেষ পর্যন্ত এই দাবী স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নতুন অনুসন্ধানের প্রকৃতি ও গুরুত্ব শাহনাওয়াজ কমিটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শাহনাওয়াজ কমিটি একটি ইনকোয়ারী কমিটি মাত্র ছিল এবং এই কমিটির অনুসন্ধানের বিষয় ছিল 'বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর বিবৃত মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

কিন্তু পাঞ্জাবের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস খোসলার অধীনে ভারতীয় কমিশন সহ ইনকোয়ারী অ্যাক্টের নির্দেশে এবারে একটি 'কমিটি' নয়—একটি পূর্ণাঙ্গ 'কমিশন' গঠিত হয়েছে। এই কমিশনের অধিকার শেষের সমপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, এবারের অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত নয়—নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত রহস্যের সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত অনুসন্ধান করা। এই কমিশন ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রয়োজনীয় সমস্ত স্থানে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে এবং এই কমিশনের অধিবেশন হবে প্রকাশ্যে। এই কমিশনে প্রদত্ত সমস্ত সাক্ষ্যকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে জেরা করার অধিকার থাকবে।—যা' শাহনাওয়াজ কমিটির ছিল না।

এই কমিশনের কাজকে সাহায্য করার জন্য পার্লামেন্টের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন অফিসার এবং বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিকদের সমবায়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। আমরা আশা-করি নতুন নেতাজী অনুসন্ধান কমিটির উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এবং নেতাজী সম্বন্ধে নতুন চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার তথ্য, দলিল ও সংবাদ সহ বিভিন্ন ব্যক্তি এই কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে এবং অনুসন্ধান-সহায়ক কমিটিকে সর্বভাবে সাহায্য করে নেতাজী রহস্যের চূড়ান্ত সমাধানে নেতাজী-প্রেমিক দেশবাসী অগ্রসর হবেন।

## সাহসী কন্যা

শ্রীমতী সুলয়া গুহ ও কমলা সাহা পর্বতারোহণের দুঃসাহসিক অভিযানে জীবন হারিয়েছেন। মানুষের অনিবার্য মৃত্যু দুঃসাহসের ব্রত সাধনার পথে এসে তা' মহনীয় হ'য়ে ওঠে। শ্যামল বাংলার এই সাহসী কন্যাদ্বয় সেই মহান্ মৃত্যুর অধিকারিণী হয়েছেন। এঁদের শোচনীয় মৃত্যু দুঃখের, কিন্তু এই দুঃসাহসী মৃত্যু গৌরবেরও। এই পর্বত অভিযাত্রীদের জীবন বাংলার তারুণ্য শক্তিকে দুঃসাহসী অভিযানের স্বদেশ-গর্বে উদ্বুদ্ধ করুক।

## পরলোকে সনৎ চ্যাটার্জী

নেতাজীর একজন নিষ্ঠাবান অনুগামী, শ্রীসনৎ চ্যাটার্জী আকস্মিক সেরিব্রেল থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। কিশোর বয়স থেকে শ্রীচ্যাটার্জী নেতাজীর অনুগামীরূপে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে নানা দুঃখ বরণ করেছেন এবং স্বাধীনতার যুগেও বহু গণসংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। নেতাজীর এই অনুগামীর জীবনাবসানে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

## সংকট, সন্ত্রাস ও সংহার

পশ্চিম বাংলার জন-জীবনে আজ এমন এক সংকট সৃষ্টি হয়েছে যার প্রকৃতিকে 'সমস্যা' শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সর্বগ্রাসী সমস্যা আজ তীব্র সন্ত্রাসের রূপ নিয়েছে এবং এই সন্ত্রাস এক রুদ্র সংহারের পর্য্যায়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। এই সন্ত্রাসের পর্য্যায়েই যদি পশ্চিম বাংলার বর্তমান সার্বিক সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে না পাওয়া যায় তা' হলে যে সংহারের তাণ্ডব এই রাজ্যে সৃষ্টি হবে তা মৃত্যুর দাবানলকে বিভীষিকা পর্য্যায়ে ছাড়িয়ে দিয়ে এই রাজ্যটিকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে।

পশ্চিমবাংলার বর্তমান সমস্যা কোন প্রাকৃতিক বা আপাত আর্থিক কারণে সৃষ্টি হয়নি—এর মূল কারণ রাজনৈতিক। পশ্চিম বাংলার রাজনীতির তাৎপর্য গোটা ভারতবর্ষ থেকে স্বতন্ত্র, গোটা ভারতে আজ গদীর লড়াইয়ের সংঘর্ষ চলছে এবং এই সংঘর্ষের মুখ্য হাতিয়ার ভোট-বাক্স। কিন্তু পশ্চিম বাংলার এই দ্বন্দ্ব ভোটের লড়াই বা ব্যালট বাক্সের সংঘাতে সীমিত নয়—এই লড়াই আজ দ্রুতগতিতে ব্যালট বনাম বুলেটের লড়াইয়ে পরিণত হচ্ছে।

পশ্চিম বাংলার রাজনীতি আজ দুটি মূল দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিভক্ত। একটির আগ্রহ ব্যালটের মাধ্যমে রাজপাটের গদী দখল করা, অন্যটি চাইছে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টিকরতে যার লক্ষ্য রক্তাক্ত লড়াইয়ের পথে ক্ষমতা দখল করে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা বদলের নির্বাচনী পদ্ধতির চির অবসান ঘটান। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লক্ষ্য ও প্রতিচ্ছবির প্রতীক হ'ল ভিয়েৎনাম।

এই বুলেটপন্থীদের কার্যক্রমের দ্বি-মুখী অভিব্যক্তি ঘটছে আজ পশ্চিম বংলার আশু একটির কার্যক্রমের পদ্ধতি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ এবং অপরটির লক্ষ্য গণ-সন্ত্রাসবাদ। এই সন্ত্রাসবাদী দ্বৈত পন্থীদের মধ্যে আপাত সংঘর্ষ ঘটলেও মূলতঃ এদের দুই পন্থারই লক্ষ্য ও অভিসন্ধী অভিন্ন। দুই পন্থারই চরম লক্ষ্য দ্রুতগতিতে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক, আর্থিক, শিক্ষা ও সমাজিক জীবনকে বিধ্বস্ত বা বিপর্যস্ত করে প্রথম পর্য্যায়ে একটি অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এই অরাজকতার পরিস্থিতিকে রক্তাক্ত ক্ষমতা-দখলের লড়াইয়ে পরিণত করা।

ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ সরকারী মহলের দৃষ্টিতে অধিক গুরুত্ব লাভ করলেও, বস্তুত গণসন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি ও পরিনাম অধিক ভয়াবহ। সাম্প্রতিক দুর্গাপুরের ধর্মঘট, বাংলাবন্ধের ডাক, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট, বাস ধর্মঘট, শিক্ষক ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচী এই গণসন্ত্রাসবাদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এই ধর্মঘটগুলি আপাত দৃষ্টিতে শ্রেণীভিত্তিক আর্থিক দাবীতে অনুষ্ঠিত হলেও মূলতঃ এরূপ কার্যক্রমের লক্ষ্য প্রধানত সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির প্রসার। সাম্প্রতিক কোন ধর্মঘটের সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা সরকারী কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক মতামত গ্রহণ করা হয়নি। সংখ্যালঘু গোষ্ঠি সন্ত্রাসবাদের পথে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠির উপরে অবরদস্তিমূলক ধর্মঘট চাপিয়ে দিয়েছে। এই ধর্মঘটগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বটে কিন্তু সন্ত্রাসবাদী পরিবেশ প্রসারে সফল হয়েছে।

এই সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির নিরোধের কার্যক্রমরূপে সরকার ভ্রান্তপথ অনুসরণ করেছে। গণসন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের কার্যক্রম সরকারী দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব লাভ করেছে, পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকার অধিক তৎপর হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্যাপক কারফ্যু জারীর কার্যক্রম গ্রহণ করে সরকার গণ-সন্ত্রাসবাদীদের কার্যক্রম প্রসারের সুযোগ করে দিচ্ছেন। দিল্লীর সংখ্যালঘু সরকার নিজেকে ক্ষমতাসীন রাখার প্রচেষ্টায় এমন এক স্ববিরোধী শাসনতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করেছেন যার ফলে পশ্চিম বাংলার শাসনব্যবস্থার হাতে নিবর্তন-মূলক হাতিয়ার তুলে দেওয়ার ব্যাপারে হয় তারা অপারগ অথবা পরাঙ্মুখ। বোমার মসলা নিয়ন্ত্রণের জন্য আশু অর্ডিন্যান্স জারী করার ব্যাপারেও দিল্লী দ্বিধাগ্রস্ত। ইন্দিরাসহচর একটি রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার জন্য নিবর্তনমূলক আইন জারী করতে পর্য্যন্ত দিল্লী সরকার অগ্রসর হয়নি। পক্ষান্তরে ইংরেজ আমলের পচা আইনগুলি চালু করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্যোগে ব্যাপক জন সমষ্টিকে দায় ও দুর্ভোগের সম্মুখীন করে তুলছেন। ব্যাপক কারফ্যু জারী করার শাসননীতির ফলে ব্যাক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পরিণাম ব্যাপক গণ-অসন্তোষে পরিণত হচ্ছে।

গুলি বা কারফ্যু জারী করে পশ্চিম বাংলার বর্তমান সন্ত্রাসবাদী পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। বস্তুত, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি সমূহের যৌথ উদ্যম ব্যতীত বর্তমান সংকট উত্তরণ অসম্ভব। জনসাধারণের মনে আজ ব্যক্তিগত বা গণ-সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রবল ও ব্যাপক ঘৃণা, বিদ্বেষ বা বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের এই পুঞ্জিত ক্ষোভের সংহত ও সক্রিয় অভিব্যক্তির জন্য আজ প্রয়োজন জাতীয়তা ও গণতন্ত্র বিশ্বাসী শক্তিসমূহের যৌথ মোর্চার নতুন আস্থা সৃষ্টি করা। নির্বাচন আজ পশ্চিম বাংলার মুখ্য সমস্যা নয়,—আজ পশ্চিম

বাংলার মৌল প্রয়োজন জনমনে এবং এই রাজ্যের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং শিল্প ও কৃষি জগতে এক নতুন স্বস্তি ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা। যদি জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সামরিক ভাবে নির্বাচনী জিগীর বন্ধ করে ব্যক্তিগত বা গণ-সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে বৃহত্তর জনজীবন থেকে এই সন্ত্রাসবাদীদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের মুখোস খুলে দিতে পারে তবেই পশ্চিম বাংলার সংকট মোচনের যথার্থ পদক্ষেপের সূচনা করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই মৌল কর্তব্য পালনে পশ্চিম বাংলার জাতীয়তা ও গণতন্ত্রবাদী শক্তিগুলি আজ বিভ্রান্ত ও বিমুখ। শুধু তাই নয়—এই শক্তিগুলিও পারস্পরিক বিরোধিতায় মত্ত হয়ে প্রকারান্তরে সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলির কার্যক্রম প্রসারে সহায়তা করছে। সরকারী নিবর্তন নীতির ব্যাখ্যা সমালোচনা করে নয়—জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সংহত করে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন আরম্ভ করার কর্মসূচীর মাধ্যমেই,—পশ্চিম বাংলার রাজনীতির মোড় ঘোরানো সম্ভব। অন্যথায় সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির দমনে সরকারী শাসনযন্ত্র উত্তরোত্তর যে কাউন্টার সন্ত্রাসবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে বাধ্য হবে,—তার ফলে পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা আরও মারাত্মক পর্য্যায়ের দিকে এগিয়ে যাবে। পশ্চিম বঙ্গের সংকট আজ সংহার-পর্বের কিনারায় এসে পৌঁচেছে। জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি মোর্চাবদ্ধ হয়ে যদি এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হয় তা হলে শীঘ্রই পশ্চিম বঙ্গে যে ধ্বংসে ও মৃত্যুর ব্যাপক দাবানল জ্বলে উঠবে,—তা আজ আর শুধু আশংকার সীমায় আবদ্ধ নয়।

## সামরিক বাহিনীর সতর্কবাণী

ভারতীয় রাজনীতির গতি ও রাজনৈতিকদের নীতিহীন চরিত্রে ভারতীয় সামরিক বাহিনী যে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে প্রাক্তন সামরিক নেতাদের বক্তব্যে তা' সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাক্তন সেনাপতি জেঃ কারিয়াপ্পা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বর্তমান চেহারার বার-কয়েক সমালোচনা করেছেন। সম্প্রতি সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি জেঃ কুমারমঙ্গলম আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাষায় ভারতের বর্তমান রাজনৈতিকদের নীতি ও আদর্শহীন ব্যক্তিজীবী রাজনীতির বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক শ্লেষাত্মক উক্তি করেছেন। বর্তমান রাজানীতিকদের তিনি 'পিগমী' বা বামন আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন আদর্শ-হীনতার প্রতিযোগিতায় এই রাজনীতিকরা দেশকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেছেন যে উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে এই রাজনীতিকরা দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

জেঃ কুমারমঙ্গলম পার্লামেণ্টারি গনতন্ত্রের পরিবর্তে কোন সামরিক শাসনের বিকল্প প্রস্তাব করেন নি, কিন্তু অবিলম্বে ভারতীয় রাজনীতির গতি যদি কোন নতুন মোড় না নেয় তা হলে পরিণামে যে অন্তকোন রাজনীতির উদ্ভব হতে পারে তার ইশারা খুব স্পষ্ট ভাবেই দিয়েছেন।

জেঃ করিয়াপ্পা বা জেঃ কুমারমঙ্গলম যে প্রকাশ্যভাবে নিছক তাদের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করছেন,—এরূপ ভাবা ভুল হবে। সামরিক নেতারা রাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণত নীরব থাকেন অথবা অতি স্বল্পবাকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সম্প্রতি প্রাক্তন সামরিক নেতারা যেরূপ কঠোর ভাষায় এবং বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বর্তমান ভারতীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিকদের সমালোচনা করছেন তা'তে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই প্রাক্তন সামরিক নায়কদের কণ্ঠে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যে বিক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে তা সাধারণ ভাবে সমগ্র সামরিক বাহিনীর মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি। একথা এবং তার তাৎপর্য অনুধাবনে দেরী হলে ভারতের জাতীয় জীবনে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটা যে অসম্ভব নয়,—সেই ইশারা

খুবই সুস্পষ্ট। বর্তমান আদর্শহীন রাজনীতি বিরোধিতার মনোভাবই তাদের ঐক্যের ভূমিকা তৈরী করে দেবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আশা করি, জেঃ কারিয়াপ্পা ও জেঃ কুমারমঙ্গলমের সতর্ক বাণীর গুরুত্ব সময় থাকতে উপলব্ধি করবেন।

## বিপর্যয়ী বন্যা

পশ্চিম বাংলার যে লক্ষ লক্ষ লোক বন্যা-কবলিত হয়েছে দিল্লীর সরকারী মহলে বা সংবাদপত্রে তার প্রতিফলন নেই। দিল্লীর কর্তাদের উদ্বেগও তাই খুবই কম। মন্ত্রী-সভার অঁাদরেল প্রবক্তারা নির্বাচনী বা বৈদেশিক সফরে বেরিয়েছেন,—পশ্চিম বংলায় আসার তাগিদ বোধ করেন নি। হাফ-মন্ত্রীদের কেউ কেউ দয়া করে এসে একটু ঘুরে যাচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী,-যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও—তাঁর মাথায় এত বোঝা যে তিনি পশ্চিম বাংলার সংকট বা দুর্যোগে ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ পান না। পার্লামেণ্ট বাংলা দেশের বাজেট আলোচনায় তিনি দু'মিনিটের জন্যও যোগ দিতে পারেন নি। অথচ ১৯৬৭ সালের বাজেট আলোচনা কালে শ্রীচ্যবন শুদ্ধ বিতর্কের জবাবই দেন নি গোটা আলোচনার সময়ে পার্লামেণ্ট গৃহে উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধ্র প্রদেশে এরূপ ভয়াবহ বন্যা এলে প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অনেক মন্ত্রীরাই অস্থির হয়ে পড়তেন বন্যার্ত এলাকা পরিদর্শনে। যাহোক, বর্তমান বন্যার সমস্যা সমাধানে পশ্চিম বাংলার দাবী :

প্রধান মন্ত্রী পশ্চিম বঙ্গ পরিদর্শনে এসে পশ্চিম বঙ্গের বন্যার্তদের উদ্ধার, রিলিফ দান ও পুনর্বাসনের খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান এবং ডি. ভি. সি এই বন্যার জন্য কতখানি দায়ী সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করুন। বন্যার্তদের জন্য খাদ্য ও দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থাও করা হোক।

পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের নামে দিবারাত্র বুক চাপড়াচ্ছেন। আমরা আশা করি সেই জনগণের এই সংকটে রাজনীতির তুবড়ী ও বোমবাজী আপাতত বন্ধ রেখে তারা সবাই সম্মিলিতভাবে বন্যাত্রাণের কাজে এগিয়ে আসবেন।

## নিরুদ্ধ উদ্বাস্তু স্রোত ও ভারত সরকার

গত দশমাসে পশ্চিম বঙ্গ থেকে ২ লক্ষ ১০ হাজার উদ্বাস্তু এসেছে এবং কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী বর্ষার পরে আরও ১৮০,০০০ উদ্বাস্তু পশ্চিম বঙ্গে আসবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

এই উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করা তথা পূর্ব বাংলার সখ্যালঘু-দের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। বৈদেশিক মন্ত্রী শ্রীশরণ সিংহ পার্লামেণ্টে বার বার একথা বলেছেন যে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু ভারত-সরকারের পক্ষ থেকে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের আমন্ত্রণে সাড়া দেয় নি।

পাকিস্তানের পিণ্ডি সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলা থেকে উদ্বাস্তুদের বিতাড়িত করছে। শুধু উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে পাক সরকারের উদ্যোগী হওয়ার কোন কারণ নেই। পাক-সরকারের উপরে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রায় সমস্বরে দাবী তোলা হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক মন্ত্রী এরূপ চাপ-সৃষ্টির রাজনীতির ঘোর বিরোধী। কিন্তু কিভাবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় পাকিস্তান সরকারকে রাজী করান যায় সে সম্বন্ধে কোন বিকল্প উপায়ের কথাও তিনি বলেন নি। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে ভারত সরকার এক অবাঞ্ছনীয় ক্লীব-রাজনীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্বন্ধেও ভারত সরকারের নীতি গতানুগতিক। এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে এবারে কোন বক্তব্য পর্যন্ত ভারত সরকার রাখেন নি এবং পার্লামেণ্টের সদস্যদের স্মারকলিপির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত ভারত সরকার স্বীকার করেন নি। এদিকে রাজনৈতিক দলগুলিও প্রায় নীরব,—কারণ উদ্বাস্তুদের ভোট নেই,—সেজন্য পশ্চিম বাংলার 'বিপ্লবী রাজনীতিক'দের উদ্বাস্তুদের জন্য কোন মাথাব্যথাও নেই।

## রাজন্য ভাতা ও পদাধিকার বিলোপ

বিশেষ কতগুলি পদাধিকার-সহ ভারতীয় রাজন্যবর্গ প্রতি বছর চার কোটি আশী লক্ষ টাকা ভাতা পেয়ে থাকেন। এই ভাতার হার প্রতি বছর আনুপাতিক হারে হ্রাস পায়। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির প্রতি বছর যে পরিমাণে লোকসান হচ্ছে সে তুলনায় এই রাজন্যভাতার পরিমাণ নগণ্য। এই ভাতা তুলে দিলে ভারতীয় অর্থনীতির গতি-প্রকৃতিতে কোন তারতম্য হওয়ার কারণ নেই। সুতরাং বলা যায় যে ওই ভাতা বিলোপের যুক্তি মূলতঃ রাজনৈতিক।

রাজন্যবর্গের বিশেষ অধিকার ও ভাতা ভারতের বর্তমান গণতান্ত্রিক জীবনবিধি ও নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যকর। গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনাকারীরাও নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তথাপি রাজন্যবর্গের বিশেষ অধিকার তাঁরা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেই নৈতিক কারণেই অধিকার বিলোপ করার পরিবর্তে রাজন্যবর্গের সঙ্গে পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে ভারত সরকারের এই কাজটি করা উচিত ছিল। এজন্য ভারত সরকার উদ্যোগীও হয়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে আলোচনা ভেঙে দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তাড়াহুড়া করে রাজন্যবর্গের বিশেষ অধিকার বিলোপ করার জন্য তৎপর হন।

কেন শ্রীমতী গান্ধী এই পন্থা গ্রহণ করেন তার তাৎপর্য অস্পষ্ট নয়, ভারতের জনগণের মৌলিক আর্থিক সমস্যা তথা মূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যাদি সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় সহজ পথে নিজের বৈপ্লবিক প্রতিচ্ছবি সতেজ রাখার জন্য একটি চটকদারী রাজনৈতিক চাল দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পথ গ্রহণ করা হয়।

লুসাকা সম্মেলনে এবং কেরালা নির্বাচনের পূর্বে তিনি একটি রাজনৈতিক 'স্টাণ্ট' দেওয়ার জন্যই পার্লামেণ্ট রাজন্যবর্গের বিশেষ অধিকার বিলোপের বিল পাশ করতে না পেরে রাষ্ট্রপতির 'অধ্যাদেশে' এই কাজটি সম্পন্ন করেন। এরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করে শুধু ভারতীয় পার্লামেণ্টকেই অবমাননা করা হয়নি, ভারতীয় গণতন্ত্রের উপরেও এক প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যে উপায়ে রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করেছেন সেই পথের মাধ্যমে তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং 'স্টাণ্ট' রাজনীতির চাল সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আগামী পার্লামেণ্ট অধিবেশনে এরূপ স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা' পরিলক্ষ্যের বিষয়। সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রায়ত করে শ্রীমতী গান্ধী যেন ক্রমশ এক ডিকটেটরীর রাজনীতি অনুসরণ করে চলেছেন। কিন্তু একটি জরাজীর্ণ ও বৃত্তিজীবী রাজনৈতিক দলের পিঠে চড়ে এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির কাঠামোর উপরে নির্ভর করে, এই ডিকটেটরী রাজনীতি শ্রীমতী গান্ধীকে ক্রমশ ডুবাডুবির দিকে নিয়ে যাবে বলে আমাদের আশঙ্কা।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস
ধারাবাহিক রচনা

# বিস্ফোরণ

কালীচরণ ঘোষ

## কালাপানি

বিপ্লবী সংঘাত চলছে, ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করছে। গভর্ণমেণ্টও আপ্রান চেষ্টা করছে, কেবল রোধ করা নয় বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড এমন কি হিংসাত্মক মনোভাব কি ভাবে নির্ম্মূল করতে পারা যায়। যাঁদের অতিগুরু সাজা হ'লো, কোন রকমে দুজনে ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে গেলেন। কি অবস্থায় তাঁদের দিন কাটছে তার বিবরণ এখানে দেবার কথা নয়, কিন্তু এ প্রসঙ্গে কিছুটা বলা প্রয়োজন।

ইন্দুভূষণ রায়ের আত্মহত্যার কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। কারণটা একটু বিশদভাবে বলা যাক। গোলাকৃতি চৌকীদারী ঘর ( Watch Tower ) বা গম্বুজকে কেন্দ্র করে সাতটা স্বতন্ত্র তিনতলা একহারা লম্বা কোঠা বা ইমারত চলে গেছে। প্রত্যেকটি অপর হতে "জেল পাঁচিল" ( বিবরণ নিষ্প্রয়োজন ) দিয়ে আলাদা করা। সাতটার মধ্যে তিনটা একটু বড়। প্রত্যেক তলায় সারি বন্দী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আট ফুট করে স্বতন্ত্র কুঠুরী একনাগাড়ে চলে গেছে সংখ্যায় পঞ্চাশটি, সামনে একসারি টানা লম্বা দালান বা বারান্দা। আর তিনটি wing অপেক্ষাকৃত ছোট, সেল বা কুঠুরী সংখ্যায় পরত্রিশ, একই ধরণের সামনে টানা লম্বা দালান। বারান্দা বা দালানের খিলানের প্রত্যেক ফোকর বা ফাঁকটি লোহার মোটা ছড় দিয়ে বন্ধ করা। আলো-জল আসে, চড়াই চামচিকে গলে যেতে পারে ; জন্তুর মধ্যে বিড়াল হয়ত বা পারে।

সেলগুলির সামনের দিকে কপাট বা পাল্লা নেই। জেল-খানার মত শক্ত ছড়ের দরজা, দেয়ালের মধ্যে খোপ কেটে তালা-চাবি দিয়ে তাকে বন্ধ রাখবার পাকাপোক্ত রকম ব্যবস্থা। জানালা নেই আছে পিছনে প্রায় চৌকো এক গর্ত বা ফোকর, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দু'ফুট ও দেড় ফুট, জেলের নিয়মে ছড় বা শিক দিয়ে আঁটা উঁচু প্রায় ছাদের কাছাকাছি, দাঁড়িয়েও যাতে হাত না পৌঁছায়। আলো আসে নাম মাত্র ; বাইরে ঝড় বইলে বাতাস বাধ্য হয়ে খানিকটা ঢোকে। প্রচুর আসে জল, আর আন্দামানে বার্ষিক বারিবর্ষণ হ'লো ১২০ ইঞ্চি।

এখানকার জেলের প্রধান সুবিধা হ'লো দ্বীপটি চারিদিকে উত্তাল সীমাহীন সমুদ্র দিয়ে ঘেরা ; সাতশ আটশ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগর ও মাদ্রাজ। বর্ম্মা সওয়া বা সাড়ে তিনশ' মাইল হবে। পালাবার উপায় নেই, সুতরাং একবার পুরে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। ইন্দু রায়ের মত যে মরেছে মাত্র সেই-ই কারাদণ্ডের নির্দ্দিষ্টকালের পূর্ব্বে পালাতে সক্ষম হয়েছে, অপর একজনও নয়। দ্বিতীয় সুবিধে, সেখানকার কেনো সংবাদই কারও কাছে পৌঁছে দেবার উপায় নেই।

সুপারিণটেণ্ডেণ্ট অথবা জেলার কয়েদীদের প্রথম সম্ভাষণে

জানাতেন যে সেখানে 'বাঘ, সিংহ' হিংস্র জন্তুদের অক্লেশে বশীভূত করা হয়, সুতরাং 'সাবধান'। সর্ব্বপ্রথম কথা হ'চ্ছে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে একেবারে সাধআহ্লাদ দার্ঢ্যহীন নির্জ্জীব নিস্তেজ জীবিত জড়পিণ্ড করে ফেলার প্রক্রিয়া। তার জন্য জেলের আইন ছাড়া বে-আইনী যে-কোনো রকম অত্যাচার অনাচার প্রযুক্ত হতো; বাধা-নিষেধের বালাই ছিল না। দ্বিতীয় লক্ষ্য, জেলের আয় যেন ক্রমে বাড়তে থাকে, কয়েদীদের স্বাস্থ্য এমনকি প্রাণের বিনিময়েও।

দুর্দ্দান্ত বা অশান্ত কয়েদী বশ করবার প্রধান দুইটি যন্ত্র; এক, ঘানি; আর, দ্বিতীয়, নারিকেল ছোবড়া পেটাই এবং তাই থেকে নারকেল দড়ি বা 'কাতা' তৈরী করা। দুটোই শক্তিমান কয়েদীর পক্ষেও প্রাণান্তকর শ্রমসাপেক্ষ কাজ। দারুণ দুর্দ্দান্ত আসামীও জেলের এই দু'টি অতি 'সাধারণ' কর্ত্তব্যের নামে শিউরে উঠতো। আর যখন সম্ভ্রান্ত, হয়ত সমৃদ্ধ উচ্চ শিক্ষিত সাধারণ বাঙ্গালী ঘরে প্রতিপালিত হওয়ার কিছুটা স্বভাব-দুর্ব্বল আসামীকে এ কাজে "জুড়ে" দেওয়া হ'লে, তখন অবস্থা নিতান্ত বর্ণনাতীত হয়ে দাঁড়ায়। যার যা নির্দ্দিষ্ট কাজ দেওয়া হ'তো তার কোনো ত্রুটি হ'লে জেল আইনের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দায়ী ক'রে সাজা দেওয়া হ'তো। এছাড়া অপরাধ আবিষ্কার করবার অফুরন্ত কৌশল বর্ত্তমান। কাজে অবহেলা (বোমার আসামীদের মধ্যে) পরস্পরে কথা বলা, জেলের অতি ক্ষুদে ওয়ার্ডার, পেটি আফিসার টিণ্ডাল প্রভৃতির "আজ্ঞা" অবহেলা বা পালনে বিলম্ব, মুখে মুখে উত্তর, মার খেয়ে প্রতিবাদ, ইত্যাদি সবই নতুন 'অপরাধ'। 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি'টি মাত্র।

যেমন অপরাধের তালিকা অফুরন্ত, সাজা-শাস্তিও ছিল সীমাহীন, বৈচিত্র্যে একেবারে তুলনাহীন। পান থেকে চুণ খসতে হ'তো না, খসবার সম্ভবনার আন্দামানের আবহাওয়ার সামঞ্জস্য রেখে বৃষ্টির ধারার মত কিল, চড়, লাথি, গলাধাক্কা, গলার হাঁসুলি ধরে টেনে ফেলে দেওয়া প্রভৃতি 'দাওয়াই' সদ্য সদ্য প্রযুক্ত হ'তো; এর জন্য 'অফিসার' জেল কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত ওপারে যেতে হ'তো না।

নির্জ্জন কারাবাস ত ছিলই। কুঠরীর ভেতরেই বা দালানের কোন স্থানে মোটা শক্ত তারের জালের খাঁচা তৈরী করে তার ভিতর হিংস্র পশুর মত বন্ধ করে রেখে দিন-মাস-সপ্তাহ নয়, বছর গড়িয়ে গেছে। তার মধ্যেই কয়েদীর জীবনাবসান হয়েছে।

সর্ব্বাপেক্ষা নিরীহ ও ব্যাপক বিধি ছিল কুঠরীবদ্ধ ও কঞ্জি সেবন। পোকা-ধরা চালের গুঁড়া গরম জলে গুলে দেওয়া, লবণ ও মিষ্টিহীন বস্তু হ'চ্ছে 'কঞ্জি'। সাধারণ পথ্যও এরই "মাসতুতো ভাই"। উপেন্দ্র নাথ (নির্ব্বাসিতের আত্মকথা) পরিচয় দিয়েছেন "রেঙ্গুন চালের ভাত ও মোটা মোটা রুটি, এ না হয় একরকম চলে, কিন্তু কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুপড়ি আলু, খোসা সমেত কাঁচকলা ও পুঁইশাক, ছোট কাঁকর আর ইঁদুর নাদি এক সঙ্গে সিদ্ধ" এই হলো সাধারণ পথ্য। তার সঙ্গে চড়-চাপড়, লাথি, দাঁত-খিচুনি ছিল অতিরিক্ত লাভ, 'চাটনী" বল্লেই হয়।

ডাণ্ডা বেড়ী কথায় কথায়। সঙ্গে ছিল দাঁড়া হাতকড়া। পায়ে বেড়ী যুক্ত অবস্থায় ছোবড়া পেটা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কাজ করতে বাধ্য করায় ছিল বাহাদুরী। অকথ্য গালিগালাজটা ফাউ; 'একট্রা' লাভ। এসকলের সঙ্গে সহাবস্থান—আন্দামানী ম্যালেরিয়া আর আমাশয়। ডাক্তাররাও ছিলেন প্রায় সকলেই বাঙ্গালী সুতরাং বাঙ্গালী কয়েদীর অসুখ হ'লে তাঁদের প্রায় ডাক দেওয়া হতো না; প্রায় বিনা চিকিৎসা বা হাতুড়ে ব্যবস্থায় চলন ছিল। কয়েদীর 'রোগ' অর্থাৎ সেটা 'ছুতো' এই 'রোগ' নিরাময়ের ব্যবস্থা জমাদার, ওয়ার্ডার, টিণ্ডালরা নিজ হাতেই রেখে দিয়েছিল।

মানুষের মাথায় নিপীড়ন নির্য্যাতনের যত রকম ফন্দী যোগাতে পারে, দেশ বিদেশের কারাগারে 'বাঘ' বশ করার যতরকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে সে সকল আবিষ্কার বা শিক্ষা

লাভ করার জন্য আন্দামান থেকে অফিসাররা সরকারী ব্যয়ে 'ডেপুটেশনে' যাবার খবর জানা নেই, কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তিতে এরা কারও চেয়ে কম যান না। একটু কড়া মাত্রার অপরাধী হলে, যেমন জেলর বা সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে বাদানুবাদ একটি বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। একটা "তে কাঠা" (triangle), যদিও লোহার ঢালাই, বা whipping-rack-এ খুব টান করে একসঙ্গে হাত দুটো যতদূর সম্ভব মাথার ওপর উঁচু করে টেনে হাতকড়া লাগিয়ে এবং পা দুটো যতটা যায় ফাঁক করে তে-কাঠার পায়ার সঙ্গে আটকে উলঙ্গ করে দশ-বিশ-ত্রিশ ঘা বেত মারা হতো। রক্ত ঝরছে, সংজ্ঞাহীন হ'য়ে মাথা ঝুলে পড়ছে, হাত কড়ায় বাঁধনে দেহ মাটিতে পড়তে না পেয়ে ঝুলছে—কিন্তু তখনও পাঁচ ঘা বাকী—যখন গুনতিতে মিললো বিশ ঘা তখন বাঁধন খুলে নির্দ্দিষ্ট কুঠুরীতে ধরাধরি করে ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত। যাদের জেলের বাইরে settlement একাজ দেওয়া হতো, তাদের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। রৌদ্র বর্ষা-জোঁক পরিবৃত-হয়েও কাজ ওঠাতেই হ'তো। তার ওপর ছিলনা আহারের নিশ্চয়তা। সবদিন হয়তো যোগাড় ক'রে নেওয়া সম্ভব হ'তো না।

সব-রকম হীন অত্যাচার মিলিয়ে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে ইন্দুভূষণ রায়ের মত আরও কয়েকটা আত্মহত্যা ঘটেছে। পিটিয়ে মারা হয়েছে পাঞ্জাবী শিখ কয়েদীর কয়েকজনকে। তাছাড়া নির্ম্মম প্রহারের ফলে রক্তবমন হয়ে মরেছেন, আঘাতজনিত যক্ষ্মা ( traumatic pthisis ) হ'য় মরেছেন আরও কত। পাগল হয়েছেন অত্যাচারে অনেক; হিসাব করলে তালিকা নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়ার কথা নয়। যে-কোনো অত্যাচার-যার মুখের হাসি, মনের তেজ কেড়ে নিতে পারেনি সেই উল্লসকর-দত্তকে এরা পাগল করে দিয়েছিল। জেলের বাইরে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে তাঁকে কাঁচা মাটি থেকে ফর্ম্মায়ি ফেলে 'ইট কাটবার' হুকুম হয়। তিনি তাতে সম্মত না হয়ে জেলের মধ্যে ফিরে আসেন। এতবড় অপরাধ, বিনা শাস্তিতে ত নয়ই, লঘু শাস্তি দ্বারা রেহাই দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাতদিন 'দাঁড়া হাতকড়া', অর্থাৎ সটান দাঁড়িয়ে হাত সম্পূর্ণ উঁচু করলে যেখানে পৌঁছায়, সেইখানে দেয়ালের গায়ে হাত-কড়ি লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। শরীর আগেই দুর্ব্বল ছিল। ঐ অবস্থায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় হয়ে তিনি হাতকড়ি অবলম্বনে ঝুলতে থাকেন। যন্ত্রণা বোধেরও শক্তি অন্তর্হিত হয়েছে। সকালে যখন হাতকড়ি থেকে মুক্তি পেলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থাতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান হ'লো তখন তিনি বিকট উন্মাদ।

বোমার মামলার আসামীরা পৌঁছুবার পর মহারাষ্ট্রের কয়েকজন নেতা হাজির হলেন। কত ব্যথা-বেদনা, নির্যাতন, নিপীড়ন, দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দ্বীপটিকে ঘিরে উঠলো তার ইয়ত্তা নেই। কত মাতা ভগ্নী পত্নী কন্যার অকূল চিন্তা, মাঝে মাঝে চোখে দেখবার উদগ্র বাসনা, একটা সংবাদ পাবার জন্য বুককাটা উৎকণ্ঠা, বন্দীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অশান্ত মন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঝড়ের তাণ্ডবে সমুদ্র অপেক্ষা বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত হয়ে থাকতো, তৃণ অপেক্ষা সংখ্যাতিরিক্ত কত চিন্তা কারাগৃহের অন্তর বাহির আচ্ছন্ন করে থাকতো তার হিসাব করা সম্ভব নয়। অনাগত-অমঙ্গল-আশঙ্কা-মথিত নিঃশ্বাস সুদূর দ্বীপের আকাশ বাতাস ভারি করে ফেলেছিল। তাতে ইংরেজের সাম্রাজ্যের প্রকাশ্য ক্ষতি কিছু হয়নি। বাঙ্গালীর মধ্যে কয়েকটি পরিবারের মাত্র কয়জন লোক সংসার থেকে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের আগুন এতে বাত্যা সংযোগ করেছিল।

বাইরে খবর আনতে পারনি, এসেছে অতি ক্ষুদ্র ছিন্ন সংবাদের টুকরো। কিন্তু জেলের 'শান্তি' ক্ষুণ্ণ হতে আরম্ভ হলো এইসব কয়েদীদের আবির্ভাবে। জেলের দরজায় পদার্পণের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদ মনের মধ্যে

গজিয়ে উঠেছে। নবাগতদের দৈহিক অত্যাচার সাহায্যে মনকে দুমড়ে কাদার তাল করা এক পক্ষের ইচ্ছা, আর এক শক্তি তাকে প্রতিরোধ করতে বদ্ধ পরিকর। তখন দুই পক্ষের মনের জগতে

"বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়;
ভ্রূকুটির সনে গর্জ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।"

রাজনৈতিক বন্দী নিয়ে এ খেলা চলেছে ১৯১০ থেকে; সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি যতদিন না সেলুলার জেলে রাজনৈতিক কয়েদী পাঠানো বন্ধ হয়েছে। সেকথা বলবার সময় এখনও আসেনি।

## জোয়ার ভাঁটা

জগতের ঘটনার স্রোতে, নদীর মত, জোয়ার ভাঁটা চলছে। একটানা ভাল বা নিরবচ্ছিন্ন মন্দ কখনও থাকে না। অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। যেখানে শক্তির দ্বন্দ্ব সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে জয়-পরাজয়ের রৌদ্র মেঘের খেলা চলে।

স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে শাসক ও শাসিত দুই দলের শক্তির পরীক্ষা সামনে চলতে থাকে। কখন কে প্রবল হয়ে প্রতিপক্ষকে নিঃশেষ করে ফেলবার অবস্থায় এনে ফেলতে পারে সে কথা বলা যায়না। পাশার কাঠিতে কখন যে হাত খোলার দান পড়তে থাকবে কারও জানা নেই। অত্যাচারী শাসক দুর্বলকে বিব্রত করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও নিঃসংশয়ে জয়ী হ'তে পেরেছে ইতিহাস সে কথা বলে না।

বাঙ্গলার বৈপ্লবিক আন্দোলন ও ক্রিয়াকলাপ এ পর্য্যন্ত সে-শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি যাতে ইংরেজ শাসক খুব বিব্রত হয়ে পড়ে। সংগ্রামের সম পর্য্যায়ে উঠতে না পারলেও বিপ্লবীরা কতদিন শত্রুকে যে ভীত ত্রস্ত চিন্তাকুল করে ফেলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঠেলাঠেলি চলছে দুপক্ষে। এ সময়ের পরিস্থিতিটা কিছুটা যেন হুবহু চিত্রিত করেছেন লেখনী সাহায্যে রুশ-ঐতিহাসিক জিলিয়াকস (Konnie Zilliacus), রুশরাজ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থান অবলম্বন করে।

রুশ বিপ্লব' পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন (আগষ্ট ১৯০৫): মহামান্য সম্রাট পিটার (Peter the Great)-এর আমল থেকেই রুশ নাগরিক ভয়াবহ বিপ্লবের পন্থা অনুসরণ করে চলেছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে এ শক্তিরোধ করা যায়নি। কখনও মনে হয়েছে বন্যা কূলের যতখানি প্লাবিত করেছিল তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; আবার প্রবলতর বিক্রমে ফিরে এসে যে সকল অঞ্চল ইতোপূর্ব্বে স্পর্শ করেনি, এখন তাও ছাপিয়ে যাচ্ছে।

এক নায়কত্বের অত্যাচার হতে উদ্ধার পাবার পথের কাহিনী মূলতঃ একই। দয়ালেশহীন দুপক্ষের সঙ্ঘর্ষ। একপক্ষের সেন্সর (গোপন পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ), কারাগার, ডাণ্ডাপ্রহার এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসন; আর অপর দিকে গুপ্তঘাতকের শানিত ছুরিকা, বোমা প্রভৃতি হাতিয়ার। এ কাহিনীর তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে মন বেদনায় ভরে ওঠে। বয়স্করা কর্মস্থল থেকে যেমন অন্তর্হিত হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর এমনকি কিশোরীকে পর্যন্ত স্বাধীনতা লোপ, অবধারিত মৃত্যুর পথে যে ভাবে টেনে আনছে তাতে মন গভীর শ্রদ্ধায় ও প্রশস্তিতে ভরে ওঠে।

বিপ্লবীরা যথেচ্ছাচারকে প্রায় সমাধির কিনারে এনে উপস্থিত করেছে এবং শীঘ্রই তার ঘৃণিত অস্তিত্ব এই কবরের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাবে।

তাঁর রুশ ভাষায় লিখিত পুস্তকের ইংরেজী তর্জ্জমা নিয়ে দেওয়া হ'লো। দুবার অনুবাদে (রুশ থেকে ইংরেজি আবার ইংরেজী থেকে বাঙ্গলা) মূলের ভাব ও ভঙ্গি কতকটা ক্ষুন্ন হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং ইংরেজী অনুবাদটা নিম্নে প্রদত্ত হ'লো:

"From the time of Peter the Great there has been this grim march towards revolution. There have been constant checks. Now and again the tide has seemed to go sweeping back from the shore that it had invaded, but has always returned flowing over areas it had left untouched before

"The main outlines of the story of the war against autocracy are familiar enough. It has been a struggle without mercy on either side, with the censorship, the prison, the knout, and Siberia as the weapons of one party, and assassins, dagger and the bomb as the final appeal of the other. The story is one that cannot be read without pain, without admiration for the manner in which men and women, and even boys and girls, have quietly taken up work which meant loss of freedom or of life as their comrades have been ramoved out of the ranks.

"Tha revolutionaries have gradually forced autocracy to the brink of the grave, whither it is bound ignominiously to descend is no distant future."

### ১৯০৮—১৯০৯ সালের নবনেতৃত্ব

প্রথম উদ্যমের লক্ষণ স্বরূপ কয়েকটা বিপ্লবী সংঘটন হয়েছিল ; পরে কমবেশী হিসাবে চলেছেও কিছুদিন, কিন্তু বিপ্লবী সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে বেশ আঘাত খেয়েছিল। বারীনের সঙ্গে তীব্র মনোমালিন্যে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় নিলেন রণাঙ্গন থেকে। আলিপুর বোমার মামলায় বারীন উল্লাসকর প্রভৃতি দীর্ঘ কারাবাসে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অপসৃত হলেন। পুলিন দাসের ওপর বিষ নজর পড়েছে, নানারকমে তাঁকে "দাগী" করে রাখছে যাতে যুবকদের অভিভাবকরা পুত্র আত্মীয় বন্ধুকে তাঁর সঙ্গে মিশতে না-দেন ; যুবকরাও ভয় পেয়ে দলে আসা থেকে নিরস্ত হয়। তিনি প্রেরিত হলেন নির্বাসনে, অরবিন্দ গেলেন পণ্ডিচেরী, হ'লো রাজনীতি থেকে তাঁর চির অবসর। আর আদি শূর পি. মিত্র করলেন মহাপ্রস্থান।

নেতৃহীন হয়ে পড়লো দলগুলি। এ সময় যাঁরা এগিয়ে এসে হাল ধরে নিমজ্জমান তরণী ভাসিয়ে রেখেছিলেন, তাকে কর্ম্মপটু করে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদের শিরোমণি হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি যখন ভার নিলেন তখন বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান রাজরোষে বিপর্যস্ত হয়ে গোপনে প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।

## মাকে ভাবতে গেলে যেমন : শান্তি লাহিড়ী

তোমার বুকের জলোচ্ছ্বাসে কেবল ডুবছি-ভাসছি-ডুবছি।
দূরের জানালা খোলা পেলেই কয়েক হাজার বছর আমায়,
ছুটে এসে বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত বাড়ায়
আকুল হয়ে, সমর্পণে তাদের যদি দেখতে পেতে !

পূর্বজন্ম ফুলের মালায় এক এক হয়ে তাকিয়ে আছে।

মনে পড়ে না তোমার বুঝি, তুমি লজ্জাবতীর পাতায়
আমার নাম লিখতে গিয়ে যেই না ওদের ছুঁয়ে দিলে—
জড়িয়ে গেল পাতাগুলি, কেন অমন অবাক হলে
লজ্জাবতীর পাতার উপর আমার নাম লেখা হল না।
পুতুল খেলার দুপুরবেলা, জানি তোমার প্রথম বুকে
একটা অচিন পাখির পালক রেখেছিলাম অতর্কিতে,
রঙিন পাখির সেই পালকে আলতো ঠোঁটের চুমো খেলে
মেহগিনির বনের মধ্যে ফিরছি তখন হরিণ খুঁজে
হঠাৎ তোমার কি যে হল বনের মধ্যে মনের মধ্যে
শিরায় রক্ত রং ফেরালো—হঠাৎ তোমার কি যে হল,
যেন তোমার বিয়ের পিঁড়ি পুড়ে গেল দাবানলে
তোমার শরীর জড়িয়ে আছে বেনারসীরে পাড়ে যে সাপ—
কালো সর্বনাশের দিকে এগিয়ে গেলে দু এক পাতা,
অস্তমিত সন্ধ্যাকালে সানাই বাজলো সাহানাতে।

তোমার তখন কি হল মা, অন্য নামে সপ্তপদী,
কোনক্রমে মুখচন্দ্রা কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে,
বধুবরণ-তোমার চোখে ঝাপসা দূরে বৃষ্টি-মাখা
পাহাড় যেন—এখান থেকে ওখানে কি দেখা যায় না,
তুমি আবার ফিরে গেলে জলের কাছে দীঘির ঘাটে।

তুমি কি সেই স্বয়ংবৃত মাটি আমার ? তোমায় পেলে
কেন যেন বোধের মুক্তি, ব্যাধির মুক্তি, ইন্দ্রিয়াতীত
সুখের মুক্তি—তোমায় পেয়ে কেয়ার বনে ফুলে গন্ধ।
তুমি কি সেই খেলনা-নুড়ি যা হারালে কান্না আসে
পুবের দিকের জানালাগুলি ককিয়ে ওঠে ঝড়ের তোড়ে,
দেয়াল জুড়ে পুরনো সব সাতপুরুষের ছবিগুলি
ঝন্‌ঝনিয়ে মেঝেয় পড়ে বাজে ঝরাপাতার মত।
তুমি মাটির অতল আঁধার, তোমার গর্ভে সেই পৃথিবী,
সেই পৃথিবী, যেখানে কেউ—কোন মানুষ নামের মানুষ
সেই, সেখানে সবে সবুজ পাতার আলো শিলাস্তরে।
কোথায় তোমার সবুজ শাড়ি, কোথায় তোমার পায়ের নূপুর
কোথায় তোমার বেহালামন একটা করুণ সুরের চাপা
ককিয়ে ওঠে, ব্যথায় বাজে রক্তজবার তাকিয়ে থাকা
কোথায় তুমি সহজ বিকেল—নদীর পারের সহজ বিকেল।

মা, তুমি কি প্রকাণ্ড সেই মস্ত জমিদারের বাড়ি
দেউড়ি বোঝাই সেপাই থাকে, সামনে গজাল-পেটা ঘড়ি,
সু-বিস্তৃত পাম এভিনিউ, পদ্মফোটা বাঁধানো ঘাট,
ঢাকের বাজনা রোজই বাজে, সৈন্যেরা সব যুদ্ধ বাধায়
তুমি কি সেই রাজার বাড়ি গা ছমছম দেউড়ি পেরোই।
না, তুমি সেই দীর্ঘ প্রবাস বিষাদ-দুপুর শিকের আড়ে।
কপাল কোটে, রক্ত মাখে, হতাশ্বাসে হাতের রেখায়
এলোমেলো নদীরেখায় অবিন্যস্ত ভবিতব্য
ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে কখন থেকে মরছে ঘুরে।
আমি যে তোর ডাকের বাক্সে ফেলা চিঠি পৌঁছে দিতে
কোথায় থেকে কোথায় এলাম জানি কি মা স্বদেশ প্রবাস ?
আমি যে তোর উড়ে যাওয়া হীরামনের দেখা পাব
আমি যে তোর সমস্ত সুখ ফিরিয়ে দেব মুঠোয় ক'রে।

বৃষ্টি হ : চিত্ত ঘোষ

হৃদয় রে তুই বৃষ্টি হ
সোনার কলস উপুর কর
নীল ঢেউএর সমুদ্র।
ফলবতীর গুণবতীর
লাল কমল আনন্দ।

হৃদয় রে তুই গাছের পায়ে
নূপুর বাঁধ
ঢেউএর মত ফুলে উঠুক
চাষীর কাঁধ।

হৃদয় রে তোর গল্পটা
অন্ধকারে বিদ্যুতের হাত বাড়িয়ে
ফেলে দেরে স্বপ্নটা।

হৃদয় রে তুই বৃষ্টি হ
সোনার কলস উপুর কর
নীল ঢেউএর সমুদ্র
ফলবতীর গুণবতীর
লালকমল আনন্দ।

## চেতনায় মননের নেই অন্ধকার : জয়ন্ত সাহা

চেতনায় মননের নেই অন্ধকার
আত্মগোপনের ; দীপ্ত চেতনা তোমার
সহজ সিঁড়ির ধাপে জটলা জটিল
দু'দিকেই পদক্ষেপ, অবিরাম গতি বিসর্পিল।

তীব্রতম আকর্ষণ নীচের তলায়
দেওয়ালে টাঙানো ছবি সূর্যাস্তের ; জীবন জুয়ায়
বালিয়ারী ছয় উপকূলে
সম্মোহনে ভুলে
দ্বি-সত্তা বিপ্লব দ্বন্দ্বে লিপ্ত ; যাদুকর
বার বার ছোড়ে তীক্ষ্ণ শর।

শুধু মাত্র অন্তরায় চেতনা-বিন্যাস
তোমার আমার সহবাস।
তোমাকে অমান্য করা সহজ অথচ সারাক্ষণ
মন্দার গাছের সঙ্গে নিভৃতে নিরন্ধ্র আলিঙ্গন।

"কোন মানুষ
বা কোন দেশ
অন্যকে ঘৃণা করে
বাঁচতে পারেনা"

স্বামী বিবেকানন্দ

# বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র : ১০

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একান্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে মুখ্যত উন্মোচন করেছেন তেমনই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উপস্থাপন করেছেন বঙ্গালী জীবনের বিরাট বৈচিত্র্যকে। দুজনে বাল্যবন্ধু এবং একই সঙ্গে দুজনে সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন আর সে-সাধনাতে ছিলেন একে অপরের প্রধান উৎসাহদাতা। 'বাঁকালেখা' নামে একটি উপন্যাস, যার মধ্যে মনীন্দ্রলাল বসুর প্রভাব দেখা যায়, দুজনে যৌথভাবে রচনাও করেছিলেন : এইটেই দুজনের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। কিন্তু তারপর থেকে দু বন্ধুর পথ দুদিকে বেঁকে গেল, আপন আপন স্বভাবের প্রেরণায় দুজনে দুরকম উদ্দেশ্য ও উপায় নিরূপণ করলেন। কালচেতনাই প্রেমেন্দ্রর মৌল বোধ যেমন অচিন্ত্যকুমারের দেশচেতনা অর্থাৎ প্রথমজনের কাছে সত্তা আর অপরজনের কাছে বস্তুই অপেক্ষাকৃত বেশী সত্য। এজন্যেই ছোটগল্পের গতির সঙ্গে 'অফুরন্ত' নামে গল্পটির শুরুতে প্রেমেন্দ্র মিত্র নদীর স্রোতের তুলনা করেছেন, পক্ষান্তরে প্রথম 'শতগল্পে'র ভূমিকাতে অচিন্ত্যকুমার নিদিষ্ট বিন্দুতে সমাপ্য ছোটগল্পের ধারণাতে লিখেছেন, "ছোটগল্পের যদি কোনো জ্যামিতিক চেহারা থাকতো তবে সে সরলরেখা হতো না, হতো বৃত্তরেখা। গল্প যদি খালি সোজা চলে তবে হয় সে শুধু বৃত্তান্ত, কিন্তু যদি চলে বৃত্তরেখায়, তার বৃত্তের অন্তে সে হয়ে ওঠে সত্যিকারের ছোটগল্প। যেখানে বৃত্ত যত বেশী সম্পূর্ণ সেখানে ছোটগল্প তত বেশী সার্থক।" এজন্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের শুরুটা বিশেষ তাৎপর্যময় : সে-শুরু যেন সমগ্র গল্পের বীজমন্ত্র, তার উচ্চারণেই লেখকের সম্মুখে উন্মোচিত হয় মানবমনের রহস্যময় প্রাসাদে প্রবেশের গুপ্তদ্বার। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের কাছে শুরুর চাইতে সারাটাই বেশী রোমাঞ্চকর : এক-একটি গল্পকে শেষ করার তাঁর যে-কৌশল তাতেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে জন্ম দেয় এক-একটি সার্থক ছোটগল্পের। অর্থাৎ সমাপ্তিতেই নিহিত থাকে অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকাশের মৌল বিশেষত্ব।

আবাল্য অসুস্থতার দরুন ও বিচারবিভাগীয় সরকারী চাকুরির চাপে অচিন্ত্যকুমারকে জীবনের একটা বড়ো অংশ রুদ্ধকক্ষে কাটাতে হলেও তাঁর রচনায় সামাজিক উপাদানের উদার বিস্তার বিস্ময়কর। যেমন করে ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারের মধ্য দিয়ে আলোকচিত্রী দৃশ্য খোঁজেন সেভাবে তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করেন আপন রুদ্ধকক্ষের বাইরে এবং যেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ সক্রিয় অংশ নেই, যে-নাটকের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনও সুস্পষ্ট সম্পর্ক নেই, সেখানে তিনি বিচারকের মতো নিরপেক্ষ চিত্রগ্রাহক মাত্র, সেখানেও তিনি মনে মনে বা কল্পনাতে অংশ নেবার উন্মাদনাতে, স্বদেশের বাস্তবকে অকাতরে সন্তোষের আনন্দে ছোটগল্প লিখেছেন। অচিন্ত্যকুমারের যাত্রা মনস্তত্ত্বের অন্ধকার অন্তহীন অলিগলিতে নয়, মানবজীবনের আলোকিত ঘটনাবহুল মাঠে ঘাটে রাস্তায়:

আবরণের চাইতে আহরণেই, উন্মোচনের চাইতে উপস্থাপনেই তাঁর স্বাভাবের স্ফূর্তি।

অচিন্ত্যকুমারের প্রথম বিখ্যাত গল্প 'দুইবার রাজা' উনিশ শ তেইশ কি চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল। গল্পের নায়ক অমর হাঁপানির রুগি, বি. এ. পড়ে, সুপারিশ নেই বলে কলেজে বিনা খরচে পড়ার সুবিধে পায়নি, এতদিন তাই পড়ার খরচ চালিয়েছে মায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে, কিন্তু ইদানীং সেভাবেও আর সংসার চালানো যাচ্ছে না। অগত্যা অনেক কষ্টে যদি বা সে গৃহশিক্ষকের কাজ জোগাড় করল সেটাও টিকল-না, ছাত্র কিশলয়ের কাব্যপ্রীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সে বিতাড়িত হলো, উপরন্তু তার বাকি বেতন বাজেয়াপ্ত হলো অরিমানা হিসেবে। স্বাভাবিক জীবনের সমস্ত দরজা চারিদিকে বন্ধ দেখে অমর শেষপর্যন্ত দুবছর পড়ার খরচ আর নগদ হাজার খানেক টাকার বিনিময়ে বিয়ে করল কুরূপা এক মেয়েকে। বিয়ের দিন তাকে ঘিরে সমস্ত আয়োজন, তাই সেদিনকার জন্যে সে রাজা আবার কদিন পরে যখন দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে শববাহকদের কাঁধে চড়ল তখন তাকে ঘিরেই সমস্ত আয়োজন, তাই সেদিন সে দ্বিতীয়-বার রাজা হলো। এগল্প যে ভাবপ্রবণতায় ভরপুর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তলিয়ে ভাবলে মানতেই হবে যে 'দুইবার রাজার নায়ক অমর প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের অতল অকৃতার্থতা ও শোচনীয় হতাশার প্রতিমূর্তি। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য, এই নিষ্ঠুর অথচ মনোহর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটু সুযোগ পাওয়ার জন্য তার কী দুর্মর আকুতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে যে-বিপর্যয় ঘনাতে শুরু করে তার প্রথম দৃষ্টিগ্রাহ্য লক্ষণ দেখা দেয় বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থানের অভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে এই লক্ষণ এমন একটা সর্বজনীন রূপ লাভ করে যে তার অভিনবত্ব ক্ষয়ে যায়, সাহিত্যের পক্ষে তা হয়ে ওঠে মামুলি প্রসঙ্গ। কিন্তু এই অজ্ঞাতপূর্ব অর্থনৈতিক তথা সামাজিক সংকটের লক্ষণটির প্রথম আবির্ভাব যে বাংলার তরুণ-মানসে কতদূর উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য-কুমার, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখের তৎকালীন রচনায়। 'দুইবার রাজা' গল্পটির মুখ্য প্রসঙ্গই হলো অর্থনৈতিক; অমর তৎকালীন মধ্যবিত্ত বিপর্যয়ের ফাঁদে বন্দী অসহায় শিকার। অমরের সমগ্র অস্তিত্বটাই এক মস্ত বিড়ম্বনা এবং তার জীবনের অর্থহীনতা প্রদত্তকালের বাঙালী শিক্ষিত যুব-সমাজের এক বিশেষ মনোভঙ্গির থেকে রূপ লাভ করেছে।

অবশ্য কুমোরের চাকের উপরে রাখা কাদার তাল কুমোরের হাতের স্পর্শে যেভাবে বিশেষ আকার বা রূপ লাভ করে 'দুইবার রাজা' সেভাবে রূপ লাভ করেনি। গল্পটির শেষে অমরকে দ্বিতীয়বার রাজা বানিয়ে অপ্রত্যাশিতের যে-চমক অচিন্ত্যকুমার সৃষ্টি করেছেন তাতে সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রচ্ছন্ন আছে বটে, কিন্তু এই সমাপ্তির অনিবার্যতা গল্পটির প্রারম্ভিক অংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে গল্পটি কী ভাবে শেষ করবেন তার কোনও আভাস বা ইঙ্গিত গল্পটির প্রারম্ভিক অংশে লেখক দিতেই চান নি এবং যেটা লেখকের উদ্দেশ্যর অন্তর্গত নয় বলে বোঝাই যাচ্ছে সেটার অভাব নিয়ে কোনও অভিযোগও অচল। 'দুইবার রাজা' গল্পটিতে অমরের সম্বন্ধে যে-তথ্যসমষ্টি পরিবেশন করা হয়েছে তার পরিমাণ বা সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে গল্পটির পরিণামের তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হয় কি হয় না এটাই আমার প্রশ্ন। যদি দেখা যায় যে ওই হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ওই তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হয় না তাহলে মানতেই হবে যে ছোটগল্প রচনার বিশেষ শিল্পকৌশলটি 'দুইবার রাজা' গল্পটিতে পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি।

'দুইবার রাজা' প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের বাঙালী মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিড়ম্বিত ও অর্থহীন অস্তিত্বকে তীব্ররূপে প্রকাশ করেছে বলেই এ-গল্প খুঁটিয়ে পড়া দরকার।

সেভাবে পড়লে দেখা যায় যে এ গল্পের বাকভঙ্গিতে ও ঘটনাবলীর বিন্যাসদক্ষতা ও শিল্পনৈপুণ্যের চাইতে উপস্থিত পরিবেশের প্রভাবজনিত বিহ্বলতা এবং সমাজযন্ত্রণার দরুণ অস্থিরতাই প্রকটতর অর্থাৎ ঘটনাবলীর পারম্পর্যের মধ্যে ব্যঞ্জনাময় অমোঘতা নিষ্ক্রিয়। প্লেটো, সেলি, বার্নাড শ প্রমুখ স্বপ্নদ্রষ্টার পাশাপাশি বায়রন, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি অসূয়কতাবাদীদের নাম উল্লিখিত হয়েছে আবার কিশলয়ের মনে অমর যাঁদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাতে চেয়েছে তাঁদের মধ্যে স্ব-স্ব কালের জীবনে বিশেষভাবে দগ্ধ ও বিদগ্ধ নুট হামসুন, ডস্টয়ভস্কি, গোর্কি প্রভৃতি সাহিত্যিকের নাম আছে। এসব বরণীয় মনীষীদের ও সাহিত্যিকদের নামোল্লেখে গল্পের রস কিংবা তাৎপর্য স্বতন্ত্ররূপে সমৃদ্ধ হয়নি, কিন্তু পরিবেশিত তথ্যের অন্তরালে লেখকের মন, আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গি স্পষ্টতর হয়েছে। এখানে গোর্কির নামোল্লেখ আরও বেশী অর্থপূর্ণ এজন্যে যে ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার আগে পর্যন্ত রুশ বিপ্লব, বিপ্লবের নেতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাগ্রসর বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও অল্পই ওয়াকিবহাল ছিলেন, অথচ সদ্যতরুণ অচিন্ত্যকুমার গোর্কির নাম উচ্চারণ করেছেন সর্বজনবিদিত ব্যক্তির নামের মতো অনায়াসে। পশ্চিমের আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি প্রবেশ করেছিলেন অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণোদনায়। প্রকৃতপক্ষে প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যিক তথা সামাজিক আদর্শকে অতিক্রম করে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন একটা বোধকে অধিকার করার জন্যে একটা প্রবল তাড়না অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে কাজ করছিল এবং সামগ্রিকভাবে একান্ত শিল্পগত প্রশ্নকে প্রাধান্য বা সমমূল্য না দিয়ে উপস্থিত পরিবেশগত সমস্যাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

অচিন্ত্যকুমারের প্রথম জীবনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলি একই লক্ষণে আক্রান্ত। তিনি নিজেই যাকে 'কল্লোল যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন তাঁর ওই ছোটগল্পগুলি সেই যুগেরই অন্তর্ভুক্ত। এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্যকে তিনি নির্ণয় করেছেন 'বিহ্বল ভাববিলাসিতা' বলে এবং ওই বৈশিষ্ট্য তাঁর উল্লিখিত পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিরও বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় যে এই পর্যায়ের অধিকাংশ ছোটগল্পের পাত্রপাত্রীই শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্গত এবং অধিকাংশ ছোটগল্পই যেমন, 'অরণ্য', 'অমর কবিতা', 'ধ্বন্তরি' ইত্যাদি, তাঁর পরবর্তী বা পরিণতকালের ছোটগল্পগুলির তুলনাতে রীতিমতো দীর্ঘ। এই দৈর্ঘ্য যে সবসময় গল্পের নিজস্ব দাবিতেই সম্পন্ন হয়েছে এমন নয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে 'অরণ্য' তৎকালীন সমাজ-সত্যের দিকনির্দেশে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রচনা। যে-মূল্যবোধের ভিত্তিতে একদা একান্নবর্তী পরিবার-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল বাংলার নাগরিক জীবনে তার অবক্ষয় শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, অথচ ব্যক্তিকে একক হিসেবে গণ্য করে নতুন পরিবার-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে যে-মূল্যবোধের প্রয়োজন হয় তা ঔপনিবেশিক সমাজে অলীক, ফলে তেমন সমাজে একান্নবর্তী পরিবার-ব্যবস্থা দেউলে দশায় টিঁকে থাকে এবং পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক গ্রথিত হয় একটা কল্পিত বিশ্বাসের সূত্রে। 'অরণ্য' গল্পে অচিন্ত্যকুমার এরকম একটি একান্নবর্তী পরিবারের আপাত সংহতির পেছনে খণ্ডবিখণ্ড জীবনকে উপস্থাপন করেছেন অবিকল ভাবে এবং ছোট গল্পটির মধ্যে চিত্রগুলির খণ্ডতা উপজীব্য জীবনের খণ্ডতাকেই প্রকট করেছে অর্থাৎ আধার এগল্পে আধেয়রই উপযুক্ত।

কিন্তু সন্দেহ হয় যে 'অরণ্য'-তেও অচিন্ত্যকুমার স্বকীয় সাহিত্যিক সত্তাকে সম্পূর্ণ খুঁজে পাননি, এখানেও তিনি কিঞ্চিত অনিশ্চিতভাবে আপন মার্গ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কাহিনীর শেষাংশে যখন সমগ্র পরিবারের মধ্যে একমাত্র অকপট চরিত্র দুরন্ত বালক রুশ উড়ন্ত ঘুড়ি ধরতে গিয়ে

ছাদের উপর থেকে সরাসরি নিচের উঠানে পড়ে মারা গেল তখন তার সেই শোচনীয় মৃত্যু একটিবারের জন্যে বাড়িসুদ্ধ সকলকে একই অভিভূত অভিজ্ঞতার পৈঠায় এনে দাঁড় করিয়েছে। রুশের দুর্ঘটনার পরে সকলের প্রতিক্রিয়াকে বোঝাবার জন্যে লেখক স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন: "সমস্ত অরণ্যে আগুন লেগেছে; প্রকাণ্ড জাহাজ রাত্রির ঝঞ্ঝাবিদীর্ণ অন্ধকারে সমুদ্রের তলায় ডুবেছে; একটা আগ্নেয়গিরি যেন মুহূর্তমধ্যে মরীয়া হয়ে উঠল।" ভয়ংকর বিপর্যয়ের ভাবকে প্রকাশের জন্য পরপর তিনটে জোরালো চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কোনটাই আপন আপন চিন্তার, স্বার্থের ও ব্যর্থতার বলয়ে বিচ্ছিন্ন পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মানস-ক্রিয়াকে ব্যক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যথার্থও নয় এবং তা যে নয়, সেকথাটা লেখকও যেন বুঝতে পেরেছেন. তাই প্রথমটির অসম্পূর্ণতা ঢাকতে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয়টির অসম্পূর্ণতা ঢাকতে তৃতীয় চিত্রকল্প প্রয়োগ করেছেন। তিনটে চিত্রকল্পের কোনওটাই লেখকের অভিপ্রেত অভিভাবকে জাগাতে পারেনি, সেজন্য এই অনুচ্ছেদটি সমগ্র গল্পে শুধু স্বতন্ত্র নয়, প্রক্ষিপ্তও হয়ে থাকে। প্রক্ষিপ্ত অংশের বা বাহুল্যের জন্য কোনও অবকাশ ছোটগল্পে নেই। একালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'ধন্বন্তরি' শুরু হয়েছে রোগী রেবতীর দৃষ্টিকোণ থেকে, তারপর প্রায় দুপৃষ্ঠার পর সে-অবলম্বনকে ত্যাগ করে যে-চরিত্রটির ব্যক্তিস্বরূপের জাগরণ এগল্পটির প্রধান উপজীব্য সংগত ভাবেই সেই ডাক্তারের দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করেছে এবং সেই আশ্রয়েই বাকি কাহিনী বিকশিত। স্বীকার করে নেওয়াই সমীচীন যে দৃষ্টিকোণের এই পরিবর্তন শুধু ছোট-গল্পটির প্রাকরণিক ত্রুটির নয়, উদ্দেশ্য-ও-উপায় সম্বন্ধে লেখকের অনিশ্চয়তা বোধেরও পরিচায়ক।

অচিন্ত্যকুমারের প্রথম জীবনে রচিত অনেক ছোটগল্পই উক্ত অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে' অথবা প্রথম গল্পগ্রন্থ 'টুটাফুটা'র প্রতি চকিত দৃষ্টিক্ষেপেও একথাই প্রতিভাত হয় যে ওই গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তির পৌনঃপুণ্য লেখকের স্বভাবজ নয়, তা বহুলাংশে অভিনবত্বের বা অনভ্যস্ত প্রসঙ্গের আঘাতে পাঠককে চমকিত করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত উপায় মাত্র। রোগ বিকারের বর্ণনার প্রতি তাঁর আগ্রহাতিশয্যের সমালোচনা করে, ওই উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘপত্রে অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছিলেন, "তবু সব সত্ত্বেও তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি। তার স্বকীয়তা আছে—ঋজুতা আছে—আত্মশক্তির প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখে প্রশস্ত পটভূমিকার উপরে নানা চরিত্র ও বিচিত্র ঘটনা নিয়ে যে বৃহৎ চিত্র তুমি এঁকেছ তাতে তোমার লেখনীর আশ্চার্য্য বলশালিতা প্রকাশ পেয়েছে। একদিন পরিণতি সহকারে যখন তোমার প্রতিভা সরলতার ভঙ্গী ছেড়ে দিয়ে যথার্থ সরল হয়ে উঠবে, যখন সে বলিষ্ঠ তুলি দিয়ে মানুষকে বড়ো করে আঁকবে, সাহিত্যে চিরজীবী মনুষ্যত্বকে চিরন্তন আকার দেবে সেই দিন তুমি ধন্য হবে—বাংলা সাহিত্যে ভারতীর তুমি নূতন আসন রচনা করবে। সে দিন তোমার আসবে, এই আমি কামনা করি ও বিশ্বাস করি।"

অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কামনা ও বিশ্বাস সত্য হয়ে উঠল 'রুদ্রের আবির্ভাব' নামে গল্পটিতে। গল্পের শুরু-তেই চাকুরি-নির্ভর মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ অস্তিত্বময় জগতের উল্লেখ করে লেখক গ্রাম্য জীবনের অপরিসীম বিস্তৃতির মধ্যে চরিত্রগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওই পরিবেশে আকাশের অবারিত প্রসার, মাঠ-নদী ভরে জ্যোৎ-স্নার প্রচুর উচ্ছ্বাস, নিজের সংসার ও গ্রামের বালক-বালিকার জন্যে বিদ্যালয় গড়ে তোলার আনন্দ ও পরিতৃপ্তি সহজে মেয়ে বাসন্তীকে জীবনের নতুন তাৎপর্য শিখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পল্লী-জীবনের অফুরন্ত প্রশান্তি আস্তে আস্তে বাসন্তীকে অমোঘরূপেই ক্লান্ত ও জীর্ণ করে

তোলে, তার সহজ ও সংগত সামাজিক সত্তাকে ক্রমাগত পীড়িত করে, কেননা প্রকৃতির একটা অসামাজিক তথা প্রচণ্ড অমানবিক সত্তা এবং প্রকৃতির এই সত্তা মূর্ত হয়ে উঠেছে গ্রামের পাশের নদীটির প্লাবিত রূপের মধ্যে। পাড় ভাঙতে ভাঙতে নদী ক্রমশঃ এগিয়ে আসে, একের পর এক অনেকেই গৃহহীন হতে থাকে, নদীর সেই সর্বনাশা রূপ দেখে স্বামী-স্ত্রীর অন্তঃস্থল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। লেখক স্বীকার করেছেন: "এত বড়ো মুক্তির চেহারা দেখিয়া দুইজনে মনেমনে ভীত হইয়া পড়ি, কিন্তু সেই ভয় পরস্পরের থেকে লুকাইতে গিয়া আরো সহজে ধরা পড়িয়া যাই।"

মানুষের সৃজনবৃত্তি এ গল্পে ব্যক্ত হয়েছে বাসন্তীর চরিত্রে আর নিসর্গের ধ্বংসবৃত্তি হয়েছে নদীর মধ্যে: জীবনের দুই প্রতীপবৃত্তি বা ধর্মের পদে পদে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এই ছোট-গল্পটি উদ্বর্তিত হয়েছে। নিসর্গের ভয়ংকর বেগ ও রূপের বর্ণনাতে অচিন্ত্যকুমারের ভাষাশৈলীও এক অনবদ্য দুর্লভ যাথার্থ্যে বিধৃত। "জল, জল, ক্ষুরের মতো ধারালো, বিদ্যুতের মতো দ্রুত—ধাবমান ঘোড়ার মতো ঢেউগুলি পাড়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িতেছে। কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নাই, স্তব্ধতা নাই—ফুঁলিয়া গর্জিয়া ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া অনড়, স্থবির মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণবিদীর্ণ করিয়া দিবে। অমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই নিয়ত বেগবান বিরাট শক্তির কাছে আমাদের অস্তিত্ব কেমন ম্লান, সংকুচিত হইয়া গেছে। পরিমিত নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদের এই জীবনধারণের তুচ্ছতাকে নদী যেন চারিদিকের উগ্র খলহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।" অচিন্ত্যকুমারের প্রথম জীবনের বা 'কল্লোল' যুগের রচনাগুলির অধিকাংশ তো বটেই, পরিণত জীবনের কোন কোন রচনাও অতিকথনে দুষ্ট, শব্দের অতুল সম্ভারের ভিড়ে ও চিত্রকল্পের অনাবশ্যক বাহুল্যে শিল্পের নিগূঢ় তাৎপর্য বিস্মৃতিতে বিলীন। কিন্তু 'রুদ্রের আবির্ভাব'-এ অচিন্ত্যকুমারের শিল্পশক্তি গল্পটিতে গতি নদীটির মতোই অপরাহত রূপে প্রবাহিত। যে-দুর্দৈবকে লেখক বলেছেন তাদের জীবনের "পরম-লগ্ন" তার আবির্ভাবের বর্ণনায় অপরিমিত নৈসর্গিক সত্তা ও পরিমিত মানবিক সত্তার বৈপরীত্য অত্যন্ত তীব্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে "রাত অনেক হইয়াছে—অকূল আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার আর অবধি নাই। সেই পরিপূর্ণতম প্রশান্তির নীচে নদীর এই লেলিহান উন্মত্ততার কোথাও এতটুকু সংগতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

অরোধ্য প্রকৃতির গ্রাসে বাসন্তীর সাধের সৃষ্টিগুলি একে একে ভেঙে নদীর গর্ভে তলিয়ে গেছে, অবশেষে আদর্শবাদী দম্পতী আশ্রয় নিয়েছে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সংকীর্ণ গলিতে এবং পদে পদে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছে: "নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।" মুক্তির উল্লসিত উত্তুঙ্গ শিখর থেকে অনিশ্চয়তার অতল-গহ্বরে পতনের এই দীর্ঘ কাহিনীর প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি চরিত্র, প্রত্যেকটি শব্দ শুধু সুপ্রযুক্তই নয়, পরিণামী ফলশ্রুতিকেও মহৎ শিল্পগুণে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সৃজনবৃত্তি ও ধ্বংসবৃত্তির চূড়ান্ত সংঘর্ষের থেকে উদ্ভূত অনিশ্চয়তার ভাবসত্ত্ব তখনই অকাট্য সত্য বলে মনে হতে-পারে যখন জীবনের সর্বব্যাপী সংকট সম্বন্ধে কেউ প্রথম চেতনা লাভ করে। সেই বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র-জাত মনোভঙ্গিকে অচিন্ত্যকুমার 'রুদ্রের আবির্ভাবেই' প্রথম পরিপূর্ণ সার্থকতা ও যথার্থতার সঙ্গে উপস্থাপন করলেন।

সমকালে লেখা আরও অনেক সফল ছোটগল্পের মধ্যে 'সংকেতময়ী,' 'সময়-সমুদ্র', 'তিরশ্চী', 'ন যযৌ ন তস্থৌ', 'দেহের দাবি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সংকেতময়ী'তে পাটনা থেকে শ্বশুরমশায়ের টেলিগ্রামে মৃত সন্তান প্রসবের পরে স্ত্রী নীলিমার অবস্থা খুব সংকটাপন্ন জেনে ট্রেনের সময়ের জন্যে অস্থির প্রতীক্ষার কালে সোমেশের উদ্বেগে আলোড়িত

চিন্তার ভিতর থেকে তাদের নিবিড় ক্রম-ঋদ্ধিমান মধুর ও জটিল দাম্পত্য জগৎ উত্থিত হয়েছে ; এমন সময় এক বিপন্ন প্রসূতির হতাশায় মরীয়া স্বামীর অবাঞ্ছিত উদয় এবং সোমেশের সমস্ত ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে সেই আগন্তুক নিয়ে গেছেন তাঁর স্ত্রীকে দেখাবার জন্যে। সোমেশ ভেবেছিল, কোন মতে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েই সে চলে যাবে, কিন্তু অন্তরবাসিনী কোন সত্তার সংকেতে শেষপর্যন্ত সে মৃত্যুর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করে প্রসূতি ও আতক উভয়কেই বিপন্মুক্ত করল। সোমেশের স্বার্থাশ্রিত প্রেমের অস্থিরতা, সেই প্রেম ও চিকিৎসক হিসেবে কর্তব্যবোধের টানাপোড়েন এবং সবশেষে দুয়ের সমন্বয়ে এক বিস্তৃত প্রেমোপলব্ধিতে তার উত্তরণের কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস্যভাবে পরিবেশিত। 'সময়-সমুদ্র' গল্পটিতে রোগীর অস্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশে রোগীর মা, রোগীর স্ত্রী সুবর্ণ ও ডাক্তারের পারস্পরিক সম্পর্কের কূটসত্ত্ব এমন সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ফোটানো হয়েছে যে অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ পরিণামও গল্পের শেষে উপস্থিত হয়েছে অনিবার্য সহজতাতে। আধা-ঔপনিবেশিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার মূল্য কানাকড়িও নয়, এবং সেখানে নীতিপরায়ণতাও শেষ পর্যন্ত হৃদয়বত্তার অভাবকেই স্পষ্টতা দিতে চায়। সুবর্ণ ও 'তিরশ্চী-'র সুমিতা যথাক্রমে যে-ডাক্তার ও যে-হাকিমের আচরণে চরম আঘাত পেয়েছে সে দুজনে ব্যক্তি হিসেবে একজনও মন্দ নয়, তথাপি ওই দুজন ন্যায়নিষ্ঠার যে-অভিমানে সুবর্ণ ও সুমিতার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখে সেটাও এক কপট সমাজব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত এবং তাদের চারিত্রিক উচ্চতার আদর্শ সম্ভবত জীবনের উচ্চতর বিচারালয়ে তাদের পৌরুষের সীমাবদ্ধতা বলেই গণ্য হবে। 'সংকেতমরী' গল্পটির চিত্তরঞ্জক সমাপ্তি সত্ত্বেও উল্লিখিত ছোট গল্পগুলির সামগ্রিক আবহাওয়া যে শ্বাসরোধকারী তা মানতে হবে : অবক্ষয়, অচিরতা, অক্ষমতা, অকৃতার্থতা, অসূয়কতা ইত্যাদি নানারূপে অচিন্ত্যকুমারের প্রথম জীবনের রচনাবলীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এসব গল্পে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পেয়েছে জীবনের আপন মনোহারিত্বের অন্তরালে এক অস্বাভাবিক হৃদয়দৈন্য, কখনও বা চিত্তবিকৃতি। এমন কি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' গল্পে প্রথমাংশের উচ্ছল উল্লাসের পরে এই সত্যই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে ছেলের প্রতিও মায়ের মনোভাব ও মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় ছেলের উপার্জনশীলতার মূল্যে।

এই ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'দেহের দাবি' রসে ও স্বাদে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশব ক্ষুধার হিংস্র করাল ভয়াবহ অসহ্য আর্তির বর্ণনা গল্পটিতে অনন্যসাধারণ কবিত্বে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ক্ষুধার আর্তিতে জীবন সম্বন্ধে সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ভবেশ আত্মহননে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বন্ধু সন্তোষের কাছ থেকে অনেক অনুনয়ে শেষবারের মতো একটি টাকা ধার করে সে আফিঙের খোঁজে বেরিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে পড়ে চোট পায় হাঁটুতে, অতঃপর যে-দেহ কিছুক্ষণ পরে অলীক হয়ে যাবে পরম যত্নে সে তার পরিচর্যা করে, একটু এগিয়ে একটা খাবারের দোকান দেখে সে দু-আনার খাবার কিনে খায়, কিন্তু খাবার খেয়ে ক্ষুধার তীব্রতা হ্রাস পেতেই তার আত্মহত্যার ইচ্ছাও হ্রাস পায় এবং সামনে পোস্টাপিস দেখে চৌদ্দ আনার খাম কেনে। সেদিনকার মতো আত্মহত্যার পরিকল্পনা মুলতুবি রেখে কাগজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে সেই খামগুলিতে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল বটে, কিন্তু কদিন পরে শুরু হলো আবার ক্ষুধার নিদারুণ আর্তি যার থেকে মৃত্যু ছাড়া অব্যাহতি অসম্ভব। "ভবেশ মনকে কোনোরকমে রাজি করিয়েছে, কিন্তু শরীরের প্রতি তন্তুতে এখনো তার নিঃশব্দ কাকুতি, প্রতি পা ফেলায় এখনো তার করুণ প্রতিবাদ। দূর তারার আলোয় মন আর পৃথিবীর পথ খুঁজতে চায় না, কিন্তু আশ্চর্য—শরীরে আছে এই পথাতিবাহনের সম্মতি।" শেষপর্যন্ত অনিচ্ছুক দেহটাকে জোর করে টেনে আবার যখন পথে বেরোয় তখন পোস্ট-

ম্যানের হাত থেকে পায় তেইশ টাকা মাইনের একটা চাকরির নিয়োগ পত্র। "তারপরে আর গল্প কী! তারপর সাদা, সহজ, সরল, সত্যকথা।"

বেকার জীবনের অসহায়তা, দেহযন্ত্রের কেন্দ্র থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে উৎসারিত অরুন্তুদ প্রদাহ, দেহধারণের প্রচণ্ড গ্লানি ও দেহকে ধ্বংস করার হতাশ পরিকল্পনা, আবার সেই দেহের প্রতি অপরিসীম মমতা, মন ও দেহের দ্বন্দ্ব, ক্ষুধাত্রাসের ফলে প্রাণস্পৃহার বৃদ্ধি, প্রত্যাশার অতীতে জীবিকার সংস্থান-লাভে জীবনের প্রাঞ্জলতায়—সমস্তই একই সঙ্গে গভীর তন্নিষ্ঠার ও অনাবিল কৌতুকে, বিশাল শব্দসম্ভারে ও প্রসঙ্গানুগ ধ্বনি-স্পন্দনে পরিস্ফুট হয়েছে গল্পটিতে। ছোটগল্পের সংজ্ঞার দৃঢ় সংকীর্ণতায় অনেকান্ত ভাব-ব্যঞ্জনার যথাযথ ও সুসম প্রকাশের অবকাশ সর্বদাই ক্ষুরের মতো ধারালো, কিন্তু যেটুকু অবকাশ কল্পনা করা যায় তার নিঃশেষ সদ্ব্যবহারে অচিন্ত্যকুমার 'দেহের দাবি'-তে দুর্লভ শিল্পশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

'রুদ্রের আবির্ভাব', 'দিগন্ত', 'সংকেতময়ী' প্রভৃতি গল্প-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় উনিশ শ উনত্রিশ-ত্রিশ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ, তখন অচিন্ত্যকুমার কলকাতায় আইনব্যবসায় করেন। উনিশ শ একত্রিশে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিচার বিভাগে চাকরি নিয়ে চলে যান বিভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চলে, এমন কোন কোন অজ শহরেও যেখানে শহুরে মানসিকতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এমন কি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও পৌঁছয়নি। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা স্বারস্বত সমাজের থেকে এই বিচ্ছেদে তাঁর সাহিত্যসাধনার উৎস শুকিয়ে যেতে পারত, কিন্তু পরিবর্তে ওই নির্বাসিত নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁর লেখনী হয়ে উঠল সুখের খনি, সূচিত হলো তাঁর সাহিত্যিক যুগান্তর। যেমন পদ্মায় বোটে জমিদারীর কাজে ঘুরে বেড়াবার সময় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ দেখা দেয় তেমনই অচিন্ত্যকুমারের অভিজ্ঞতাতেও গ্রাম-বাংলার অক্ষয় রূপ উপস্থিত হলো চাকরির সূত্রে মফঃস্বলে মফঃস্বলে তাঁর পরিক্রমার সময়। বাংলার আকাশ-বাতাস জল-মাটি ও মানুষকে এমন অন্তরঙ্গভাবে, এমন নিবিড়ভাবে, এমন ব্যাপকভাবে জানার সুযোগকে তিনি নষ্ট হতে দিলেন না, সেই জানা থেকে এল অ-নাগরিক বাংলার গ্রামীণ জীবনে অভ্যাস আর তার থেকে অনুরাগ, অনুধ্যান। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বাংলা এক এবং অখণ্ড এবং অবিভাজ্য এবং মূর্ত সত্য। বাংলাদেশের এমন অনুরক্ত ও বহুব্যাপ্ত পরিচয় আর কোনও আধুনিক সাহিত্যিকের রচনায় বিধৃত হয়েছে বলে মনে হয় না।

(দশম পরিচ্ছেদ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

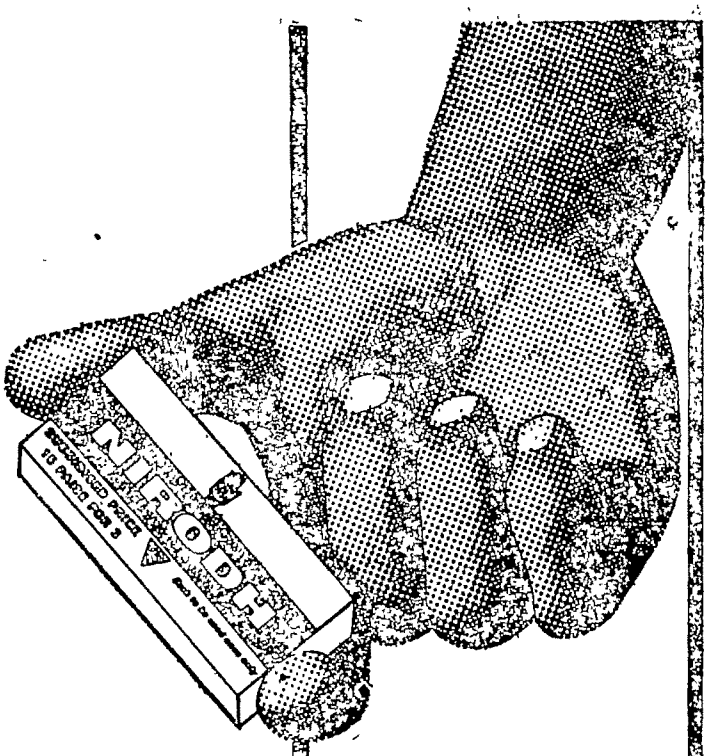


মাত্র
5টি পয়সা
খরচ করলে
আপনি আপনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন!

# নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্যে
উন্নত ধরণের
রবারের জন্মনিরোধক
15 পয়সায় 3টি

সরকারী সাহায্যে দাম কম রাখা হয়েছে।

**সময়ের ব্যবধানে সন্তান উৎপাদনের জন্যে**

আজকাল, নিজের ইচ্ছে মাফিক্ সময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না। আপনি যখন চাইবেন, তখনই আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। নিরোধ আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।

**মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যে**

জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার বছরের সময়ে শিশুর যত্ন নেওয়া উচিত—তাহলেই ওরা ভালো ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তার-রেরা মত দিয়ে থাকেন। সন্তান প্রসবের পরে সুস্বাস্থ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও কিছু সময় দরকার। নিরোধ ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম স্থগিত রাখতে পারেন।

নিরোধ (কণ্ডোম) পুরুষদের জন্যে উন্নত ধরণের রবারে তৈরী জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে, তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয় না। নিরোধ সব জায়গায় পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, মণিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ বিপণী, পানের দোকান আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়।

# অবেলার সিঁড়ি

ধারাবাহিক উপন্যাস

বাসুদেব দেব

বড়রাস্তার টিউবওয়েল থেকে বালতি করে জল আনতে হয় পুলুকে, রোজই। কলকাতা কলের জলে সব কাজ হয়না। মাথায় এখনো ভালোকরে চুল গজায় নি, একমাসও হয়নি শ্রাদ্ধশান্তির পর। কলে জল তুলবার সময় ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর করে আর্তনাদ ওঠে, যান্ত্রিক। শুধু কলেরই নয় পুলুর চোখেও জল আসে। বাড়ির কথা মনে পড়ে। তালা বন্ধ করে চলে আসার কথা। মার কথা মনে পড়ে। বালতি উপচে জল পড়তে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকা ঠেলাওয়ালা এবার ধমক লাগায়: 'কি কোরছেন খোকা বাবু! একবালটিমে কিতনা পানি ঢালছেন? কেয়া হোগিয়া।' রোদের তেজ কড়া। তৃষ্ণার্ত মানুষ জলের জন্য দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ আর ছেলেটা ভরা বালতিতে জল ঢালছে। পুলু লজ্জিত হয়। রাস্তা ভেতে আছে। ভিতরের গলি পর্যন্ত একেবারে কমপথ নয়। বৌদির চান হলে পুলুকে আবার জল এনে চান করতে হবে। বাথরুমের মেজেটা শেওলা জমে জমে পেছল। অপরিসর, অন্ধকার একটা ঘেরা জায়গা, নাম বাথরুম। বাড়িতে বাথরুমে চান করবার অভ্যাস ছিল না। ভরা বালতি নিয়ে ঢুকতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খায় পুলু—পা পিছলে পড়ে যায়। অত কষ্ট করে আনা জল—বৌদি চান করতে আসছিলেন। এমনিতেই কলকাতার এই ছোট বাসাবাড়িতে হঠাৎ পুলুর চলে আসা নীলুর সঙ্গে—বিজলীর অসুবিধা কম হচ্ছিল না, ভেতরে ভেতরে বিরূপতার আগাছা জাগছিল—পুলু নীলু যে বুঝতে পারতো না তা নয়—দুলালও বুঝতো—কিন্তু মার পেটের ভাই—আর বিশেষ করে এই অবস্থায় দেশের বাড়িতে পুলু একা পড়ে থাকেই বা কি করে। নীলুর পরীক্ষা হয়ে গেলে তখন ভেবেচিন্তে একটা কিছু করা যাবে।

বালতি পড়ার শব্দটা বিজলীর কানে যেতেই চেঁচিয়ে ওঠে: 'অত বড় ছেলে, একটু দেখে শুনে কাজ করতে পারো না!' ভৎর্সনা তীব্র ছিল না, কিন্তু তীব্রতর ছিল পুলুর অভিমান। চোখ বেয়ে জল নামে। ঠোঁটের কোনটা বোধহয় কেটেছে, জ্বলছে। জিভ বুলিয়ে নিল জায়গাটায়, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মায়ের কথা। মাকি দেখতে পাচ্ছে না এই সব? আকাশ হয়ে!

'যাও তাড়াতাড়ি জল এনে কৃতার্থ করো…'

বালতি হাতে পুলু রাস্তার দিকে চলে। গলির মোড়ে নীলুর সঙ্গে দেখা, কলেজ থেকে ফিরছিল খাতা হাতে। পুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে নীলুর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

'কি হয়েছে রে পুলু।'

পুলু কথা বলে না। নীলু এসে কাঁধে হাত রাখে। পুলু মাথা নামায়, বলে:

'আমার এখানে ভাল লাগছে না মেজদা'

হাতের বালতিটা কেড়ে নিয়ে নীলু কলের দিকে যায়। বড় রাস্তা দিয়ে তখন একটা রুটির গাড়ির পিছে পিছে কয়েকটা ভিখিরির ছেলে ছুটছে। উপরে কড়া রোদ। নীচে পিচ গলছে।

* * *

হঠাৎ এক একদিন কি হয় কিছু আর ভাল লাগে না নীলুর। কলেজের সবাই—তীর্থ, অরুণ, নিখিল, বিনয়

কত হৈ চৈ করে, ছাত্র ইউনিয়ন, কলেজ ম্যাগাজিন, সকালবেলার সিফটে মেয়েদের সঙ্গে একটু বাচালতা, ক্রিকেট খেলা, কবিতা লেখা, সিনেমা দেখা, রাজনীতি আলোচনা—নীলু যোগ দিতে পারে না। কেমন যেন সংযোগ হারিয়ে ফেলে। কোত্থেকে অকারণ এক রাশ মেঘ এসে জমে। নোট নেওয়া হয় না, এমন কি এস. কে. বি-র অত সুন্দর লেকচার নীলুর কানে যায় না। ব্লাকবোর্ডে কে যেন লিখে রেখেছে 'বনলতা সেন' ভারি মিষ্টি নাম। কবিতাটি পার্থ আবৃত্তি করে মাঝে মাঝে, আর বন্ধুদের মধ্যে নিখিল কবিতা লেখে, দু-একটা ছাপাও হয়েছে, ওর কাছে শুনেছে কবির কথা। জীবনানন্দ দাশ।

'পরীক্ষার আর বেশী বাকি নেই।' এস. কে. বি বোর্ড মুছতে থাকেন, 'কয়েকটা সাজেসান লিখে দিচ্ছি।' বনলতা সেনের মুখ মিলিয়ে যায়। 'তোকে একটা লেখা দিতে বল্লাম না ম্যাগাজিনের জন্য; পার্থ আবার ম্যাগাজিনের সেক্রেটারি।' 'দে না লিখে'।

হাই টা ঢেকে নিলু বলে 'পারছিনা লিখতে। আমাকে ছেড়ে দে।'

'কি হয়েছে রে তোর?'

অরুণের মন্তব্য—'আহ্ হা ছেড়ে দে না, ও হলো দেবদাস।'

'গাঁয়ের ছেলে হলে কি হবে, ডুবে ডুবে জল খান। ওর পাখি শেকল কেটেছে যে!'

'স্টপ ইট' নীলু চেঁচিয়ে ওঠে। বন্ধুরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কি হয়েছে ওর আজকাল। মা মারা গেছে। কেউ কেউ সান্ত্বনা দেয়—মাকি চিরকাল থাকে! সান্ত্বনায় আরো বিরক্ত হয় নীলু। জানালার কাছে সরে যায়। আকাশে মেঘ জমেছে। পকেটে পয়সা নেই—খিদে পেয়েছে। আকাশ কাঁপিয়ে মেঘ গরজাচ্ছে। পাশের পার্কের ধুলোবালি-মাখা শীর্ণ গাছপালাগুলো মাতামাতি শুরু করেছে। হাজরার মোড়ে একটা লাল আলো অনেকগুলো চলন্ত গাড়িকে থামিয়ে রেখেছে মন্ত্রমুগ্ধের মত।

'চল্ নীলু কমনরুমে যাই'—বিনয় টানলো।

যেন কোন কিছুর ওপর আকর্ষণ নেই নীলুর। ওরা কত সুখী, বাড়ি ফিরে ভাই বোন মা বাবার সঙ্গে গল্প করবে, খাবে, বেড়াবে। নীলু যেন নিরাশ্রয়, ভিখিরি। যেন ওর চেনা পৃথিবী, নিজের জগৎ মেঘেদের মত কেবলই ভাঙছে, রূপ বদলাচ্ছে।

'কি অত ভাবিস চল'।

কেউ পিং পং খেলছে। কজন ক্যারম নিয়ে বসেছে। দু-একটি ভালো ছেলে বইতে মুখ গুঁজে বসে আছে। হৈ হৈ করছে কয়েকটি ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে—যেন বাজার। নীলুর ভাল লাগে না। একটা ম্যাগাজিন টেনে নেয়।

'আজ খুব বৃষ্টি হবে'। ছেলেদের মধ্যে সোরগোল পড়ে। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাড়ি চলে যায় কেউ কেউ। দুপুর ভেঙে বিকেল নামে মেঘের ছায়ায়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। বৃষ্টি নামে। কমনরুম প্রায় ফাঁকা—কেউ ক্লাসে, কেউ বাড়ি, সকলেই কোথাও না কোথাও আশ্রয় খুঁজছে, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, আমোদপ্রমোদ। নীলুর কোন কাজ নেই। কোথাও যাবার নেই। দীপার কথা মনে পড়ে, মায়ের কথা, গ্রামের কথা···নিজের কথা। কেউ যেন তাকে সব কিছু থেকে ছাড়িয়ে এনে এক উদ্দেশ্যহীন অপরিচিত লোকে অবাঞ্ছিতভাবে ফেলে রেখে গেছে। অভিমান? কার ওপর? বিরাট কড়িডোর ফাঁকা হয়ে গেছে। নীলু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি ঝরা দেখছে। কলকাতার বৃষ্টি অন্যরকম। নিমপুকুরে মাঠের ওপর, আম জাম কলা বাগানের ওপর অঝোর বৃষ্টি অন্যরকম লাগতো—কত বড় আকাশ—দূর থেকে মায়াপুরের সাদা মন্দিরের চূড়া দেখা যেত আবছা। একবার দীপা ভিজতে ভিজতে এসে হাজির বৃষ্টির মধ্যে। দুপুরবেলা। 'ইস্ কি ভিজে গেছিস।'

'জামাটা ছাড় না' বলেই বুঝতে পারে নীলুর সামনে জামা বদলাবার প্রস্তাব হাস্যকর, তা ছাড়া ওর ফ্রকই বা কোথায়। কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। কি ভালো লাগছিল। দীপু ভিজে হাত নীলুর গালে বুলিয়ে দেয়। 'দিলাম তো ভিজিয়ে।'—কি একটা অদ্ভুত মৃদু গন্ধ, চুলের, না বৃষ্টির, না ভালোবাসার? 'তাকিয়ে আছিস কেন? অসভ্য!'

নীলু চোখ নামায়। ফুটপাথের সংসার সামলাতে ব্যস্ত এক ভিখিরি একটা দোকানের নীচে দাঁড়িয়েছে। কর্সা জামাপরা এক ভদ্রলোক তার স্পর্শ বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন—আর কি যেন বলছেন। ভিখিরিটি হাত জোড় করে কি সব বোঝাচ্ছে। এই যাঃ, একটা ট্যাক্সি ছুটে যাবার সময় রাস্তার কাঁদা জল ছিটিয়ে দিয়ে গেল লোকটার জামা-কাপড়ে। একটা কাক কতক্ষণ ধরে ভিজছে মূর্তিটার কাঁধের ওপর। কাঁধের ওপর বিনয়ের হাত। বিনয় গেয়ে ওঠে:

গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা—

কি সুন্দর গলা বিনয়ের। কত কথা ছিল! কত কথা।

'হয়ত সে তুমি শোন নাই,
সহজে বিদায় দিলে তাই—
আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝরোঝরো বারিধারা।'

বিনয় নীলুর একটা হাত মুঠোয় তুলে নেয়।...

আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে—জনমের মত হায় হয়ে গেল হারা....' 'জনমের মত' যখন কাঁপছিল বিনয়ের গলায়, যখন পৃথিবী ভিজে যাচ্ছিল বাইরে ভিতরে নীলু বিনয়কে জড়িয়ে ধরে—

'বিনু, কাউকে ভালোবেসেছিস কখনো!'

'একটা মেয়েকে চুমু খেয়েছিলাম একদিন।'

'সে ভালোবাসা নয়, অন্যরকম। অন্যরকমের...'

বৃষ্টির ভিতর ওরা সিঁড়ি ভেঙে নামে। বিনয় বলে—'দেরী হলে মা ভাববে রে!'

'আমাকেও টিউশনিতে যেতে হবে'।

কলকাতার রাস্তায় অল্প জলেই সমুদ্র। কে যেন একটা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছে। কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে নীলু, বৃষ্টি কমছে। রাস্তায় দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে।

* * *

'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি বিজন ঘরের কোণে
নামিল শ্রাবণ সন্ধ্যা কালো ছায়া ঘনায় বনে-বনে।
এসো গো।'

কলিং বেল টিপতেই গান থামে। কলকাতার শ্রাবণ সন্ধ্যায় কালো ছায়া কোথায়? কোথায় বন? জায়গাটার নাম বকুলবাগান হলেও! পুলুর বয়সী মেয়েটি—মিতা—নাইনে পড়ে, অথচ ওরা যেন অন্য জগতের মানুষ। নাচ, গান, হাসি—সহজ মেলামেশা—যেন পৃথিবীতে কোথাও দুঃখ নেই, শোক নেই, আঘাত নেই। ওদের বাগানভরা যেন ফুল। পাখি। গান শেখে, নাচ শেখে। সন্ধ্যেবেলা পড়াতে আসে নীলু—এসেই চা জলখাবার। আরেকবার কলিং বেল বাজাবার আগেই দরজা খুলে দেয় মিতা—বৃষ্টির জন্যই নাকি, না সদ্য গানের ভিতর থেকে উঠে আসছে বলে এত সুন্দর লাগছিল মিতাকে।

'মাষ্টার মশাই! আসুন। আজ যা বৃষ্টি, ভাবছিলাম আসবেনই না।'

নীলু গম্ভীর ভাবে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে। হারমনিয়াম বন্ধ করে মিতা ভিতরে চলে যায়।

'আজ পড়তে একদম ইচ্ছে করছে না মাষ্টারমশাই। আজ রেনি-ডে। আজ গল্প, এ্যাঁ?'

হেসে ফেলে নীলু। যেন ঐটুকু মেয়ে মন্ত্র বলে মনের ভার

দূর করে দেয়। কে যেন নীলুর ভিতর থেকে চপল ভঙ্গীতে বলে ওঠে : 'তা হলে গানটা হোক্।'

চা পাপড়ভাজা চলে আসে, শ্রাবণ-সন্ধ্যার গান বাজায় মিতা। নীলুর আঙুল চেয়ারের হাতলে তাল দেয়। গানের ভিতর থেকে উঠে আসা এক প্রতীক্ষা সমস্ত ঘরটাকে ভরে ফেলে। হৈ হৈ করতে করতে ঢোকে মিতার মা বাবা—

'দিস ইজ গুড। রোজ পড়া ভালো নয়। আজ গান-বাজনা হোক—'

'কি সুন্দর ওয়েদার আজ'।

আদুরে ভঙ্গীতে মিতা বলে : 'বাপি, আজ মাস্টারমশাই এখানে খেয়ে যাবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'না, না' নীলু সংকুচিত ভাবে বলে—'বাড়িতে চিন্তা করবে।'

'তা হলে তো মুস্কিল।'

বাড়িতে বৌদি যে কখনো চিন্তা করে বসে থাকবে না, তা মনে পড়লেই নীলুর অভিমান বুক ঠেলে উঠতে চায়। ট্যাংরা মাছের ঝোল ও পাতলা ডাল। ঠাণ্ডা—ঢেকে রাখা। ঘেরা বারান্দায় বিছানা। বেশীক্ষণ আলো জ্বেলে পড়লে মিটার বাড়বার আশঙ্কা—

'আরেকদিন তা হলে নেমন্তন্ন করে খাওয়াস' মিতার মা বলেন।

'আজ তা হলে উঠি।' নীলু ওদের নমস্কার করে অকারণেই।

'আচ্ছা, আচ্ছা'—মিতার মা ও বাবা পাশের ঘরে গিয়ে কাকে যেন টেলিফোন করতে থাকেন। দুজনের কথাবার্তা শোনা যায়, কাকে যেন আসতে বলছেন—'তোদের গাড়িটা কি খারাপ।'

মিতা এগিয়ে দেয় নীলুকে। নীলু যেতে যেতে বলে : 'আজ তা হলে না ভিজেই তোমার রেনি-ডে হলো?

কেমন?'

'দাঁড়ান'—দৌড়ে ভিতরে ছুটে যায় মিতা। ফিরে এসে হাতে কি যেন গুঁজে দেয়, একটু হাসে। 'আমাদের বাগানে ফুটেছে।' একটি গন্ধরাজ। নীলু ভিজে পথ হেঁটে ফিরে আসে চেৎলার গলিতে।

* * *

পুলু নাইনে পড়ত, নিমপুকুরের ইস্কুলে। ইস্কুলে এখনো নাম আছে। ডিসেম্বরে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসবে। বই-পত্তর নিয়ে বসে সন্ধ্যেবেলা, পড়তে মন বসে না। কলকাতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না, খাপ খাওয়াতে পারছে না দাদা-বৌদির সংসারে। ভাইপো মিন্টুর বছর পাঁচেক বয়স, পাশে বসে পড়ছে, দুষ্টুমি করছে। 'ছোটকাকু, একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে?' পুলু ঘাড় নাড়ে। বারান্দায় খালি জায়গাটুকুতে ঘুঁটে, কয়লা, প্যাকিং বাক্স, বাতিল জিনিসের ডাঁই একদিকে, আর সতরঞ্চ পেতে পাশে ওদের পড়াশুনা। নীলুও ফিরে ঐখানে পড়তে বসে। রাতে বিছানা করে দুই ভাই শুয়ে থাকে। কোন কোনদিন তিন ভাই মিলেও গল্প হয়—বাড়ি-ঘরের কথা।

'পড়ো বাড়ি হয়ে আছে বাস্তুভিটে, বিক্রি করে দিলে কেমন হয়?' বিজলী মাঝে মাঝে উস্কে দেয়। দুলালের সম্মতি নেই। তবুতো পুজোর সময় গিয়ে ওঠা হয়। কলকাতার বাসায় মানুষ যে কি অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয় তা কে না জানে? তাছাড়া এজমালি সম্পত্তি। নরুবাবুই কবে গ্রাস করেন! মাঝে মাঝে নীলু প্রস্তাব দেয়,—'সবাই মিলে গ্রামের বাড়িতে থাকো না! দাদা মেসে থাকবে—শনি রবিবার যাবে'. অর্থাৎ মা যা চাইতেন। শহুরে মেয়ে বিজলীর সে ইচ্ছে নয়। সুতরাং দুলাল নিরুপায়। এমনি করে দিন কাটে। কলকাতা শহরে কিছুর জন্য কিছু আটকে থাকে না। গন্ধরাজ শুকোয়।

* * *

পুলু রেশন আনতে গেছে, নীলু কলেজে যাবার জন্য

তৈরী হচ্ছিল। টিফিনের বাক্স আর ছাতা নিয়ে দুলাল অফিসের জন্য বেরুতে বেরুতে বল্ল: 'তোর টুইশনির টাকাটা পেলে এখন ভালো হতো। একদম টাকা নেই হাতে, কলকাতার সংসার!' মামুলি কথা। নীলু উত্তর দেয়। 'চাইনিতো কখনো এমনিই দিয়ে দেবে ওরা। আজ কি কাল'—'ঠিক আছে।' পা বাড়াতেই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ঢুকলো পুলু—'কি হয়েছে রে!' কান্না আর থামে না।

'একটা লোক আমার হাতের টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে গেছে।'

'মানে? মামাবাড়ি? হাতথেকে টাকা কেড়ে নিয়ে গেল!'

'হ্যাঁ দাদা, আমাকে ডাকলো। নামধাম জিজ্ঞেস করলো, বল্ল কোথায় যাচ্ছিস?—বল্লাম রেশান তুলতে। বল্ল কত টাকা আছে?—বল্লাম আট টাকা। সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। টাকাটা নিয়ে চলে গেল। কেউ কিছু বললো না।'

'পাজি, বদমাস—তোর টাকা নিয়ে গেল। গণ্ডা গণ্ডা লোক রেশন তুলতে যায় তাদের টাকা যায় না, আর…' সঙ্গে বিজলীর তর্জন গর্জন। টাকা কি গাছে ফলে না নিম-পুকুর থেকে মনিঅর্ডারে আসে? পিসবার গোঁসাই তো অনেক! এখন সারা সপ্তাহ মুখে দেবে কি?'

'চল্ তো দেখি'—নীলু ওকে নিয়ে রাস্তায় যায়। দুমড়ানো রেশন কার্ড, রেশনের থলে পড়ে থাকে। দুলালের অফিসে দেরি হয়ে যাবে তাই—সে বাস স্টপের দিকে ছোটে।

নতুন মানুষ পুলু—মানুষের ধরণ ধারণ বোঝে না।

স্টেশানারী দোকানের ভদ্রলোক বল্লেন: 'প্রথমে তো বুঝতে পারি নি, লোকটাও এ পাড়ার নয়। কত রকম গুণ্ডা দেখাযাচ্ছে আজ কাল। ছেলে মানুষ আর নতুন বুঝেই…ঘুসিটুসি মারে নি।'

'কাঁদিস নে পুলু। আমি আজ টাকা জোগাড় করে এনে কালই রেশন তুলবো। কদিন কষ্ট কর। আমরা দেশে চলে যাব।'

* * *

টিউশনি থেকে ফিরতেই দেখে বড়দা বারান্দায় গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আর বৌদি ফুটন্ত কড়াইয়ের মত ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে: 'তখনি বলেছিলাম, উটকো ঝামেলা। টাকা পাঠিয়ে দাও বাড়িতে। এ রকম দায়িত্ব ঝামেলা, এখন বোঝো, হাতে দড়ি পড়বে যখন।' ভাইপোটাও পড়তে বসে নি পুলুকেও দেখা যাচ্ছে না। নীলু শুধোয়:

'পুলু কোথায়!'

বড়দা খেঁকিয়ে ওঠে—'তাইতো জানতে চাই, কোথায় সে হতভাগা! তোকে বলে যায়নি কিছু? দেশের বাড়িতে গেছে নাকি?'

'সে কি? না বলে? টাকা পাবে কোথায়?'

'কেন? ঐ যে রেশনের টাকা মেরে তলেতলে মতলব ভাজছিল কিনা কে জানে!'

'ছি দাদা! ওর কোন বিপদ আপদ হলো কিনা কে জানে—আর তুমি ঐ রকম ভাবতে বসেছ! ঐটুকু ছেলে, কখনো কলকাতায় আসেনি, নিজের পেটের ভাই।'

দুলাল স্বভাবভীরু। চেঁচায় না আর। কেমন যেন মিইয়ে যায়।—'আমি তো অফিস থেকে এসেই খুঁজছি। এখন থানা হাসপাতাল করতে হয়'—'কখন বেরিয়েছিল?'

'তোর বৌদি তো বলছে দুপুর থেকেই আর ফেরেনি।'

'খেয়ে গিয়েছিল?'

বিজলীরও দু-চোখ ভরে জল নামে। 'না, ঠাকুরপো, খেয়ে যায় নি। না হয় একটু বকাঝকাই করেছি আমরা, তা বলে এমন শাস্তি দিতে হয়।'

দুভাই মিলে বড় রাস্তায় বেরুতেই একটা গাড়ি থামলো খ্যাঁচ-করে। গাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক নামলেন, তার পিছে-পিছে পুলু।

'কি খোকা? এই গলি তো?'

নীলু দুলাল এগিয়ে যায়: 'পুলু! পুলু! ওকে কোথায় পেলেন? আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো?'

'আরে না না। পুলু বুঝি আপনাদের ভাই? ও আমাদের বারান্দায় বসেছিল সারা বিকেল। আমার গিন্নি দেখেই বুঝেছেন সারাদিন খাওয়া হয় নি। কি একটা দুঃখ আছে মনে।'

পুলু রাস্তায় বেরিয়ে নাকি দেখতে পেল সকালবেলার সেই গুণ্ডাটা হন হন করে যাচ্ছে। পুলুও তার পিছু পিছু ছুটলো। তার পর একটা গলির মধ্যে লোকটা ঢুকেই হারিয়ে গেল। পুলুও নাছোড়বান্দা, লোকটার অন্য গলির মুখে বারান্দাওয়ালা বাড়িটার রোয়াকে ঠায় বসে রইল। তারপর পরেশবাবু ও তার স্ত্রীর আদর-যত্ন—কতদিন পরে ভালবাসার স্বাদ। পাশে বসিয়ে লুচি বেগুন ভাজা খাওয়ালেন ভদ্রমহিলা। গুণ্ডার খোঁজে গিয়ে পুলু বুঝি ফিরে পেল আরেক মাকে।

'মানে যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের ছেলেপিলে নেই। যদি পুলু আমাদের ওখানে থাকে—মানে আপনারাও যখন তখন দেখে আসতে পারবেন—ও-ও পড়াশুনা করতে পারে—হোষ্টেলে থেকেও তো কত ছেলে পড়াশুনা করে—মানে আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে। আমার স্ত্রী বলছিলেন।'

'পুলু, থাকবি ও-বাড়িতে'? নীলু সস্নেহে শুধায়। 'বড় হতে পারবি'।

'হ্যাঁ।'

এলোমেলো চুলে হাত বুলায় দুলাল—'সে পরে হবে'খন। আমরা সবাই আলোচনা করে কালকে আপনাকে জানাবো, কেমন?'

'কাল না হয় আসবো আমি—ঠিকানা তো নিয়ে গিয়েছি পুলকের কাছ থেকে। আচ্ছা চলি'—নমস্কার করে নরেশ বাবু গাড়ীতে ওঠেন। তিনভাই গলিতে ঢোকে। দুলাল পুলুর কাঁধে হাত দেয়। 'বুঝলি নীলু, তোর বৌদি এমনি খারাপ নয় তেমন, শুধু মেজাজটা। ওর বাবা মিলিটারি অপিসের একাউটেন্ট ছিলেন তো!'

বাড়ির সামনে মিণ্টুকে কোলে নিয়ে বিজলী দাঁড়িয়েছিল। পুলুকে দেখে দু-চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল নামলো। গলির মোড়েই ভাষ্টবিনের কাছের জগ্‌গিডুমুর গাছের পাতায় ভিতর পাশের বাড়ির জানলা চোয়ানো আলো এসে কাঁপছিল। মিণ্টু পুলুকে জড়িয়ে ধরলো: 'ছোটকাকু, তুমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলে? ভালুক দেখেছো? হরিণ? বলো না ছোটকাকু?'

সারাদিন ধকলের পর নীলুর খুব ক্লান্ত লাগে। কি রকম বর্ণহীন দিন রাত। পুলু হয়তো নতুন আশ্রয় পাবে, নরেশ বাবুর বাড়িতে। হয়তো ওর ভালো হবে। আর এ বয়সে ওর মনের ক্ষুধা শান্ত হবে, নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে নিমপুকুরের চারা কলকাতার টবে বড় হতে থাকবে—কিন্তু নীলু—বিছানায় ঘুমন্ত পুলুর মুখখানা দেখে মায়া লাগে—নীলুর মনে হয় তার কোন ঘর নেই, কোন পথ নেই। ঘুমের ভিতর স্বপ্নে শুধু কতকগুলো সাদা সিঁড়ি দেখতে পায় আর এক খানা হাত—হাতে দুলছে ম্লান নীল লণ্ঠন। ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয় যেন বালিশের তলায় গন্ধরাজ, আবছা গন্ধ। অনেক রাতে টুং-টাং একটা শব্দ—বুঝি কোন ক্লান্ত রিক্সাওয়ালা···আবার স্বপ্নের ভিতর অজস্র সাবান-ফেনার বুদ্‌বুদ ফাটে, তার ভিতর থেকে নিমপুকুরের বিখ্যাত শ্মশানকালীর লকলকে জিভ, রক্তমাখা খাড়া··· দ্রুত প্রখর বাজনা·····নিষিদ্ধ সুখ, বন্ধুদের অশ্লীল আলোচনা···মিত্তার লাল ফ্রক···ফণীমনসার ঝোপের মধ্যে ট্রেণের উঁচু সিগন্যাল···মা···নীলু···ট্রেণ ধরতে হবে না? ঘুম ভেঙে যায়। বারান্দা পেরিয়ে বাথরুমে যায় বৌদি—সায়া ব্লাউজ মাত্র পরনে। আবার চোখ বোজে নীলু।

প্যাকিং বাকসের থেকে বুকের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায় একটা ইঁদুর।

এমনি করে লাফিয়ে যায় সময়। নীলুর দাড়ি শক্ত হয়, বয়স বাড়ে। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা জমিটার ওপর ইঁট বালি পড়ছিল, মিস্ত্রিরা আসে—বাড়ি উঠতে থাকে—করবী গাছটা কেটে ফেলে লোকগুলো, পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার কি সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল বিধবা ভদ্র-মহিলাকে—বোধহয় তারই বাড়ি ··নীলকমল দেখে···কি দ্রুত সময় বদলাচ্ছে। পৃথিবীর চেহারা পাল্টাচ্ছে। ময়দান, মিছিল, টিয়ারগ্যাস, ট্রাম পোড়ানো···সিনেমার লাইন··· সারারাত জলসা···কলকাতার হাইড্র্যান্ট্ থেকে জল ঝরে যায়।

* * *

'মিতা, কাল থেকে আর পড়াতে আসবো না, দেশে যাবো'।

'আমি ঠিক ফেল করবো। নিজের পড়া শেষ হলো, আর কি ?'

'না, না, তা ঠিক নয়। তোমার আরো ভালো মাষ্টার আসবেন।'

'আমি নিজেই পড়ব। আমার কোন লোক চাই না।' নীলু বেরিয়ে পড়ে। 'চিঠি লিখবেন, মাষ্টারমশাই' মিতার গলা কি ভিজে ?

'চিঠি ? না।'

দ্রুত রাস্তায় এসে দাঁড়ায় নীলু। বিদায় কলকাতা। বিদায় কলেজ। বিদায় মিতা। পুলু নরেশবাবুর বাড়িতে ভালোই আছে। পরীক্ষা দেবে সামনের বছর। কিন্তু কিছুতেই কলকাতাকে আপন করতে পারল না নীলু···বুঝি তার স্বভাবেরই দোষ; বুক পকেটে তখনো দীপার সেই সংক্ষিপ্ত চিঠি: 'আর চিঠি লিখো না। তোমার ওখানে ঝড়। আমাদের এখানে বৃষ্টি।'

বিমলের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে ছেলে-মানুষিতে চেপেছিল নীলুকে। দীপা কি লিখতে চেয়েছে ? না, না, সত্যি গৌহাটিতে খুব বৃষ্টি। ভূগোলেও পড়েছে নীলু। আর কলকাতায় ? কলকাতায় এক অচেনা মানুষ, কেউ কাউকে চেনে না, ভালোবাসে না। এখানে ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, অথচ আচমকা ট্যাক্সি জামা কাপড়ে কাদা জল ছিটিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। বিদায় কলকাতা, প্রশস্ত রাস্তার বদলে চেয়েছিলাম প্রশস্ত হৃদয়, ঘরে ঘরে রুটিন-মাফিক শীর্ণধারা জলের বদলে চেয়েছিলাম অফুরন্ত আবেগময় ভালোবাসা—হয়তো সবই তোমার আছে, ঢেকে রেখেছো আমার কাছ থেকে। হয়তো আমারই স্বভাবের দোষ। কালীঘাট পুল পেরিয়েই লাল বাড়ি, জেলখানা। নীলু মনে মনে রুমাল উড়িয়ে বলল: বিদায় বন্ধুগণ। তোমাদের জন্য শুভেচ্ছা।

গলির মোড়ে টিউবওয়েলের ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ হচ্ছে, ডাষ্টবিনের লাগোয়া জগ্‌গী ডুমুর গাছটা নুয়ে পড়েছে। কিসের যেন একটা বিজ্ঞাপন না পোষ্টার সাঁটা তাতে।

(ক্রমশঃ)

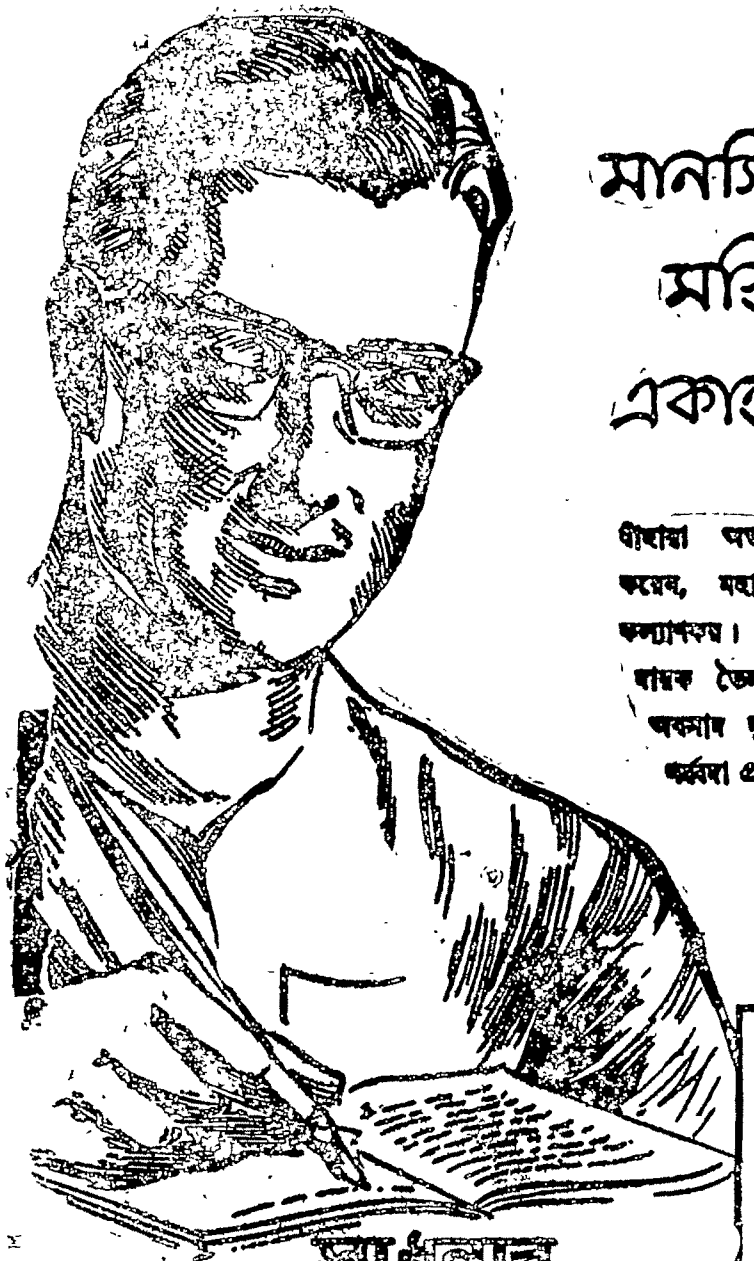

# মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

## সাধনার মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় লেন কলিকাতা- ৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এল. এম. পি, বি, এস, ( কলিঃ ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ.
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, এম, বি, এস, (লণ্ডন) এল, সি, এস (আয়ুর্বেদিক)
অনেকদিন কলেজের ছাত্রদের শারীর পড়ানোর কৃতিত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা

: উপন্যাস

উত্তরখণ্ড

# কণ্ঠভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

## সতেরো

জ্যৈষ্ঠের গুমোট। বাইরে অন্ধকার। আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমছিল। কিন্তু হাওয়া নেই। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না বোধহয় ঝড় উঠবে। ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

হাত পাখা নেড়ে সমানে হাওয়া দিচ্ছিল রাধা।

ভারতচন্দ্র বললো—তুমি আর কতক্ষণ বসে বসে হাওয়া দেবে এবার শুয়ে পড়ো—

—আর একটু দিই, যা গরম, আপনি ঘুমোন—

—না আমার এখন ঘুম আসবেনা, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—বলতে বলতে উঠে বসল ভারতচন্দ্র।

আজ বিকেলে শ্বশুর বাড়ি এসেছে সে। সারা সন্ধ্যা আর কথা বলার সুযোগ হয়নি।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে পর এই কিছুক্ষণ আগে ছেলে কোলে নিয়ে শোবার ঘরে এসেছে রাধা।

পালঙ্কের উপর শীতল পাটি পাতা বিছানা। দুইপাশে দুইজন মধ্যে আড়াই মাসের শিশু।

ঘরের কোণে একটি ম্লান প্রদীপ জ্বলছিল। শান্তচোখে একবার স্বামীর দিকে তাকাল রাধা।

আবার চোখ নামিয়ে ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—দেখুন ছেলেটা কেমন ঘামছে-এক হাতে পাখা নাড়ছে রাধা।

—তুমি পাখাটা এবার আমার হাতে দাও—

—না থাক, আপনি কি বলছিলেন তখন, ছেলের নাম কি ভেবেছেন—

—তুমিতো আমার কথা ভাল করে না শুনেই চলে গেলে—

—আহা, আমার রান্নাঘরে তখন কত কাজ, বাবাকে খেতে দেব, তারপর আপনি আর বিশ্ব বসবেন, একা মাধবী সব সামলাতে পারে নাকি, তাছাড়া বাড়ীর সবাই জেগে রয়েছে তাদের সামনে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো, ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন—

মুখখানি সামান্য ফিরিয়ে রাধার এই ছিঃ বলার ভঙ্গিটি ভারী মনোরম।

প্রদীপের আলোয় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল ভারতচন্দ্র।

চোখাচোখি হতেই মাথার আঁচলটা সামান্য টেনে লজ্জিতভাবে আবার বললো রাধা—কি দেখছেন, অমন করে—

—তুমি যেন আরো সুন্দরী হয়েছ, রাধা দিন দিন তোমার—

—যান কিযে বলেন, অমন করে কেউ বলে নাকি, ছিঃ—

মুখ নিচু করল রাধা। তারপর আরেকটু নিচু হয়ে ছেলের কপালে আলগোছে একটি চুমু খেয়ে বললো—কি রকম দুষ্টু হয়েছে জানেন, আমি উঠে গেলেই ঠিক বুঝতে পারে, হয়তো পাশে শুয়ে ঘুম পাড়াচ্ছি, ভাবছি ঘুমিয়ে পড়েছে, যেই উঠতে যাব, ওমা অমনি টুলটুল করে তাকাবে এমন দুষ্টু, ইস কেমন ঘামছে দেখুন—আচল দিয়ে ছেলের ঘাম মুছিয়ে দিল রাধা। জোরে জোরে কিছুক্ষণ হাওয়া দিল। তারপর বললো—ওর নাম কি দেবেন, তাতো বললেন না—

—ওর নাম রাখবো পরীক্ষিৎ, আমার জীবনের মহা পরীক্ষার মধ্যে ও এসেছে, শুধু আমার বলে কথা নয়, সারা বাঙলা দেশেরই যেন এক চরম ভাগ্য পরীক্ষা চলছে, রামেশ্বর

মুখুজ্জের মুখে শুনেছি, দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ নাকি মনে করেন নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর মৃত্যুর পর সুবে বাংলার নবাবী শাসন একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, তারপর যে কি হবে কেউ বলতে পারে না—

রাধা বললো—আপনাদের ও সব রাজনীতির কথা আমি বুঝি না, মহাভারতের গল্প যা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে রাজা পরীক্ষিৎ এর ভাগ্য খুব ভাল ছিল না, জন্মের আগেই বাবা অভিমন্যু মারা গিয়েছিলেন, নিজেও কোন এক মুনিব শাপে —বলতে বলতে হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে নমস্কার দিল— রাত্তির বেলা নাম করতে নেই, তার কামড়ে প্রাণ দিয়েছিল —চমৎকৃত চোখে রাধার মুখের দিকে তাকিয়েছিল ভারতচন্দ্র। মহাভারতে রাজা পরীক্ষিতের কথা একবার মনে হয়েছিল বটে, তবে এতটা তলিয়ে সে ভেবে দেখেনি। আস্তে আস্তে বললো—রাধা তোমার যুক্তি শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি, তুমি যে এমন মনোযোগ দিয়ে মহাভারত শুনেছ, এমন চমৎকারভাবে মনে রেখেছো, এতে সত্যই আমি খুব আনন্দ পেলাম, তবে একটা কথা কি জানো, মানুষ মাত্রই নিয়তির দাস, নিয়তির হাত কেউ এড়াতে পারেনা। মহাভারতের মহাবীর কর্ণের কথা ভেবে ছাখো ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, অভিমন্যুর মত মহাবীরও নিয়তির খেলাঘরে পুতুলমাত্র ছিলেন, মহারাজ পরীক্ষিতও নিয়তির বিধান এড়াতে পারেননি, কিন্তু যিনি পাণ্ডবদের উত্তরাধিকারী, অভিমন্যু যার পিতা, জন্মেজয়ের মত যাঁর পুত্র, তাঁকে নিতান্ত ভাগ্যহীন বলতে আমি রাজি নই, আর তা'ছাড়া— বলতে বলতে ঘুমন্ত শিশুর মাথায় হাত রাখল ভারতচন্দ্র— আমাদের পরীক্ষিতের ভাগ্য খারাপ হবে না, আমরাতো কখনো কারো অনিষ্ট করিনি, জ্ঞানতঃ কোন পাপ করিনি, আমাদের সন্তান কোন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হবেনা, আমার এই নামটি ভারী পছন্দ হয়েছে, তুমি আর আপত্তি করো না—

—আমি আপত্তি করবো কেনো, আপনি যা ভাল বুঝবেন— সামান্য সময় দুজনেই চুপচাপ। তারপর আবার বললো ভারতচন্দ্র—রাধা এবার আমি কৃষ্ণনগর যাব, সেই কথাই তোমাদের বলতে এসেছি, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদ থেকে খালাস পেয়ে ফিরে এসেছেন, এবার ফরাসডাঙ্গার পাট চুকিয়ে দেব এই কয়েক মাস পাঠশালা চালাবার চেষ্টা করে দেখলুম, তেমন কিছু সুবিধে হল না—

—কেন সুবিধে হলনা কেন—জানতে চাইল রাধা

—প্রথমে আটটি ছাত্র ছিল, এখন দাঁড়িয়েছে পাঁচটি, তার মধ্যে একটি নিয়মিত আসে না, অসুখে ভোগে প্রায়ই কামাই করে, বাকি রইল চারটি, তার মধ্যে দুটি রামেশ্বর মুখুজ্জের ভাগনে মহাদেব আর বাসুদেব, একটি সম্পর্কে দৌহিত্র কেষ্টলাল, সেই আরেকটি তার খাজাঞ্চি হরকালী সরকারের ছেলে গৌরপদ, এই চারিটি ছাত্রকে আমি সকালে সংস্কৃত শেখাই, বিকেলে ফার্সী পড়াই, কিন্তু এ.ত কোন কাজ হচ্ছেনা, ছাত্র সংখ্যা আর বাড়ছেনা, শিবদাস দাদাও বলেন, পণ্ডশ্রম করছি, এর কারণ আমার মনে হয়, গোন্দলপাড়ার আশেপাশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত-টোল চতুষ্পাঠি রয়েছে, কয়েক ঘর প্রাচীন পণ্ডিত বংশ বর্তমান, টোলের জন্য তাঁরা মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকার থেকে, বর্ধমান কিংবা নদীয়ার রাজবাড়ি থেকে নিয়মিত বৃত্তি পান, ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করেন, যারা ভালভাবে সংস্কৃত শিখতে চায় বিশেষতঃ উপাধি পেতে চায় তারা স্ব ভবিক কারণেই এইসব টোলে গিয়ে ভর্তি হবে আর যারা আরবী-ফারসী শিখতে চায় তারা মোল্লা-মৌলভীদের মক্তব-মাদ্রাসায় যাবে, আমার কাছে আসবে কেন, বল, সংস্কৃতজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিতদের চোখে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসা অর্বাচীন অপাংক্তেয় ব্যক্তি, আর মোল্লা-মৌলভীদের কাছে আমি নালায়েক কাফের মাত্র—বলতে বলতে সামান্য হাসল ভারতচন্দ্র। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। কোন কথা বললো না রাধা।

হাত পাখা নেড়ে যেমন হাওয়া দিচ্ছিল, দিতে থাকল। জানালার দিকে তাকাল ভারত। তারপর একটু ইতস্তত করে বললো—বাইরে যাবে রাধা, ভেতরে বড় গরম, চলো পুকুরঘাটে গিয়ে বসি দুজনে—

—ওমা, এতরাত্রে আপনার সঙ্গে গিয়ে পুকুর ঘাটে বসবো, কি যে বলেন, তারপর ছেলে থাকবে কার কাছে—ওকেও নিয়ে চলো—ভারতচন্দ্রের প্রস্তাব শুনে যেন শিউরে উঠল রাধা—না, না, এত রাতে বাইরে নেবো না, কোথা থেকে কার দৃষ্টি পড়বে, মাগো—

পালঙ্ক থেকে নেমে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ভারত। বাইরের অন্ধকারের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর এপাশে ফিরে এসে বললো—বাইরে বেশ হাওয়া আছে, চলো না, যাই, ছেলেকে এখানেই রেখে যাও, কি আর হবে ঘুমিয়ে তো রয়েছে।

—আচ্ছা আমি দেখছি—আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল রাধা। আস্তে আস্তে দরজার খিল খুলে ফেলল। পুরনো দরজার সামান্য ক্যাচ্ ক্যাচ শব্দ। তারপর ছেলেকে কোলে নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ওপাশের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে চাপা গলায় ডাকল—মাধবী, মাধবী—খানিকবাদে ফিরে এসে হাসি মুখে বললে—ছেলেকে মাধবীর কাছে রেখে এলুম, কোথায় যাবেন, বাব্বাঃ, আপনার যতসব অদ্ভুত খেয়াল—

বাইরের দিকের দরজা খুলে দু'জনে প্রায় নিঃশব্দে রোয়াকে এসে দাঁড়াল। দরজা ভেজিয়ে শেকোল তুলে দিল রাধা। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশ। অল্প অল্প মেঘ জমেছে। প্রায় পা টিপে টিপে পুকুর ঘাটে এল দুজনে। ঘাটের দুধারে হাত দেড়েক উঁচু বাঁধান বেদীর মত। ঘাটের পাশে সেই বৃদ্ধ মহানিম গাছ। পুকুরের ওপারে গাছ-গাছালির আড়ালে কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ।

এক একবার হালকা মেঘের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। কিছু পরেই আবার বিষণ্ণ জোৎস্না ফুটে উঠছে। বাঁধান বেদীর উপর পাশাপাশি বসল দুজনে। প্রায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে কেমন জড়সড় ভঙ্গিতে বসেছে রাধা। হঠাৎ মাথার আঁচলটা টেনে খুলে দিল ভারতচন্দ্র—এখানে অমন করে বউ সেজে বসবার দরকার কি, এত রাতে কে আর দেখতে আসছে—

—আঃ কি যে করেন—মাথার আঁচল তুলে সামান্য সরে বসল রাধা—ওরকম করলে চলে যাব—

—ইস্, যাওত দেখি, কেমন যেতে পার—রাধার একখানি হাত খপ করে ধরে ফেলে বললো ভারত

—আমি তোমাকে ছাড়বই না—

—আস্তে কথা বলুন, কি যে ছেলেমানুষী করছেন—

—কেন আস্তে বলবো কেন, এত রাত্রে আমাদের কথা শুনবে কে—

—তা' হোক, রাত্তিরের কথা অনেক দূর শোনা যায়, মাধবী এখনো ঘুমোয়নি, তাছাড়া বাবার ঘুমও খুব পাতলা, চোখে ভাল দেখেন না বটে' কিন্তু কান খুব ভাল, এতরাতে পুকুর-ঘাটে মানুষের সাড়া পেলে উঠে আসতে পারেন—বলতে-বলতে চারপাশে একবার তাকাল রাধা।

চারপাশে অন্ধকার। মধ্যরাত্রির নিশুতি প্রাম। এখন কেউ দেখতে আসবে না ঠিকই।

তথাপি এতখানি খোলামেলা জায়গায় স্বামীর পাশে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে থাকতে দারুণ অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল রাধার। অস্বস্তি আর লজ্জা।

যতই কাছে টানার চেষ্টা করছিল ভারতচন্দ্র, ততই একে-বেঁকে সরে যেতে চাইছিল রাধা। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে মধ্যে মধ্যে চাপা স্বরে বলছিল—আঃ ছাড়ুন, কি যে করছেন, ছিঃ—শেষে হতাশ হয়ে বললো ভারত—তুমি একেবারে গেঁয়ো' কোন সহবৎ শেখোনি—

—থাক, আমাকে আর সহবৎ শেখাতে হবে না, আমি গেঁয়ো,

আছি বেশ আছি, শহরের মেয়ে বিয়ে করলেই পারতেন—

অন্ধকারে মুচকি হাসল রাধা—তারা আপনার এসব খাম-খেয়ালিতে সায় দেবে, আমার দ্বারা ওসব হবেনা—

—এই বয়সে আবার বিয়ে, কি যে বলো, এই বয়সে আবার নতুন করে কারো সঙ্গে বোঝাপড়া আর সম্ভব নয়—

—আহা, আপনার এমন কিছু বয়েস হয়নি, তাছাড়া পুরুষ-মানুষের আবার বয়স আছে নাকি—রাধার কথা শেষ হতে না হতেই গুরগুর করে মেঘ ডাকল।

পুকুরের ওপর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি।

কথায় কথায় খেয়াল ছিল না দু'জনের। কখন মেঘ জমেছে। কৃষ্ণা পঞ্চমীর জোৎস্না মরে গেছে। কখন অলেক্ষ্য সারা আকাশ জুড়ে বৃষ্টির আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

ছুট ছুট। দু'জনে হাত ধরাধরি করে ওই অন্ধকারে পুকুরঘাট থেকে ছুটে এসে রোয়াকে উঠতে উঠতে ভিজে একসা হয়ে গেল।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে অকারণেই খিলখিল করে হেসে উঠল রাধা।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ভারতচন্দ্র—কি হল, হাসছো কেন—

কোন জবাব নেই। ভেজা আঁচল মুখে দিয়ে খুকখুক করে হাসতে লাগল রাধা।

এমনিতে সে বেশ শান্ত গম্ভীর। সেই ছোটবেলার মত কল-কল করে কথা বলে না।

অকারণ হাসিখুসিতে তেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না।

প্রায় আঠারো বছর স্বামীসঙ্গহীন অসহায় সঙ্কুচিত জীবন-যাত্রা তার আচরণ, তার অভ্যাসকে অনেক বদলে দিয়েছিল। নিঃসঙ্গতাবোধ, একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের আবরণ, তার কথাবার্তা, তার আচার-ব্যবহার, তার সমস্ত সত্ত্বাকে যেন ঘিরে থাকত। গত একবছর ধরে এই সমস্ত ব্যাথার আবরণটা যেন একটু একটু করে মুছে যাচ্ছিল।

আজ এতকাল পরে এই মধ্যরাত্রের বৃষ্টিধারায় সমস্ত গোপন গ্লানি, সমস্ত নিরুদ্ধ বেদনা যেন ধুয়ে মুছে গেল। বহুকাল পরে হঠাৎ যেন সেই বালিকাবয়সের খুশির উচ্ছ্বাসকে আবার খুঁজে পেয়েছে রাধা। দুহাতে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল ভারত।

দুজনেরই সর্বাঙ্গ জবজবে ভেজা। ভারতচন্দ্রের ভেজা বুকের মধ্যে মুখ গুজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে হাসছিল রাধা।

বাইরের অন্ধকারে তখন অসম্ভব বৃষ্টিপতনের শব্দ।

( ক্রমশঃ )

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

# জাপানের দিনগুলি

## বারীন বর্দ্ধন

প্রশ্ন করলাম—তবে কি ৭নং ৬নং যেসব চটি রয়েছে সেগুলো অক্ষত থাকবে? আর লোকেরা?

বললেন—শীতের সময় তো এই চটি বা চটিওয়ালাদের কোন চিহ্নই খুঁজে পাবেননা। মাস দুয়েকের মধ্যেই সব চটি ভেঙ্গে বিছানাপত্র নিয়ে চটিওয়ালার দল চলে যাবে সমতলে।

ক্লান্তির চরম সীমায় এসে ৭নং চটির দূরত্ব আন্দাজ করতে পারলাম। বিশ্বাস করলাম নিজেকে যে এবার চটিতে নিশ্চিত পৌঁছুতে পারব।

এস্তোরাদা এবং আরও কয়েকজন কাগামীসানের সঙ্গে আগেই চটিতে পৌঁছে জানিয়ে দিয়েছিল আমাদের আগমন-বার্ত্তা। চটিওয়ালা এবার দু'পা নীচে নেমে এক এক হেঁচকা টানে দু'তিন সিঁড়ি পার করে দিল।

মরুভূমির তীব্র জলকষ্টের পর মরূদ্যান দেখলে তৃষ্ণার্ত্তের কি ভাব হয় জানিনা। কিন্তু একটানা চার ঘণ্টা পাহাড়ে চলার পর যদি কেউ বলে যে আজ রাতের মত এখানেই বিশ্রাম করা যাবে, তাতে মনে যে আনন্দ হয় একমাত্র ভুক্ত-ভোগীই তা বুঝতে পারে।

রাতটুকু চলা বন্ধ থাকবে শুনেই হাত পা ছড়িয়ে খোলা মাটিতে শুয়ে পড়লাম সব জামাকাপড় নিয়ে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। বন্ধুদের ডাকে উঠে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে বসে পড়লাম হিবাচীর পাশে। যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তেমনি তাণ্ডব হচ্ছে বাইরে। একএকবার হাওয়ার ঝাপটায় মনে হচ্ছে সবাই রওয়ানা হলাম ঝড়ের সঙ্গে অনির্দিষ্ট ঠিকানায়।

একটু পরেই জাপানী ভদ্রলোক দু'জন এসে সবার কাছ থেকে চাল আদায় করতে লাগলেন। হোষ্টেল থেকে কাঁচা চাল সঙ্গে নেওয়ার মর্ম তখনও বুঝিনি। এবার বুঝতে পারলাম। চটিওয়ালাদের ৮।১০ হাজার ফিট্ নীচ থেকে চাল সংগ্রহ করতে হয় পরিশ্রম করে। তাই অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে আসে কাঁচা চাল এবং তার বিনিময়ে চটিওয়ালা দিচ্ছে তৈরী সাদা ভাত। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে, শিল্পসমৃদ্ধ জাপানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের শীর্ষদেশে চলছে পুরোপুরি বার্টার সিষ্টেম। ভাত তৈরীই ছিল। বড় এক হাঁড়িতে চটিওয়ালা নিয়ে এল ভাত এবং তার সহকর্মী আমাদের প্রত্যেককে দিয়ে যেতে লাগল এক জোড়া কম্বল। ঐ ক্লান্তির পর খাওয়ার কোনই ইচ্ছা ছিলনা। তবু নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে ভাতের থালাটা টেনে নিলাম। সঙ্গে ছিল টিনের মাছ। এর আগে টিনের মাছ কোনদিন খাইনি। তাই টিন কাটতে গিয়ে ভাবছিলাম এবার পুরোপুরি বাঙ্গালী খানা খেয়ে আরামে ঘুমিয়ে নেব পুরো রাতটা। কিন্তু, হা, হতোস্মি।

টিন কাটার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে এমনই দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল যে মুখে দেওয়া তো দূরের কথা, দশ-বার হাতের মধ্যে থাকলে অন্নপ্রাশনের ভাতও বেরিয়ে আসবে।

চটিওয়ালার কাছে এক কৌটা নুন চাইলেও পাবার সম্ভাবনা নেই। অগত্যা কয়েকটুকরো অবশিষ্ট রুটিতে জেলী মাখিয়ে আর বাকী জেলী সাদা ভাতে মিশিয়ে খেতে সুরু করলাম।

খাওয়া শেষ হতেই কোনরকমে হাতমুখ ধুয়ে কম্বলের নীচে আশ্রয় নিলাম। চটিতে পৌঁছে আগে থেকেই যে যার জায়গা বেছে নিয়েছিল। কারুর জন্য এতটুকু জায়গা ছাড়তে কেউ রাজী নয়। প্রথমটায় ডাক্তার ধর এবং চৌধুরীর মধ্যে একটু জায়গা করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবাই প্রায় স্ট্যাণ্ড্ উইচের পর্যায়ে এসে গিয়েছে। ইচ্ছা হলেও সরে যাবার উপায় নেই।

কি করব ভাবছি। এমনি সময় পাশেরই এক ফরাসী মহিলা উঠে কি কাজে বাইরে গেলেন। তার সঙ্গীরা দূরে বসে খাচ্ছে। কোন কিছু না বলে সারা দেহ কম্বলে ঢেকে ঐ মহিলার জায়গাটি দখল করে শুয়ে পড়লাম। ভাব করলাম যেন ঘুমে অচেতন।

একটু পরেই ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন। ঐ রকম একটা কম্বলকুণ্ডলী দেখে সঙ্গীদের দিকে ফিরে ফরাসীতে জিজ্ঞাসা করলেন—কোত্থেকে এ শ্রীমান এখানে এসে জুটল ?

ভদ্রমহিলা ইংরেজ। বিয়ে করেছেন ফরাসী। এতক্ষণ সবার সঙ্গে ইংরাজীতেই বেশ কথা বলছিলেন। আমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই হঠাৎ ফরাসী ভাষার সাহায্য নিলেন। কিন্তু ভাবেননি যে এ শর্মারও দু'এক টুকরো ফরাসী মুখে আসে। জানাবার প্রয়োজনও ছিলনা। অন্ধকারেই মুচ্‌কি হেসে কম্বলটা আরও ভাল করে মুখের উপর টেনে দিলাম।

অত্যধিক ক্লান্তি বা পরিশ্রমের পর বোধ হয় সহজে ঘুম আসে না। তাই আধজাগা অবস্থায় ছিলাম বহুক্ষণ। এদিকে ঝড়ের মাতামাতি দ্বিগুণতর হয়ে উঠেছে। হাওয়ার এক টানা শোঁ শোঁ আওয়াজ আর সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। বাইরে যখন চলেছে এই লড়াই ভিতরে তখন পরম নির্বিকারে ঘুমুচ্ছে ত্রিশটি প্রাণী। ঘরটির জন্য ভাবনা হচ্ছে —এই বোধহয় বমাল উড়ে গেল। কিন্তু তাতে আমার কি? বর্ত্তমান অর্থাৎ চরম পরিশ্রমের পর শীতের রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার কাছে অনাগত বিপদের আশঙ্কা মোটেই মনে ঠাঁই পেল না।

রাত চারটার সময় জাপানী ভদ্রলোক দু'জন এবং চটিওয়ালা এসে তাগাদা দিতে লাগল ব্রেক্‌ফাষ্টের জন্য। এক পেয়ালা চায়ের কথা শুনলে হয়ত অনেকেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠতাম। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনই প্রতিবাদ গায়ে মাখতাম না। কিন্তু ব্রেক্‌ফাষ্ট্ মানেই তো ঐ সাদা ভাতের ডেলা আর টিনের মাছ বা জেলী। কোনই চাঞ্চল্য এল না ঘুমন্ত ত্রিশটি প্রাণীর মধ্যে।

এবার জাপানী দু'জন চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল যে পাঁচটার মধ্যে বেরোতে না পারলে ফুজিসানের চূড়ো থেকে সূর্য্যোদয় দেখা অসম্ভব। অতিরিক্ত উৎসাহী কয়েক জন এতে উঠে পড়ল এবং প্রথম দফায় জামাকাপড় পরে জিনিষপত্র গোছাতে সুরু করল। অলসতার ডিপো আমরা কয়জন ভাবছি—উৎসাহের আতিশয্যে কি বোকাই না হয়ে পড়ে সব। বাইরে ঝড় জল চলছে সৃষ্টি লয় করবার মত। আর এরা সব ঘণ্টাখানেক পাহাড় ভেঙে সূর্য্যোদয় দেখবেন!

কিন্তু শুয়ে থাকা আর হল না এবার সঙ্গীরাও ডাকতে এসে টেনে কম্বল উঠিয়ে দিতে লাগল। অগত্যা উঠে গিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম অভিযানের শেষ দেখবার জন্য। আমার বোঝা তখনও কাগামীসানের জিম্মায়।

প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় জল কাদার মাঝে আবার সবাই বেরিয়ে পড়লাম। এবারকার পাহাড়ের গা পিচ্ছিল। রাত্রির আমেজে শরীরও অনেকখানি দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে। তবে এবার আর নৈরাশ্যের স্থান ছিল না। দূরে মাথার উপর ছোট একটা বিন্দুর মতই দেখাচ্ছে আট নম্বরের চটি বা ফুজিসানের শিখর। শেষ ধাপে পা দেবার আগে রয়েছে একটা গেট্। জাকজমকের কোনই আড়ম্বর

নেই। অতি সাধারণ কাঠামো। দু'দিকে রয়েছে দুটো থাম। এবং উপরে আড়াআড়ি করে আছে আরেকটা। সিমেন্টের তৈরী। দূর থেকে সাঁচীস্তূপের গেটের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ফুজিসানের প্রথম প্রহরী হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই গেট অভ্যর্থনাকারীর ভঙ্গীতে। আর মাত্র কয়েক ফুট। আর মাত্র দু মিনিটের মধ্যেই সমস্ত উত্তেজনার চিরসমাপ্তি। শেষ মুহূর্তে দলের কে সবাইর আগে শিখরে পৌঁছুতে পারে তাই নিয়ে সুরু হল রেস্। ছুটতে গিয়ে দু'একজন আবার পড়েও গেল।

একে একে সবাই এসে জড় হলাম আট নম্বর চটির দুয়ারে। হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলাম এই অনন্ত সিঁড়িভাঙার হাত থেকে রেহাই পেয়ে। আমাদের আগেও দুই একটি দল এসে পৌঁছে গিয়েছে। হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে তারা শেওলা ধরা পাথরের উপর। দু'হাতে লাঠিটি ধরে মাথা নীচু করে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। দূরে চটিওয়ালা বিক্রী করছে অরেঞ্জ স্কোয়াশ। পর পর তিন বোতল স্কোয়াশ, দুটা পুরো আপেল এবং এক টিন্ ফলের রস খেয়ে দেহের 'কামারশালাকে' প্রথম দফায় ঠাণ্ডা করলাম। এবার চটিওয়ালা এগিয়ে এল সবুজ রংএর কতগুলো তিন-কোণা ঝাণ্ডা নিয়ে। লেখা রয়েছে—ফুজিসানের শীর্ষদেশ। উচ্চতা ১২,৩৯৫ ফিট। ঘুঙুর বাঁধা লাঠির ঘুঙুর যে কখন খুলে পড়ে গিয়েছে টেরও পাইনি। শুধু বাঁধা ছিল একটা লাল রং-এর ফিতা। এবার ঘুঙুরের বদলে লাঠির ডগায় বেধে নিলাম সবুজ ঝাণ্ডা। ফুজি বিজয়ের নিদর্শন।

তিন বোতল স্কোয়াশ খেয়ে শরীর বেশ সতেজ হয়েছিল। কিন্তু ফুজিসানের গহ্বর বা ক্রেটার কোথায়?

দূরে আরও উঁচু একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তবে কি ওখানেই ক্রেটার?—ভাবছি, হঠাৎ চৌধুরী এসে বলল—এই আট নম্বর চটির পিছনেই রয়েছে বিরাট গহ্বর। দেখবেন তো চলুন।

—দেখবেন তো মানে? যার জন্য এত পরিশ্রম তাকে না দেখে যাব কি করে?

এক মুহূর্তে ক্লান্তি কোথায় উবে গেল। ক্যাপ্-স্যাক্ ছাড়া বাকী সব জড়িয়ে লাঠি হাতে গিয়ে পৌঁছুলাম ক্রেটারের উপরে। চারদিক ঘুরে পরখ করতে লাগলাম ক্রেটারের পরিধি। আধ মাইল হবে বই কি। উল্টো-দিকের লোকজনকে বেশ ছোটই দেখাচ্ছে। শরীরের উপর নিজের কোনই হাত ছিল না। পাহাড় বেয়ে বেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। ভয়ে ভয়েই ক্রেটারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ছোট বড় নানা আকারের পাথরে ফুজিসান ভর্ত্তি। দু'চার মণ' ওজনের পাথরও রয়েছে। কে যেন নিজ হাতে সাজিয়ে রেখেছে। সব অতিক্রম করে গহ্বরের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রায় বিশ ত্রিশ ফিট্ গভীর খাদ। দেয়ালগুলো এবড়ো-খেবড়ো, টকটকে লাল। পুড়ে ইঁট হয়ে গিয়েছে। অনেকটা কয়লার উনুনের চারপাশের মত। কোথাও এতই ঢালু যে পায়ে হেঁটে খাদের নীচ অবধি যাওয়া চলে। আবার কোথাও খাড়াই নব্বই ডিগ্রী কোণ করে। আরও ঝুঁকে পড়ে পরখ করতে লাগলাম তাণ্ডব লীলার উৎসকে। উৎসাহের আতিশয্যে প্রথমটায় মনে হল এই উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে হয়ত পাতালপুরীর সিঁড়ির খোঁজ পেয়ে যাব। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না। বোধ হয় দু'শ বছরের ঝিমুনিতে তন্দ্রা পরিণত হয়ে গিয়েছে গভীর নিদ্রায়। খাদের নীচটা কে যেন ধুয়ে মুছে পরিপাটি করে রেখেছে। একেবারে নিরেট সমতল। তফাতের মধ্যে শুধুই পোড়ামাটির রং। লাল হয়ে রয়েছে নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ডের মত।

লাঠির ডগায় বোঁচকা বেঁধে চলছিলেন ডাক্তার ধর।

ন্যাপস্যাক্ বা কোন বিলেতী সরঞ্জামের বালাই ছিল না তার। দূর থেকে তাই বহুবার মনে হচ্ছিল মহাপ্রস্থানের শেষ অঙ্কে স্বর্গের দেখা মিলবে এই ভারতীয় তীর্থযাত্রীর। প্রয়োজনের তাগিদে আমরা ন্যাপস্যাক খুলে সময়ের বহু অপচয় করে তবে বার করেছি খাবারের প্যাকেট। আর ডাক্তার ধরের বেলায় তা ছিল অতি সহজ। ফুরোশিকি বা বড় রুমাল থেকে খাবার বার করা।

ঝুঁকে পড়ে দেখছি খাদটা আর মনে পড়ছে স্কুলের ভূগোল বইএর বর্ণনা। যেখানে লেখা আছে ফুজিয়ামার কাহিনী। সঙ্গে তার ছবি। মুহূর্তে মনটা চলে গেল ফুজিসানের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে মফঃস্বলেরই এক নগণ্য সহরের স্কুল ঘরে। যেখানে পড়ান হচ্ছে ভূগোল। একটু তন্ময় হয়েই পড়েছিলাম এত সব ভাবতে গিয়ে। হঠাৎ ডাক্তার ধরের ডাকে পিছন ফিরে তাকালাম।

আমার দিকে এগোতে এগোতে ডাক্তার ধর বললেন—চলুন, ঐ পাথরটার ধারে বসে সবাই ছবি তুলে নিই। বলে দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন চেয়ারের ঢংএর পাথরটি।

চৌধুরী ক্যামেরা তৈরী করতে ব্যস্ত। আর ডাক্তার আগরওয়াল বসে আছে পোজ্ করে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম ফটো তুলতে। উস্কোখুস্কো চুল এবং ততোধিক অবিন্যস্ত জামাকাপড় ঠিকঠাক করেই ছবি তুলব ভাবছি এমনি সময় সমস্ত আড়ম্বর আর রসোচ্ছ্বাস ভেদ করে কাণে এসে ঢুকল জাপানী ভদ্রলোকদের কণ্ঠস্বর—লাইনে সব দাঁড়িয়ে পড়ুন।

আর সেই সঙ্গে ভেসে এল কাগামীসানের সামরিক আদেশ—কুইক্‌মার্চ।

এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ুন শুনে অনেকেই ছুটে গিয়ে মিলিটারী কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা তখনও এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে ব্যস্ত। কাল সারাদিন মেঘ আর বৃষ্টির সীমা ছিল না। আজও সূর্য্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তে মেঘের আবরণে ছিল দিকদিগন্ত ঢাকা। অনেকের মত আমরাও নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম সূর্য্যদেবের মুখ দেখতে না পেয়ে।

জাপানে বিদেশীদের বিশেষ করে ছাত্রদের কনসেশন মিলে সর্বত্র। জাপানী ভগবানের তাই বোধ হয় কিছুটা দয়া হল। পাহাড় ছেড়ে চলে যাবার পূর্বমুহূর্তে কোত্থেকে ঝড়ো হাওয়া এসে ঐ পুরু মেঘের আস্তরণকে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে গেল একদিকে। আর আমাদের সামনে তুলে ধরল সীমাহীন দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভা।

এ শোভা তুলনাহীন। বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে সবুজ রংএর ঝিলিক খেলে যাচ্ছে পৃথিবীর এপার থেকে ওপার। ছোট্ট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে লেক্ ডিষ্ট্রীক্টের লেকগুলো। দূরবীন দিয়ে আরও পরিষ্কার দেখতে পেলাম লেকের ঘন নীল জল। একদিকে উঠে আসছে অভিযাত্রীর দল ফুজিসানের গা বেয়ে। এবার দূরবীন ঘুরিয়ে নিলাম অন্য দিকে। অন্তহীন বিস্তৃতি। দূরবীনের কাঁচেও ধরা পড়ল না এর কোন প্রান্ত। এমনিভাবে অচল অনড় হয়ে দেখছি সীমাহীন দিগন্ত আর উপলব্ধি করছি আমার ক্ষুদ্রত্ব। গাইড বা জাপানী ভদ্রলোকদের কোন কথাই কাণে ঢুকছে না। বার দুই আরও ডেকে তাই তারা পাঠিয়ে দিলেন কাগামীসানকে। শেষবারের মত আট নম্বর চটি আর ফুজিসানের ক্রেটারের দিকে তাকিয়ে পিছন ফিরে চলতে সুরু করলাম নূতন পথে।

যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সে পথ দিয়ে ফিরে যাচ্ছি না শুনে পড়ল উত্তেজনা আবার ফিরে এল নূতন ভঙ্গীতে। যে দিক দিয়ে উঠে এসেছিলাম তার উল্টোদিক দিয়ে নামতে সুরু করলাম। প্রথম কয়েক মিনিট চলল উঁচুনীচু পাহাড়ী জমির উপর দিয়ে চলা একটু পরেই রাস্তা একটা বাঁক নিয়ে একেবারে সোজা নামতে সুরু করল। সেই একই খাড়াই। তবে এবার উঠছি না। শুধুই নামছি। একবার এ পাথরের

উপর এবং পরক্ষণেই দু'ফিট দূরে আরেক পাথরের উপর পা দিয়ে নেমে চলেছি প্রতি পদেই নেমে চলেছি দু' থেকে তিন ফিট্। ঠিক যে ভাবে ধাপে ধাপে উঠে এসেছিলাম! তবে তখন ছিল পুরোটাই নিজের প্রচেষ্টা। যাকে প্রতিমুহূর্তে ক্ষুণ্ণ করতে ব্যস্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এবার নামতে গিয়ে সেই শক্তিই দেখা দিল পরম মিত্র হয়ে। নিজে যদি নামতে চাই এক ফুট মাধ্যাকর্ষণের টানে তা হয়ে যাচ্ছে দু' থেকে তিন ফিট। তাই মুখ থুবরে পড়ার ভয়ে লাঠির উপর ভর করে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছিলাম। এবার আর মাথা তুলে দেখার অবকাশ ছিল না। পা ঠিকমত পাথরের উপর না পড়লে পাথরের মুড়ির মতই গড়িয়ে পড়তে হবে। এক ঘণ্টা চলার পরই মনে হল প্রায় অর্দ্ধেক নেমে গিয়েছি।

একটু পরেই একজন জাপানী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আমরা এ নূতন পথে নামছি কেন?

উত্তরে তিনি বললেন—এ পথে রয়েছে সুনাহারা বা বালির ময়দান। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গিয়েছে টুকরো মসৃণ পাথরে ঢাকা মাঠ। পাথরের মুড়ির আস্তরণ প্রায় দু'তিন ফিট্ পুরু। চলতে গিয়ে পড়ে গেলেও আঘাত পাবার সম্ভাবনা নেই।

এ পথেও পঁচিশ ত্রিশ মিনিট পর রয়েছে এক একটি চটি। একই ধরণের চেহারা। ক্ষুধা মেটাচ্ছে এ পথ দিয়ে আরোহণকারী যাত্রীদলের। এ রকম গোটা দুই তিন চটি পার হবার পরই হঠাৎ পাহাড়টা ঢালু হয়ে গেল অস্বাভাবিকভাবে। চটির সীমানা পার হতেই নজরে এল দিগন্ত বিস্তৃত সুনাহারা! কাল গোল মুড়িতে মোড়া পাহাড়ের গা। কোথাও এতটুকু রংএর ব্যতিক্রম নেই। এ দিকটা তত খাড়া নয়। আন্দাজ মত ঢালু।

লাফিয়ে যেতে যেতে যেতে জাপানী ভদ্রলোক বললেন—এখান থেকেই সুনাহারার সুরু। এই সুনাহারা যেখানে শেষ হবে সেখানেই আমরা ব্রেক্‌ফাষ্ট্ সেরে বাসে চাপব গোতেম্বা ষ্টেশনের দিকে। কিন্তু এবার পথ চলতে সবাই সাবধান।

সাবধান হওয়ার কারণ তখনও ততটা পরিষ্কার হয়ে উঠেনি। তাছাড়া ভেবেছিলাম এরকম ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাওয়া সহজই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল অন্যধরণের। কুইক্‌মার্চ শুনে আমাদের হাঁটা সুরু হলেও হাঁটার গতি বেড়ে গেল অসম্ভব রকম। আমি যদি এক পা এগোই মাধ্যাকর্ষণ তাকে করে দিচ্ছে তিন পা। কিছুতেই নিজেকে সহজ করে চালাতে পারলাম না। এক একবার দৌড়োচ্ছি আর একটু হাঁপিয়ে উঠার সাথেই সামনে কাঁকরের লাঠিটাকে গেঁথে নিজের পতনোন্মুখ দেহকে সামলে নিচ্ছি। জুতোর মধ্যে কম করেও সেরখানেক করে অন্ততঃ দু'সের পাথরের কুঁচি ঢুকে গিয়েছে। সেই চাপে পা জুতো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দৌড়ে যখন এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, তখন চেপে এল মুষলধারায় বৃষ্টি। মাথায় ওয়াটারপ্রুফ্ টুপী। গায়ে ওয়াটারপ্রুফ। কোনই অসুবিধা হচ্ছিল না! আর ছোটাছুটিতে শরীরে তাপ বেড়ে গিয়েছে বেশ করেক ডিগ্রী। তাই ঐ ঠাণ্ডাতেও ভিতরে ঘেমে উঠেছিলাম। তবু দাঁড়াবার উপায় নেই। সবাই ছুটে চলেছে অদৃশ্য শক্তির টানে। পাহাড় বেয়ে উঠার সময় বার বার করে এগোবার অনুরোধ জানিয়েছিল জাপানী ভদ্রলোক দু'জন। এবার সকলেই চুপ। কেবল সেই শক্তি অলক্ষ্যে বসে থেকে কাজটি করিয়ে নিচ্ছে। একটার পর একটা চটি এগিয়ে আসছে। আবার দু'মিনিটের মধ্যেই চলে যাচ্ছে দৃষ্টির বাইরে। কিন্তু এ ছোটাতে ক্লান্তির লেশ মাত্র ছিল না। তার বদলে ছিল শুধুই উদ্দাম উত্তেজনা।

ছুটে চলেছি একের পেছনে এক। হাতে সবুজ ঝাণ্ডা। যেন একদল বেহুইন লুটপাট করতে ছুটে চলেছে সমস্ত বাধা

অতিক্রম করে। ছুটতে গিয়ে দু'একজন যে পড়ে যাচ্ছে না তা নয়। এ পতন মারাত্মক না হলেও তার ফল হল আরও ব্যাপক। একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের দু'তিন জন সামলাতে না পেরে একে অন্যের ঘাড়ের উপরই এসে পড়ল। এই রকম পড়ে পড়ে জামাকাপড় সব হয়ে গিয়েছে কাদা! সবাই যেন করলাখনি থেকে উঠে এসেছে। এদিকে মুষলধারায় চলেছে বিরামবিহীন বৃষ্টি। সামনে দু'হাত দূরেও কেউ নজরে পড়ছে না। অন্ধের মত সব ছুটে চলেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে তৈরী হয়ে নিচ্ছে। বালির ময়দান। তাই কেউ আঘাত পাচ্ছিল না। বরং কয়েকবার উত্থান-পতনের পর সবার রোখ চেপে গেল গড়িয়ে পড়বার জন্য। তাপমাত্রা তখন শূন্য ডিগ্রীরও নীচে। তার উপর ঐ বৃষ্টি। কিন্তু কারুর ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। ছুটতে গিয়ে কয়েকজন এগিয়ে গিয়েছে। কয়েকজন রয়ে গিয়েছে পিছনে। তাই কাগামীসান চলে গেল সবার পিছনে যাতে কেউ ভুল পথে চলে না যায়। আর পথ দেখিয়ে নিতে লাগল কাশীওয়াগী-সান। এই অবস্থায় সামনে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে পিছনের দূরত্ব হয়ে পড়ল প্রায় আধ মাইল। আমরা কয়েকজন ছিলাম মাঝামাঝি। হঠাৎ এক জায়গায় এসে আমরা একজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম! রাস্তা এখানে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং জাপানী ভাষায় লেখা একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। চেঁচিয়েও গাইড দুজনের পাত্তা মিলবে না। তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম কাগামীসানের জন্য। সামনেই ছিল একটা চটি। বৃষ্টির ধারায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এদিকে কাশীওয়াগীসান বোধহয় আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিল। তাই আগের দলকে চটিতে রেখে উঠে এল আমাদের খোঁজে। যতই উঠে আসছে ততই কাশীওয়াগীসানের কণ্ঠস্বর কাণে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।—কোকুসাইর ছাত্রের দল এদিকে চলে আসুন।

আশ্বস্ত হয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলাম।

সকাল নয়টায় আমরা সুনাহারা অতিক্রম করে ফুজিসানের পাদদেশে এসে পৌঁছেছিলাম। যে ফুজিসান ভাঙতে লেগেছিল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা, নেমে গেলাম তার গা বেয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে। এবং অতিক্রম করেছিলাম আট মাইলের মত। এ চটিটা ছিল বেশ বড় এবং অভিযাত্রীদের জন্য খানকয়েক চেয়ার টেবিলেরও বন্দোবস্ত রয়েছে। ঝোলা খুলে লাঞ্চ খেতে সুরু করলাম।

পাহাড়ের আবহাওয়ার কোনই নিশ্চয়তা থাকে না। ফুজিসানের ঝড়জলও তাই আবার উবে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। প্রভাত সূর্য্যের রক্তিম আলো এসে ঠিকরে পড়ল সবুজ পাহাড়ের গায়। এখান থেকেই আমরা বাসে চেপে রওনা হব রেল ষ্টেশনের দিকে। ফুজিসানকে ছেড়ে আসার আগে তাই আবার পিছন ফিরে মাথা উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করছিলাম। কখন যে পিছনে ফেলে এসেছি এবং কতখানি এগিয়ে এসেছি তার কোনই ধারণা ছিল না। অনেক চেষ্টা করলাম যদি বা আট নম্বর চটির কোন ছায়াও দেখতে পাওয়া যায়। আট নম্বর চটি তো দূরের কথা ফুজিসানই কোথায় চলে গিয়েছে! নানা জায়গা থেকে নানা কোণ করে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পিছনের সবই যেন উড়ে গিয়েছে কর্পূরের মত। কোন চিহ্নই নেই। শুধু শরীরের ক্লান্তিই মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিচ্ছে পাহাড় ভাঙার খাটুনি।

একটুক্ষণের মধ্যেই বাস এসে চটির সামনে দাঁড়াল। আমরা সব লাইন দিয়ে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম। বাস এখান থেকে যাবে গোতেমা ষ্টেশনে। সেখানেই আমরা টোকিওর ট্রেনে চাপব। কাশীওয়াগীসান এবং কাগামীসানের বাড়ীও ঐ দিকে। তারাও উঠে পড়ল আমাদের সঙ্গে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বহু চড়াই উৎরাই

অতিক্রম করে গ্রাম আর মাঠের মধ্য দিয়ে আমরা গোতেম্বা রেল ষ্টেশনে পৌঁছুলাম।

প্লাটফর্ম টোকিওগামী যাত্রীতে ছেয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ের দল। মুখে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে বটে। কিন্তু সবাই খুসীতে ঝলমল। ভাবটা যেন সবচেয়ে সেরা যে স্পোর্ট জাপানে অর্থাৎ ফুজিসান জয় করা —তা শেষ করে জীবন হয়েছে সার্থক। লেখাপড়ার সঙ্গে স্কোর্টও এদের জীবনে হয়ে পড়েছে একটা প্রধান অঙ্গ। দেশে বত্রিশটি বছর পার করে দিয়েও আসল স্পোর্টের স্বাদ কোনদিন পাই নি। যাতে রয়েছে রিস্ক, আছে থ্রিল্ এবং সব মিলিয়ে যার নাম এ্যাড্‌ভেঞ্চার। বয়সটা যদিও ছিল এ কাজের পক্ষে বেমানান, আনন্দ কিন্তু তাতে কম হল না। হিংসে হচ্ছিল এই জাপানী ছেলেমেয়েদের দেখে। স্কুল কর্তৃপক্ষই এদের ব্যবস্থা করে যেন ফুজিসান আরোহণ করতে। স্কুল থেকেই বলে দেওয়া হয় কারুইজাওয়া গিয়ে স্কি করবার জন্য। লেখাপড়ার সঙ্গে স্পোর্টও হয়ে গিয়েছে স্কুল পাঠ্যবস্তুর একটি পরিচ্ছেদ।

দাঁড়িয়েছিলাম ষ্টেশন কম্পাউণ্ডে। হঠাৎ কাগামীসান এবং কাশীওয়াগীসান এসে আমার জাপস্যাকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে জাপানী কায়দায় উর্দ্ধাঙ্গ আনত করে বলল— সাইওনারা।

পুরো একদিন এই গাইড্ দু'জন পালা করে আমার বোঝাটা বহন করেছে। তাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে একশ ইয়েন করে দু'জনকে বখশীষ দেব বলে ঠিক করেছিলাম। নোট দু'টো হাত বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, যেন সাপ দেখে এরা দু'জন পিছিয়ে গেল। এবং সমস্ত অঙ্গভঙ্গী এক করে বলল যে হোষ্টেল থেকেই তারা টাকা পেয়েছে। আবার পয়সা কেন?

যতই বলছি এ হোষ্টেলের টাকা নয়, হোষ্টেলের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, তারা আমার বোঝা বহন করছে বলে খুসী হয়েই এ টাকা দিচ্ছ, ততই দু' হাত পিছিয়ে যাচ্ছে। আমিও নাছোড়-বান্দা। কোন রকমে দুজনের হাতে টাকাটা গুঁজে দিলাম। ভেবেছিলাম জিতটা আমারই। কিন্তু অনেক দেখার বাকী ছিল। একটু পরেই তারা ফিরে এল। এবার সঙ্গে আমাদের হোষ্টেলের জাপানী ভদ্রলোক দুজনের একজন। ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে আমার দিকে নোট দু'টো ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনিই ওদের এটাকা দিয়েছেন?

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি? ওরা আমার মোট বইছিল। সেজন্যে খুশী হয়েক ওদের বখশীষ দিয়েছি।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা জাপানীতে বলছিলাম কথাগুলো। গাইড্ দুজন তাই বুঝতে পারল কথার মর্ম। এবং আবার সেই একই ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলে উঠল এ টাকা তারা কিছুতেই নিতে পারবেনা।

একশ ইয়েন টাকার হিসেবে দু'টাকার মত। বখশীষের পক্ষে কিছুই নয়। কিন্তু কি আত্মসম্মান বোধ এদের! সাধারণ গাঁয়ের লোক। পেশা গাইডগিরি। তাও আবার বছরে ছমাস বন্ধ। সারা বছরের রোজগার হয়ত এ থেকেই করতে হয়। বাড়ীতে জমিজমা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু পেট চালাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলেই পাহাড় ভাঙার খাটুনী ঘাড়ে করে নিয়েছে।

ভাবতে গিয়ে দেশের একটা ছোট ঘটনা মনে পড়ে গেল। ছাত্রাবাসের এক বন্ধু কোন এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাজনীতি নিয়ে অনেক কথা বলত। বুঝিয়ে দিত কেন এই দলগত বিরোধ ইত্যাদি। কিছু মাথায় ঢুকত আর বেশীর ভাগই রয়ে যেত বুদ্ধির অগোচরে। হঠাৎ সেদিন কি কারণে ডেকে গিয়েছিলাম। একটা জাহাজ এসে ভিড়েছে আর যাত্রীর দল কাষ্টমস্ এর কাজ চুকিয়ে এক এক করে বেরিয়ে আসছে। কয়েক জন বিদেশীও ছিল এদের মধ্যে। জাহাজ কোম্পানী

থেকেই মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করা আছে। এই বাহকদের লাল জামার উপর লেখা রয়েছে ফ্রি পোর্টার। অর্থাৎ জাহাজ থেকে মাল নামাতে গিয়ে এরা কোন পয়সা চাইতে পারবেনা যাত্রীদের কাছ থেকে। কিন্তু কি অদ্ভুত! ঐ ফ্রি পোর্টার ব্যাজ্ নিয়ে রীতিমত ধমকের ভঙ্গীতে প্রতি মাল পিছু এরা আদায় করে নিচ্ছে একটাকা দু'টাকা। একজন যাত্রী আবার দু'টাকার জায়গায় একটাকা দিতেই ফ্রি পোর্টার তা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বন্ধুকে দৃশ্যটা দেখাতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এ অন্যায় বন্ধ করার দায়িত্ব তার এবং তার দলের রয়েছে কিনা।

একটু রেগে গিয়ে বন্ধু জবাব দিয়েছিল—যে টাকা ন্যায্যভাবে এদের প্রাপ্য তাতে এদের কুলোয়না। কাজেই অর্থবানদের কাছ থেকে যদি ঐ রকম করে এরা টাকা আদায় করে তার মধ্যে তো আমি কোন অন্যায় দেখিনা।

কাশীওয়াগী এবং কাগামীসানের ব্যাপারে এক নিমিষে সমস্ত ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। আমাদের তথাকথিত ফ্রি পোর্টারদের চেয়ে এদের অবস্থা কোন ক্রমেই উন্নত নয়। তারউপর একজন যেচে বখশীষ দিতে চাইছে। দেশের কথা ভাবতে গিয়েও শিউরে উঠলাম।

ট্রেন এসে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি নির্লোভের প্রতীক এই গাইড দু'জনের ছবি তুলে ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়লাম। দেশে ফিরে এসে এদের কথা আজও ভুলতে পারিনি। যখনই বখশীষ কথাটা কানে আসে তখনই মনে পড়ে কাশীওয়াগী আর কাগামীসানের কথা। মাথা ঝুঁকিয়ে, হাত নেড়ে যতরকমের নেতিবাচক ভঙ্গী আছে সবগুলোকে জড় করে জানাচ্ছে বখশীষ নেওয়া অসম্ভব। যেন জীবনের একটা চরম দীনতা প্রকাশ পাচ্ছে এই বখশীষ নিতে গিয়ে।

(ক্রমশঃ)


অনিল আচার্যের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০

(তৃতীয় সংস্করণ)

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯


২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

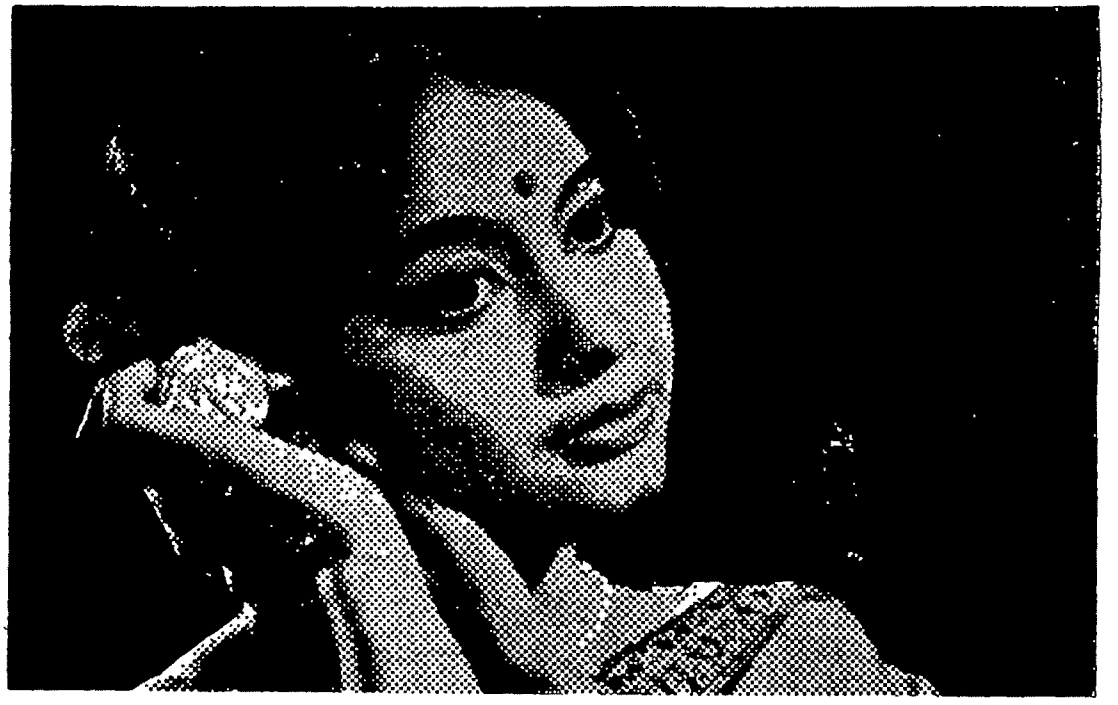

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৩
SBC-1/69

9 NOV 1970

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·70
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

আশ্বিন
১৩৭৭

# জয়শ্রী

প্রতিষ্ঠাত্রী – সম্পাদিকা :-
লীলা রায়

## সূচীপত্র

জয়শ্রী : আশ্বিন : ১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৫৪৩ |
| বিস্ফোরণ : ১৯১০ ( ধারাবাহিক রচনা ) | কালীচরণ ঘোষ | ৫৫১ |
| সুভাষবাদ ( আলোচনা ) | পবিত্রকুমার ঘোষ | ৫৫৯ |
| **কবিতাগুচ্ছ** | | |
| যাঁর কর স্পর্শে : | সুনীল বসু | ৫৬৩ |
| ঈশ্বরের বিকল্প | প্রভাকর মাঝি | ৫৬৪ |
| যুক্ত-প্রতিনিধি | শংকর দে | ৫৬৪ |
| প্রণাম | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ৫৬৬ |
| অনুষ্ঠান বর্জনের উৎসব | ক্ষিতীশদেব সিকদার | ৫৬৬ |
| কণ্ঠভরা বিষ ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) | সিহির মুখোপাধ্যায় | ৫৬৭ |
| জাপানের দিনগুলি ( ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী ) | বারীন বর্ধন | ৫৭৫ |
| জাতীয়তার রূপায়ন ( ধারাবাহিক আলোচনা ) | দীপঙ্কর | ৫৮১ |
| উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য ( পুস্তক পরিচয় ) | রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার | ৫৮৭ |


সম্পাদক : সুনীল দাস

## জয়শ্রীর নিয়মাবলী

### গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

### লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়**

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
পোঃ নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

# সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

## মতামত

সুভাষচন্দ্র প্রথম খণ্ড পড়ে ভাল লাগলো। অন্যান্য জীবনী থেকে এর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনার পরিচয় দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন লেখক। এই পরিকল্পনা যথার্থ বলে মনে হয়। সুভাষচন্দ্র কবি, দার্শনিক বা ধর্মগুরু নন। তিনি দেশনেতা। তাই দেশের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর নেতৃত্বে বনিয়াদ গড়েছে। সুতরাং তাঁকে জানতে হলে দেশ ও কালকেও জানা চাই। কবি এবং দার্শনিককে তাঁদের জীবনের মধ্যেই জানা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অসামান্য দানের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বিস্তৃত জীবনীই তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারে।

এই প্রথম খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ জীবনীর যে আভাস পাওয়া গেল তা আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। দেশ ও কালের প্রভাব কিভাবে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে লেখক তা সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে "শিবচেতনার জাগরণ" অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনারীতি বিষয় বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ছাপা বাঁধাই সুরুচিসম্মত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'জাতীয় গ্রন্থাগার'

৩৫ বর্ষ ০ ষষ্ঠ সংখ্যা ০ আশ্বিন ১৩৭৭

## সম্পাদকীয়

### রাজ্যপালদের "বিচার-বিবেচনার" সাংবিধানিক ক্ষমতা

রাজ্যপালদের 'বিচার-বিবেচনার' সাংবিধানিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের প্ররোচনায় প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। কর্তাভজা রাজ্যপালেরা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ক্রীড়নক হয়ে রাজ্যপালের আসন কলুষিত করেছে। উত্তর প্রদেশে সাম্প্রতিক ঘটনা তার একটি চরম উদাহরণ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং-এর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল তার মন্ত্রীসভার চৌদ্দজন মন্ত্রীর দপ্তর কেড়ে নেবার পর তারা পদত্যাগে অস্বীকার করলে। তাদের পদচ্যুত করার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে রাজ্যপাল চরণ সিং এর পদত্যাগ দাবী করেন ঐ যুক্তিতে যেহেতু চরণ সিং-এর মন্ত্রীসভা একটি কোয়ালিশন সরকার এবং সেই কোয়ালিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শাসক কংগ্রেস চরণ সিং মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে, সেই কারণে চরণ সিং সংখ্যালঘু হয়ে তার পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অথচ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই চরণ সিং তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সপ্রমাণের জন্য বিধান সভা আহ্বান করে তার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিল।

কোনো মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কি নাই তা যাচাই করবার অধিকার রাজ্যপালের এক্তিয়ার বহির্ভূত। একমাত্র বিধানসভাতেই তার যাচাই হবে। এই সাংবিধানিক সূত্রটি রাজ্যপালদের সম্মেলনে এবং বিধানসভার অধ্যক্ষদের সম্মেলনে পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে। যেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী কালহরণ করবার জন্য এই অবস্থার সংশয় নিরসনে বিধান সভার বৈঠক বসাতে গড়রাজী হবে সেসব ক্ষেত্রেই রাজ্যপাল তার 'বিচারবিবেচনা' প্রয়োগের কথা ভাবতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সাংবিধানিক সঙ্কটের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করতে পারেন। উত্তর প্রদেশের পরিস্থিতিতে এ ধরণের ঘটনা আদৌ ঘটে নাই, তিন-চারদিন অপেক্ষা করলেই বিধান সভার ভোটে জানা যেত চরণ সিং এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিনা। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রমাণ করতে হবে বিধান সভায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিনা। মন্ত্রীসভায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্ন সংবিধানের

দিক থেকে গৌণ। সংবিধানে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার আদৌ যখন কোন স্বীকৃতি নাই, একবার সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা চরণ সিংকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব দিয়ে সেই সংখ্যালঘিষ্ঠতার অজুহাতে তাকে পদচ্যুত করবার সুপারিশ সাংবিধানিক ব্যাভিচার মাত্র। উপরন্তু যেখানে অন্যান্য কয়েকটি দল, যাদের বিধান সভায় নিঃসংশয়ে সমবেত সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে—তারা চরণ সিংএর প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাজ্যপালকে বিধান সভায় চরণ সিং-এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। কিছুদিন পূর্বে পাঞ্জাবে কোয়ালিশন বাদল মন্ত্রীসভা জনসংঘের সমর্থন হারিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরামর্শক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বাদলকে বিধান সভায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের সুযোগ দিয়ে সেই মন্ত্রীসভাকে কেন্দ্রীয় সরকার বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন কারণ সেক্ষেত্রে শাসক কংগ্রেসের সমর্থন বাদল মন্ত্রীসভার দিকে প্রসারিত হয়ে আকালী-শাসক কংগ্রেসের সমঝোতার ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রশ্নটি প্রবল ছিল।

রুশ দেশের কিয়েভে রাষ্ট্রপতির শাসনে নির্দেশনামা সহি করে রাষ্ট্রপতি গিরি স্বরাষ্ট্র বিভাগের মতকে নির্বিচারে গ্রহণ করে আরেকটি নিন্দনীয় নজীর সৃষ্টি করে তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির সুযোগ দিয়েছেন। আসলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তর প্রদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করবার উদগ্র আগ্রহই উত্তর প্রদেশের সাংবিধানিক ব্যাভিচারের মূল উৎস। ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টায় সকল সাংবিধানিক শালীনতাকে অগ্রাহ্য করে পরিষদীয় গণতন্ত্রকেই হাস্যস্পদ করে তুলবার পরিস্থিতি সৃষ্টিতে শাসক কংগ্রেসের অগ্রণী ভূমিকা দেশে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এই সঙ্কটের জন্য বিরোধীদলগুলির দায়িত্বও কম নয়। পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রতি কেন্দ্রীয় শাসকেরা আঘাত হেনে যে অপরাধ করেছিলেন, ১৯৬৮ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারীর পর সে-সময়কার সংখ্যালঘু পি, ডি, এফ সরকারকে বিধান সভায় পরাজিত করবার সুযোগ না দিয়ে সরকার-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করে সেই অপরাধেই চিহ্নিত হয়ে আছেন। এমন কি তৎকালীন বিধান সভার অধ্যক্ষ, বিধান সভার সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধাবোধ না করে বিরোধী যুক্তফ্রন্টের ও লোকসভার বিরোধীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পি, ডি, এক মন্ত্রীসভাকে বাতিল করবার জন্য সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের জন্য প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিধান সভার প্রাধান্য যারা এইভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতার পায়ের তলায় লুটিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই, তারাও শাসক কংগ্রেসের সাংবিধানিক ব্যাভিচারের শরিকরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

## উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত বিধায়ক দল

পরিস্থিতির চাপে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর প্রদেশে পুনরায় পরিষদীয় শাসন চালু করতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রপতির শাসন সেখানে তুলে নিয়ে সংগঠন কংগ্রেস্ জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র বি, কে ডি ও এস, এস, পির সমবায়ে গঠিত সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা শ্রী টি, এন সিং মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন। ইতিপূর্বে উত্তর প্রদেশে চরণ সিং-এর নেতৃত্বে সংযুক্ত বিধায়ক দলের শোচনীয় পরিণতিতে, এবারকার বিধায়ক দল সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া না গেলেও, এই দলগুলি অতীতের শিক্ষা গ্রহণ করে সংযুক্ত বিধায়ক দলকে টিকিয়ে রাখতে কতটা সমর্থ হবে, সে-পরীক্ষা সবে সুরু হোলো। উত্তর প্রদেশে চন্দ্রভানু গুপ্ত ও চরণ সিং-এর বিরোধ এবং এস্ এস্ পি ও বি, কে, ডির বিরোধ যে পরিমাণে প্রশমিত হবে সেই

পরিমাণে বিধায়ক দল স্থায়ী হবে। চরণ সিং এবং চন্দ্রভানু গুপ্ত দুজনেই মুখ্য মন্ত্রীত্বের দাবী থেকে এই বিরোধের জন্যই সরে গিয়ে টি, এন, সিং কে স্থান করে দিয়েছেন। টি, এন, সিং প্ল্যানিং কমিশনের ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন, রাজনৈতিক দলের রেষারেষি তাকে এখনও স্পর্শ করে নাই। সুতরাং তার নেতৃত্ব, দক্ষ পরিচালনা এবং নিরপেক্ষতা সংযুক্ত বিধায়ক দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হবে। কিন্তু এখনও কোন দল কতজন মন্ত্রীপদ নেবে সে বাটোয়ারার বিবাদ উত্তীর্ণ হতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট কোনো দল তার দলীয় কর্মসূচী সংযুক্ত বিধায়ক দলের ওপর আরোপ করতে চাইলে পুনরায় সঙ্কট দেখা দেবে। এস, এস, পি, মন্ত্রীসভার উপর সময়-ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের এবং চরণ সিং মন্ত্রীসভা কর্তৃক প্রবর্তিত অর্ডিনান্সগুলি তুলে নেবার যে শর্ত আরোপ করেছে, তার মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজ নিহিত রয়েছে।

## আবার পাকিস্তানী আক্রমণ?

গত ২৮শে অক্টোবর 'পতাকা দিবসে' অর্থসংগ্রহ অভিযান উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বোম্বাই শহরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সহকারী মন্ত্রী এন, এস, সাহিদা বলেছেন যে পাকিস্তান-ইসরাইলী-ধরণের ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধের জন্য ("hit and run Isreali-type war") প্রস্তুত হচ্ছে। সেই সঙ্গে বোম্বাই অধিবাসী-দের স্মরণ করিয়ে দেন যে বোম্বাই করাচী থেকে মাত্র ৩০০ মাইল দূরে রয়েছে এবং এই ধরণের এলাকাগুলি পাকিস্তান আক্রমণের লক্ষ বস্তু হবে।

পাকিস্তানের নির্বাচন আগামী ৬ ই ডিসেম্বর। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবার রহমানের সম্ভাব্য প্রাধান্য খর্ব করবার জন্য পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক, ফৌজী এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ইতিমধ্যে দুই লক্ষের উপর পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গে এবং ত্রিপুরায় ঠেলে দিয়েছে এবং নূতন ভাবে হিন্দু-বিতাড়ন শুরু করেছে। এই নির্বাচনের গতি-প্রকৃত যদি আওয়ামী লীগের অনুকূলে যাবার সম্ভাবনা থাকে, শুধু পাকিস্তানের কয়েমী স্বার্থ নয়, যে সকল শক্তি পাকিস্তান ও ভারতের সৌহার্দকে এই উপমহাদেশে তাদের ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিপন্থী বলে মনে করে তাদের সকলের চেষ্টাই থাকবে সে সম্ভাবনাকে বানচালে সহায়তা করবার। এদিক থেকে চীন এ-পর্যন্ত পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং ১৯৬২ সাল থেকে খোলাখুলি ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ইন্ধন যুগিয়েছে, সীমান্তে আক্রমণের উদ্যোগ অব্যাহত রেখে পাকিস্তানের সামরিক আয়োজনে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। সম্প্রতি চীন ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য তাদের ভারত-বিরোধী মনোভাব কিছু পরিমাণে শিথিল করেছে এই মর্মে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার কতটা কপট, কতটা সুনিশ্চিত একথা এখনই বলা মুস্কিল। অবশ্য চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধূলি-ঝঞ্ঝা প্রশমিত হয়ে যাও সে তুং এবং চীন সামরিক বাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব চীনের জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর, চীনের দিক থেকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিতে পারে। বহুকাল বিরতির পর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সে-ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে।

তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্বে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে যারা সম্প্রতি পাকিস্তানের কয়েকটি সামরিক প্রধানের পিকিং-এ উপস্থিতিকে চীনের দিক থেকে লঘু করে দেখাবার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করছেন, তাদের এই ত্বরিৎ সিদ্ধান্তকে নির্বিচারে গ্রহণ করা ভুল হবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র-প্রধান ইয়াইয়া খানের আসন্ন চীন

সফরের পর সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে।

পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে নূতন কোনো সামরিক সাহায্য না পেলেও এ-যাবৎ যে সামরিক সাহায্য চীন দিয়ে এসেছে, সে-সঙ্গে সোভিয়েত রুশ, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের সামরিক সহায়তা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে প্রবলভাবে আক্রমণাত্মক করে তুলেছে। চীনের প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ সহায়তায় এবং অন্যান্য দেশের শস্ত্রবলে বলীয়ান পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব আগামী ৬ই ডিসেম্বরের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে বানচাল করে দেবার জন্য ১৯৬৭র আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের মত ভারতবর্ষের উপর ঝটিতি পাকিস্তানী আক্রমণকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পাকিস্তানের সামরিক শক্তির পাঁচগুণ ভারতের সামরিক শক্তি, এই যুক্তির বলে পাকিস্তান বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শক্তির আক্রমণাত্মক বিন্যাস এবং ভারতের সামরিক শক্তির প্রতিরক্ষাকেন্দ্রিক বিন্যাস এই যুক্তির অসারত্ব সপ্রমাণ করবে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শক্তি প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ, বিমান বাহিনীর প্রায় ২০,০০০ এবং নৌবাহিনী প্রায় ১০,০০০। এ-ছাড়া পাকিস্তানে সামরিক সংযোগ এবং সংবাদ আদানপ্রদানের আধুনিকতম মার্কিনী ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া আমেরিকা থেকে ৩০০ নূতন সমর সজ্জায় সজ্জিত পরিবহন বাহিনী, ৬টি এফ ১০৪ ৭টি বি-৫৭ বিমান এবং ৪টি নৌ-ওদারকী বিমান, শিক্ষাদেবার জন্য একটি সাবমেরিন পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

ফ্রান্স ও পাকিস্তানকে অবারিত সাহায্য দান করেছে: ৪টি সাবমেরিন, মিরাজ ৫ জেট বিমান।

পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর বহর সর্বসাকুল্যে ২৪ স্কোয়াড্রনের বেশী হবে। এতে যেমন মিরাজ ৫ জেট রয়েছে, তেমনি রয়েছে মিরাজ-৩, মিগ ১৯, আই-এল-২৮, ও আমেরিকার বিমানগুলি।

সোভিয়েত রুশ বিমানে ও ট্যাঙ্কে মিলিয়ে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করেছে। ২০০ নূতন ট্যাঙ্ক, তার মধ্যে ৫০টি টি-৫৫, এই সূত্রে পাকিস্তান সংগ্রহ করেছে। ইতিপূর্বে চীন পাকিস্তানকে টি-৫৯ রুশ ট্যাঙ্ক দিয়েছে তাছাড়া প্যাটন, শেরমান ও সার্কি ট্যাঙ্ক তো রয়েছেই।

ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা শক্তি—চীন ও পাকিস্তান—দুই সীমান্ত রক্ষা করবার জন্য নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক শক্তি ভারতবর্ষের সীমান্তেই উদ্যত। আক্রমণাত্মক পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ভয়াবহ অরাজকতার তাণ্ডব সৃষ্টি করবে, বিশেষত সীমান্ত রাজ্যগুলিতে। সে-অবস্থায় কেবলমাত্র সামরিক শক্তির পূর্ণ প্রস্তুতি নয়, সীমান্তের পশ্চাতে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বৈদেশিক শক্তির বিধ্বংসী অনুচরদের বিরুদ্ধে সংহত হয়ে তাদের উপর প্রতিরোধ করবার দায়িত্ব এসে-যাবে। পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক বিন্যাসও এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢেলে সাজতে হবে।

## নির্বিচার হত্যা

পশ্চিম বঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে, যে বর্তমান অবস্থায় নির্বিচার হত্যা সুরু হয়েছে। একদিকে নক্সালপন্থীরা, কখনও নক্সালদের আড়ালে কিম্বা প্রকাশ্যে সি, পি, এম পন্থীরা নির্বিচার ও নির্বিবেক হত্যার শেষ পর্যায়ে পৌঁচেছে অপরদিকে পুলিশও শেষ পর্যন্ত 'গুলি করে মারো' এই নীতির আশ্রয় নিয়ে হত্যার অপরাধে সন্দেহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাস্তায়-মহল্লায় গুলি করে জীবনাবসান ঘটাচ্ছে। গত মার্চ-এপ্রিল থেকে সুরু করে এ-পর্যন্ত প্রায় ত্রিশটি বিভিন্ন স্তরের পুলিশ কর্মচারীকে

বিনা প্ররোচনায় হত্যা করা হয়েছে, ৩৫০-এর বেশী পুলিশ কর্মচারীরা আহত হয়েছে। এই হত্যাকারীরা গ্রেপ্তার এড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পলায়ন করেছে, যাদেরও বা সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আইনের ফাঁক দিয়ে তারা জামিনে বেরিয়ে এসে আবার হত্যায় লিপ্ত হয়েছে। এতো অরাজকতা ও হত্যা সত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি নিবর্তন-মূলক আইনের বিরুদ্ধে যেমন উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তেমনি এই হত্যার অভিযান প্রতিহত করতে কোনো সক্রিয় ভূমিকা থেকে বিরত থাকছে। হত্যাকারীদের যারা দেখছেন, চিনছেন তারাও সাহসে ভর করে এগিয়ে এসে নাগরিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। পনের বছর বয়সের ছাত্রকে স্কুলের ক্লাশ থেকে ডেকে এনে প্রায় তিন'শ ছাত্র-শিক্ষকের সামনে গুলি করে হত্যা কিম্বা ক্লাসে ঢুকে শিক্ষিকার বুকে ছুরিকাঘাত—এই নারকীয় ঘটনার জন্য যেমন একদিকে যথাক্রমে সি. পি, এম এবং নক্সালপন্থীরা দায়ী, তেমনি আর একদিকে যুক্তফ্রন্টের আড়ালে গদিয়ান হয়ে যে-সব দল সেদিন ক্ষমতার সুখস্বপ্ন দেখে যুক্তফ্রন্টের বাহিরে বিভিন্ন দলের সদস্যদের কিম্বা দল-নিরপেক্ষ লোকদের ওপর সি, পি, এম গুণ্ডাদের লাঞ্ছনা নীরবে হজম করে—'যা শত্রু পরে পরে নীতি' অবলম্বন করে উট পাখির মত বালুতে মাথা গুজে ছিলেন,—পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করতে পরোক্ষে সহায়তা করেছেন, পুলিশের উপর লাঞ্ছনার নীরব দর্শক হয়েছেন, কারণে-অকারণে পুলিশের উপর চোখ রাঙিয়ে তাদের নৈতিক মনোবল চূর্ণ করে দিয়েছেন, বর্তমানের এই নারকীয় পরিস্থিতির জন্য তারাও সর্বতোভাবে দায়ী—তারা আট-পার্টি জোটে কিম্বা ছয় পার্টি জোটে যেখানেই থাকুন না কেন। বাংলা কংগ্রেসের দায়িত্বও কম নয়। তবুও বলতে হবে অজয়বাবুর নিজের ভুল বুঝে তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন—পুলিশের নিরাপত্তা ও কঠোর হস্তে অরাজকতা দমনের এবং নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তণের দাবী করে।

আর যারা দফায় দফায় প্রস্তাবে পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন, নিবর্তনমূলক আইনের প্রয়োগকে বাধা দিচ্ছেন, তাদের বুঝবার দিন এসেছে যে যদি পুলিশ আজ নির্বিচার অত্যাচার করে তার মূল প্ররোচক এই বামপন্থী ধ্বজাধারীরা—যারা পুলিশকে লাঞ্ছনা ও হত্যার মুখে ঠেলে দিয়ে তাদের প্রাথমিক আত্মরক্ষার অধিকারটুকু কেড়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। সুতরাং যতই তারা অপরাধী দমনে নিষ্ক্রিয় থাকবেন বরং পরোক্ষে অপরাধীদের প্রতি কোমল হবেন, ততই তারা পুলিশকে অসংযত করে তুলবেন। দুর্বার আত্মরক্ষার তাগিদে যদি পুলিশ মরিয়া হয়ে ওঠে তবে তার জন্য দায়ী হবে এই বামপন্থী ধ্বজাধারীরা। তারা গণতন্ত্রের সমাধি রচনাও অগ্রণীর ভূমিকা সৃষ্টি করে চলেছেন। আজ যদি সমবেতভাবে, কঠোর হস্তে, নির্বিচার ও নির্বিবেক হত্যার জন্য প্রতিরোধ শক্তি না গড়ে তোলা যায়, যদি প্রশাসনকে শক্তিমান না করে তোলা যায়, পশ্চিম বাংলায় অবিলম্বে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে নির্বিচার হত্যার ব্যাপক তাণ্ডব নেমে আসবে। দল-নির্বিশেষে ঘাতকের হাতে মৃত্যু সেদিন রাজনৈতিক নেতাদের অদৃষ্টের লিখন হয়ে দাঁড়াবে। যারা এখনও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে খেলা করছেন, ভোটের স্বপ্ন দেখে নিবর্তনমূলক আইনের বিরোধিতা করছেন, তারা ভুলে যাচ্ছেন, যাদের হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তারা যদি ক্রমাগত হত্যার ও রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হন, সে-ক্ষেত্রে তারাও একদিন বেঁকে বসতে পারে। সেদিন যে অঘটন ঘটবে সেই সর্বনাশা-পরিস্থিতি মনে রেখে বামপন্থী ধ্বজাধারীরা সময় থাকতে সাবধান হবেন আশা করি। সময়ের সীমা বিপদের প্রান্তসীমায় গড়িয়ে এসেছে। কালহরণের আর সময় নাই।

## আমাদের বন্ধু-বিয়োগ

অতি অল্পসময়ের ব্যবধানে আমাদের দুই সুহৃদ অকস্মাৎ অকালে লোকান্তরিত হয়ে আমাদের আত্মীয়-বিয়োগ বেদনায় সিক্ত করে গেছেন। গত ১২ই অক্টোবর বেলা বারটায় প্রাক্তন বিপ্লবী শ্রীবিভূতি কুমার গুহ চৌধুরী ( ননী ) অল্প কয়েকদিন রোগভোগের পর হঠাৎ তার পার্কসার্কাসের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তারই মাত্র কয়েকদিন পর ঢাকার 'বাণীসঙ্ঘের' উদ্যোগী সদস্য শ্রীকৃষ্ণজীবন রায় ( ভক্ত ) গত ৭ই নভেম্বর বেলা বারটায় দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত রাত্রি সাড়ে দশটায় মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উভয়েই মাত্র ৬২ বছরে পৌঁচেছিলেন। এঁরা দুজন আমাদের সকল অনুষ্ঠান-উদ্যোগের শুভাকাঙ্খী ও সঙ্গী ছিলেন।

বিপ্লবী বিভূতি গুহ চৌধুরী কলিকাতা কংগ্রেসের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্তৃক গঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীর অফিসার ছিলেন এবং দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন। কৃষ্ণজীবনবাবু ছাত্রজীবনে ঢাকার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলিকাতার সেবামূলক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৩ আসামে বাঙ্গালী বিতাড়নের পর দীর্ঘকাল আসামে অবস্থান করে তিনি বিপর্যস্ত বাঙ্গালীদের সাহায্য ও সেবা করেন। এ শোকাবহ ঘটনা দুইটি আমাদের আরও ব্যক্তিগত-ভাবে স্পর্শ করেছে এই কারণে যে বিভূতিবাবুর সহধর্মিণী শ্রীমতী সুলতা গুহ চৌধুরী এবং কৃষ্ণজীবনবাবুর সহধর্মিণী শ্রীমতী উষা রায়—যাঁরা সহোদরা এবং শ্রীমতী সুলতা তাদের মধ্যে কনিষ্ঠা—জয়শ্রী-পরিচালনায় আমাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ-সহযোগী, আমাদের সুখ-দুঃখের সমভাগী এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকার একান্ত অনুসারী। এঁদের পিতা স্বদেশপ্রাণ ৺হেমাঙ্গমোহন ঘোষ এবং সমগ্রপরিবার ঢাকায় লীলা রায় ও অনিল রায়ের একই পল্লীবাসী ছিলেন এবং তাদের শুভানুধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ সমর্থক ছিলেন। তাই এই দুই সহোদরার ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের আবেগে অভিভূত করেছে। আমরা তাদের এই অন্তহীন শোকে তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সর্বান্তঃকরণের সমবেদনা এবং আমাদের দুই অকৃত্রিম সুহৃদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। বিধাতা তাঁদের আত্মার শান্তি বিধান করুন শোকার্তদের শক্তি দিতে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

# সব মানুষের জন্য সব কলমের জন্য

## সুলেখা

### সুলেখা
স্পেশ্যাল

পার্মানেন্ট ঃ
ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু
ব্ল্যাক ★ ব্রাউন
ওয়াশেব্‌ল ঃ রয়েল ব্লু
রেড ★ গ্রীণ

### সুলেখা
একজিকিউটিভ

পার্মানেন্ট ঃ
ব্লু-ব্ল্যাক ★ নেভি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেব্‌ল ঃ রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড গ্রীণ
স্কারলেট রেড

### সুলেখা
জেনারেল

পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেব্‌ল ঃ
রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের
গৌরব-ধন্য

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

## ভুল সংশোধন

ভাদ্র সংখ্যা জয়শ্রীতে প্রকাশিত "কেরালার রায়" নিবন্ধে কয়েকটি গুরুতর ছাপার ভুল রয়েছে। নীচে ভুলগুলি ও সংশ্লিষ্ট সংশোধন দেওয়া হল। [ জঃ সঃ ]

| ভুল | সংশোধন |
|---|---|
| ৫৩৫ পৃঃ ২য় কলম ১০ম লাইনে | |
| 'কংগ্রেস পার্টি' | 'কম্যুনিষ্ট পার্টি' |
| আবার ঐ কলমের ২৩ লাইনে | |
| 'কংগ্রেস' | 'কম্যুনিষ্ট' |
| ৫৩৬ পৃঃ প্রথম লাইনে 'ভোট' | জোট |
| ,, প্রথম কলমে ১৪-১৫ লাইনে | |
| মাঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি | বাদ যাবে |
| ,, দ্বিতীয় কলমের ৪র্থ প্যারার | |
| ২য় লাইনে '১টি' | ৯টি |
| ৫৩৭ পৃঃ প্রথম কলমে ২৮ লাইনে | |
| 'এলেপিপ্, এর্ণাকুনার, | এলেপ্পি, এর্ণাকুলাম, |
| কোট্টানাম, | কোট্টায়াম |
| ৫৩৭ পৃঃ দ্বিতীয় কলমের ১৯ লাইনে | |
| '১৮৬৫' | ১৯৬৫ |
| ৫৩৮ পৃঃ দ্বিতীয় কলমে ১২ লাইনে | |
| মার্কস | মস্কৌ |

## ক্ষিপ্তি

অনিবার্যকারণে শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধ 'দিদি' এ-সংখ্যায় ছাপা গেল না। পরবর্তী সংখ্যায় পরের কিস্তি ছাপা হবে। জঃ সঃ

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস

ধারাবাহিক রচনা

# বিস্ফোরণ

১৯১০

কালীচরণ ঘোষ

সংক্ষিপ্ত সার ঃ

ষড়যন্ত্র ; বীরেন দত্তগুপ্ত ; খুলনা-যশোর ষড়যন্ত্র মামলা ; সোলেগাস্তি ; ধুলগ্রাম, মোহনগঞ্জ ; হাওড়া ষড়যন্ত্র ; নন্দনপুর ; মহেশা ; ঢাকা ষড়যন্ত্র ; গোলোকপুর বন্দুক চুরি ; হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টা, মুনসীগঞ্জে অস্ত্র আবিষ্কার ; হলদিয়া হাট ; কালয় গাঁ ; দাদপুর ; বিপ্লবী বসু হত্যা।

সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের অত্যাচার রোধ করবার জন্য নানা প্রকার নিরোধক আইন প্রবর্তিত হয়েছে। অপরাধের জন্য বিচারে আসামীদের দণ্ড দেওয়া চলছে, কিন্তু মনে হচ্ছিল পুলিশ এই সব পথে বিশেষ লাভবান হচ্ছে না। আলিপুর ষড়যন্ত্রে হাত পেকেছে, এক সঙ্গে অনেকগুলি আসামী বা সন্দেহভাজন লোককে শাস্তি দেবার সুযোগ দেখে গভর্ণমেণ্ট এই সময় বড় বড় তিনটে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় ১১৪ জনকে। আর সন্দেহে ধরপাকড় কত হয়েছে তা বলা বড় কঠিন। কাকে কাকেও প্রাথমিক তদন্তের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আর কিছুই নয়, কতকটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা আর বাকীটা লোককে "দাগী" করে দেওয়া যাতে পুলিশের খর দৃষ্টির মধ্যেই থাকে আর নতুন ঘটনা হলে ঐ মার্কামারাদের ধরে তাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

## বীরেন দত্ত গুপ্ত

আলিপুরের ষড়যন্ত্র মামলার পর মনে করলেই এই ঘটনার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত বুঝতে কষ্ট হয় না। ঐতিহাসিক মামলার আসামীদের দণ্ডবিধানের জন্য যাঁরা খুব তৎপর ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পুলিশের ইনস্‌পেকটর সামস্‌-উল্‌-আলমের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মামলার পর সফল পরিসমাপ্তিতে সরকারী নেকনজর তাঁর ওপর ঝরে পড়েছে। জীবনে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে, প্রায় রাতারাতি ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হয়ে যান। এ হেন সময় দৈব দুর্ব্বিপাক তাঁর সকল আশা সমূলে উৎপাটন করে ছাড়লো।

এই পুলিশ সাহেবটিকে আলিপুর মামলার আসামীরা ভালভাবেই চিনতেন। এর সম্বন্ধে সে সময় একটি প্রচলিত ছড়া গজিয়ে উঠেছিল :

"তুমি সরকারের শ্যাম
আমাদের শূল
(কবে) তোমার ভিটেয় চরবে ঘুঘু
দেখবে চোখে সরষে ফুল॥
(নির্বাসিতের আত্মকথা)

অল্পকালের মধ্যে সত্যি সত্যি তার চোখে সরষে ফুল ফুটে

উঠেছিল। শাসনযন্ত্রের স্তম্ভ স্বরূপ আলম সাহেব শরীর রক্ষী নিয়ে চলা ফেরা করতেন। কিন্তু যাকে যমে টানছে তার বিপদ ঘটবার জন্য শতছিদ্র খুলে যায়। লক্ষীন্দরের নিশ্ছিদ্র ঘরেও কালনাগিনী প্রবেশ করে দংশন করেছিল। নিয়তি তার মৃত্যুর জন্য যোগাযোগ ঘটিয়েছিল।

১৯০৯ সালের ডিসেম্বর নাগাদ আলম সাহেব হাইকোর্টে আলিপুর মামলার রেফারেন্স (refence) এর সরকারী তদ্বির কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯১০ জানুয়ারি ২৪-এ বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাছারীর কাজকর্ম শেষ করে পূর্ব (দক্ষিণ) দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার জন্য এগিয়ে চলেছিলেন। তাঁর সামনে চলেছেন এ্যাডভোকেট জেনারেল আর পিছনে চলেছে আলমের অস্ত্রধারী দেহরক্ষী।

আলম সাহেব প্রায় পা বাড়িয়েছেন প্রথম ধাপে নামবার জন্য। হঠাৎ একটি স্বল্প বয়স্ক যুবক সামনে এসে উপস্থিত। হাতে তার রিভলভার; আলমের শাস্ত্রী সেটা দেখতে পেয়েছিল। চক্ষের নিমেষে রিভলভার উঁচু করে প্রায় আলমের গা ছুঁইয়ে ঘোড়া টিপে দিল। আহত হয়ে আলম চীৎকার করে উঠলেন, "পাকড়ো" এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের ছড়িটা আততায়ীকে আঘাত করার জন্য শাস্ত্রীকে দিলেন আর নিজে চিৎপাত হয়ে মেঝের পড়লেন। বোঝা গেল গুলিটা তার হৃদযন্ত্রের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে; সঙ্গে সঙ্গেই আলমের ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল।

বীরেন পিছু ফিরেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে "খুন! খুন', বলে চীৎকারে উঠে পড়েছে। বীরেন সিঁড়িতে বাধা পায়নি, সরাসরি পূব দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়তে গিয়ে দেখতে পেলো দরজা বন্ধ এবং দরজার বাইরে জনতা দাঁড়িয়ে। একটা গুলি ছোড়ায় লোক পাতলা হয়ে পড়লো আর বীরেন তার পরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েই রাস্তা ধরে উত্তর দিকে ছুটতে লাগলো।

এক অশ্বারোহী পুলিশ তার পিছনে ধাওয়া আরম্ভ করে। বীরেনের বিপদ বেশী হ'লো লোকের ভিড় ঠেলে দৌড়ানো। অতি কষ্টে হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে পৌঁছুলে এক দ্বারোয়ান পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে। বীরেন ধরা পড়ার ঠিক আগে পুলিশকে তাক্ করে একটা গুলি ছোঁড়ে কিন্তু সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। অশ্বারোহী পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তখন বীরেনের হাতে ছিল ডুবরা ৩৮০ নলের ওয়েব্লি রিভলভার; সঙ্গে ছোরা বা ছুরি একখানা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক তদন্ত। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোনো কষ্টই হলো না ১৯১০ জানুয়ারী ২৭-এ যখন তিনি আসামীকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। কালবিলম্ব না করেই হাইকোর্ট বিচার আরম্ভ করলো জানুয়ারী ৩১-এ।

এ সব বীরত্বকাহিনী কজন শুনতে চায়। বীরেনের পক্ষে কোনো আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিল না। আসামীর পক্ষ সমর্থনে উকিল ব্যারিষ্টার, সাক্ষী প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ১৮।১৯ বছরের যুবক বীরেন বল্লে, যে সে আসামীকে মেরেছে। সে মৃত্যুদণ্ডের আসামী তাই প্রধান বিচারপতি আসামীর পক্ষে এক ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু জজকে সে বলে যে সাহায্যে তার প্রয়োজন নেই।

ঐ এক দিনেরই ব্যাপার। জুরীদের আর অন্তরালে গিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করতে হলো না, সেখানে বসেই সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করে মত দিলেন। জজ সাহেব কালবিলম্ব না করেই ফাঁসির হুকুম দিলেন। রায় শুনে আসামীর মুখ স্বর্গীয় বিভায় ভরে গেল; স্মিতহাস্য; ঠোঁট দুটিতে পদ্মদলের সুষমা ফুটে উলো। মৃত্যু বিভীষিকা লজ্জা পেয়ে অন্তর্হিত হলো। এজলাস শুদ্ধ লোক বিস্ময়ে হতবাক্; "বর্ম্ম আবরিত দ্বারির চোখে" অর্থাৎ কঠোরতম হিয়ার মানুষের চোখে দু ফোঁটা শোক আনন্দের অশ্রু ফুটে বেরুলো।

হাসিমুখে, লঘু ও ত্বরিত পদে কাঠগড়া থেকে আসামীর

পিঁজরার মধ্যে লাফ মেরে সে প্রবেশ করলো ; যেন দীর্ঘ প্রবাস থেকে বাড়ী ফেরার জন্যে পাল্কী চড়তে যাচ্ছে।

এক মুহূর্ত্তের জন্য সে বিচলিত হয় নি, যেন এ অভিনয় সে মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিল এবং অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে (জীবনের) রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ালো। ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন রাজপুরুষরা ভাবলে ইংরেজ শাসনের ভিত থেকে একখানা মূল পাথর সরে গেল।

আজ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। যখন আতঙ্কে তালু শুষ্ক হয়ে যাবার কথা, ক্ষুধা বিদায় নিয়ে গলার মধ্যে উদ্বেগ ডেলা হয়ে ঠেলে ওঠে, তখন মধ্যাহ্ন কর্ম্মবিরতির সময় ফাঁসীর আসামী বল্লে যে তার কচুরি সন্দেশ আর রসগোল্লা খাবার ইচ্ছা করছে। সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তার জন্য সে ব্যয়ভার বহন করেছিল। স্বয়ং টেগার্ট এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরম পরিতৃপ্তিতে বীরেন খাবার খেয়ে আবার ফাঁসির হুকুম শোনবার জন্য তদ্গত হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেল।

তার মামলার রায় আর ফাঁসির তারিখের মধ্যে পুলিশ এক অপকর্ম্ম করে। একটা সংবাদ পত্রের পাতা নতুন করে ছাপিয়ে বীরেনকে দেখানো হয় যে অন্যান্য লোক তার বিরুদ্ধে পুলিশকে গোপন তথ্য সরবরাহ করেছে এবং তার মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আছেন।

বীরেন এতে মর্ম্মাহত হয়। অব্যবস্থিত মনের অবস্থায় পুলিশের প্ররোচনায় বীরেন বলে যে যতীন মুখার্জ্জির নির্দ্দেশে সে এই কাজ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে যতীন মুখার্জ্জীকে আসামী খাড়া করে প্রেসিডেন্সী জেলে এক মামলা শুরু করা হয়। যতীন্দ্রনাথ এ সময় হাওড়া গ্যাং কেসের আসামী, জেল হাজতে দিন কাটছে। বীরেনের জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করে প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যেই এজলাশ খাড়া করা হলো। ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১৯-এ যতীনের আত্মীয়দের কাছে খবর গেল যে যতীনকে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরদিনই মামলা। বীরেনের জবানবন্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের ব্যারিষ্টারকে বলা হ'লো বীরেনকে জেরা করতে। ব্যারিষ্টার আপত্তি জানালেন তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে তিনি কোনো কথাই শোনার সময় পাননি।

হাকিম নাছোড়বান্দা। কারণ বীরেনের ফাঁসির দিন আসন্ন। ব্যারিস্টারের অনুরোধে মামলা খানিকক্ষণ মুলতুবী রাখা হ'লো। ব্যারিষ্টার ও পুলিশ কমিশনার ছুটলেন হোট লাটের কাছে, ফাঁসির দিন পিছিয়ে দেবার জন্য। তাঁরা বিফল হলেন, যথাকালে বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেল।

গভর্ণমেণ্ট পক্ষে যুক্তি হ'লো যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ, তখন জেরা না হ'লেও সে বিবৃতি যতীনের মামলায় লাগবে। ব্যাপারটা হাইকোর্টে পাঠালে জজেরা বলে দিলেন সেটা আইনমতে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। ফলে যতীন সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন।

বীরেনের একটা সন্দেহ ছিল যে কোথায় যেন কি গোল পাকিয়ে গেছে। "দাদা" কখনও তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না। পরে সে সমস্ত ঘটনার মধ্যে পুলিশের অপকর্ম্মের ইঙ্গিত পায়। তখন অনুশোচনায় সে ভেঙ্গে পড়ে। ফাঁসির হুকুম এই একরায়ের তুলনায় তার কাছে বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণার কাছে পিপিলিকার কামড়ের মত মনে হয়েছিল। সে কাতরভাবে যতীন্দ্রনাথের ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে লোক মারফত জানিয়েছিল। বলা বাহুল্য যতীন্দ্রনাথ জানতেন নীচ প্রতারণার কবলে না পড়লে বীরেনের মুখ থেকে কোনো কথা আদায় করা সম্ভব হয়নি।

১৯১০ ফেব্রুয়ারী ২১-এ অকুতোভয় বীরেন্দ্রের পবিত্র দেহ ফাঁসিকাষ্ঠে লটকে দেওয়া হয়।

আজ যে-ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বল্ জ্বল্ করছে, সে সময় সাধারণ লোকের কাছে এর কদর ত হয়ইনি, জাতীয়তা-

বাদী অমৃতবাজার পত্রিকা ঘটনাটি উল্লেখ করে সম্পাদকীয় মন্তব্য করে ( ২১. ১. ১০ )

"The terrible outrage committed yesterday shows that these diabolical terrorists are determined not to give peace to the country. Alas, how to convince them that the consequences of these terrible deeds in succession are causing an amount of misery which is beyond the power of endurance of the nation already bent down as it is under a mountain of suffering of various other kinds."

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

## খুলনা-যশোর-ষড়যন্ত্র মামলা

এক মহেশা ছাড়া নন্দনপুর, ধুলগ্রাম, সোলেগাস্তি প্রভৃতি কয়েকটা ছোটবড় ডাকাতির ব্যাপারে, পুলিশ আসামী ধরতে পারলে না। অগতির গতি তখন একটা ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হ'লো। প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হয় ( ১৯১০ ) অক্টোবর ২১-এ। কুড়ি জনের মধ্যে আঠারো জনকে নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত চলে। মামলা ১৯১০ ডিসেম্বর ১০-ই হাই-কোর্টে পাঠানো হয়। হাইকোর্টে শুনানী আরম্ভ হলো ১৯১১ এপ্রিল ২-রা। ঐ তারিখেই শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই—মুচলেখাবদ্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয়; যদি আবার অপরাধের সংবাদ পাওয়া যায় তা'হলে তাদের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড ভোগ করতে হবে। আসামীদের মধ্যে যে তিনজন অন্য মামলায় দণ্ডিত হয়েছে, তাদের মুক্তি দেওয়া হয়নি।

অন্যান্য মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত তিনজন আসামীর ক্ষেত্রে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে নারাজ হয়। ষড়যন্ত্রের আসামী তালিকায় এদের নামও ছিল।

প্রথম বিজয় কুমার চক্রবর্তী পলাতক অবস্থায় রাজসাহী অস্ত্র আইনে ১৯১০ মার্চ ১৯-এ তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী মহেশা ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত হয়।

ভগবতী চরণ ভট্টাচার্য্য মহেশা অতিরিক্ত ( সাপ্লিমেণ্টারী ) মামলায় তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

## সোলেগাস্তি ডাকাতি

খুলনা জেলার দামুরিয়া থানার অধীনে সোলেগাস্তি গ্রামে রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ( ১৯১০ ) ফেব্রুয়ারী ৭-ই দশ বারোজন লোক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে হানা দেয়। বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি, শ' দুই টাকা মাত্র লুণ্ঠিত হয়।

## ধুলগ্রাম ডাকাতি

এবার যশোরের পালা। ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১১-ই ধুল-গ্রামের ( থানা অভয়নগর ) চরণঋষির বাড়ী থেকে হঠাৎ হট্টগোল উঠ্‌লো "ডাকাত পড়েছে"। রাত্রি তখনও খুব বেশী হয়নি। কিন্তু ভয়ে বিশেষ কেউ বাধা দিতে এগিয়ে আসেনি। লুঠেরারা গহনা ও নগদে দু' হাজার টাকার বেশী নিয়ে চম্পট দেয়। যথারীতি তল্লাসী প্রভৃতি চল্‌লো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মামলা করবার মত তথ্য পাওয়া যায়নি।

## মোহনগঞ্জ ডাকাতি

রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় প্রায় জন বিশেষ লোক বাখরগঞ্জের কোতোয়ালী থানার মোহনগঞ্জ গ্রামে ১৯১০ মার্চ ৪-ঠা আক্রমণ করে। গহনাপত্রে মোটমাট দেড় হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়।

## হাওড়া ষড়যন্ত্র

পাইকারী হারে আসামী ধরে মামলা খাড়া করার মতলব কাজে লাগানো শুরু হয়ে গেছে। রাজদ্রোহের

আসামীর ব্যাপার ; নানা স্থানের ঘটনা বা সঙ্ঘ এক পাত্রে সিদ্ধ করলে সবই একাকার হয়ে যাবার কথা। এই সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে গভর্ণমেণ্ট হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা (gang case) ছেড়ে দেয়। ধরা যে কত জন হয়ে ছিল তার হিসাব করা শক্ত। তবে প্রায় শতাধিক হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লোক ছাড়া একেবারে গোছাধরে (groups) গভর্ণমেণ্ট টান মেরে ছিল। একটু "অতি বুদ্ধি" হয়ে পড়ে। সরকারী উকিল বল্লেন এগারোটা ভিন্ন ভিন্ন দল এই একই মামলার আসামী। স্থানের দূরত্ব অনেক, আর দল গুলি ভাগ করলে দেখা যায় ১) শিবপুর ২) কুরফি ৩) খিদিরপুর ৪) চিংড়ি-পোতা ৫) মাজিলপুর ৬) হলুদবাড়ী ৭) কৃষ্ণনগর ৮) নাটোর ৯) ঝাউগাছা ১০) যুগান্তর ১১) ছাত্রভাণ্ডার ১২) রাজসাহী (রামপুর বোয়ালিয়া) গ্রুপ।

তোড়জোড় ত মন্দ হলো না। সব ফাঁক বন্ধ করে মামলা সাজানো হ'লো। প্রাথমিক তদন্তের পর (১৯১০) জুলাই ২০-এ মামলা হাইকোর্টে দায়ের হয়ে গেল ছ'চল্লিশ জনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আয়োজন বা বিদ্রোহ। ১৯২০ ডিসেম্বর ১-লা থেকে মামলা আরম্ভ হয়।

শুনানির সময় পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। আসামী ভুবন মুখার্জী পাগল হওয়ায় আসামী তালিকা থেকে বাদ পড়ে এবং চারুচন্দ্র ঘোষ মারা পড়ায় রক্ষা পেয়ে যান। রায় প্রদত্ত হয় ১৯১১ এপ্রিল ১৯-এ। তেত্রিশজন মুক্তি পায়। আর হলুদবাড়ী ডাকাতি মামলার অভিযুক্ত ছ'জনের মধ্যে, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী ও কিরণচন্দ্র রায় দুজনের দু'বছর করে এবং চার জনের (শৈলেন্দ্র কুমার দাস, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অতুলচন্দ্র মুখার্জ্জী ও গণেশচন্দ্র দাস) এক বছর করে দণ্ড বাড়িয়ে দেওয়া। পূর্ব্বদণ্ড কাল শেষ হ'লে নতুন দণ্ড ভোগ সুরু হবে।

মোট আসামী তালিকার মধ্যে ছজনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত এক গুরুতর অভিযোগ ছিল। দশস জাট সেনা বিভাগের কাকেও রাজানুগত্য থেকে ভাঙ্গিয়ে আনার চেষ্টা। সেসন আদালতে (১৯১১) এপ্রিল ২৮-এ মামলা রুজু হয়। কিন্তু মূল মামলায় হাইকোর্টের রায় পড়ে গভর্ণমেণ্ট এপ্রিল ২৮-এ মামলা প্রত্যাহার করে।

মামলায় সাজা পেয়েছে অল্প সংখ্যক আসামী। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এ মামলা নাকি আশাতিরিক্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। সিডিসন কমিটির রিপোর্ট (পৃঃ ৪৪) বলছে, The continuance of the proceedings..... over a period of 12 months against 50 accused persons was followed by a complete cessation of **Bhadralok** dacoities in the districts around Calcutta.

## নন্দনপুর ডাকাতি

মোটাসুদে টাকা ধার দেয়ার বদনাম ছিল বিশ্বনাথ করের ; নিবাস নন্দনপুর, থানা ও জেলা খুলনা। ১৯১০ মার্চ ৩০-এ পনেরো ষোলজন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মধ্যরাত্রে গিয়ে বিশ্বনাথের বাড়ীতে হাজির। বাধা বিশেষ পেতে হয়নি বরং ডাক হাঁক আর অস্ত্রের ব্যবহার সম্ভবনায় প্রতিবেশী বিশেষ কেউ আসেনি গৃহস্বামীর বাড়ীতে। নগদে ও গহনায় প্রায় ১৩ হাজার টাকার মত লুণ্ঠিত হয়ে ছিল।

## মহেশা ডাকাতি

ঘটনাস্থল মহেশা গ্রাম যশোরের যামুদপুর থানার অন্তর্গত উমাচরণ ঘোষের বাড়ী। ১৯১০ জুলাই ৫-ই জন সাতেক যুবা বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন বলে বাড়ীর মালিককে দিয়ে সদর দরজা খুলিয়ে নেয়। হাতে অস্ত্রশস্ত্র, সাজ পোষাক "রণং দেহি" গোছের ; সুতরাং আগন্তুকদের উদ্দেশ্য বুঝতে আর বিলম্ব হ'লো না। জবরদস্তি হাজার আড়াই টাকা নিয়ে তারা চম্পট দেয়।

ডাকাতির অভিযোগে দায়রা মামলা উঠলো ১৯১০ আগষ্ট ২৭-এ আর রায়ে বেরুলো অক্টোবর ৮ই। এতে নিম্নোক্ত পাঁচ জনের সাজা হয়, একজন রাজসাক্ষী হয়েছিল। এদের দুজন যশোর-খুলনার ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিল। হেমচন্দ্র গাঙ্গুলির ছ'বৎসর সশ্রম, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচবৎসর সশ্রম, আর সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, বীরেশ্বর চ্যাটার্জ্জী প্রত্যেকের তিন বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য পলাতক ছিল। ১৯১১ এপ্রিল ৫ই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গ্রেপ্তার হয়। পরে মহেশা অতিরিক্ত (সাপ্লিমেন্টারী) মামলায় ১৯১১ মার্চ ৬-ই তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

## ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা

ঢাকা ও আশপাশের ডাকাতিতে গভর্ণমেণ্ট খুব বিব্রত হয়ে উঠেছিল। তখন 'সর্ব্বৌষধি মহৌষধি' রূপ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো। অভিযোগটা গুরুতর দণ্ডবিধি আইনের ১২১-এ, সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা এবং সে সম্পর্কে ষড়যন্ত্র। গভর্ণমেণ্টের মতে "a case of wide and gigantic conspiracy to subvert the British Government in near future."

জুলাই (১৯১০) থেকে ধরপাকড় আরম্ভ হয়। মাস খানেকের মধ্যে ধৃত লোকের সংখ্যা ৬০-এ উঠে গেল। গভর্ণমেণ্ট চেয়েছিল আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এবং সে উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হয়েছিল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ৫৫ জন আসামীর হাজির হবার কথা আগষ্ট ১৫-ই। তারমধ্যে ৪৫ জন উপস্থিত হয়। প্রাথমিক তদন্ত আগষ্ট ১৮-ই শুরু হয়ে কয়েকদিন বন্ধ থাকে। সেপ্টেম্বর ৩০-এ 'কেঁচে গণ্ডুষ' হ'লো।

তাড়াতাড়ি শুনানী শেষ হবে এবং বিচারকদের ওপর পুলিশের প্রভাব কম হবে বলে আসামীরা স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে বিচারের জন্য অক্টোবর ২৮-এ এক দরখাস্ত করে। নভেম্বর ১৮-ই সেটা নাকচ করে দেওয়া হয়।

সেসনে মামলা সোপর্দ হ'লো নভেম্বর ২২-এ। শুনানী আরম্ভ হয় ডিসেম্বর ১২-ই, আর নিয়মিত চলতে থাকে (১৯১১) জানুয়ারী ৬-ই পর্য্যন্ত। মে ৭-ই এ্যাসেসররা আসামীদের নির্দ্দোষ বল্লেও জজ সাহেব যে সাজা দিলেন সেটা সব দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর।

### যাবজ্জীবন দীপান্তর

(১) পুলিনচন্দ্র দাস (২) আশুতোষ দাশগুপ্ত ও (৩) জ্যোতির্ম্ময় রায়।

### দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

(১) অশ্বিনী কুমার ঘোষ (২) গুরুদয়াল দাস, (৩) চারুচন্দ্র সেন, (৪) যোগেশচন্দ্র রাউত, (৫) ক্ষীরোদ চন্দ্র গুহ, (৬) বঙ্কিম চন্দ্র রায়, (৭) রাধিকাভূষণ রায়, (৮) নিশিভূষণ বসু, (৯) নিতাই চন্দ্র বণিক্য, (১০) প্রফুল্লচন্দ্র সেন, (১১) রাধিকামোহন ব্যানার্জি, (১২) সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, (১৩) সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়, (১৪) সারদাচরণ দাশগুপ্ত, (১৫) শান্তিপদ (ওরফে প্রমথনাথ) মুখার্জ্জি, (১৬) ভূপতিনাথ সেনগুপ্ত, (১৭) ক্ষীরোদ চন্দ্র গুহ ও (১৮) মাণিক্য চন্দ্র গুহ।

### সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

(১) বিজয় চন্দ্র রাহা, (২) শচীন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, (৩) সুরেশ চন্দ্র সেন, (৪) অক্ষয় কুমার দত্ত, (৫) অবনী মোহন গাঙ্গুলী, (৬) বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী, (৭) গোপাল চন্দ্র ঘোষ, (৮) গোপীবল্লভ চক্রবর্ত্তী, (৯) হেম চন্দ্র সেন, (১০) যদুনাথ দাস, (১১) নিশিভূষণ মিত্র,

(১২) নৃপেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, (১৩) পরেশ চন্দ্র সেন ও (১৪) প্রমোদ বিহারী দাস।

কেবল সুধেন্দ্রমোহন সেনের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মোট ৩৫ জনের পক্ষে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। বিজয় চন্দ্র রাহা উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় আর আপীল হয় নি। আপীলের শুনানী আরম্ভ হয় (১৯১২) জানুয়ারী ১৫-ই; রায় বেরোয় এপ্রিল ২ রা। পরিবর্ত্তিত হলেও ১৪ জনের সাজা বহাল থাকে এবং ২১ জন মুক্তি পায়।

শেষ পর্য্যন্ত দণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে:

পুলিনচন্দ্র দাসের সাত ও আশুতোষ দাশ গুপ্ত ও জ্যোতির্ম্ময় রায়ের ছয় বৎসর করে দ্বীপান্তর।

গুরুদয়াল দাস ও বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

রাধিকাভূষণ রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শক্তিপদ মুখার্জী, ক্ষীরোদ চন্দ্র গুহ আর ভূপতি মোহন সেন গুপ্ত প্রত্যেকের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

গোপীবল্লভ চক্রবর্ত্তী, নিশিভূষণ মিত্র, নৃপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও প্রমোদ বিহারী দাশ প্রত্যেকের দু বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। গভর্ণমেণ্ট বিজয় রাহার সাজা দু বৎসর করে কমিয়ে দেয়।

### গোলকপুর বন্দুক চুরি

ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত গোলোকপুর গ্রামে জমিদার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী। ১৯১০ জুলাই ১০-ই দেখা গেল দু'টা দো-নলা 'গাদা' বন্দুক আর একটা দূর পাল্লার বন্দুক (রাইফেল) চুরি গেছে। চোর ধরা পড়ে নি।

## হত্যা ও হত্যা-প্রচেষ্টা

### গুপ্তচর হত্যা

শান্ত শিষ্ট লোকটি রাম দাস; কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। হঠাৎ একদিন সে রাজনীতি চর্চায় মনোযোগী হয়ে উঠলো; এবং ঢাকা সমিতিতে যোগও দিয়ে ফেল্লো। ক্রমে দলের খবর জানবার জন্যে অত্যুৎসাহী লক্ষ্য বলে করা গেল। তখন বিপ্লবী দল থেকে রামের উদ্দেশ্যটি আবিষ্কার করবার জন্য বিপ্লবী দলের গুপ্তচর পিছনে লাগলো। শীঘ্রই দেখা গেল রামচন্দ্র ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ একজনের বড়ই আস্থাভাজন ব্যক্তি।

এ অপকর্ম সহ্য করা যায় না। জুলাই ১৯-এ ঢাকা শহরের ওপরেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ঝর ঝরে ব্যবস্থা, কারও বিরুদ্ধে মামলা করা সম্ভব হয় নি।

### পুলিশ হত্যার চেষ্টা

ঢাকার পুলিশের সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর শরৎচন্দ্র ঘোষ। তার ওপর বিপ্লবীদের নজর পড়ে। (১৯১০) সেপ্টেম্বর ১-লা সন্ধ্যার পর তিনি তাঁর-যুগীনগর বাসা থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছেন, হাতে খরিদ করা ছোট খাটো জিনিষ। সেসন কোর্টের সামনে আসতেই একজন লোক তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তিনি সামান্য আহত হন।

দুজন যুবকের নামে মামলা রুজু হয় হাইকোর্ট সেসনে। ১৯১১ মে ৪-ঠা তারা অব্যাহতি পান।

### মুন্সীগঞ্জে অস্ত্র আবিষ্কার

ঢাকা অঞ্চলে উৎপাত চলছিল এবং পুলিশ বিব্রত হয়ে উঠেছিল। সন্দেহক্রমে (১৯১০) সেপ্টেম্বর ৫-ই মুন্সীগঞ্জে "চৌধুরীদের বাসা" তল্লাসী করা হয়। একটা টিন কানাস্তারার মধ্যে খানিকটা দেশী বারুদ মশলা আর এগারোটা বোমা পাওয়া যায়। তা ছাড়া বোমার ফর্মুলা, সাংকেতিক অক্ষরে কিছু লেখা এবং বিভিন্ন কাজের ভারপ্রাপ্ত তের জনের নাম। আর যায় কোথায়? সব গ্রেপ্তার। মামলা উঠলো, দশ জন মাঝ পথে

ছাড়া পেলো। শেষ পর্যন্ত তিন জন রয়ে গেল। সেসন আদালতে বিস্ফোরক আইনে ১৯১১ এপ্রিল ১০-ই কেবল ললিত চন্দ্র চৌধুরীর দশ বৎসর দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

## হলদিয়া হাট ডাকাতি

সন্ধ্যা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে, আঁধার নেমে এসেছে। মিষ্টি মিষ্টি শীতের আমেজ, লোকজন কিছুটা বিরল। তারিখ (১৯১০) সেপ্টেম্বর ৩০-এ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত প্রায় ত্রিশ জন ভদ্রলোক ঢাকার লোহাজং থানার অন্তর্গত হলদিয়া হাটের কিছু দোকান পত্র লুঠ করে চলে যায়। বিপদাশঙ্কা ছাড়া এতগুলি লোকের মজুরি পুষিয়েছে বলে মনে করা ভুল হবে। সর্ব্ব সাকুল্যে হাজার দেড়েক টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যেতে হয়েছিল।

## কালারগাঁ ডাকাতি

লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ বিচারের অপরাপর প্রায় সকল ডাকাতিকে অতিক্রম করে কালারগাঁ ডাকাতিতে। স্থানটি ফরিদপুরের ভেদারগঞ্জ থানার এলাকায় অবস্থিত। ডাকাত দল সংখ্যায় প্রায় পঁচিশ জন। ১৯১০ নভেম্বর ৭-ই রাত্রি আটটা নাগাদ ডাকাতরা ছুটো ঘাষি নৌকো করে ঘরিষা খাল বেয়ে এসে ধনী পাট ব্যাবসায়ী ঈশ্বরচন্দ্র পালের উপর আক্রমণ চালায়। লুঠের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক সাড়ে বারো হাজার টাকা।

## দাদপুর ডাকাতি

বৎসরের শেষ ডাকাতি, ১৯১০ নভেম্বর ৩০-এ; ডাকাত সংখ্যা ত্রিশ পয়ত্রিশ, বেশী হওয়ার সম্ভব। খুব বেশী রাত হয়নি, তবে শীতকাল রাত্রি আটটা নাগাদ ডাকাতরা বাখরগঞ্জের মহেন্দিগঞ্জ থানার দাদপুর গ্রামের দুর্গামোহন রায় চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করে এবং নগদে গহনায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

# বিপ্লবী হত্যা

## কালাচাঁদ বসু

পুলিশের হেফাজতে বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তির মৃত্যু বাঙলার ইতিহাসে অনেকগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। খুব গোড়ার দিকের একটি ঘটনা থেকে সমস্ত বিধি বিধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

১৯১০ সালে ডাকাতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে খুলনা সাতক্ষীরার পুলিশ কালাচাঁদ বসুকে গ্রেপ্তার করে সেপ্টেম্বর মাসে। সাতক্ষীরায় এক তৃতীয় শ্রেণীর জেলে তাঁকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আত্মীয় স্বজন কিছু কিছু খবর পায়। একদিন হঠাৎ প্রচারিত হল, কালাচাঁদকে কারাকক্ষে পাওয়া যাচ্ছেনা। পুলিশবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। কয়েকদিন দারুণ তল্লাসীর পর কালাচাঁদ ধরা পড়ে কল্যাণপুরের নিকট এবং তাকে মাগুরা জেলে সতর্ক প্রহরায় বন্দী করে রাখা হয়। একবারের অভিজ্ঞতার ফলে পুলিশের সতর্কতা বহুগুণ বেড়েছে; কাজেই জীবিত অবস্থায় জেল থেকে পলায়ন অসম্ভব।

পুলিশের হেপাজতে কালাচাঁদের কি হ'লো জানতে পারা গেলনা। হঠাৎ একদিন সাতক্ষীরা মহাকুমার এক নিভৃত অঞ্চলে ঝোপের মধ্যে কালাচাঁদের গলিত শব আবিষ্কৃত হ'ল। ধুমধামের সঙ্গে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে গভর্ণমেণ্ট লেগে গেলেন।

চারিদিক খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল আসামীকে আবিষ্কার করতে হবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গেলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে—কিন্তু যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে, তার মধ্যে ভূত আশ্রয় করে আছে। যারা এই খুনের জন্য দায়ী তাদেরই হাতে তদন্তের ভার, ফল যা হবার তার ব্যতিক্রম হয়নি। আততায়ী খুঁজে পাওয়া গেলনা।

(ক্রমশঃ)

# সুভাষবাদ

পবিত্রকুমার ঘোষ

## মার্ক্সবাদ ও সুভাষবাদ

রাজনৈতিক স্বার্থ দল বা ব্যক্তি বিশেষকে সুভাষবাদ ও মার্ক্সবাদ সমার্থক এই মত প্রচারে প্রণোদিত করতে পারে—কিন্তু এই এই প্রচারের পক্ষে যুক্তি আদৌ নেই। উক্ত দুটি মতাদর্শের দার্শনিক ভিত্তি সম্পূর্ণই পৃথক। কার্ল মার্ক্সের তুলনায় সুভাষচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতা বহুধা বিস্তৃত—পৃথিবীর সব কয়টি মহাদেশ তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মধারার সঙ্গে জড়িত, তাঁর গতি সর্বত্র প্রসারিত। কার্ল মার্ক্স জন্মেছিলেন স্বাধীন দেশে, বাসও করেছিলেন স্বাধীন দেশে—কিন্তু জীবনটা কেটেছিল তাঁর পুঁথিগত জগতে, পাঠাগারের মধ্যে প্রায় বন্দী দশায়। তাঁর দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু স্বদেশ থেকে তিনি ছিলেন বিতাড়িত;—এমন এক তত্ত্ব উদ্ভাবনায় তিনি সারা জীবন ব্যয় করেছিলেন দেশপ্রেমের স্ফূর্তির কোন অবকাশ যে তত্ত্বে নেই;—নিজের বিড়ম্বিত জীবনের কতকটা সান্ত্বনা এইভাবেই তিনি লাভ করেছিলেন। ইংলণ্ড তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেজন্য সেদেশের প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ তাঁর ছিল। বিপ্লবের ভরঙ্গে সারা ইয়োরোপকে প্লাবিত করতে চাইলেও তিনি ইংলণ্ডকে রক্তাক্ত পরিণাম থেকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছিলেন। Capital গ্রন্থের প্রথম ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস তাই লিখেছিলেন: ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও পরিস্থিতি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করে কার্ল মার্ক্স এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে,

> at least in Europe, England is the only Country where the inevitable social revolution might be effected entirely by peaceful and legal means.
>
> (Preface to the First English Edition ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৫৯ সালের সংস্করণের ৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)

আমাদের দেশে প্রচারিত হয়ে আসছে যে কার্ল মার্ক্স রক্তক্ষয়ী বিপ্লবেই একমাত্র বিশ্বাস করতেন;—কিন্তু ১৮৮৬ সালে, মার্ক্সের মৃত্যুর তিন বছর পরেই এঙ্গেলস জানিয়েছিলেন ব্যাপারটা তা নয়, রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ ও আইনতান্ত্রিক বিপ্লবেও মার্ক্সের বিশ্বাস ছিল।

কার্ল মার্ক্স তাঁর দার্শনিক প্রত্যয় লাভ করেছিলেন জার্মাণ দার্শনিকদের কাছ থেকে জার্মানীর বন, বার্লিন ও জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছিল, দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রী তিনি পেয়েছিলেন জেনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়ার ফলে তিনি বন থেকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হন, সেই সঙ্গে আইন পাঠ থেকে অব্যাহতি নিয়ে তিনি দর্শন পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর জীবনের অনেক অসঙ্গতির মধ্যে এও একটি।

যেমন আর একটি অসঙ্গতি তাঁর মাতৃভাষা সম্পর্কেও ছিল। জার্মানী তাঁর মাতৃ-ভাষা ছিলনা, ছিল পিতৃভাষা। তাঁর বাবা জার্মান হলেও, মা ছিলেন হাঙ্গেরীয়, যিনি জার্মান ভাষা পড়তে, এমন কি বলতেও পারতেন না। অথচ

জার্মান ভাষার প্রতি মার্ক্সের আসক্তি ছিল মাতৃভাষার চেয়েও অধিক। ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল বাস করে, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই ব্যাপক পড়াশোনা করে এবং ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখে জীবিকার্জন করেও তিনি তাঁর মূল গ্রন্থগুলি রচনা করে ছিলেন জার্মান ভাষায়।

মার্ক্সবাদের ভিতরেও মার্ক্সের জীবনগত অসঙ্গতিগুলি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যেমন, মার্ক্সবাদের দার্শনিক ভিত্তি জার্মানী থেকে আহৃত হলেও, তিনি তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তথা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ পেয়েছিলেন ফরাসী থেকে, যেখানে তিনি তাঁর যৌবনের দু তিনটি বছর কাটিয়েছিলেন এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লবেও অংশ নিতে গিয়েছিলেন। মার্ক্স তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্ব পেয়েছিলেন ইংলণ্ড থেকে, বিশেষত অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর রচনা ছিল তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার উৎস। মার্ক্স যে তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্ব ইংলণ্ডের অর্থনীতি অধ্যয়ন করেই লাভ করেছিলেন, এমনকি তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিই হচ্ছে ইংলণ্ডের উনিশ শতকের বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সেকথা তিনি গোপনও করেননি। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় জার্মান ভাষায় তখন সেই গ্রন্থের ভূমিকায় মার্ক্স স্বয়ং লিখেছিলেন :

The physicist either observes physical phenomenon where they occur in their most typical form and most free from disturbing influence, or, wherever possible, he makes experiments under conditions that assure the occurrence of the phenomenon in its normality. In this work I have to examine the capitalist mode of production, and the conditions of production and exchange corresponding to that mode. Up to the present time, their classic ground in England. That is the reason why is used as the chief illustration in the development of my theoretical ideas.

( ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, কর্তৃক ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণের ৮ পৃষ্ঠা )

এই কথাগুলিও মার্ক্স লিখেছিলেন ১৮৬৭ সালে জুলাই মাসে লণ্ডনে বসে।

এই রকমই ছিল কার্ল মার্ক্সের চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা। গোটামুটি যে তিনটি দেশে তিনি বাস করেছেন সেই তিন দেশের চিন্তাজগৎ থেকে তিনি আহরণ করেছেন তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তার উপাদান, এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর খুব সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বলে তিনি তাঁর জীবনদর্শনের জন্য মূলত নির্ভর করেছেন পুঁথির ওপর। মার্ক্স নিজে কখনো তাঁর জীবন, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার পরিমণ্ডল ও ভিত্তিভূমির সঙ্কীর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না ;—গোটা মানবজাতির অতীত ইতিহাস, সমকালীন পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ বিচারের ক্ষেত্রে অসঙ্কোচে তিনি তাঁর সঙ্কীর্ণ পরিবেশ থেকে লব্ধ তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন, যার ফলে অধিকাংশ সময়ে মানবচিন্তা ও কর্ম প্রবাহকে সত্যের দিকে চালিত করার বদলে তিনি বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করেছেন। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে একটা মোহ বহু অমার্ক্সবাদীর মনেও আছে—অনেকেরই উচ্ছ্বাসপোষিত ধারণা এই যে কার্ল মার্ক্স একজন গভীর মানবপ্রেমিক ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। এই ধারণা কি যুক্তিসিদ্ধ? একটা খণ্ড কাল ও খণ্ড দেশের একপেশে অভিজ্ঞতা, নিউরোটিক ব্যক্তিত্ব, অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তিজীবন—মার্ক্সবাদের উৎসমূলে আছে এইগুলি। এই মতাদর্শের সীমাবদ্ধতা এত প্রকট যে উদার মানবসত্য এই মতাদর্শে বিধৃত হয়েছে একথা ভাবা অযৌক্তিক সংস্কার ও উচ্ছ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

সুভাষচন্দ্রের জীবন বহুব্যাপ্ত—অভিজ্ঞতার সম্পদ তাঁর

অপরিমেয়। তিনি পরাধীন দেশে জন্মেছিলেন, জানতেন পরাধীনতার বেদনা; সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রত্যক্ষ রূপ দু'চোখ মেলে তিনি দেখেছেন। আধুনিক ইয়োরোপের বুর্জোয়া অর্থনীতি কী নিদারুণ শোষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা কার্ল মার্ক্সের চেয়ে সুভাষচন্দ্র অধিক প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এবং ইংলণ্ডে একটা শান্তিপূর্ণ ও বৈধ বিপ্লব হলেই বা এমনকি ইয়োরোপের অন্যত্র রক্তাক্ত বিপ্লব হলেই যে মানবজাতি শোষণমুক্ত হবে না, বরং নতুনতর শোষণজালে জড়িয়ে পড়তে পারে সেকথা কার্ল মার্ক্সের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। এমনকি ইয়োরোপে তথাকথিত বিপ্লবের চেয়ে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শোষণমুক্তির সংগ্রামের পক্ষে ইতিহাসের তাগিদ যে বেশি সে কথাও কার্ল মার্ক্স কল্পনা করতে পারেননি। সুভাষচন্দ্র বিশ্বের সকল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা সাম্রাজ্যবাদী শোষণমুক্তির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—শুধু স্বপ্নচারী, পুঁথিপড়ুয়া ও থিসিস লেখক নন, বিশালতম সংগ্রামের মহত্তম নায়ক। তাঁর গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা-জাত চিন্তার মধ্যে তাই মানবমুক্তির সঙ্কেত অনেক বেশি পাওয়া যায় কার্ল মার্ক্সের চিন্তাধারার তুলনায়।

ভারতের পঞ্চসহস্রাধিক বছরের দর্শনচর্চা সুভাষচন্দ্রের জীবনের পশ্চাদপটে ছিল;—আর তিনি সানন্দে সেই বাস্তব সত্যকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। তাঁর দার্শনিক প্রত্যয় স্বয়ম্ভু ছিল না, একটা নতুন ও কষ্টকল্পিত দার্শনিক মতবাদ উপস্থাপনার ঝোঁকও তাঁর ছিল না। তাঁর দার্শনিক প্রতীতি কী ছিল সে সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে তিনি মূল কথাগুলি বলেছেন। একটু তলিয়ে পাঠ করলে তাঁর জীবন ও বিশ্ববীক্ষার স্বরূপ ঐ প্রবন্ধ থেকেই জানা যাবে।

আগেই বলেছি, জার্মানীতে প্রচারিত দর্শনই ছিল কার্ল মার্ক্সের দার্শনিক মতবাদের উৎস—যদিও মার্ক্সীয় দর্শন জার্মান দর্শনের বহতা ধারাকে বিপথ চালিত করেছে। ডায়ালেকটিকস তত্ত্বকে বস্তুবাদের সঙ্গে জড়িত করে। মার্ক্স লিখেছিলেন:

My dialectic method is not only different from the Hegelian, but its direct opposite. এবং with him (অর্থাৎ হেগেল) it (অর্থাৎ ডায়ালেকটিক) is standing on its head. It must be turned right side up again, if you discover the rational kernel within the mystical shell.
(Capitil গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের মার্ক্স লিখিত ভূমিকা)

যে ডায়ালেকটিক হেগেলের উদ্ভাবিত—এবং হেগেল যা পেয়েছিলেন কান্টের কাছ থেকে—মার্ক্স তা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ বিপরীত ক্রমে; —বিকৃতি আসা তাই অনিবার্য ছিল। জার্মান দর্শনের ধারায় বিকৃতি আনার দায়িত্ব কার্ল মার্ক্সই বহন করেছেন। কথাটা বিশদ করা দরকার।

ইয়োরোপে খ্রীস্টধর্ম প্রায় দুই হাজার বছর সুপ্রচারিত হবার ফলে যে বিশ্ববীক্ষা ঐতিহ্য সম্মত হয়ে উঠেছিল তাতে মানুষ ও ভগবান দুটি আলাদা সত্তা বলেই গৃহীত হয়েছে; একজন অপূর্ণ, অল্পজ্ঞানী, মরণশীল, মর্ত্যবাসী; আর একজন পূর্ণ, সর্বজ্ঞ, অমর ও স্বর্গবাসী; এ দুজনের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান চির বর্তমান। মানুষ তার অনুশোচনা, পাপ স্বীকার, প্রার্থনা, অশ্রু মোক্ষণ ও সৎ কাজের দ্বারা হয় তো ভগবানের কাছ থেকে মার্জনা, দয়া বা পুরস্কার পেতে পারে, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন না বা ভগবান হয়ে যেতে পারে না।

গ্যয়টের কাব্যে এই বিশ্ববীক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুনতে পাওয়া গিয়েছিল; তাঁর কাব্যের নায়ক ফাউস্ট ঈশ্বরপ্রতিম জ্ঞান ও ক্ষমতার অন্বেষু, মানব সত্তার সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম

করার অভিলাষী। কাণ্ট এই বিদ্রোহবাণীকে দার্শনিক প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন এবং হেগেল ব্যাপকতর কল্পনায় অসীমের উদ্দেশ্যে মানবাত্মার অভিসারের নিগূঢ় মর্মকে বিশ্ব-দর্শনের মূল বস্তুরূপে স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই এসেছিল ডায়ালেকটিকের ধারণা। মার্ক্স তথাকথিত বস্তুবাদের সঙ্গে ডায়ালেকটিককে জুড়ে দিয়ে—হেগেল যে সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বস্তুজগতের বিচারে ডায়ালেকটিক আনা অসঙ্গত,—জার্মাণ দর্শণের স্বকীয় বিশিষ্ট ধারাকে ঊন্মার্গ-গামী করে দিয়েছেন।

কাণ্টের মতে মানুষের প্রকৃতি দ্বিবিধ, অর্ধ-মানবিক, অর্ধ-দৈবিক। অর্থাৎ একদিকে সে মানব স্বভাবের, আর একদিকে দেব স্বভাবের। কিন্তু মানব স্বভাবটাই তার প্রকট, দেব স্বভাবটি চাপা। মানুষ যেন দুভাগে বিভক্ত একটি জীব, কিংবা একই মানুষের রয়েছে দ্বৈত সত্তা, দ্বৈত ব্যক্তিত্ব। কাণ্ট এই দ্বিবিধ সত্তার নাম দিয়েছেন homo noumenon ও homo phenomenon। হোমো নুমেনন আমাদের ভিতরের সত্তা, দৃষ্টিগোচর নয়, দেবসত্তা। হোমো ফেনোমেনন আমাদের বাইরের সত্তা, সমাজের কাছে যে সত্তা দিয়ে আমাদের পরিচয়, মানবসত্তা। নুমেনন হচ্ছে রিয়ালিটি, সত্যতর সত্তা; ফেনোমেনন হচ্ছে অ্যাপিয়ারান্স, আপাত প্রতীয়মান সত্তা। জার্মান দার্শনিক পরিভাষায় নুমেনন হচ্ছে Ding-an-sich বা thing-in-itself, আর ফেনো-মেনন হচ্ছে thing as it appears. তাহলে হোমো নুমেনন হচ্ছে man-in-himself এবং হোমো ফেনোমেনন হচ্ছে man-as-he-appears. কাণ্টের মতে প্রথমটাই তার আসল সত্তা বা প্রকৃত আত্মরূপ, real self, আর দ্বিতীয়টি তারই প্রতিবিম্বন বা প্রতিফলন।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )


## অনিল ভাদুড়ী

### সময়োপযোগী দুইটি বই

**সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০**

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০**

( তৃতীয় সংস্করণ )

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ( ভূমিকা )

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

## যাঁর করস্পর্শে : সুনীল বসু

ঈশ্বর তুমি দিয়েছ বলে
অঞ্জলি ভরে ক্লান্তিতে জল পান করি
ঝর্নার হৃদয় থেকে
ঈশ্বর তুমি দিয়েছ বলে গাছের ছায়ায় বসি
তারা-ভেজা নরম অন্ধকারে স্নান করি
ঈশ্বর তুমি দিয়েছ বলে
আমার সজাগ ইন্দ্রিয়ে
শুনি প্রতিদিন পৃথিবীর পদধ্বনি
দু'টি চক্ষু দিয়েছ বলে দেখি তোমার মোহন-লীলা
জলে স্থলে-অন্তরীক্ষে
তুমি আছ, তাই আমি আছি
তাই চরাচর আছে
আমি আছি বলে চরাচর আছে
ঈশ্বর আমাকে তুমি রেখেছ
পৃথিবীর স্বাদ নেবার অনুমতি দিয়েছ,
কাক, কোকিল, চিল, মাছ, গাছ, রোদ্দুর, মেঘ, আকাশ,
সমুদ্র, পাহাড়, ঝর্না, নদী, জন্ম, মৃত্যু, বেদনা, প্রেম, বিচ্ছেদ
আগুন, বৃষ্টি, ঝড়, নৌকা, গরুর গাড়ি, মেঠোপথ, সন্ধ্যা,
গোধূলি, শিশুর ভালোবাসা, নারীর দুঃখ, পুরুষের ত্যাগ,
মন্দিরের সুগন্ধ, শ্মশানের হাহাকার, গাছের পাতার জন্ম,
ফুল ফোটা, মাটির রঙ, আয়না, পাড়াগাঁ-র রাত্রি, ভোর,
পুকুর, হ্যারিকেন, কুপী, রান্নার শব্দ, মধ্য-রাত্রির গুঞ্জন,
আমি সমস্ত, ইন্দ্রিয়ে ভোগ করে দেখি, আত্মার আমূল
অবধি দেখি,
আর কৃতার্থ হই
বলি, ঈশ্বর তুমি দিয়েছ বলে,
তুমি দিয়েছ বলে।
আবার যেদিন ফিরিয়ে নেবে
সেদিন সব ফেলে যাব, আমার এই মায়াবী চক্ষু
আমার অঙ্গুলিস্পর্শ, আমার ত্বক, আমার জিহ্বা
আমার ঘ্রাণ,
আমার শিহর
আমার দুঃখ
আমার প্রেম
সমস্ত ফিরায়ে দিয়ে যাব
ঈশ্বর!

## ঈশ্বরের বিকল্প : প্রভাকর মাঝি

হ্যাঁ আছে ঈশ্বর, আছে জাদু তার সর্বত্র ছড়ানো
রোদ্দুরে লাবণ্য আছে, উদরেও ক্ষিধে সনাতন।
সমস্ত অস্তিত্বে, রক্তে যে পিপাসা হয়ে হয়ে ছিল
উল্লম্ফ পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেল সে এখন।

কি ভাল লাগচে এই অল্প-চেনা পুষ্পের সুরভি,
সুনিপুণ চিত্র কর্ম পিরামিডে, কুতুব মিনারে।
নিবিড় প্রশান্তি আহা নীড়ে-ফেরা পাখির কুজনে,
যুবতীর দেহ গন্ধ উত্তরোল প্রেমও জোয়ারে।

হ্যাঁ আছে ঈশ্বর, না কি ঈশ্বরের বিকল্প কেউবা?
যে জোগায় বিন্দু বিন্দু সোমরস বেকার যৌচাকে।
গনগনে আগুনকে বাষ্প করে—লাগ ভেল্কি লাগ
ছাতু দিয়ে কিনে নেয় ঈগলের অজেয় আত্মাকে।

ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম চাকরিটার পেয়েছি হদিস,
মাসান্তিকে মূল্য ঘাট, মাগ্যিভাতা আরও চুয়াল্লিশ।

## যুক্ত-প্রতিনিধি : শংকর দে

শান্তি জলের এই নদীতেই আজ শুকিয়ে ওঠা ডাঙায়
মানুষেরই প্রতিনিধি আমরা, কেননা
মানুষের বেঁচে থাকাই একজন মানুষের বেঁচে থাকা
এই নদীতেই ঝাঁপিয়ে দেখতে হবে, সূত্র না
অসুখের মূল—
তাঁতের সঙ্গেই বেঁধেছিলাম নিজেকে
রোদ্দুরেই বেঁচে থাকা আমার শান্তি জলেই, আজ
রোদ্দুর না দানের প্রতিমা।

নদীর জলেই যুক্ত এই হাত ও স্বাধীনতার
কাছেই ছিলাম
আমরা মানুষেরই যুক্ত-প্রতিনিধি।

## প্রণাম ঃ নচিকেতা ভরদ্বাজ

[ শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের পদ্মভূষণ সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ]

কোনো কোনো বৃক্ষ থাকে—
মাটির গভীরে তার শত লক্ষ শেকড়ের মৌন অভিযানে তপস্যায়
আঁধার বিদীর্ণ করে ঊর্দ্ধায়ত শাখা প্রশাখায়
শুধুমাত্র আকাশের সূর্যকে গ্রহণ করে না,
পরন্তু, সমস্ত সূর্য-ঋণ-মৃত্তিকার দেনা
শোধ করে সমৃদ্ধ বীমায়।
যতটুকু নিয়েছে সে তারে চেয়ে ঢের বেশি ফিরিয়ে দেয় হৃদয়ের মুগ্ধ মমতায় ঃ
ফুল দেয়, ফল দেয়, পথিকেরে ছায়া দেয়।
সবুজ পাতায় তার বিপন্ন হাওয়ার বিষ পরিশ্রুত করে।
ভালোবাসা ভরা তার প্রত্যহের জীবন চর্যায়
জীবন রচনা করে নন্দিত প্রথায়।

কোনো কোনো পাহাড় থাকে-উচ্চশীর্ষে উপত্যকায়
যে কোন গহন ঘন অরণ্য রচনা করে না,
না, শুধু স্বচ্ছ শুভ্র ও দিগন্ত তুষারের পুষ্পগুচ্ছ নয়,
পরন্তু সে অনির্বাণ হৃদয় গলিয়ে
নদীকে জন্ম দেয় নিরন্ত উৎস-ধারায়—
সূর্য-সমতলে তারা বয়ে যায় সমুদ্র-সন্ধানে—
জলের অমেয় শিল্পে, সবুজের সমারোহে
ফসলের সোনায় সোনায়
দুই কূল ভরে দিয়ে আতিথ্যের আনন্দ সংলাপে
সৃষ্টির শত লক্ষ সম্ভাবনায়।
কোনো কোনো পাহাড়ের থেকে পানি এ রকম নদী নেমে আসে।
কোনো কোনো নক্ষত্র থাকে
যারা শুধু জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যায় না আকাশে।

## অনুষ্ঠান বর্জনের উৎসব ঃ ক্ষিতীশ দেব সিকদার

যে খানে স্নেহপদার্থের অভাব
এমন কোন অনুষ্ঠানে আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি না
আমি কামনা করি খাবার টেবিল মাঝখানে রেখে সবাই গোল হয়ে বসবে
একটি পাত্র থেকে তুলে নেবার জন্য প্লেটগুলি এগিয়ে আসবে
প্রাচীন বা নবীন শিশু বা বৃদ্ধ যুবক বা যুবতী
সকলের অভিজ্ঞতা গল্পের আকারে শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ভোজন পর্ব চলবে
সকলের কাছে আমি বিদায় কালীন অশ্রুভারাক্রান্ত হওয়া পছন্দ করি
আমি চাই রনুষ্ঠানের চাঁদোয়ার নিচে বিদায়সম্ভাষণের চরম মুহূর্তে
সবার বুক ভেসে যাক।
খুব সহজভাবে আমাকে অনেকেই গ্রহণ করতে পারবেন না আমি জানি
আমার পছন্দ অপছন্দের সাথে সকলের আশ্চর্যজনক মিল থাকবে
এতটা আশা করি না
পক্ষান্তরে আমার চালচলন হাবভাব অনেকের কাছেই নৈরাশ্য জনক
আমি ভদ্রপাড়ার রীতিনীতি অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছি
ঝারুদারকে বাসন মাজার ঝিকে আমি ভি-আই পি দের সমতুল্য মনে করে
এক বুক আশ্রয় দিয়েছি
গোত্র সচেতন নিমন্ত্রক পারত পক্ষে আমাকে এড়িয়ে স্বমহিমা বজায় রাখেন
এতে আমার কোনখনে বিন্দু মাত্র দুঃখ নেই।
যতদিন মনুষ্যত্বের সমানাধিকারের দ্বার উদ্‌ঘাটন না হচ্ছে
যত দিন বেছে বেছে কেবল মাত্র স্বল্পসংখক লোকের মুখে নিমন্ত্রণ পত্র
বিলি করা হবে
ততদিন আমি সকল প্রকার একপেশে অনুষ্ঠান বর্জন করে প্রতিবাদ করে যাব
আমি চাই স্নেহ পদার্থের প্রতুলতার কথা ভেবে ভেবে আমার জীবন সময় খরচ হলে
যেন সেই অনুষ্ঠানের চাঁদোয়ার নিচে সকলে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে একত্রিত হয়।

: উপন্যাস

# কইতরা বিব

উত্তরখণ্ড

মিহির মুখোপাধ্যায়

## উনিশ

দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র চোখ তুলে তাকালেন। গভীর দৃষ্টি। যেন চোখের ভেতর, বুকের ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পান।

আস্তে আস্তে বললেন—আপনার নাম ভারতচন্দ্র রায়, ভুরশুটের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র আপনি—

—আজ্ঞে—নম্রভাবে নমস্কার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতচন্দ্র।

—দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ আপনার খুব প্রশংসা করে লিখেছেন—চিঠিখানা মিত্র মশাইর হাতেই খোলা ছিল। আবার চোখ বুলিয়ে বললেন—মহারাজার কাছেও নাকি চিঠি দিয়েছেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—বেনিয়ানের জেব থেকে আরেকখানি চিঠি বার করে দেওয়ানজীর হাতে দিল ভারতচন্দ্র। কোষ্ঠির মত পাকানো শিলমোহর আঁটা তুলোট কাগজে লেখা চিঠি। শুধু নেড়ে চেড়ে একবার দেখলেন দেওয়ানজী। কিন্তু শিলমোহর ভেঙে চিঠি খুললেন না। মহারাজার নামে লেখা কোন চিঠি, কোন আরজি দরখাস্ত কারো খোলায় হুকুম নেই। বিশেষ ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পত্র খুলে দেখতে পারেন একমাত্র দেওয়ান রামগোপাল চক্রবর্তী। তিনি দেওয়ান-সহবতী। নদীয়ারাজ সরকারের দু'জন দেওয়ান। একজন রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ান এই রঘুনন্দন মিত্র। আদায়-উশুল, সেরেস্তার কাজকর্ম কিংবা শাসনশৃঙ্খলা, আইন-কানুন রক্ষার ভার দেওয়ান রঘুনন্দনের উপর।

আর রাজবাড়ির ক্রিয়াকর্ম, পূজা-পার্বন, দোল-দুর্গোৎসব, পণ্ডিত-বিদায় কিংবা কাঙালীভোজন, অতিথি-অভ্যাগতজনের সমাদর কিংবা প্রার্থী-প্রত্যাশীর বৃত্তি-বখশিশের বন্দোবস্ত অথবা মহারাজার ব্যক্তিগত কাজকর্ম—এসব দেখাশোনা করেন দেওয়ান-সহবতী রামগোপাল ওরফে গোপাল চক্রবর্তী। সহবত কথার অর্থ অন্তরঙ্গ। মহারাজার পাঞ্জা, শিলমোহর, হুকুমনামার মুসাবিদা, ব্যক্তিগত হিসাবপত্র, শিকার কিংবা নৌবিহার, প্রয়োজন কিংবা সৌজন্যমূলক ভ্রমণ, কখন খাশ-কামরায় বসবেন, কিংবা দরবারে দেখা দেবেন, কখন কার সঙ্গে কথা বলবেন—এসব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়ান-সহবতীর উপর। মহারাজার নামে যত কিছু চিঠিপত্র আরজি দরখাস্ত, সব যথাস্থানে যাবে দেওয়ান রামগোপালের মারফত।

আরো একটি বিভাগ আছে। মহারাজার পাইক-বরকন্দাজ, সেপাই-শান্ত্রী, তীরন্দাজ-গোলন্দাজ, এক কথায় সমস্ত সেনাবাহিনীর উপরে আছেন প্রধান সেনাপতি।

তিনি রায় বকসী মদনগোপাল রায়। তিনি দেওয়ান-সহবতীর সহোদর ভাই।

কৌলিক পদবী চক্রবর্তী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাবার আমলের দেওয়ান রামরাম চক্রবর্তীর দুই ছেলে, রামগোপাল আর মদনগোপাল। কিন্তু চক্রবর্তী পদবীটা আর ব্যবহার করেন না মদনগোপাল। তিনি মহারাজার কাছ থেকে রায়-বকসী উপাধি পেয়েছেন। সেই উপাধিই এখন তার নামের সামনে পেছনের অলঙ্কার।

এসব খবর কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিল ভারতচন্দ্র।

এখন সে আনকোরা নতুন মানুষ। রাজবাড়ির আদব-কায়দা জানা থাকলেও, এখানকার কাউকে সে চেনে না, কোন নিয়ম-কানুনও সে জানে না।

এখন রঘুনন্দন মিত্র ডাক দিলেন—নকুল, নকুল—

দেওয়ানজীর চাপরাশী নকুলভদ্র। নামের সঙ্গে চেহারার এমন সাদৃশ্য সহসা চোখে পড়ে না। বেটেখাটো রোগা পাকানো চেহারা। তামাটে রঙ। চাপরাশীর চাপকান তার গায়ে ঢলঢল করছে। মস্ত বেমানান শামলার নিচে সরু ছুঁচলো মুখ। গোঁফদাড়ি ভুরুর চিহ্নমাত্র নেই।

দেখলেই একটি নকুলের চেহারা মনে পড়ে। নিঃশব্দে ঘরে এসে নমস্কার দিয়ে দাঁড়াল। দেওয়ানজী বললেন—এই চিঠি মহারাজার নামে এসেছে, এটা দপ্তরে দিয়ে আয়—কোন দপ্তরে দিতে হবে জানে নকুল। যেমন এসেছিল, তেমনি চুপচাপ বেরিয়ে গেল।

আবার বললেন দেওয়ানজী—এবেলা আর মহারাজার সঙ্গে দেখা হবে না, আরো সকালে আসা উচিত ছিল, এত দেরি করলেন কেন—

—আজ্ঞে পৌঁছুতে দেরী হয়ে গেল, পরশু সকালে নৌকা ছেড়েছে, উজান বেয়ে আসতে আসতে—আষাঢ় মাসের ভরা গঙ্গা। দুকূল প্লাবিনী ভাগীরথী প্রবলবেগে বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। এসময় স্রোতের বিপরীতে শুধুমাত্র দাঁড় টেনে উজান বেয়ে যাওয়া প্রচুর পরিশ্রমের কাজ। জোয়ারের মুখে মুখে যাওয়া সহজ। কিন্তু জোয়ারের জন্য অযথা অপেক্ষা করতে হয়। বিলম্ব ঘটে। সুবিধে মত বাতাস থাকলে পাল তুলে স্বচ্ছন্দে যাওয়া চলে। কিন্তু হুগলী ছাড়াতে না ছাড়াতেই হাওয়া পড়ে গেল।

তখন বেশ বেলা হয়েছে। চারদিকে ঝলমলে রোদ। আকাশে ভাঙা ভাঙা মেঘ। বাতাস বন্ধ। অধর মাঝি বিড়বিড় করে বকছিল—হালার বাতাস নাই, বাদাম দিয়া যামু ভাবলাম, ওরে চরইজ্জা, ওরে ফেলা, গুণ টানতে হইবে, দাড় লইয়া লাম দেহি—তারপর জামাইকে লক্ষ্য করে কিছু মোলায়েম সুরে—বাবা নাইন্দো, এটু তামাক সাজো দেহি—চরণ আর ফেলারাম গুণ দড়ি নিয়ে ডাঙায় নামল। নদীর কিনারা ঘেঁষে গুণ টেনে নিয়ে চললো। হাল ধরে ব্যাজার মুখে বসে আছে অধর মাঝি। মহাজনী ভড় মন্থর গতিতে চলেছে। অধর মাঝির বাঙাল কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসছিল শশধর।

শশধর যাবে কাশিমবাজার। যাবার পথে নবদ্বীপের ঘাটে নামিয়ে দেবে ভারতচন্দ্রকে। সেখান থেকে আরেকখানি ছোট নৌকা ভাড়া করে জলাঙ্গী উজিয়ে কেষ্টনগর যেতে হবে। এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। চন্দননগর থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত আর নৌকা ভাড়া দিতে হবে না ভারতের।

শশধর ছেলেটি বেশ। কথাবার্তার চটপটে, চতুর হাসি-খুশি। আগে দু'চারবার দেখলেও, তেমন আলাপ হয়নি। আলাপের সুযোগ পায়নি ভারতচন্দ্র। সেদিন একসঙ্গে নৌকায় যেতে যেতে বেশ আলাপ জমে উঠেছিল। গোলোকপতি সামন্ত হঠাৎ খুন হওয়ায় চাকরিতে উন্নতি হয়েছে শশধরের। কাশিমবাজারের কাছে সৈদাবাদের ফরাসীকুঠির সেরেস্তাদার হয়েছে সে।

দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ তার জন্য সুপারিশ করেছেন। সামান্য হিসেবনবীশের কাজে এসে কয়েকমাসের মধ্যেই অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে শশধরের। নিঃসন্দেহে সে ভাগ্যবান। ক'জনের কপালে এমন ঘটে। সেই ভাগ্যের কথাই ভাবছিল ভারতচন্দ্র। কার ভাগ্য যে হাত ধরে কা'কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে কেউ সঠিক বলতে পারে না। শশধরের ওই চাকরিতে যাবার কথা ছিল ভারতচন্দ্রের। গোলোকপতি সামন্ত তাকে সোজাসুজি কাশিমবাজার নিয়ে যেতে চেয়েছিল। জগমোহন দত্তর কাছে বৃথা উমেদারী না করে, এমন কি দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের অনুমতি ছাড়াই হয়তো সে সৈদাবাদ কুঠির কাজে বহাল হতে পারতো। তারপর যা ব্যবস্থা

করার গোলোকপতি করতো। সব দায়িত্ব সে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেখানে আর যাওয়া হয়নি।

এক নৌকোয় ভাসতে ভাসতে চলেছে দু'জনে। একজন যাবে কাশিমবাজার, আরেকজন নামবে নবদ্বীপের ঘাটে। সেখান থেকে কৃষ্ণনগর।

ভাগ্য তার হাত ধরে নিয়ে এসেছে এখানে। এই নদীয়া রাজসরকারের সেরেস্তাঘরের একপাশে দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রর খাস কামরায়।

মিত্রমশাই বললেন—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন—

মস্ত ফরাসের একপাশে সসঙ্কোচে বসল ভারতচন্দ্র।

আবার বললেন দেওয়ানজী—মহারাজার শরীর ভাল নেই, কয়েকদিন দরবারে বসছেন না, বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে অবশ্য সাক্ষাৎ করা যায়, তবে আগে থেকে বলে কয়ে অনুমতি নেওয়া দরকার, হয়তো দু'একদিন দেরি হবে, আপনি কোথায় উঠেছেন—

—আজ্ঞে কোথাও উঠিনি, নদীর ঘাটে নৌকো রেখে এসেছি, সঙ্গের সামান্য জিনিষপত্তর নৌকোয় রয়েছে—

—তা'হলে এক কাজ করুন, মালপত্তর নিয়ে এখানেই আসুন, আপাততঃ অতিথিশালায় উঠুন—

মিত্রমশাইর কথা শেষ হবার আগেই গৌরবর্ণ সৌম্যিন চেহারার একজন মোটাসোটা মানুষ ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে মশলা দেওয়া পানের ভুরভুরে গন্ধ। রেশমী বেনিয়ান, গরদের ধুতি, পায়ে নাগরা, বাবরী চুল। জিজ্ঞেস করলেন—ভেতরে আসবো দেওয়ানজী—

—আসুন, আসুন, কি আশ্চর্য, একথা বলার কি আছে—

—আপনি ব্যস্ত আছেন, শুনলাম, ভুরশুট রাজবাড়ির এক ছেলে নাকি আপনার এখানে এসেছেন—

—এরই মধ্যে খবর রটে গেছে, কোথায় শুনলেন—

—ঠিক রটনা হয়নি—বলতে বলতে ভেতরে এলেন মানুষটি —নবদ্বীপঘাটের করালীমাঝির নৌকোয় এসেছেন উনি, করালীর সঙ্গে ঘাটে দেখা হ'ল, তার মুখে সব শুনে খোঁজ নিতে এলুম—

—এই যে ইনি, ভুরশুটের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ভারতচন্দ্র রায়—আলাপ করিয়ে দিলেন মিত্রমশাই—আর ইনি হলেন মহারাজার ভগ্নীপতি আনন্দিরাম মুখুজ্জে—

উঠে দাঁড়াল ভারতচন্দ্র। দু'হাত তুলে নমস্কার দিল। মুখোমুখি দাড়িয়ে ভারতের দু'কাঁধে হাত রেখে বললেন আনন্দিরাম—আরে আপনি—তারপর দেওয়ানজীকে লক্ষ্য করে—এ যে কন্দর্পকান্তি কবি, একে ব্রাহ্মণ, তায় কবি, তায় রাজপুত্র, তার উপর আবার এমন চেহারা, এ যে কেষ্টনগরের বউ-ঝি দের মাথা ঘুরিয়ে দেবে, আমাদের গিন্নীদের দেখছি ঘরে রাখাই দায় হবে, কি বলেন দেওয়ানজী—বলতে বলতে হোহো করে হেসে উঠলেন আনন্দিরাম। রঘুনন্দন মিত্রও হাসলেন। প্রথম আলাপেই এরকম মন্তব্যে লজ্জিত হয়ে পড়লো ভারতচন্দ্র।

—আজ্ঞে কি যে বলছেন, আমি—

—ঠিকই বলেছি, আপনি এখন চলুন আমার সঙ্গে, এই গরীবের ঘরেই দু'টি ডালভাত যা হোক—কিন্তু দেওয়ানজী আমাকে অতিথিশালায় উঠতে বলেছিলেন—ভারতচন্দ্রের কথা শুনে যেন আঁতকে উঠলেন আনন্দিরাম—অতিথিশালায় রামোঃ রামোঃ, ওই বারোয়ারী রান্না আপনি খেতে পারবেন, বলুন, পারবেন মুখে দিতে, এত বেলায় এখন ঠাকুরবাড়ির খিচুড়িভোগ আর কুমড়োর ঘ্যাট খেতে হবে—

আনন্দিরামের মন্তব্য শুনে মিত্রমশাই যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, আমতা আমতা করে বললেন—আমি ওর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করাতুম—

—কি আর করাতেন আপনি, জগন্নাথ রায় কি আপনার কথা শুনতো' ওকি কারো কথা গ্রাহ্য করে, না এই সব বড় ঘরের মানুষের মর্য্যাদা বোঝে, সেবার পণ্ডিত বিদায়ের ব্যাপারটা কি আপনি ভুলে গেছেন—হঠাৎ

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আনন্দিরাম। সামান্য দম নিয়ে আবার বললেন—আসলে আপনাদের রাজামশাই আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছেন, কি আর হত, আপনার কথায় হয়তো জগো খানিকটা, চালডালের সিধে পাঠিয়ে দিত, তারপর কোথায় কাঠ, কোথায় উনুন, কোথায় কলাপাতা, কোথায় মেটে হাড়ি, এসব যোগাড় করতে আরো দেরি হত, হাত পুড়িয়ে উনি রান্না করতেন, তারপর ভিনপো বেলার সময় যখন কাঙালী ভোজনের পাতা পড়তো, তখন তার একপাশে উনি আলোচাল আর কাঁচকলা সেদ্ধ নিয়ে খেতে বসতেন, তার সঙ্গে না একটু ঘি, না একটু তেল, এক ছিটে নুন যদি জোটে তো মহাভাগ্যের কথা, এই তো আপনাদের অতিথিশালার অবস্থা, ওদিকে আপনাদের রাজামশাইয়ের পেয়ারের লোক গুপ্ত রায়তো দুহাতে লুটে-পুটে খাচ্ছে—আনন্দিরামের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ হাসিমুখে বললেন দেওয়ানজী—আচ্ছা, আপনি আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছেন কেন—

—আপনাকে শোনাব না তো, কাকে শোনাব, কা'কে বলতে যাব, আপনি দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র, আপনার এত নাম ডাক, আপনি পারেন না এই সব অনাচার বন্ধ করতে—

—কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি, আপনি তো জানেন, রাজবাড়ির কোন কর্মচারীকে বহাল বরখাস্ত করার ভার আমার উপর নেই, এসব দেওয়ান সহবতি দেখাশোনা করেন, আপনি এসে বলুন, অমুক মহালের, অমুক পরগণার' অমুক তহশীলদার কিংবা অমুক গোমোস্তা এই করেছে, তারপর দেখুন আমি তার কি ব্যবস্থা করি—

তারপর গলা নিচু করে, যেন কোন গোপন খবর দিচ্ছেন, এমনি ভাবে বললেন মিত্রমশাই :

—তা'ছাড়া আপনি এও জানেন জগন্নাথ রায় মহারাজার প্রিয় জ্ঞাতি, দেওয়ান সহবতির পাশা খেলার নিত্যসঙ্গী, সুতরাং বুঝতেই পারছেন—

চুপচাপ শুনছিল ভারতচন্দ্র। সবটা সে বুঝতে পারেনি। কে জগন্নাথ রায় আর কে দেওয়ান সহবতি। তারা কেমন মানুষ। কিছুই জানে না সে। তবে আনন্দিরাম আর রঘুনন্দন মিত্রর কথাবার্তা শুনে এইটুকু মাত্র অনুমান করতে পারল, বর্ধমান রাজ দরবারে যে অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, ফরাসডাঙ্গার ফরাসীকুঠির সেরেস্তার যা দেখেছে সেই কূটকচাল দলাদলি নদীয়ার রাজবাড়িতেও আছে। থাকা স্বাভাবিক। যেখানেই রাজা-মহারাজার সভা, নবাব-বাদশার দরবার, সেইখানেই পরিষদ, মোসাহেবের ভীড় আর সেখানেই সামান্য স্বার্থের টানাটানি, ঈর্ষা বিদ্বেষের দ্বন্দ্ব।

ত'হলে এখানে এসে আর ভালো কি হল। বরং চন্দননগর -গোন্দোলপাড়ায় সে ভাল ছিল। সেখানে অন্ততঃ মহাদেব বাসুদেব গৌরপদয় মত কয়েকজন ছাত্র ছিল। যাদের সঙ্গে অধ্যয়ন অধ্যাপনার আনন্দে সব কিছু ভুলে থাকা যেত। যমুনাদিদির মত স্নেহশীলা শ্যালিকা ছিলেন। যাঁর সেবা-যত্নের মধ্যে আন্তরিকতার আশ্রয় পাওয়া যেত। ইন্দ্রনারায়ণ কিংবা রামেশ্বর মুখুজ্জের মত মহৎ হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। যাদের কাছে সুখ দুঃখের কথা নিবেদন করা যেত।

কিন্তু সেখানে এখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই। চন্দন-নগরের পাট সে চুকিয়ে এসেছে। কাশিমবাজারের চাকরির চেষ্টাও সে অবহেলা করছে। এখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শেষ ভরসা। তিনি যদি বিমুখ হন, কোন ব্যবস্থা না করেন, তা'হলে কোথায় যেতে হবে জানে না ভারতচন্দ্র।

কিন্তু একটা বিষয় সে তক্ষুনি মনে স্থির করে নিল। যদি মহারাজা তাকে আশ্রয় দেন, অনুগ্রহও করেন, তথাপি রাজ-দরবারের কাছাকাছি থাকবে না সে।

কিছুটা ব্যবধান রেখে চলবে। যদিও দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র কিংবা আনন্দিরাম মুখুজ্জেকে প্রথম দর্শনে তার খারাপ লাগেনি। সামান্য আলাপেই বোঝা যায় মিত্রমশাই ধীর-স্থির বিচক্ষণ ব্যক্তি। আর আনন্দিরামকে দেখে মনে হচ্ছে,

শৌখিন, আরামপ্রিয়, ঢিলেঢালা স্বভাবের মানুষ। হয়তো রাজবাড়ির জামাই বলে কিছুটা অভিমানী। সামান্য কারণেই বোধহয় চট করে চটে ওঠেন। আবার পরক্ষণেই প্রসন্ন হতে পারেন। এসব মানুষের মনে কোন ময়লা জমেনা। হয়তো কোন কারণে কোন এক জগন্নাথ রায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সেজন্যই কিছু বিরূপ মন্তব্য করছেন বটে। তবে দেখলেই মনে হয়, আলাপ করলেই বোঝা যায় আনন্দিরামের মনে কোন মালিন্য নেই। ভারতচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন রঘুনন্দন মিত্র—তা'হলে এই ব্যবস্থাই থাক, আপনি মুখুজ্জেমশাইর বাড়িতেই উঠুন, আরামে থাকবেন, উনি খুব অতিথিবৎসল, খুব যত্ন করবেন, আর বুঝতেই পারছেন, রাজবাড়ির জামাই উনি—

—আচ্ছা, আপনার আর বলতে হবে না সবই উনি বুঝতে পারবেন, দুদিন থাকুন আমার বাড়িতে, রাজবাড়ির জামাই যে কত বড়লোক দু'দিনেই টের পাবেন—হাসতে হাসতে বললেন আনন্দিরাম—আরামে থাকলেন কিনা, জানি না তবে যত্নের কোন ত্রুটি হবে না, চলুন আপনি আমার সঙ্গে—

দেওয়ানজীর খাস কামরা থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। সেরেস্তা দালানের টানা বারান্দা ধরে আনন্দিরামের পাশাপাশি যেতে যেতে লক্ষ্য করল ভারতচন্দ্র। অনেকেই উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে। দু'একজন আনন্দিরামকে নমস্কার দিল, সেলাম জানাল।

আনন্দিরামও কখনো মাথা নেড়ে, কখনো সামান্য সামনে ঝুঁকে সে সব অভিবাদন গ্রহণ করলেন। সিঁড়ির কাছাকাছি একজনকে দেখিয়ে বললেন—এই যে ইনি হলেন দেওয়ানজীর পেস্কার বিশ্বনাথ বসু, আর ইনি হলেন ভরশুটের রাজপুত্র ভারতচন্দ্র রায়—বসুমশাই বিস্মিত চোখে তাকালেন, আপ্যায়নের হাসিমুখে বললেন—

—নমস্কার, নমস্কার, তা উনি এখানে—

—মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছেন—

—কোথায় উঠেছেন?

—উঠবেন আর কোথায়, আপনাদের অতিথিশালায় যে রকম ব্যবস্থা, তাই আমার বাড়ীতেই নিয়ে যাচ্ছি—

—তা' বেশ, বেশ করেছেন—বিশ্বনাথ বসুর কথা শেষ হবার আগেই একরকম ছুটতে ছুটতে এল নকুল ভদ্র। ভারতচন্দ্রের সামনে এসে হাত পেতে বললো—হুজুর আমার বখশিশ—

—কিসের বখশিশ—ধমক দিলেন আনন্দিরাম—এখানে যেতে আসতে তোদের বখশিস দিতে হবে নাকি, এতো ভাল আবদার, তাছাড়া উনি নতুন মানুষ, আমাদের অতিথি উনি তোকে বখশিশ দেবেন কেন, ওর কোন কাজটা করেছিস তুই—

—আজ্ঞে ওর একখানা চিঠি দেওয়ান-সহবতির দপ্তরে পৌছে দিলুম, এই মাত্তর দিয়ে এলুম, ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন—কাচুমাচু মুখে তাকিয়ে রইল নকুল ভদ্র। মুখের ভাব সাধ্যমত করুণ করে তুলল। আনন্দিরাম তাকালেন ভারত চন্দ্রের দিকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার একখানি চিঠি ও দিয়ে এসেছে—

—কিসের চিঠি, কার নামে চিঠি—

—দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহারাজার কাছে আমার নামে একখানি পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছিলেন, মিত্রমশাই ওর হাত দিয়ে সেখানি পাঠিয়ে দিলেন—

—ওহ, তাহলে উনি তোকে বখশিশ দেবেন কেন—নকুল ভদ্রের দিকে মুখ ফেরালেন আনন্দিরাম—তুই তো দেওয়ানজীর হুকুম তামিল করেছিস, ওর কোন কাজটা করেছিস, এখন যা এখান থেকে, আর জ্বালাসনি, বাপু—

আনন্দিরামের ধমক শুনে ব্যাজার মুখে বিড়বিড় করে বকতে বকতে চলে গেল নকুল ভদ্র। ভারতচন্দ্রের কোমরের গেঁজেতে কয়েকটি টাকা ছিল। খুচরো নেই।

দিতে হলে পুরো একটি টাকাই বখশিশ দিতে হয়। একবার ভাবল এত করে যখন চাইছে দিয়েই দেওয়া যাক। কিন্তু

আনন্দিরামের আপত্তির জন্ম দিতে পারলো না। কি জানি, উনি যদি কিছু মনে করেন। যদি অপমানিত বোধ করেন। কেমন মেজাজের মানুষ কিছুই জানা নেই। নতুন মানুষ, নতুন পরিচয়, নতুন পরিবেশ। এরকম অবস্থায় রাজবাড়ির জামাতা বাবাজীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করাই সঙ্গত। আরো কিছুটা পথ দু'জনে পাশাপাশি যাবার সময় বিশেষ কোন কথা হ'ল। রাজবাড়ির জাঁকজমক দেখতে দেখতে যাচ্ছিল ভারতচন্দ্র। প্রাসাদের সামনে বিস্তৃত প্রাঙ্গন পার হয়ে রাজবাড়ির সীমানা ছাড়াবার পর খুব সাবধানে এদিক-ওদিক একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন আনন্দিরাম

—তা'হলে বোঝা গেল, দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ, আমাদের দেওয়ান-সহবতি গোপাল চক্রবর্তীর কাছে সোজাসুজি কোন চিঠি দেননি, তিনি দিয়েছেন দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রর নামে, কি বলেন রায়-মশাই—

—আজ্ঞে, উনি একখানা দিয়েছেন মহারাজার কাছে, আরেকখানা মিত্রমশাইর নামে, দু'খানি চিঠিই আমি নিজে নিয়ে এসেছি—ভারতচন্দ্রের জবাব শুনে বললেন আনন্দিরাম

—তা'তো নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে, আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন—

—আজ্ঞে না—

—কিছুই খবর রাখেন না দেখছি—

—আজ্ঞে কি করে রাখব, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, পরের আশ্রয়ে আছি, নিজের লেখাপড়া নিয়ে থাকি, রাজা-মহারাজা কিংবা দেওয়ান-দরবারের খবর রেখে আমার লাভ কি—

—কিন্তু খবর তো আপনার রাখতে হবে রায়মশাই, রাজ বাড়ি এসেছেন, এখানে আখের গুছিয়ে নিতে হলে কার সঙ্গে কার দহরম মহরম, কার সঙ্গে কার আড়াআড়ি, কা'কে ধরলে কোন কাজটা উদ্ধার হবে, কার মেজাজ-মর্জি কি রকম, কার কাছে কখন উমেদারীর জন্ম যেতে হবে, কা'কে কেমন ভাবে খোশামোদ করতে হবে, এসব জরুরী খবর না জানলে তো আপনি জীবনে উন্নতি করতে পারবেন না, রায়মশাই—

বলতে বলতে আপন স্বভাব মত হো হো করে হেসে উঠলেন আনন্দিরাম।

তারপর গলা নীচু করে আবার বললেন—সম্প্রতি আমাদের দেওয়ান-সহবতী গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের মতান্তর থেকে মনান্তর হয়েছে, আগে যে রকম দহরম-মহরম ছিল, যেমন চিঠি লেখালেখি হ'ত, ইদানীং সে সব বন্ধ, আপনি জানেন না—

—আজ্ঞে না—মাথা নাড়ল ভারতচন্দ্র।

—তা'হলে শুনুন, আমি যদ্দুর জানি, মহারাজা তখন মুর্শিদাবাদে বন্দী ছিলেন, নবাব বাহাদুর বার লক্ষ টাকা চেয়ে বসেছেন, না পেলে ছাড়বেন না, এদিকে রাজবাড়ির তহবিলে তখন অত টাকা মজুত নেই, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা হল, তারপরও তিন লক্ষ টাকার মত ঘাটতি, গোপাল চক্রবর্তী তখন গিয়েছিলেন ইন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে টাকা ধার করতে, আপনি তো সে সময় চন্দননগর ছিলেন শোনেন নি কিছু—

—আজ্ঞে না, আমি থাকতুম গোন্দলপাড়া, সেখানে একটি পাঠশালার মত খুলেছিলুম, তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকতুম, বাইরের খবরাখবর খুব একটা রাখতুম না, মধ্যে মধ্যে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে যেটুকু শুনতে পেতুম, তা'ছাড়া তখন হয়তো আমি দু'চার দিনের জন্ম শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলুম—ভারত-চন্দ্রের জবাব শুনে আবার বললেন আনন্দিরাম—তা'হতে পারে, তা'ছাড়া গোপাল চক্রবর্তী গোপনে গেছেন, গোপনেই চলে এসেছেন, বাইরে খুব একটা জানাজানি হতে দেন নি, যাই হোক, ইন্দ্রনারায়ণ তখন তার হাতে কোন টাকাই দেন নি, বা দিতে পারেন নি, আমাদের দেওয়ান সহবতী ভেবেছেন, ইন্দ্রনারায়ণ তাকে অবিশ্বাস করেছেন, অপমান করেছেন, তারপর থেকেই মন কষাকষি,

সেই জন্যই ইন্দ্রনারায়ণ চিঠি দিয়েছেন রঘুনন্দন মিত্রর নামে, যদিও মহারাজার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হলে দেওয়ান-সহবতির মারফতই করা উচিত, তাতে কাজ অনেকটা সহজ হয়, কিন্তু আপনার ভাগ্যে দেখছি ব্যাপারটা কিছু ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল, এজন্য হয় তো ভবিষ্যতে আপনাকে ভুগতে হবে, কিন্তু—বলতে বলতে ভারতচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেন আনন্দিরাম মৃদু হেসে বললেন—আপনি কিছু ভাববেন না, আমি যতক্ষণ আছি, কোন ভয় নেই, আমি আপনাকে সাধ্যমত সাহায্য করব—

কোন কথা বললো না ভারতচন্দ্র। সামনে চোখ রেখে পাশাপাশি যেমন যাচ্ছিল তেমনি যেতে লাগল। তার মনে কোন ভয় নেই, কোন ভরসাও নেই। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়। দু'জনে কথা বলতে বলতে ততক্ষণে বড় রাস্তা ছেড়ে রাজবাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি ছোট গলি রাস্তার এসে পড়েছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পাড়া। রাস্তার দু'পাশে একতলা পাকা দালান, কিছু কিছু খড়ের ঘর ধানের মরাই।

একটি একতলা দালানের সামনে এসে বললেন আনন্দিরাম—এই গরীবের আস্তানা, আপনার পায়ের ধুলোয় পবিত্র হ'ল, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক—

লজ্জিত মুখে জবাব দিল ভারতচন্দ্র—আমি নিরাশ্রয়, আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি, ওরকম করে বলে, আমাকে লজ্জা দেবেন না—

—আরে না, না, আসুন, আসুন কি যে বলেন—

দালানের সামনে একফালি ঘাস জমি। ওপাশে একটা বেশ বড় পুকুর। বাঁধানো ঘাট। ঘাটের পাশে মস্ত একটা তেঁতুল গাছ। পাতলা ইটের পুরনো দালান হলেও বেশ উঁচু ভিত। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে চওড়া রোয়াক। লম্বা রোয়াকের দু'পাশে দুটো আলাদা মুখোমুখি কুঠুরী। সামনে মস্ত বৈঠকখানা ঘরে জোড়া তক্তাপোষের উপর ফরাস, তাকিয়া।

মাথার উপর ঝাড়বাতি ঝুলছে এক নজরেই বোঝা যায়, আনন্দিরাম মুখুজ্জে মোটামুটি স্বচ্ছল গৃহস্থ।

(ক্রমশঃ)

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

# সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

**সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা** কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-1/69

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

# জাপানের দিনগুলি

## বারীন বর্দ্ধন

সেদিন সন্ধ্যার সবাই আমরা ফিরে এলাম ছাত্রাবাসে। হৈ হৈ করতে করতে নয়। রীতিমত নববধূর ভঙ্গীতে; ধীরপদক্ষেপে। ত্রিশটি প্রাণী ওকুবো থেকে হেঁটে এসেছিলাম। জুতোর ভিতরে কাঁকরের দল পা দুটোকে করেছে একেবারে কোণঠাসা। জুতোর ওজন হয়ে পড়েছে দ্বিগুণ। একটু একটু করে এগোই আর মনে হয় গোটা পা'দুটোই বোধ হয় রুখে দাঁড়াবে। সাধারণত ওকুবো থেকে দশ মিনিটের রাস্তা আমাদের ছাত্রাবাস অবধি। আমাদের লেগেছিল প্রায় আধ ঘণ্টা এই দূরত্ব অতিক্রম করতে। যেরকম হুল্লোড় করে ফুজিসান বিজয়ে বেরিয়েছিলাম, ততোধিক নিঃশব্দে এসে ঢুকলাম নিজের ঘরে। দু'একজনের পা কেটে রক্ত পড়ছে। তবে উত্তেজনার মুহূর্ত্তে হাড়িকাঠে মাথা গলাতেও বোধ হয় কারুর আপত্তি হতনা। তাই যাত্রাশেষে, সমস্ত উত্তেজনার অন্তিমে পদযুগল তাদের চরম প্রতিবাদ জানাতে সুরু করেছিল, যার জের চলেছিল পুরো দু'দিন।

দ্বিতীয় দিনের দুপুরে গেলাম ডাক্তার আগরওয়ালের খোঁজে। জাপানী ধরণের বাড়ী। দোতলার সিঁড়ির মুখে জুতো ছেড়ে ঘাসের চটি পরে নিঃশব্দে উঠে গেলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই আগরওয়াল গৃহিণী বেরিয়ে এলেন এবং একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি! ফুজিসান ঘুরে এসে আপনার দেখি কিছুই হয়নি। ডাক্তারসাহেব তো কাল থেকে শুয়ে আছেন পা এবং কোমরের ব্যথায়।

ভদ্রমহিলা ছাত্রজীবনে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলাও করেছেন এবং শুনেছিলাম যে এম্ এস্‌সি পাশ করার পর বি. টি. ফাইনাল পরীক্ষার দৌড়ঝাপ্ ইত্যাদিতে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। ইতিবৃত্তটা জানা ছিল বলে নিজের শরীরের কাহিল অবস্থা আর মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—তাই নাকি। এ দু'দিন একেবারে শোয়া? তবে তো দক্ষিণ জাপানে যাওয়া আরও পিছিয়ে দিতে হবে।

কথাবার্ত্তা হচ্ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে। এবার ডাক্তার সাহেব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে অভ্যর্থনা জানালেন ভিতরে আসবার জন্য।

আমাকে ঐরকম সহজ দেখে ডাক্তারসাহেব একটু অপ্রস্তুত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার তো দেখছি ফুজিসান ভেঙে এতটুকু ক্লান্তি আসেনি। আমার তো শরীর ছেড়ে দিয়েছে ব্যথার ভারে।—কিন্তু তা বলে তো চলবেনা। তিন চার দিনের মধ্যে দক্ষিণ জাপানের দিকে না বেরোতে পারলে সারা বছরে আর যাওয়া সম্ভব হবেনা।

হোক্কাইদোর মত দক্ষিণাপথ বিজয়ের তালিকাও দশ দিনের মেয়াদ নিয়েই তৈরী করেছিলাম। তার প্রধান কারণ ছিল লেখাপড়া। অর্থাৎ স্কুল খুলে যাচ্ছে গরমের ছুটির পর। এবং যদি আমাদের "অভিভাবকেরা" জানতে পারেন যে স্কুল কামাই করে সরকারী বৃত্তিধারীর দল দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে

তবে বিদেশে তো হয়রানিটা হবেই ; দেশে ফিরেও এর জের মিটবেনা। তাই ছুটি পার করে বেড়াবার প্রোগ্রাম বেমালুম ছেঁটে ফেলেছিলাম।

গরমের ছুটির আগেই অধ্যাপকদের অনেককে বলেছিলাম দক্ষিণ জাপানের দর্শনীয় বস্তুগুলির একটা ফিরিস্তি তৈরী করে দিতে। কিন্তু কার্যতঃ দেখলাম এরা সবাই টোকিও বা তার আশেপাশের বাসিন্দা। দক্ষিণ জাপানের খবর রাখেন। তবে বিশেষ ভাবে নয়।—চিরাচরিত জাপানী ধারা। সবাই ছুটে মরছে স্পেশিয়ালাইজেশনের পিছনে। ডাইনে-বাঁয়ে কি হল দেখবার অবকাশ নেই। দেখলেও মাথা ঘামাতে নারাজ। অধ্যাপকদের সবাইকেই একবার করে অনুরোধ করলাম। কিন্তু ফল হলনা কিছুই। বাকী ছিলেন শুধু দু'জন। কুবোতা এবং কুরাতা সেনসেই। দ্বিতীয় জন আবার ইন্‌চার্জ্‌। কুবোতা সেনসেইকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হলনা। তার কারণও ছিল।

সেদিন আমি, ডাক্তার আগরওয়াল এবং আরও কয়েক জন স্কুলের শেষে ট্রেনে করে হোষ্টেলে ফিরছি। কুবোতা সেনসেই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সেনসেই বোধকরি বয়সে আমাদের চেয়ে ছোটই হবেন। লাজুক প্রকৃতির অধ্যাপক। কথায় কথায় লাল হয়ে উঠেন। অনেকটা ঘাবড়ে যাওয়ার মত।

একথা ও কথার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা সেনসেই, জাপানের সবচেয়ে বড় কবির নাম কি ?

প্রশ্নটা অতি সাধারণ। কিন্তু কুবোতা সেনসেই এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন একটা দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। একটু করে মাথা চুলকাচ্ছেন আর সারা মুখ ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে। কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ। শুধু দু'এক সেকেণ্ড পর ভাবনাজড়িত কণ্ঠে বলছেন—সো দেস্ নে ? আপনি তাই জিজ্ঞেস করলেন, নয় কি ?

এ কয়দিনের অভিজ্ঞতায় সেনসেইর বিপদটা বুঝতে দেরী হল না। তাই আরও সহজ করেই জিজ্ঞাসা করলাম —সবচেয়ে বড় কে না বললেও চলবে। জীবিত কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে ?

কিন্তু মাথা চুলকানোর ধরণ বা লালিমার আভা, কোনটাই কমের দিকে মনে হল না। সেই একই উক্তি ক্ষণে ক্ষণে বেড়িয়ে আসছে।—সো দেস্ নে ? দোনাতা দেশ্যো কা ?—তাই তো, কে হবে ?

গাড়ী একে একে ষ্টেশন পেরিয়ে ওৎসুকার কাছাকাছি এসে গিয়েছে। এখানেই আমাদের নামতে হবে। তাই নাছোড়বান্দার মত আমিও প্রশ্ন সহজতর করে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, কবি নোগুচিকে আপনার কি রকম মনে হয় ? দেশে থাকতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য কবি নোগুচির নাম আমরা খুব শুনেছি। তাকে আপনার কি রকম মনে হয় ?

কিন্তু প্রশ্নের জবাব মিলল না। সেই একই ধরণের ভঙ্গী করে বসে রইলেন সারাটা পথ। আর মধ্যে মধ্যে স্বগত উক্তি করে জানিয়ে দিলেন নিজের অবস্থিতি।—কবি নোগুচি। নয় কি ? কিন্তু তার নাম তো শুনিনি।

বিস্ময়ে হতবাক হবার উপক্রম। যদি বাংলা দেশে বসে কোন অধ্যাপক বলেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন নি তবে মনের যে অবস্থা হয়, অধ্যাপক কুবোতার জবাব শুনে আমার সেই অবস্থা।

বললাম—হাঁ, নোগুচি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁর চিঠি-পত্র লেখা হয়েছিল এক সময়। লড়াই সম্পর্কে তাঁর মতামত কবিগুরুর মোটেই পছন্দ ছিল না। তবুও তা থেকে আমরা জেনেছি কবি নোগুচির নাম। জাপানের শ্রেষ্ঠ কবি। আর আপনি তাঁর নাম শোনেন নি ?

অনেকটা বিস্ময় বিমূঢ় হয়েই আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

কিন্তু কোন সুরাহা হল না। অধ্যাপকমশাই এবারও

দিতে পারলেন না কোন পরিচয়। শুধুই আপন মনে বলতে লাগলেন—নোগুচি ; না শুনিনি তো।

ছাত্রাবাসে ফিরে এলে ভারতীয় বন্ধুদের এক এক করে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি রকম? কবি নোগুচির নাম অধ্যাপকমশাই জানেন না?

বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে যা বুঝতে পারলাম তাতে মনে হল এ অজ্ঞতা শুধু কুবোতা সেনসেইকেই পেয়ে বসে নি। বহু জায়গায় তারাও খোঁজ করেছেন কবি নোগুচির। কিন্তু 'হাঁ জানি বা তার লেখা পড়েছি' এমন জবাব কারো কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে অধ্যাপক মহলে সবচেয়ে সেরা যিনি অর্থাৎ সাতো সেনসেইকে জিজ্ঞাসা করলাম কবি নোগুচির কথা। কিন্তু উত্তরের বদলে শুধুই পেলাম নেতিবাচক ভঙ্গী।—কোথায়! ঐ নামে কোন কবি আছে বলে তো জানি না।

প্রফেসর ছাত্রবন্ধু কাউকে জিজ্ঞাসা করেও ব্যক্তিটির কোন পরিচয় জাপানের মাটিতে মেলে নি। ভেবেছিলাম জাপানে বসেই বিশ্বভারতীকে একটা চিঠি লিখব। এ সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য। তবে তখন আর তা হয়ে উঠে নি। দেশে ফিরে এসেও দু'এক জায়গায় চিঠি লিখে কোন ফল হল না। দিল্লীর ডিফেন্স মিনিস্ট্রীর স্কুলের জাপানী অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করেও প্রথমটায় হতাশ হতে হল। অনেক বুঝিয়ে তাঁকে বললাম—ইয়োনে নোগুচি। জাপানী কবি।

জাপানের who's who দেখেও বন্ধু কিছু হদিশ দিতে পারল না। পরে সেই who's who মন্থন করে উদ্ধার করল কিছু উপকরণ।—ইয়োনে নোগুচির ছেলে হল ইসামু নোগুচি। কাজ স্থপতি বৃত্তি। হিরোসিমা শান্তি স্তম্ভের রচয়িতা। পিতা ইয়োনো নোগুচি জাপানী ভাষায় কোনই কবিতা লেখেন নি কোনদিন। তবে তিনি বসবাস করতেন আমেরিকায় এবং ইংরেজীতে হয় ত কবিতা লিখে থাকবেন। কুশলী লেখক বা কবি ছিলেন বলে জানা নেই। তবে পুত্রের মত পিতারও এক সময় ছিল ঐ স্থপতিবৃত্তি।

কুবোতা সেনসেইর অজ্ঞানতাকে আজ আর তাই দোষ দিতে পারলাম না।

কবিতা বা কাব্য নিয়ে জাপানেও লেখা হয়েছে অনেক। লড়াইয়ের মনোভাবের পটভূমিকায় ঐতিহ্য তৈরী হলেও ভাবুক মনের অভাব হয় নি কখনও। আত্মগরিমা এবং সাম্রাজ্যবাদ—দুয়ে মিলে তৈরী হয়েছে জাপানীজীবন। এ দুয়ের সঙ্গেই আবার জড়িয়ে রয়েছে তার উত্থান-পতনের ইতিহাস। জাপানী সাহিত্য নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় নি কোনদিন আমাদের দেশে। কিন্তু পরিমাণের দিক দিয়ে প্রাচ্য দেশে একমাত্র চীনা ভাষায় লেখা পুঁথির চেয়েই কম হবে জাপানী সাহিত্যের কলেবর।

আগেই বলেছি 'Be Brief' কথাটা বোধ হয় এদের সর্বাঙ্গে লেখা রয়েছে! সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞান—কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কিছু নজরে পড়বে না। ইংরাজী বহু শব্দ হুবহু ব্যবহার করা হচ্ছে জাপানী ভাষায়। কিন্তু কাঠামোটি এতই ছেঁটে ফেলা হয়েছে যে খাস্ ইংরেজ তার মর্মোদ্ধার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। জাপানে দেখেছিলাম ইংরেজী 'ডেমোনস্ট্রেশন্' কথাটা জাপানীতে দাঁড়িয়েছে 'দেমো' বা 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্' কথাটা চলছে 'হানস্থতো' বলে। অধ্যাপক মাৎসু আরা দিল্লীতে জাপানী ক্লাশে একদিন বলেছিলেন—কাল রাতে গিয়েছিলাম হিন্দী ছবি দেখতে। সবই ভাল। কিন্তু বড় লম্বা বই। শেষ আর হয় না। তার চেয়েও লম্বা ভারতীয় গান। পুরো পাঁচ মিনিট চলবে। গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম শেষটায়।

ভাগ্যিস্ মাৎসু আরামশাই ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের আসরে পদার্পণ করেন নি!

বিদেশীদের কাছে হয় ত তাই মনে হবে। বিশেষ করে জাপানীদের। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত বিষয়গুলি যারা একেবারে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। কি করে চব্বিশ ঘণ্টায় তিরিশ ঘণ্টার কাজ করা যায় তাবই উদ্ভাবনে ব্যস্ত সবাই। বাস্তবে যেমন এরা জীবনকে করেছে সংক্ষেপ তেমনি সে জীবনের ছোঁয়া লেগেছে সাহিত্যে। জাপানী সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত। ভাল উপন্যাস বা গল্প রয়েছে প্রচুর। কাওয়াবাতার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর এ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ছোট গল্প বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক সে ধরণের গল্প তাদের সাহিত্যে কম। তাই দেখেছিলাম আমার এক অধ্যাপক বন্ধু তন্ময় হয়ে পড়ছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছোট গল্প। বইটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—বড় কুশলী লেখক। বাস্তবকে পুরোপুরি উপলব্ধি করলে তবেই এমন লেখা সম্ভব।

বুঝতে দেরী হল না বন্ধুর মনোজগতে আলোড়নের কারণ।

কিন্তু এর উল্টোটি ঘটেছিল জাপানী কবিতা পড়তে গিয়ে। একটু খুলে বলি। জাপানী সাহিত্যে দু'ধরণের কবিতার বড় আদর। হাইকু এবং ওয়াকা। এদেরকে ক্লাসিকাল পর্য্যায়ে ফেললে অন্যায় হবে না কারণ এর উৎস, ভাবধারা এবং কাঠামো—সবগুলিই প্রাচীনতার ঐতিহ্য বহন করছে। তবুও টেকনোলজী এবং বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আধুনিক জাপানীজীবনে হাইকু বা ওয়াকার চর্চা জাপানী কবি জগতে বিরল নয়। এবং যদি কেউ সার্থক হাইকু বা ওয়াকার সৃষ্টি করতে পারেন তবে তার স্থান সাহিত্যে কারুর চেয়ে কম নয়। বাইরের প্রশংসার চেয়েও হাইকু কবি নিজেকে ভাবেন কবি সত্তার আকর বলে।

কিন্তু কি এই হাইকু বা ওয়াকা? আজ প্রায় ছ'শ বছরধরে চলছে এদের রাজত্ব। কিন্তু কলেবরের ক্ষীণতার দরুণ ভাবপ্রকাশে এদের সমকক্ষ বলে আর কেউ জাপানী জীবনে আসন পায় নি। অবশ্য আরও দু'পাঁচটা জিনিষের মত কাব্যজগতেও আমদানী হয়েছে বিলেতী ধরণের লেখা এবং আনুষঙ্গিক ভাবধারা। তবু হাইকু বা ওয়াকার স্থান এরা পূরণ করতে পারে নি। ষোল সতর সিলেবলে ভাগ করা হাইকু বা একত্রিশ সিলেবলে ভাগ করা ওয়াকা কি করে সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশে সহায়তা করে তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হবে বই কি।

ভাবপ্রবণ হলেও জাপানীরা উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়। এই হাইকু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাৎসুও বাশোর লেখা দু'টো কবিতা নমুনা হিসাবে ধরেছিলেন:

| | |
|---|---|
| ফুরু ইকে ইয়া | পুরোনো পুকুর |
| কাওয়ের্ু নো তোবিকোমু | ব্যাঙের লাফ |
| মিজু নো ওতো। | জলের শব্দ। |
| | |
| কারে এদানি | পচা জল |
| তোরি নো তোমারি কেরি | একটা কাক |
| আকি নো কুরা। | শরৎকাল। |

আর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—'জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা'। কবি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন তার ভাষ্য এবং তক্ষুণি দূরে সরে গেলেন। রেখে গেলেন পাঠকের কাছে একটা ছবি যাকে বাহন করে তার মন পৌঁছুবে কবিরই কাব্যজগতে।

হাইকুরই সমগোত্রীয় ওয়াকা বা তান্‌কা।—সামুকু নারি শি গা দো নো শিতানি ফুসু ইমুনি চিকাইওরিতে ইকু ইমু আরি নি কেরি—( সাই তো মো কিচি )—অর্থাৎ, শীতের রাতে খোলা পুলের নীচে শুয়ে আছে একটা কুকুর। তার কাছে এগিয়ে আসছে আরেকটা কুকুর। এ যেন দেয়ালে টাঙান একটা ছবি। চিত্রকর যেমন ছবির মধ্যে কোথাও নিজের চিহ্ন রাখেন না, সমস্তটাই ছেড়ে দেন দর্শকদের কাছে

তেমনি কবি দূরে সরে গেলেন। পাঠকের কাছে রেখে গেলেন শব্দে বাঁধা আপন মনের ছবিটি। আমার কাছে এ কবিতা শুধু একটা ছবি। কিন্তু জাপানী কাব্যরসিকের কাছে এর আবেদন আরও গভীর। তার কাছে এ পংক্তিটির মর্মার্থ এই রকম—শীতের রাত মানেই নিঃসঙ্গতার চরম। সেই রাতে খোলা পুলের নীচে অর্থাৎ সব কিছুর অন্তরালে একান্ত নির্জনতাকে সঙ্গী করে শুয়ে আছে এই কুকুর। এবং এই নিঃসঙ্গতায় ছেদ আনবার জন্য এগিয়ে আসছে এরই সমগোত্রীয় আরেকটি। কুকুরকে কেন্দ্র করে তাই কবি বোঝাতে চাইছেন মানুষের জীবনেও চরম নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে শান্তির বাণী নিয়ে এগিয়ে আসে তারই একজন।

কুবোতা সেনসেইর কাছে, আমার প্রশ্ন ছিল জাপানের শ্রেষ্ঠ কবি কে? 'নোগুচি—myth' বলে আমাদের দেশে যা বহুদিন প্রচলিত ছিল জাপানী কাব্যে তার অবদানশূন্যতার কথা জেনে শুরুতে অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। আরও অবাক হয়েছিলাম যখন কুবোতা সেন্‌সেই খ্যাতিমান কবিদের একজনের নামও ট্রেনে যেতে যেতে বলতে পারলেন না। উত্তরটা যে সেনসেইর অজানা, তা নয়। এবং জাপানী ভাষা পড়াচ্ছেন বলে উত্তরটা তার ভাল করেই জানার কথা। তবুও বিদেশীর কাছে বলতে গিয়ে যদি বেফাঁস কিছু বলে বসেন, যদি প্রশ্নকারী আরও বিশদভাবে সে কবি সম্বন্ধে জানতে চায়, যদি বিদেশী তার উক্তির উপর ভিত্তি করে কবি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করে বসেন—অর্থাৎ পুরোপুরি না জেনে না শুনে কোন মন্তব্য করতে একেবারে নারাজ। এ মনোবৃত্তি জাপানীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যেরই একটি। কিন্তু যখন নিজের গঠিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে তখন শুনে মনে হবে ঐ বিষয়ে তার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই।

এর পর থাকেন সিনিয়র প্রফেসার কুরাতা। ইনিও বয়সে আমাদেরই মত হবেন। তবে আত্মমর্যাদার ভারে অনেকটা গম্ভীর। হাসিঠাট্টা যে করেন না তা নয়। তবে সবই মাপজোখ করে। ভারতীয়দের সম্বন্ধে সবারই জানার ইচ্ছা রয়েছে প্রচুর। তাছাড়া আমরাই ছিলাম প্রথম ভারতীয়ের দল যারা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে এসেছি। এবং বিষয় আর কিছু নয়—জাপানী ভাষা এবং সংস্কৃতি। তাই পড়ার ফাঁকে প্রফেসর কুরাতা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতেন ভারতীয় আচারব্যবহার এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে। একদিন এই রকম পড়াতে গিয়ে জাপানী "ওজিগী" বা উর্দ্ধাঙ্গ আনত করে অভিবাদন কথাটা বুঝিয়ে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাশের প্রথম থেকে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের দেশের অভিবাদনের রীতি।

ক্লাশটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশের ছাত্রে ভর্ত্তি—ভারত-বর্মা থেকে শুরু করে ফিলিপিন্, হংকং, ভিয়েৎনাম—সব রকমের ছেলেই রয়েছে। এক একজন উঠে ভঙ্গী করে বুঝিয়ে দিচ্ছে তার দেশের প্রথা। শেষ পংক্তিতে ছিলাম আমি আর ডাক্তার আগরওয়াল। আমাদের পালা আসতেই ডাক্তার আগরওয়াল দেখিয়ে দিল হাতজোড় করে নমস্তের ভঙ্গী।

(ক্রমশঃ)

# GOBIND SUGAR MILLS LTD.

## AIRA ESTATE

*Dist.* LAKHINPUR KHERI. (U. P.)

*Manufacturers of*

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

পূর্বপ্রকাশিতের পর

# জাতীয়তার রূপান্তর

দীপঙ্কর

পূর্বেই একটি ঘটনার উল্লেখে দেখান হইয়াছে যে নীতি-ভঙ্গ বা নৈতিক মানের অবনতি ঘটিলে বিপ্লবীগণ দলীয় সভ্যকেও ক্ষমা করেন নাই। এখানে তেমন আরেকটী ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হইয়াছিল। রাজসাক্ষীর সুযোগ এই যে, সব সত্য অকপটে স্বীকার করিয়া ও সব গোপন-কথা জানাইয়া দিয়া নিজে জেল-ফাঁসির হাত হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। নিঃসন্দেহে ইহা বিপ্লবীদের যে প্রতিজ্ঞা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা। নরেন গোঁসাই তাই আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যেই কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর হাতে নিহত হইয়াছিল। কানাইলাল ও সত্যেন বসু জানিতেন, এই হত্যার জন্য তাহাদের ফাঁসি অনিবার্য তবুও ফাঁসিকে ভয় না করিয়া দল, দলীয় গোপনতা ও দলের স্বার্থকেই তাহারা নিজেদের জীবনের চাইতেও অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিপ্লবী কানাইলালের জীবন-দীপ ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর ফাঁসির রজ্জুতে নির্বাপিত করিয়া দেওয়া হয় আর ফাঁসির নিষ্ঠুর রজ্জুতেই সত্যেনের শ্বাসরোধ করা হয় ২১শে নভেম্বর।

কিন্তু ইংরাজ সরকার বিভিন্ন প্রকারের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ফাঁসির ভয়ে ভীত করিয়া বিপ্লবীদিগকে তাহাদের নির্দ্ধারিত পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'ওলারটুন হলে'। ১৯০৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবকে সেখানে গুলি করা হয়।

উপরোক্ত গুলি ও বোমা শুধু সাহেবদের উপরই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ইহা সত্য হইলেও বিপ্লবীদের লক্ষ্য শুধু যে শ্বেতাঙ্গই ছিল তাহা নহে। দেশের স্বাধীনতা বিপ্লবীদের কাম্য। এই আকাঙ্খার পথে যে বা যাহারা বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল উহারাই ছিল বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। সেখানে স্বদেশবাসী হইলেও তাহাদের সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম হইত না। সকলের ললাটের জন্যই বিপ্লবীদের হাতের এক লেখা করেকটি অগ্নি-অক্ষর!

ইংরাজ শাসনের প্রধান যন্ত্র পুলিশ বিভাগ। উচ্চপদে তাহারা অধিষ্ঠিত থাকিলেও নিম্ন পদগুলিতে নিযুক্ত ছিল আমাদের দেশবাসীগণ। মাসান্তে চাকুরীর করেকটী টাকার পরিবর্তে ঘরের খবর এবং ভাইয়ের গোপন সাংগঠনিক ক্রিয়া-কর্মের সঠিক সংবাদ পুলিশের বড় কর্তাদের কাণে পৌঁছাইয়া দিত। ইহাতে কাহারও হয়তো দুই-চার টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে আবার কাহারও হয়তো রাতারাতি চাকুরীস্থলে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার ব্যক্তিগত ঐ করেকটী টাকা বা পদোন্নতির বিনিময়ে সে দেশের ও জাতির যে কি অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করিয়া দেশের পরাধীনতাকে আরও দীর্ঘতর করিয়া দিয়াছে তাহা হিসাব করিবার মত মানসিক গঠন তাহার ছিল না। সে তখন

ভারতীয় বা বাঙালী হইলেও ইংরাজ রাজের গোলাম, বলা যায় একরূপ ক্রীতদাসই ছিল। এই গোলামগণই অগ্নিযুগের অনেক গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বিপ্লবীদের অনেক নির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্মের মতলবকে বানচাল করিয়া দিয়াছে। অন্যায় সন্দেহ অথবা কাহারও সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ সরবরাহ করিয়া নিরাপরাধ কত যুবকবৃন্দকে যে ইহারা জেল-জীবনের দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া মৃত্যু-পুরীতে পাঠাইয়া দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং দেশীয় অতি উৎসাহী পুলিশ কর্মচারীদের সম্বন্ধে বিপ্লবীগণ অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, পথের বাধা তাহারা দূর করিবেনই। তাহাদের মধ্যে এখানে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

নন্দলাল ব্যানার্জী নামে একজন পুলিশ অফিসার ছিল। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর প্রকাশ্য রাজপথে তাহাকে হত্যা করা হয়। Sedition Committee-র রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক সংগঠন ক্রিয়া বং অন্যান্য কাজকর্ম ১৯১৩ সাল হইতে উগ্রতর পথে পরিচালিত হইতে থাকে। সংখ্যার হিসাবেও দেখা যায়, নূতন নূতন সভ্য যুক্ত হওয়ায় ঐ সময় তাহাদের দলের কলেবর অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। According to Sedition Committee Report : During 1913 the revolutionaries continued their activities with increased ferocity. Two police officers were murdered on the evening of September 29th .....Haripada Deb was shot dead by three young Bengalis on the edge of the lake in College Square, Calcutta..... the Head Constable was assassinated in the middle of the throng, his assailants disappeared in the crowd.

[ বাংলার বিপ্লববাদ : শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, পৃঃ ১১০]

উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডগুলির একটিও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে বা যে যাহার খেয়াল-খুশীমত যাহাকে পাইয়াছে তাহাকে হত্যা করিয়াছে এমনও নহে। ইহা সবই বিপ্লবীদের হিসাব করা এবং পূর্ব-পরিকল্পিত। হত্যাকারীও একই ব্যক্তি নহেন। যাহার উপর যখন যে-কাজের ভার অর্পিত হইয়াছে সে তখন তাহা নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে সম্পন্ন করিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, ২৯শে সেপ্টেম্বর পুলিশ অফিসার হরিপদ দেবকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার পর মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাংলার আর এক প্রান্ত ময়মনসিংহে এমনই আর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। According to Sedition Report : Bomb was thrown into the house of Inspector Bamkim Chandra Chaudhury in Mymensingh town. And he was instantly killed. The Inspector had been a prominent worker against the Dacca Conspiracy case and there is no doubt that the Samity brought about his death.

... ... ... ... ... ... ...

in the Cornwallis street, Inspector Suersh Chandra Mukherjee, while on duty noticed an absconding anarchist in that street and approached to arrest him when he was fired by the anarchist.....the Inspector was killed.

[ বাংলার বিপ্লববাদ : শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, পৃঃ ১৯০]

স্বামীজী একদিন আমাদের দেশের যুবকবৃন্দকে তাঁহার উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ডাক শূন্যের নীলিমায় মিলাইয়া না গিয়া ইথারে ইথারে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহারই বেশ ধরিয়া পরিপূরক হিসাবে সুভাষচন্দ্র জাতীয় জীবনের তিমির দুয়ারে আঘাত হানিয়া নূতন উষার

সোনালী আলোর জন্ত ডাক দিয়াছেন "বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্ত প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্ত নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার তবে তোমরা এগিয়ে এসো; তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত জীবিত থাক—তবে স্বাধীন ভারত ভোগ করতে পারবে।"

[ তরুণের স্বপ্ন : সুভাষচন্দ্র বসু, পৃঃ ৯ ]

এ-আহ্বানে ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া বাংলার পুরজন হৃদয়-মন্দিরে নূতন মন্ত্র লইয়া রুদ্রছন্দে আগাইয়া আসিয়াছিল। সেখানে শুধু যুবজনই নহে, যুবক-যুবতী উভয়েই এমন কি যৌবন অতিক্রম করিয়া যাহারা প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়াছিলেন তাহারাও সুভাষচন্দ্রের ডাক শুনিয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে পারে নাই।

মাদারীপুরের শান্তিসেনার প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিনায়ক বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের জীবনের একটি ছোট ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বিপ্লবী যুগের সেই অগ্নিময় দিন-গুলিতে তিনি অত্যন্ত গোপনে এবং সন্তর্পণে দেশের বাড়ীতে যাইতেন। এই গোপনীয়তা সত্ত্বেও তিনি বাড়ী পৌঁছিবার কিছু পরেই দেখা যাইত থানা হইতে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত। বাড়ী হইতে থানা বেশী দূর ছিল না, তথাপি থানায় কে সংবাদটী পৌঁছাইয়া দেয় সেই গোপন দূতটির নাম বাহির করিবার জন্ত পূর্ণদাস চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নামও জানিতে পারিলেন। তাহার বাড়ীর উত্তর দিকে অবস্থিত বাড়ীর এক ভদ্রলোক। পূর্ণ দাসের সম্মুখে তখন অনেক কাজ, বিরাট দায়িত্ব। বৈপ্লবিক বিভিন্ন কাজের জন্ত তাঁহার গ্রামের কয়েকজন অনুগামীদের নির্দেশ দিবার জন্ত মাঝে মাঝে তাহাকে গ্রামের বাড়ীতে যাইতেই হইত। কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের বিরোধিতায় তাহাদের ছক্-কাটা অনেক চক্রান্তই বানচাল হইতে লাগিল। কিন্তু রক্তে যাহার বিপ্লবের বিদ্যুৎ তিনি এ-অসুবিধা বেশীদিন সহ্য করিবেন কেন? সুতরাং বিপ্লবী পথের পথিক অনুচরদের মধ্যে একজনের নিকট তিনি একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠিখানির মর্মার্থ হইতেছে এই, আমাদের বাড়ীর উত্তর পাশে পথের মাঝে একটি গাবগাছ রহিয়াছে। গাব-গাছটী অনেকদিন যাবৎ জনসাধারণের পথ-চলার বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে সুতরাং উহাকে অপসারণ করিয়া পথকে সুগম করাই দরকার।

ভদ্রলোকের গায়ের রং ছিল অত্যন্ত কালো তাই পূর্ণ দাস ভদ্রলোককে গাবগাছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। অতি সাধারণ চিঠি। অপরের হাতে চিঠিখানি পড়িলেও চিঠিখানি যে গূঢ় অর্থে লিখিত হইয়াছিল সে-অর্থ তাহার বোধগম্য হইবার কথা নহে। কিন্তু যিনি লিখিয়াছিলেন এবং যাহার কাছে লিখিয়াছিলেন তাহারা উভয়ে একই অর্থ বুঝিয়াছিলেন। উহা ছিল বিপ্লবীর ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষা।

বিপ্লবী পূর্ণদাসের জীবনের ইহা একটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনা। এমন বিপ্লবীবরেণ্য তখন পূর্ব বাংলার জিলায় জিলায় দাবানল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। বরিশালের সতীন সেন, ফরিদপুরের পূর্ণদাস, ঢাকায় পুলিন দাস, চট্টগ্রামে সূর্য সেন ইহারা সকলেই নিজেদের জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিয়া জীবনের আদর্শের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাহাদের অর্থের প্রাচুর্য না থাকিতে পারে কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্যে তাহারা ভরপুর। সেই প্রাণ প্রাচুর্যই তাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন।

সুতরাং প্রাচুর্যভরা যে প্রাণ, যাহা তাহারা বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের সময়ই শক্তিদায়িনী মায়ের পায়ে বিসর্জন

দিয়া রাখিয়াছেন সেই প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া, খেলায় খেলায় সে-প্রাণ বলিদান করিতে পারিবে না কেন? তাই তো প্রজ্বলিত অপমানের জ্বালা তাহাদিগকে অধীর করিয়া অজানা, অচেনা পথে টানিয়া লইয়াছে, অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা লইয়া ঘরের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশ-মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ভারতের ইতিহাসে ইংরাজ রাজত্বের এক কলঙ্কময় এবং কাপুরুষোচিত অধ্যায়। নিরস্ত্র, অসহায় শিশু, নারী আর পুরুষের উপর মাইকেল ও-ডায়ারের সঙ্কেতে জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন বড় লাট বাহাদুরের নিকট ওজস্বিনী-ভাষায় একখানি চিঠি লিখিয়া ইংরাজ-রাজ কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত সম্মানিত উপাধি 'নাইট-হুড' পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কবি-মনের প্রতিবাদ সভ্যতার মাপকাঠিতে তিনি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কবি-গুরুর সেই ঐতিহাসিক চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করা হইল,

## Historic letter to Lord Chelmsford

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British Subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without paralled in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of the insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is binding the noble vission of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous, as befitting its physical strength and normal tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the

millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glarring in the incongruous context of humiliation, and I for my part, wish to stand, shorn, of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have compelled me to ask your Excellency, with due difference and regret, to relieve me of my title of knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the king at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours' faithfully
Rabindra Nath Tagore

Calcutta,
6, Dwarkanath Tagore Lane,
May, 30, 1919.


**JAYASREE**

Socio-Cultural Bengali Monthly

Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

**Ordinary**

| | | |
|---|---|---|
| Full Page : | Rs. | 100·00 |
| Half Page : | Rs. | 60·00 |
| Quarter Page : | Rs. | 35·00 |

**Cover Page**

| | | |
|---|---|---|
| Second Cover : | Rs. | 175·00 |
| Third Cover : | Rs. | 200·00 |
| Fourth Cover : | Rs. | 350·00 |

For Special Position contact *Advt. Manager* Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm.
( 8″ × 6″ )

Contact
Manager, Jayasree
251A/32, Netaji Subhas Chandra Bose Road
Calcutta—47
Phone : 46-4116

আমাদের পরিবার পরিকল্পনা অভিযান আজ
দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছে। আমরা
একে শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সীমিত দিক
থেকেই দেখবো না, এর বৃহত্তর দিকে অর্থাৎ
মা এবং সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকেও আমাদের
সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

ইন্দিরা গান্ধী

favp 70/300

# 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য'*

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে জাগরণ ঘটেছিল, তা যথার্থ অর্থেই রেনেসাঁস ( renaissance )। 'রেনেসাঁস' কথাটির সঠিক মানে পুনর্জাগরণ, য়ুরোপীয় রেনেসাঁসেও এই পুনর্জাগরণ দেখি। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ফিরে তাকানো, লুপ্তরত্ন-উদ্ধার মানবমহিমার জয়গান এবং স্বাধীন চিন্তার জয়ঘোষণা—এ সমস্ত রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই আন্দোলনের তাই দুটি দিক: ( ক ) লুপ্তরত্ন উদ্ধার, ( খ ) চিন্তায় আধুনিকতা। অর্থাৎ প্রাচীনের মহত্তম দিক-গুলি অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তার প্রসার। প্রাচীনের বিচারহীন আনুগত্য নয়, বিচারপূর্ণ নবমূল্যায়ন পুণর্জাগরণ আন্দোলনের মূল ভিত্তি। এই অর্থে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাগরণ রেনেসাঁসের সমমর্যাদা সম্পন্ন।

ভারতীয় ঐতিহ্য, সনাতন তথা চিরন্তন অধ্যাত্ম-আদর্শ এ যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ সংস্কার, অন্ধ প্রথানুগত্যের বদলে বিশ্লেষণী মনোভাব দৃঢ় হয়েছে, দৈব-বিশ্বাস এবং অলৌকিকতার জায়গায় মানব মহিমার সুর ঘোষিত হয়েছে।

ভারতীয় বেদান্তনিহিত অধ্যাত্মবোধে জগৎ ও জীবন, স্রষ্টা ও সৃষ্টির যে উপলব্ধি তার আলোকে সমস্ত বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য স্বীকৃত হয়েও পরম ঐক্যে সমন্বিত। পরম সত্যকে যিনি জেনেছেন তিনি মহাজ্ঞানী আবার মহাপ্রেমিকও। সেই মহাপ্রেমের প্রেরণায় তাঁর কর্মযোগ, লোককল্যাণ, নিষ্কাম সেবাব্রত। ভারতবর্ষকে এই মহান সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্মকুশলতার মহনীয় দিকগুলি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নবলব্ধ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহে আত্মবিস্মৃত জাতি স্বকীয়ত্ব বর্জন করে পরধর্ম গ্রহণে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। সেই আত্মবিস্মরণের যুগে ভারত-পথিক রামমোহনের আবির্ভাব। বেদান্ত-উপনিষদের দেশীয় ভাষায় প্রচার তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সচেতন প্রয়াস। আর তাঁর যুক্তিবাদী মন, মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং সমাজসংস্কারে আধুনিকতার পথে অভিযাত্রা। রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত একটা যুগ নানা আন্দোলন ও আলোড়নে মথিত। পরিশেষে সমস্ত দ্বিধা-সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে একটি সমন্বিত জীবনবোধে উত্তীর্ণ হওয়া।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই বিচিত্র গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার মূলে প্রবেশ করার অকুণ্ঠ প্রয়াস করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকাতে অবশ্য তিনি বলেছেন, 'এক হিসাবে এই একাধিক খণ্ডে পরিকল্পিত সমগ্র গ্রন্থটিই আমার উনবিংশ শতাব্দীর মননলোকে প্রবেশের ভূমিকা।' তিনি জানিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর মননলোক অনুসন্ধানের ফল তিনি একাধিক খণ্ডে প্রকাশ করবেন। বর্তমান খণ্ডকে হয়তো তিনি সেই পরিকল্পনার মুখবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত করতে চান।

কিন্তু সমস্ত গ্রন্থটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করার পর মনে হয়েছে অধ্যাপক ঘোষ বিনয়বশতঃই বইটিকে 'ভূমিকা'মাত্র

* উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য : প্রণবরঞ্জন ঘোষ, লেখাপড়া। কলিকাতা-১২

বলে চিহ্নিত করেছেন। একটি মননশীল গ্রন্থধৃত বিষয়বস্তু যেমন তার ভূমিকাতেই পরিপ্রকাশিত ও বিশ্লেষিত হয়, তেমনি লেখকের এ 'ভূমিকা'ও একটি মর্যাদাসম্পন্ন 'মুখবন্ধ'। তবে আমরা কিন্তু ভূমিকার গৌরব স্বীকার করে নিয়েও মূল গ্রন্থটির মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। আসলে রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অবধি বিস্তৃত কালীমায় বাংলার জাগরণ ও প্রতিষ্ঠার একটি মনোজ্ঞ সুলিখিত আলেখ্য এই গ্রন্থটি। রামমোহন, ডিরোজিও, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণ বসু ভূদেব মুখোপধ্যায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এই ন'জন মনীষীর চিন্তা এবং সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'এ গ্রন্থে বিশেষতঃ সেই সব মনীষীর চিন্তাধারাই আলোচিত, বাংলাসাহিত্যে যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্যযুগের কবি ও নাট্যকারদের সম্বন্ধে পরবর্তী খণ্ড গুলিতে আলোচনা থাকবে, এ খণ্ডে যে সব মনীষীর চিন্তাধারার আলোচনা রয়েছে তাঁদের অধিকাংশই গদ্যশিল্পী।' এ থেকে অনুমিত হচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর অন্য যে সব চিন্তানায়কের কথা এই বইয়ে নেই তাঁদের কথা পরে আলোচিত হবে। প্রশ্ন হতে পারে, সাহিত্যশিল্পীদের চিন্তা ও কৃতি বিচার করতে গিয়ে 'নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা : শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি সংযুক্ত হয়েছে কেন? এর উত্তর খুব সহজেই দেওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যসৃষ্টি না করলেও তাঁর জীবন ও বাণী বাংলা জীবনীসাহিত্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাসে প্রবল প্রভাব ফেলেছে। অনেকটা শ্রীচৈতন্য-প্রণোদিত সাহিত্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত সাহিত্যের তুলনা করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মনীষা চিন্তায় ও কর্মে কিভাবে গতিশীল হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় অধ্যাপক ঘোষের গ্রন্থে। সে যুগের চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস প্রধানতঃ চারটি দিকে প্রসারিত হয়েছিল—(১) ধর্মান্দোলন; (২) সমাজ-সংস্কার; (৩) জাতীয়ভাবের উদ্বোধন; (৪) সাহিত্যসৃষ্টি। আর এগুলি কোনো পৃথক স্বতন্ত্র আন্দোলনের মতো ছিলনা। একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। তবে এক এক মনীষীর ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দিক হয়তো প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতীয় জীবনাদর্শে জীবনের কোনো প্রয়াসই স্বয়ংস্বতন্ত্র নয়। অধ্যাত্মচিন্তা এবং উপলব্ধিই ভারতীয় মনীষার প্রতিষ্ঠাভূমি. জাতীয়তার স্থিতিমূল, সমাজ-সংস্থানের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত থেকে নবযুগকে প্রসারিত চিত্তে যথাপ্রয়োজন আবাহন বা বর্জন করতে হবে। এসত্য রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি নানাভাবে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও বারবার এ সত্যের প্রতিফলন দেখি। রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ তো এ সত্যের বলিষ্ঠতম প্রচারক। ভারতের কিছু দেবার আছে বিশ্বে। সে শুধু অধমর্ণ নয়, উত্তমর্ণের গৌরবান্বিত ভূমিকায় জগৎসমক্ষে উন্নতমস্তকে দাঁড়াতে পারে—এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত ভারতবোধের মর্মবানী। অধ্যাপক ঘোষ এই মর্মবানীকেই কেন্দ্রে রেখে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের এই সিদ্ধান্ত সমস্ত গ্রন্থটির প্রাণবিন্দু—'পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্মই নেই বা আচার-অনুষ্ঠানের বা জাতীয় সংস্কারের দ্বারা লালিত-পালিত নয়। স্বদেশীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বর্জন করে বিশ্বধর্ম স্থাপনের প্রয়াস কোনো দেশে বা কালে যদি সম্ভবও হয়, তাহলে তা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষেই কল্যাণকর হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতি, সমাজ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির দ্বারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই বিশ্বজনীনতায় উপনীত হওয়া সম্ভব এবং কল্যাণকরা' (পৃঃ ২২৯)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় জীবনাদর্শে বেদান্তভিত্তিক অদ্বৈতবাদ এবং তার উপলব্ধির আলোকে সমস্ত কর্মপ্রয়াসের গুরুত্ব সম্বন্ধে লেখক দৃঢ়-নিশ্চয়। এই জীবনবোধে উত্তীর্ণ সাধক

এবং মনীষিবৃন্দ অদ্বৈতজ্ঞানের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে লোক-কল্যাণে নিয়ত হন। সেজন্যেই ভারতীয় কর্ম পুজোরই নামান্তর, ভারতীয় মানবতাবোধও এই উপলব্ধির আলোকে ভাস্বর। এই আদর্শোপলব্ধি যাঁর যতো গভীর, তিনিই ভারত-পথের ততো ঘনিষ্ঠ পথিক। এই পথ থেকে বিচলিত হলে কি ধর্মবোধে, কি সমাজ সংস্কারে কি রাজনৈতিক চেতনায় যে বিরোধ এবং অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় তাই হল যুগে যুগে ভারতের সমস্যা। উনবিংশ শতাব্দীতেও এই সমস্যা প্রবলাকারে দেখা গিয়েছিল। ভারতীয় জীবন-বোধ আগে থেকেই মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও দেশাচারের গণ্ডীবদ্ধ হয়েছিল মানব মহিমা হয়েছিল অবমানিত, লাঞ্ছিত। ফলে নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা সংশয় এবং অনীহা দানা বেঁধে ওঠা স্বাভাবিক। এই সংকট এবং একে উত্তীর্ণ হবার সাধনাই হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মানস-ইতিহাস। এই মূল প্রত্যয়ে স্থিত থেকে অধ্যাপক ঘোষ তাঁর গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট মনীষিবৃন্দের চিন্তাভূমি এবং কর্মপ্রয়াসের মূল্যায়নে যত্নবান হয়েছেন। তাই সমস্ত গ্রন্থটি একটি মৌল প্রত্যয় বা অভিজ্ঞা দৃঢ়সূত্রে গ্রথিত। অবশ্য একথা ঠিক, একটি মূল প্রত্যয়ে সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হলেও লেখক কোথাও অনুরাগ বা বিরাগের আতিশয্যে স্তিমিত বা উচ্চকিত হননি। বরং একটি সনিষ্ঠ আন্তরিকতার সুরে প্রবন্ধগুলি পরিপূর্ণ।

কোনো কোনো স্থলে লেখক প্রচলিত মতসমূহের বিপরীত কথা বলেছেন। যেমন বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি নতুন ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্যাদি থেকে উপাদান আহরণ করে দেখিয়েছেন, বিদ্যাসাগর ঈশ্বরসম্বন্ধে নীরব অথবা নিরুৎসুক থাকলেও ঈশ্বরচেতনার ফল্গুধারা তাঁর অন্তরে নিহিত থাকাই সম্ভব। অবশ্য তাহলেও মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের মহিমা কোনো অংশে ক্ষুণ্ন হয় না। কারণ তিনি লোককল্যাণের মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আবার রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েও হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে যে নিঃসংশয় ছিলেন তারও কারণ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। এ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর সন্ন্যাস-বিরোধিতার কারণ এবং সন্ন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করে লেখক বলেছেন, সন্ন্যাস সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। বোধ করি, ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের বাড়াবাড়ি তার কারণ। কিন্তু সন্ন্যাস আসলে মানব চেতনার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ, জীবনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি। সংসারের সব আকর্ষণের মধ্য দিয়ে গিয়েই ক্রমে মানুষ ত্যাগের সার্থকতা বুঝতে পারে—তখন ফুলের ফলে পরিণতির মতো মানুষের হৃদয়ে পরম সত্যের প্রতি একান্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।' (পৃঃ ২০১)

আরেকটি কথা বিশেষভাবে এখানে উল্লেখযোগ্য। মনীষিবৃন্দের মনন ও কর্ম আলোচনায় শ্রদ্ধা এবং বিচার পাশাপাশি থেকেছে। শ্রদ্ধা ছাড়া মূল্যায়ন হয় না। শ্রদ্ধা মানে অন্ধ অনুরাগ নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে বোঝার চেষ্টা। শ্রীঘোষ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-আবহে আবাল্য পরিবর্ধিত। তা হলেও দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি যে তন্নিষ্ঠ শ্রদ্ধানম্র বিচারণা দেখিয়েছেন তা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। মহর্ষির আন্তর জীবনের চিত্রটি তথ্যসহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রমুখ মনীষী সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের পত্র-পত্রিকা, দুষ্প্রাপ্য চিঠিপত্র থেকে আরো তথ্য দিয়ে বক্তব্য সুবলয়িত করা যেত। তবু, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের আলোচনায় সে যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মানুসন্ধানের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা মনোজ্ঞ। এই এষণাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সাধনায় প্রত্যক্ষীভূত ধর্ম (Scientific Religion) বা 'কর্মে পরিণত বেদান্তে' পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

বইটির ভাষা আমাদের আনন্দের কারণ হয়েছে। এমন সাবলীল ভঙ্গিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখা যে, দুরূহ বিষয় পাঠের ক্লান্তি অনেকাংশে লাঘব হয়ে যায়। মননের আলোচনায় ভাষাকে দুর্বোধ্য, তীক্ষ্ণ করার একটা সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এ গ্রন্থে সে রীতি অবলম্বন না করে লেখক সুদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষা যেমন প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট, বর্ণনা তেমনি পরিমিতি-গুণমণ্ডিত।

উপসংহারে বক্তব্য গ্রন্থশেষে একটি নির্বাচিত নির্ঘণ্ট এবং আলোচিত মনস্বিবৃন্দের রচনাদির একটি তালিকা থাকলে পাঠকেরা অনেকখানি উপকৃত হতেন, বইটির বিষয়-মূল্যও বেশ বর্ধিত হতো।


## খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

| | |
|---|---|
| শ্রীগীতা | ৭·৫০ |
| শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম | ৭·০০ |
| ভারত-আত্মার বাণী | ৫·০০ |
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১·৫০ |
| কর্মবাণী | ১·২৫ |
| Soul of India Speaks | 5·00 |

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসাগর | ২·২৫ |
| মানুষের মত মানুষ | ·৭৫ |
| শিশু রামায়ণ | ·৬২ |
| শিশু মহাভারত | ·৭৫ |

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

| | |
|---|---|
| বাংলার ঋষি | ৩·০০ |
| বাংলার মনীষী | ১·৩০ |
| বাংলার বিদুষী | ২·০০ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১·৫০ |
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২·০০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ৪·০০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১·৫০ |
| রবীন্দ্রনাথ | ১·২৫ |
| যুগাচার্য বিবেকানন্দ | ১·৫০ |
| আচার্য জগদীশচন্দ্র | ২·৫০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১·৫০ |

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২


২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এজভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

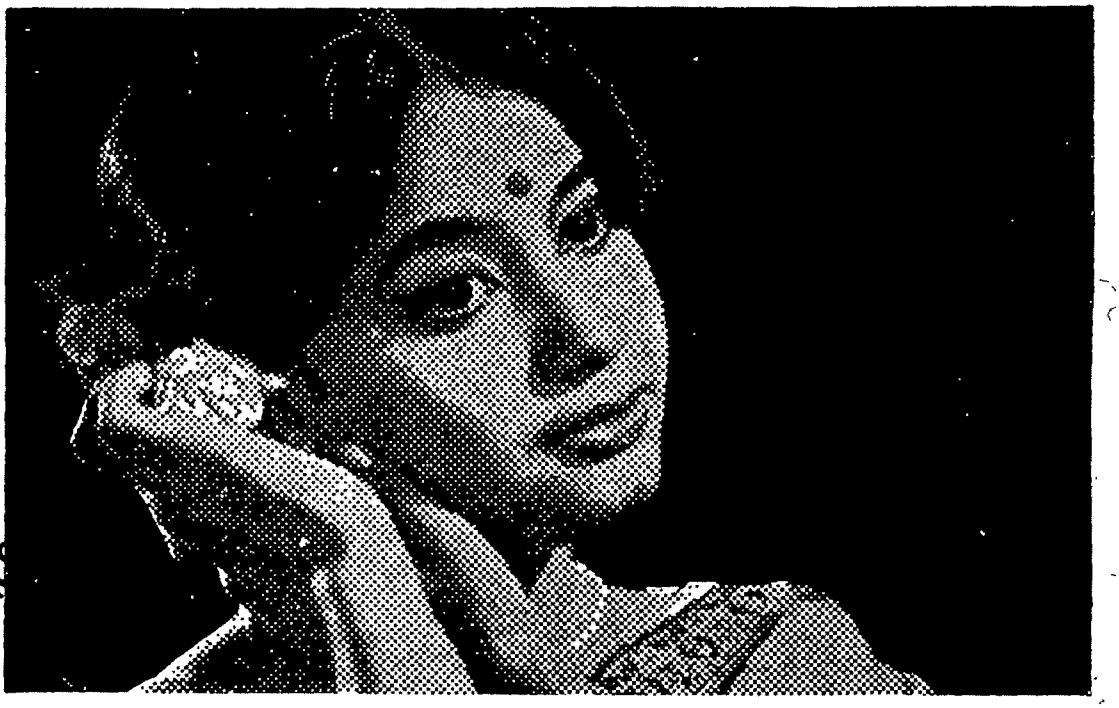

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

সাধনা ঔষধাল
কলিকাতা-৫

'সাধনা বিউটি ক্রীম': একটি অতি আধুনিক অনুরাগ

SBC-1/69


Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage
HEAD OFFICE : JAYASREE. 251A/32. Netaji Subhas Ch. Bose Road

কার্তিক
১৩৭৭

# জয়শ্রী

প্রতিষ্ঠাত্রী – সম্পাদিকা :-
লীলা রায়

# আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

## সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

**সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা** কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-1/69

# GOBIND SUGAR MILLS LTD.

## AIRA ESTATE

*Dist.* LAKHINPUR KHERI. (U. P.)

*Manufacturers of*

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

## সূচীপত্র

জয়শ্রী : কার্তিক : ১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৫৯১ |
| হে ত্রস্ত নাবিক ! ( কবিতা ) | স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী | ৫৯৭ |
| বিস্ফোরণ : ( ধারাবাহিক রচনা ) | কালীচরণ ঘোষ | ৫৯৯ |
| তরুণের স্বপ্ন ( প্রবন্ধ ) | রবি রায় | ৬০৭ |
| সুভাষবাদ ( প্রবন্ধ ) | পবিত্রকুমার ঘোষ | ৬১১ |
| কণ্ঠভরা বিষ ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) | মিহির মুখোপাধ্যায় | ৬২৩ |
| জাপানের দিনগুলি ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী ) | বারীন বর্ধন | ৬২৯ |
| যা কিছু পেয়েছি যাহা কিছু গেলো চুকে ( স্মৃতিকণা ) | কণা রায় | ৬৩৪ |
| কোনো কোনো বৃক্ষ থাকে ( কবিতা ) | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ৬৩৭ |
| এমন কবিতা চাই ( কবিতা ) | জ্যোতিরীশ চক্রবর্ত্তী | ৬৩৮ |
| জাতীয়তার রূপায়ন ( ধারাবাহিক আলোচনা ) | দীপঙ্কর | ৬৩৯ |



সম্পাদক : সুনীল দাস


## জয়শ্রীর নিয়মাবলী

### গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

### লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়**

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
পোঃ নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

# সব মানুষের জন্য সব কলমের জন্য

## সুলেখা

### সুলেখা
স্পেশ্যাল

পার্মানেন্ট ঃ
অ্যু-অ্যাক ★ রয়েল অ্যু
অ্যাক ★ ব্রাউন
ওয়াশেব্‌ল ঃ রয়েল অ্যু
রেড ★ গ্রীণ

### সুলেখা
একজিকিউটিভ

পার্মানেন্ট ঃ
অ্যু-অ্যাক ★ নেভি অ্যু ★ সুপার অ্যাক
ওয়াশেব্‌ল ঃ রয়েল অ্যু ★ এমারেল্ড গ্রীণ
কারমেট রেড

### সুলেখা
জেনারেল

পার্মানেন্ট ঃ অ্যু-অ্যাক
ওয়াশেব্‌ল ঃ
রয়েল অ্যু ★ রেড ★ অ্যাক

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ের
গৌরব-ধন্য

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

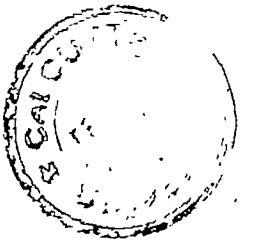

# প্রবাসী

৩৫ বর্ষ ০ সপ্তম সংখ্যা ০ কার্তিক ১৩৭৭

## সম্পাদকীয়

### পূর্ববঙ্গে ধ্বংসলীলা

গত ১৩ নভেম্বর পূর্ব বঙ্গের দক্ষিণ উপকূলে প্রবল-ঝড় ও প্লাবনে ত্রিশ হাজার বর্গ মাইল এলাকা বিপর্যস্ত হয়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়েছে। সরকারী হিসাবে এ-পর্যন্ত দুই লক্ষ লোক মৃত বলে ঘোষিত হয়েছে, বেসরকারী হিসাবে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ। ত্রিশ ফুট উঁচু বন্যার প্লাবনে সমুদ্রোপকূলের দুই হাজার দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। নোয়াখালি, হাতিয়া, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালি, ভোলা, খুলনা ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংস হয়েছে। হুগলা দ্বীপে ২০,০০০ হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। দশ হাজার নৌকার মধ্যে নয় হাজার নৌকা ডুবে গেছে, শতকরা ষাটভাগ জেলে নিখোঁজ। পাকিস্তানের ত্রাণ কমিশনারের হিসাবে মোট ক্ষতির পরিমাণ ৯৭২·৫ কোটি টাকা।

পূর্ববঙ্গের এই ধ্বংসলীলা সাম্প্রতিক কালের পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিধ্বংসী প্রাকৃতিক তাণ্ডব। অবশ্যি পর পর কয়েক বছর পূর্ব বাংলায় ছোট-বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে এসেছে। ১৯৬০ অক্টোবরে ঝড়ে ৬০০০ হাজার লোক প্রাণ হারায়। ১৯৬৩র মে মাসে অনুরূপভাবে ১০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়, ১৯৬৫-র মে'তে ১৫০০ লোক নিহত হয়, ১৯৬৬-র অক্টোবরে ৩০০ এবং ১৯৭০ এর অক্টোবরে ঝড়ে ও প্লাবনে ঢাকা অঞ্চলে ৬৫ জন নিহত হয় আর এবছর জুলাই মাসেও ঝড় ও বন্যার তাণ্ডবে প্রচুর প্রাণহানি হয়।

সব চাইতে তাজ্জবের ব্যাপার পৌনঃপুনিক তাণ্ডব সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গের সমুদ্র উপকূলে পূর্বাহ্নে ঝড়ের সঙ্কেত জ্ঞাপনের কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। এবারকার ঝড় ও প্লাবনের প্রায় দশদিন পূর্বে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ঝড়ের গতিবেগের ম্যাপ প্রেরিত হয়ে পাকিস্তান সরকারকে পূর্ববঙ্গের এই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সামরিক সরকার পূর্ববঙ্গের সমুদ্রোপকূলের অসহায় মানুষগুলিকে এই ঘোরতর দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

এই দুর্যোগের পর যেমন পূর্ববঙ্গের বিপন্ন মানুষদের প্রতি সমবেদনার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য প্রসারিত হয়েছে, তেমনি পূর্ববাংলার বিপন্ন মানুষ দুর্জয় ক্ষোভে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা, উপেক্ষা এবং বিলম্বিত সাহায্যের জন্য। আমেরিকা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী,

ইরান, জাপান, চীন, ইসরাইল প্রভৃতি দেশ থেকে দ্রুত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এসেছে ; ঢাকা বিমান ঘাঁটিতে বহু দেশ থেকে প্রচুর সাহায্য মজুত করেছে দুর্যোগের কয়েকদিনের মধ্যেই। ১১২-সদস্য বিশিষ্ট লীগ অফ রেডক্রশ তাদের সদস্য দেশগুলিকে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, ইরান, ইংলণ্ড থেকে হেলিকপ্টার এসে পৌঁচেছে ঢাকা বিমান ঘাঁটিতে ; অবশ্য সোভিয়েত রুশ কিম্বা পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট সরকারগুলি পূর্ব বঙ্গের দুর্যোগে এখনও নীরব আছেন। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও হেলিকপ্টার প্রেরণে বিলম্বের এবং আন্তর্জাতিক রিলিফ দুর্গতদের সময় মতো পৌঁছে দিতে তাদের অক্ষমতার বিরুদ্ধে ঢাকায় ৩০,০০০ হাজার লোকের মিছিল প্রতিবাদে মুখর হয়েছে ; লণ্ডনে ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের দপ্তরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের এই অবিমৃষ্যতার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মানুষেরা প্রবল বিক্ষোভ জানিয়েছে। বিপন্ন কোনো কোনো এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃতের ও গবাদি পশুর শবের দুর্গন্ধের মধ্যে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্রহীন অবস্থায় সাত থেকে দশদিন পর্যন্ত মৃতকল্প হয়ে কাটিয়েছে। বহুলোকের এইভাবে প্রাণহানিও হয়েছে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সামরিক সরকার ভারত সরকারের প্রসারিত সহায়ক হস্ত এই দুর্যোগের মুখেও বার বার প্রবলভাবে উপেক্ষা করে শুধু তাদের ভারতবিদ্বেষেরই আর একবার পরিচয় দেন নাই, পূর্ববঙ্গের দুর্গত মানুষদের সামুহিক বিপদের প্রতিও চরম উপেক্ষা ও অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। ভারত সরকার এই ধ্বংসলীলার সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ লক্ষ টাকার সাহায্য ঘোষণায় দুই-একদিনের মধ্যেই এই সাহায্যের পরিমাণ এক কোটি টাকা ধার্য করে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সাহায্যে ঔষধ ও অন্যান্য সাহায্যের সামগ্রী বিপন্ন এলাকায় পৌঁছে দেবার, হেলিকপ্টার পাঠাবার, নৌকা দিয়ে সাহায্য করবার এবং ৫০-শয্যা বিশিষ্ট দুইটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল পাঠাবার প্রস্তাব দেন। এই সব করটি সাহায্যের প্রস্তাবই পাকিস্তান সরকার অগ্রাহ্য করে এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর চালকদের ভিসা দিতে অস্বীকার করে ভারতবর্ষের আগ্রত মানবতাবোধকে পাকিস্তান সরকার অসম্মান করেন। অতঃপর ভারতবর্ষের সাহায্য স্থলপথে মোটর লরী যোগে বেনাপোল-যশোর হয়ে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে।

পূর্ববঙ্গের এই বিপদে ভারতবর্ষের উদার মানবতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার আর একটি প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষকে হেয় করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। ভারতবর্ষের আকাশ পথে ইরাণের বিমান সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানে যেতে চাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভারত সরকার তাতে সম্মতি দেওয়া এবং পাকিস্তানের বেসামরিক ও সামরিক বিমান ও হেলিকপ্টার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যাবার জন্য ভারতীয় আকাশের ওপর দিয়ে যাবার ত্বরিত অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ক্রমাগত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এই অনুমতি দিতে অস্বীকৃতির মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা ভারতবর্ষের মানবতা-বোধকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেও পূর্ববঙ্গের বিপন্ন মানুষ ভারতবর্ষের সমবেদনায় যেমন অভিভূত হয়েছে তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব আরও কঠোর হয়ে পূর্ববাংলার স্বাধিকার-সচেতনতা বৃদ্ধি করে দুই বাংলার পারস্পরিক স্বজ্ঞতা ও একাত্মতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক দুর্যোগ তাই দুই বাংলার পারস্পরিক নৈকট্যের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে এবং পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনের পর এই নৈকট্যের আবেগ দুর্বার হয়ে উঠবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকারের পূর্ব বাংলার ওপর বজ্রমুষ্টি অনিবার্যভাবে শিথিল হয়ে পড়বে।

## নেতাজী তদন্ত কমিশন

বিচারপতি খোসলার সভাপতিত্বে নেতাজীর অন্তর্ধান-রহস্য তদন্তের জন্য এক-সদস্যবিশিষ্ট কমিশনের বৈঠক দিল্লীতে এক দফা এবং কলকাতায় দুই দফা সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৫৬ সালে সেদিনকার লোকসভার সদস্য শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের প্রচেষ্টায় শাহ নওয়াজ খাঁর সভাপতিত্বে যে তিন-সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠিত হয়েছিল তারা সিদ্ধান্তে ঐক্যমত ছিলনা। তাইহোকু বিমান ঘাঁটিতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর যে সিদ্ধান্তে উপরোক্ত কমিশন পৌঁছেছিল, সে সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন কমিশনের তৎকালীন অন্যতম সদস্য, নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষ্য ও তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তার অসঙ্গতিগুলি প্রবলভাবে শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু তুলে ধরা সত্ত্বেও, এবং সরেজমিনে তদন্ত না করেই কমিশনের অপর দুই সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত দেশবাসী কোনোদিনই মেনে নেয় নি এবং শেষ পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও এই তদন্তের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিয়েছেন।

এবারকার তদন্ত কমিশন গঠন সম্ভব হয়েছে বর্তমান লোকসভার সদস্য শ্রীসমর গুহের তিনবছরের ঐকান্তিক চেষ্টায়। এবার প্রকাশ্য তদন্ত হচ্ছে। আইনজ্ঞেরা সাক্ষীদের জেরা করছেন, যা শা নওয়াজ কমিশনের সময় করা হয় নাই এবং তদন্ত কমিশন প্রয়োজনবোধে সাক্ষ্য-সাবুদের জন্য বিদেশের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেও সরেজমিনে তদন্তের সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তদন্তের প্রকৃতি, পদ্ধতি, লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যারা তদন্তে সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন তাদের অস্পষ্ট কিম্বা ভুল ধারণা রয়েছে মনে হয়। তাইহোকু বিমান বন্দরে দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে কি হয় নাই এটাই কমিশনের আশু প্রতিপাদ্য। যদি এই দুর্ঘটনা না হয়ে থাকে এবং সেই কারণে শা নওয়াজ কমিশনের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়, তারপর কমিশনকে সম্ভব হলে স্থির করতে হবে যে ব্যাঙ্কক থেকে নেতাজীর গন্তব্যস্থল কি ছিল। তদন্ত কমিশনের পক্ষে আর কিছু উদ্ঘাটন করা সম্ভব কিনা তা নির্ভর করবে কমিশনের সামনে কি তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হয় তার উপর।

এ-পর্যন্ত যে সব সাক্ষী উপস্থিত হয়েছেন তাদের মধ্যে এক শ্রীসুরেশ বসুর সাক্ষ্যই তথ্য-নির্ভর বলা চলে। আর যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের বিবৃতির স্বপক্ষে তারা কোনো স্থির-তথ্য দাখিল করতে পারেন নাই। অনুমান, কল্পনা, শ্রুতকথা বলে তারা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে শ্রোতাদের পুলক সঞ্চার করতে সক্ষম হলেও কমিশনের সত্য-নির্ধারণের দিক থেকে তাদের বক্তব্য একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। ফলে কমিশনের কাজে এই ধরণের সাক্ষ্য অবাঞ্ছিত উত্তেজনার সৃষ্টি করে কমিশনকে প্রহসনে পরিণত করতে সহায়তা করেছেন। নেতাজী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা ও আবেগ সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে লক্ষ্য করা যায় এবং নেতাজী জীবিত আছেন, ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ বয়স-নির্বিশেষে এই ধারণা সযত্নে লালন করে চলেছেন এবং তারা চান সরকারী মহল এই ধারণাকে স্বীকৃতি দিন। কিন্তু ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে কঠিন ক্লেশ-স্বীকার করে তাকে তথ্য-ভিত্তিক রূপ দিতে হবে, সেই কঠোর সাধনায় বিমুখ থেকে কমিশনকে যদি হাততালির বক্তৃতা মঞ্চ করে তোলা হয়, তাতে কোনো কাজ হবে না। ফলে যে প্রবল জিজ্ঞাসা মানুষের মনকে উদ্বেল করে তোলে তা অমীমাংসিত থেকে যাবে এবং যারা এই রহস্য-উদ্ঘাটনের সম্ভাবনায় ভীত-ত্রস্ত তারা উল্লসিত হবেন। সুতরাং কমিশনের কাজের সঙ্গে তথ্য-নির্ভর নিষ্ঠার সহযোগিতা প্রয়োজন, রোমাঞ্চ সৃষ্টি সে পথে প্রবল অন্তরায়।

## আটক আইন

অনেক পরিমসির পর হিংসাত্মক কাজ দমনে পশ্চিম বঙ্গের জন্য রাষ্ট্রপতি আটক আইন চালু করেছেন। বর্তমান আইনে নক্সালপন্থীদের ও অন্যান্য উগ্রপন্থীদের এবং সমাজ-বিরোধীদের ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক কাজ দমনে ব্যর্থতার জন্য এই আইন চালু করা হয়েছে এবং এই সঙ্গে জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আর একটি আইনের খসড়া মঞ্জুর হয়েছে। এই আটক আইন পুরোনো নিবর্তনমূলক আইনের চাইতে কিছুটা বিভিন্ন। এই আইনে আটক রাখার উর্দ্ধতম সীমা একবছর, গ্রেপ্তারের বারদিনের মধ্যে রাজ্যসরকারকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানায় মঞ্জুরী দিতে হবে এবং গ্রেপ্তারের পাঁচদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক রাখার কারণ জানাতে হবে। আটক করার দশসপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত কিম্বা চাকুরীরত জজের সভাপতিত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ আটক ব্যক্তিদের কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিচার-বিবেচনা করে যে নির্দেশ দেবেন, রাজ্য সরকার তা চূড়ান্ত বলে মেনে নেবেন।

যুক্তফ্রন্টের দলগুলির কেউ নিষ্ক্রিয় থেকে, কেউ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনে ও দলপুষ্টির জন্য অবারিত হিংসার আশ্রয় নিয়ে পশ্চিম বাংলার বর্তমান অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। এদের মধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্তৃত্বে আসীন মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা সব চাইতে অগ্রণী ছিল। এরা নক্সালপন্থীদের ও অন্যান্য একহাজারটি ক্ষেত্রে খুন-জখমের মামলা প্রত্যাহার করে, সশস্ত্র আক্রমণে প্ররোচনা যুগিয়ে, পুলিশকে হেয় ও নিষ্ক্রিয় করে এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা বৃদ্ধি করে পশ্চিম বঙ্গে বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রপতির শাসনের পর সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়ে গত ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত ৩৪১টি খুন হয়েছে, তার মধ্যে রাজনৈতিক খুনের সংখ্যা ১৭২, পুলিশ বাহিনীর উপর ৫২৬টি আক্রমণে ৩৪০ জন জখম ও ৩৬ জন খুন হয়েছে। এ ছাড়া নভেম্বর মাসের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিহত হয়েছেন, অপর একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছেন; ১৩,৫১৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের মধ্যে মামলা দায়ের হয়েছে ১৮২৮ জনের বিরুদ্ধে এবং সাজা হয়েছে ১৭৫ জনের। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই জামিনে খালাস পেয়ে আরও তিন চারবার হিংসাত্মক কাজের সঙ্গে জড়িত হবার ফলে গ্রেপ্তার হয়ে এসেছে।

এ-ছাড়া স্কুল কলেজের উপর অব্যাহত হামলা, পরীক্ষা বন্ধের জন্য ভীতিপ্রদর্শন ও আক্রমণ, ছাত্র-হত্যা, শিক্ষিকার উপর আক্রমণ, ইত্যাদি নানা ধরণের অত্যাচার দমনে ব্যর্থতা আটক আইন অনিবার্য করে তুললেও হিংসাত্মক পরিস্থিতির জনক মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি সমেত যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য দলগুলি পুলিশী অত্যাচারের ধ্বনি তুলে এই আইনের বিরোধিতা করে বাংলাদেশের দুর্যোগের দিনগুলিকে বিলম্বিত করেছে। এরা একদিকে পুলিশী নির্যাতনের আওয়াজ তুলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে আবার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে স্ববিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বেলেঘাটার মার্ক্সবাদী শিক্ষিকার উপর আক্রমণের পর মার্ক্সবাদীদের এই দুমুখো নীতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সজাগ থাকা, প্রতিবাদ জ্ঞাপন এক, কথা আর পুলিশকে পঙ্গু করার জন্য পুলিশী অত্যাচারের রাজনৈতিক প্রচার স্পষ্টই অভিসন্ধিমূলক। বর্তমানে অনেক 'বিপ্লবী' নেতা পুলিশের পাহাড়ায় আত্মরক্ষা করে পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে নির্দ্বিধায় উচ্চকণ্ঠ হতে কোনো লজ্জা কিম্বা সঙ্কোচ বোধ করেন না। এরাই আবার পুলিশী অত্যাচার ও আটক আইনের

বিরুদ্ধে আগামী ৮ই ডিসেম্বর হরতাল ও ধর্মঘট ডেকে বাংলার জনজীবনকে বিপন্ন করছেন এবং বাংলার সঙ্কটজনক আর্থিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়ে পশ্চিম বাংলার সামগ্রিক সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এ-বিষয়ে ছয় পার্টি ও আট পার্টি জোটের ভূমিকায় কোনো প্রভেদ নেই। নির্বিচার খুনজখম, হামলা ও বোমা পিস্তলের অবারিত ব্যবহার পশ্চিম বাংলায় সন্ত্রাস সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষের মনোবল বিধ্বস্ত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক জীবন ধ্বংস করবার যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, বাংলাকে তা থেকে রক্ষা করতে হবে। আটক আইন প্রয়োগেই পশ্চিম বঙ্গ রক্ষা পাবে না, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আইনের প্রয়োগ একটি অনিবার্য পদক্ষেপ। তাই যারা পশ্চিম বঙ্গে সুস্থ সবল জীবনে ফিরে যেতে চান, যারা পশ্চিম বঙ্গকে সামরিক শাসনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চান না, তারা এই আইনকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সমর্থন করবেন। এই আইন যুক্তফ্রন্টের আমলে শাসনের নামে অরাজকতার ফলশ্রুতি। অবশ্যি এ-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে বাংলা কংগ্রেস সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে তাদের সাধ্যানুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের বিপদ প্রতিরোধে এগিয়ে গেছেন।

## বারাসতে যুব-হত্যা

গত ২০ শে নভেম্বর সকালে পিঠমোড়া অবস্থায় গুলিতে নিহত আটটি যুবকের মৃতদেহ বারাসতের রাস্তায় পাবার পর পশ্চিম বাংলায় গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই যুবকদের সকলকেই পুলিশ পলাতকরূপে চিহ্নিত করেছে। ঘটনায় যতটুকু বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় এই যুবকদের কোনোও নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হবার জন্য পূর্বরাত্রে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এই হত্যা কি ভাবে সংঘটিত হয়েছে, কারা এজন্য দায়ী তা নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অবসর-প্রাপ্ত অথবা কর্মরত একজন হাইকোর্টের জজের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন বসাবার ত্বরিত সিদ্ধান্ত করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। রাজ্যসরকারের পুলিশের সহযোগে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার জন্য সচেষ্ট হলেও, এদের সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ উদ্রেকের সুযোগ থেকে যাবে। এই হত্যার জন্য পুলিশ দায়ী, না নক্সালপন্থীরা দায়ী, না অন্য কোন দল দায়ী তা অবিলম্বে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এই হত্যাকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো দল তাদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশেষ প্রচারে নেমে গেছেন। এই হত্যা গভীরভাবে নিন্দনীয় এবং অপরাধীদের অবিলম্বে শাস্তিবিধান সরকারের আশু কর্তব্য।

## আচার্য সি, ভি, রমণ

গত ২১ শে নভেম্বর ৮২ বছর বয়সে বিজ্ঞানাচার্য সি, ভি, রমণ বাঙ্গালোরে রমণ ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গনে তাঁর বাসগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আচার্য রমণের লোকান্তরে পদার্থ বিজ্ঞানে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার এক গৌরবময় যুগে ছেদ পড়লো।

আচার্য রমণ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিভাগে কর্মরত অবস্থায় কলিকাতার বহুবাজারে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স গবেষণাগারে অবসর সময়ে গবেষণার জন্য যাতায়াতের কিছুদিনের মধ্যেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নজরে আসেন। স্যার আশুতোষ আচার্য রমণের প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁর গবেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেন এবং ১৯ ৯ সালে তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানে পালিত অধ্যাপকের পদে যোগ দিতে আহ্বান জানান। ১৯২৪ সালে আচার্য রমন রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। সে বছরই আচার্য রমণ কানাডার টোরোন্টো শহরে বৃটিশ

এসোসিয়েশনের এবং গণিতজ্ঞদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আহ্বানে আলোর বিচ্ছুরণ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। ১৯২৫ সালে ইউরোপ থেকে নানা বৈজ্ঞানিক সফরের পর প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজের ডেক থেকে সমুদ্রের জলের পরিবর্তনশীল বর্ণচ্ছটা দেখে বিস্মিত হন। কারণ সমুদ্রে আকাশের রং প্রতিফলিত হয়, প্রচলিত এই ধারণার সঙ্গে আচার্য রমণ তাঁর অভিজ্ঞতার কোনো মিল খুঁজে পেলেন না। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে আলোর বিচ্ছুরণ সম্পর্কে নূতন গবেষণায় ব্রতী করে এবং কয়েক বছর গবেষণার পর ১৯২৮ সালে আলোর আণবিক বিচ্ছুরণ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান। এই সিদ্ধান্ত 'রমণ বিচ্ছুরণ' ('Raman Effect) নামে বিশ্ববিশ্রুত হয়ে ১৯৩০ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারের অধিকারী করে।

আচার্য রমণ এই অদ্বিতীয় স্বীকৃতির পরও অবিরাম গবেষণা করে গেছেন। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এবং সারা জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষে পদার্থবিদ্যায় বহু গবেষক তৈরী করে গেছেন। আচার্য রমণের মত এক নিরাসক্ত, অনাড়ম্বর, জ্ঞানতপস্বীর লোকান্তরে শুধু ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-সাধনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানসাধনার এক ঋষিকল্প যুগের অবসান হোলো।

## লাইট রেলওয়ে

হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালার মার্টিন কোম্পানী পরিচালিত লাইট-রেলওয়ে আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে দুই রেলের ১৪০০ কর্মচারী বেকার হয়ে যাবে। এই দুইটি রেলে দৈনিক ৩০,০০০ যাত্রী যাতায়াত করে এবং হাওড়া ও হুগলীর গ্রামাঞ্চল থেকে মাছ, সব্জী এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কলকাতায় আমদানী হয়। গত ৩ বছর যাবৎ এই দুইটি রেল হাওড়া ও হুগলীর গ্রামাঞ্চলের উন্নতি বিধান করে এসেছে। কিন্তু কোম্পানীর গত কয়েক বছর যাবৎ মাসে ৬০,০০০ টাকা লোকসান হচ্ছিল এবং বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আয়ও হ্রাস পাচ্ছিল। এই রেল লাইন দুটি জাতীয়করণের দাবী দীর্ঘদিনের, এ-পর্যন্ত সরকার এই দাবী অগ্রাহ্য করে এসেছে। অথচ, এই অঞ্চলে রাস্তাঘাট এতো প্রশস্ত নয়, যে সরকারী এবং বেসরকারী বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাত্রীদের এবং পণ্য চলাচলের ব্যবস্থা অব্যাহত থেকে বেকার কর্মচারীদের কর্মসংস্থান করতে পারে। এই ব্যবস্থা সময়-সাপেক্ষ। সুতরাং অবিলম্বে সরকারের এই দুইটি লাইনের দায়িত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের আসন্ন সমস্যার নিরসন করা উচিত।

## কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শুক্রবার ৬ই নভেম্বর রাত্রে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়ে গত ৮ই নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সুখলাল কারনানি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিনাজপুরের কালিয়া ডিহিতে তাঁর জন্ম। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি আই এ. ও বি. এ. পাশ করেন। সেসময় ব্রজমোহন কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। ১৯৪১ সালে এম-এ পরীক্ষায় বাংলার প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪২ সালে জলপাইগুড়ি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালে এলেন সিটি কলেজে। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হলেন। পরে রীডার। 'সাহিত্যে ছোট গল্প' বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৬০ সালে ডি. ফিল পেলেন।

নারায়ণবাবুর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীর্তিঃ শিলালিপি, বৈতালিক, তিমিরতীর্থ, লালমাটি, পদসঞ্চার, অসিধারা, ভোগবতী, বনজ্যোৎস্না, কালাবদর, তৃতীয় নয়ন, তিন প্রহর, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, মেঘের উপর প্রাসাদ, নির্জন শিখর, কৃষ্ণচূড়া অমাবস্যার রাত্রি প্রভৃতি। নারায়ণবাবুর অকাল বিয়োগে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ৩০. ১১. ৭০

# হে ত্রস্ত নাবিক !

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

স্রোতস্বিন্যাস্তরীং তে নিপিপতিষু তটং ক্রুরনক্রাদিজুষ্টং
বাত্যাবিক্ষুব্ধরাত্র্যাং ভয়বিচলিতধীর্নাবিক ? ত্বং নিবীষুঃ।
ধ্বংসগ্রাসাদ্ বিপন্নং বিগতমতিধৃতিং ত্রাতুমাশ্বাসশঙ্খ
ধ্মাতং কিং বা শৃণোষি হ্যপরতটমঠাদীক্ষসেঽভীদদীপম্॥

মিশকালো রাতি
ভরা ভাদরের গাঙ্গে ক্ষেপাবায় করে মাতামাতি।
হাল-ভাঙ্গা, পাল ছেঁড়া তরীটি তোমার,
কোথা, কোন্ নিরাপদ্ ঠাঁই, ভিড়াইবে তাই
ভাবিতেছ হে তরী বাহক !
কাছাকাছি ঐ যে খাড়া-উঁচু তট,
যার নীচে অতলের বুকে মাতা ঢেউগুলো করে হাতাহাতি,
হিংস্র হাঙ্গর আছে ওৎ পাতি,
তারি পানে দাঁড় বাও তুমি, ভয়ত্রস্ত ব্যস্ত সমস্তের মতো,
কিন্তু ভেবেছ কি, চোরা ফাটলেতে সর্ব্বনাশা ঐ কূল ভেঙ্গে পড়া,
হে গরজী ঝঞ্ঝা ভয়ে পলাতক !
ও পারেতে ঐ সীমারেখা বুঝি দূর-বহুদূর,
তবু একটিবার ফিরে দেখ—যেথায় মন্দিরদীপ মৃত্যু হ'তে
ফিরাইতে দেয় স্নিগ্ধ আশ্বাসভরা হাতছানি।
এ পারেতে যেখানেই যতবার গেলে ভিড়াইতে তরী,
ভৈরব নিঠুর গর্জ্জনে সে তট ভাঙ্গিয়া পড়ে,
তোমা তলাইবারে !

তবু ছাড়িবেনা মারাত্মক ব্যর্থ এ প্রয়াস
তবু শুনিবেনা নিরন্তর ঝামেলা বধির ঐ দুটি কাণে,
মঙ্গল মধুর শঙ্খধ্বনি—ঐ যে ও পারের মন্দির দুয়ার হ'তে
নিত্য ধ্বসে-পড়া এ পারে আশ্রয় ভিখারী !
ও পারের ঐ অকম্প দীপরশ্মিলেখা
ঐ সৌম্যোদাত্ত শঙ্খধ্বনি রব
ঐ আরতির দূরাগত শুচিবাস—
ওরা কি অমর অভয় বারতা ব'য়ে আনে,—
ভালমতো তাই বুঝে, বুকভাঙ্গা এই সব দ্বন্দ্ব দূরে ফেলি,
নাজেহাল তরীখানি, ফিরাইয়া আজ,
অকুণ্ঠায় পাড়ি দাও, ঐ ও-পারের অমরার পানে,
যেথা তব চির-শরণ সহায় সুহৃৎ তার,
শুধু তোমা পাবা লাগি চির জেগে রওয়া !
চির-দরদী তল্লাস।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস

ধারাবাহিক রচনা

# বিস্ফোরণ

( ১৯১২ )

কালীচরণ ঘোষ

**সংক্ষিপ্তসার ঃ**

সোণারং ( ডাক পিয়ন )—পণ্ডিতচর—গোয়াড়িয়া—ডালহাউসী স্কোয়ার—সুরাই কর—লক্ষ্মণকাটি—চারুছাসা—সবারচর— সিনহেয়ার— কুলিয়াচর—বালিয়া গ্রাম —চৌপল্লী—পুলিশ ও গুপ্তচর হত্যা : সতীশ চক্রবর্তী—মনোমোহন দে—রাজকুমার রায়—রসুল দেওয়ান, আমেরি দেওয়ান, কালী বিনোদ—মনোমোহন ঘোষ—এ্যাস্ হত্যা—চারু ঘোষ ( জেলে মৃত্যু )—চূড়ান্ত আত্মত্যাগ ( নরেন্দ্র নারায়ণ )—মিলিত বাঙ্গলা।

ঘটনার ধারা লক্ষ্য করলে সহজেই মনে হয় বিপ্লবীরা এ সময় গুপ্তচর ও পুলিশ কর্মচারী হত্যার দিকে কিছু বেশী মনোযোগ দিয়েছে। অনেক সময় খুব বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়নি, কারণ পল্লী অঞ্চলে একজন কাকেও নিভৃত স্থানে ডেকে এনে খুন করলে আসামী ধরা বা সনাক্ত করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। ১৯১১ তে সাত জনকে হত্যা করা হয়েছে। মাত্র একটিতে আসামীকে নিয়ে টানাটানি হয়েছিল, সেটিও আবার হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পায়। দেখা যাচ্ছে, গভর্নমেণ্টের পক্ষে এতটা ক্ষতি সত্ত্বেও বিপ্লবীদল অটুট থেকে গেল। কিছুটা সাহসও সঞ্চিত হয়ে থাকবে।

লক্ষ্য করবার বিষয় মোট ১৬টি ঘটনার মধ্যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রত্যেকের অংশে মোট পাঁচটি করে পড়ে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অতি সামান্য ব্যাপার নিয়েও বিপ্লবীরা কতকটা যেন "হাত পাকাবার" জন্যে গোলমাল সৃষ্টি করেছে এবং টানাটানি, মামলা, দণ্ড ভোগ কপালে জুটেছে। তার একটি নমুনা পাওয়া যায় ঢাকা সোনারং স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদের দিয়ে।

পূর্ব বাঙলার বিপ্লব ঘটনায় সোনারং ন্যাশানাল স্কুলের নামের পরিচয় কিছু থেকে যাবে। পূর্ব বঙ্গের অনুশীলন দলের অবিসম্বাদিত নেতা পুলিন দাস ছিলেন এই স্কুলের শিক্ষক, ১৯০৮তে স্থাপিত ; পাঠ্য ছিল এণ্ট্রান্স পরীক্ষার মান। ছাত্র সংখ্যা ৬০/৭০ মাত্র ; শরীর চর্চা, লাঠি, ছোরা খেলা লোহার ও কাঠের কাজ শেখাবার ব্যাবস্থা ছিল। বাহাই শিক্ষকদের পরিবেশে ছাত্রদের মনে বেশ একটু বেপরোয়া ভাব গড়ে উঠেছিল।

পোষ্ট অফিসের পিয়ন ডাকবিলি করতে যাচ্ছে (১৯১১)

জানুয়ারী ২১-এ ; ছোট পোষ্ট অফিসের ডাক ; টাকাপয়সা পিয়নের কাছে বেশি থাকার কথা নয়। হঠাৎ কয়েকজন লোক তাকে মারপিট করে তহবিল ছিনিয়ে নেয়—হিসাবে দেখা গেল সর্বসাকুল্যে ৫৫ টাকা। পুলিশী তদন্তে বোঝা গেল আক্রমণকারীরা সোনারং স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র।

মোট চৌদ্দ জনকে আসামী করে জুন মাসে মহকুমা হাকিমের এজলাসে এক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হাকিম এক জনকে ছ'মাস এবং অতিরিক্ত ছ'মাস ( মোট আট মাস), চার জনকে চার মাস করে, ছ'জনকে ছ'মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেন এবং তিন জনকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজের কাছে আপীলে আট মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বহাল রেখে ছজনকে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড, চার জনকে পঁচিশ টাকা করে জরিমানা করে, চার জনকে মুক্তি দেন। আট মাস দণ্ডপ্রাপ্ত যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরে যৌলভী বাজারবোমা দুর্ঘটনায় নিহত হন; পরে সে কথা বলা হয়েছে।

যা টাকা লুঠ করা হয়েছিল তার বহুগুণ টাকা মামলায়, আমীনে এবং জরিমানায় খরচ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সামান্য হলেও, এ নিয়মে অর্থ সংগ্রহের পথটা যে অধিকাংশ সময় লাভের চেয়ে ক্ষতির ভাগ বেশী করেছে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই মামলার জের গড়িয়েছিল অনেকদূর। এতে সরকার পক্ষে সাক্ষী দেওয়া এবং তথ্যাদি সরবরাহ করতে গিয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে হয়েছে।

## পণ্ডিতচর ডাকাতি

লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ দিয়ে ডাকাতির গুরুত্বের একটা বিচার করাই সাধারণ নিয়ম। সে হিসেবে ফরিদপুর জেলা ও থানার পণ্ডিতচর গ্রামের চন্দ্রকুমার পালের বাড়ীতে ১৯১১ ফেব্রুয়ারী ৫-ইয়ের ডাকাতি নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। প্রাণে কেউ মরেনি, টাকা যায় সাড়ে পাঁচ হাজার।

## গোয়াড়িয়া ডাকাতি

সন্দেহ পড়েছিল সোনারং স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর। ঢাকার লোহাজঙ্গ থানার গোয়াড়িয়ার মোহিনী মোহন ব্যানার্জ্জির বাড়ী ( ১৯১১ ) ফেব্রুয়ারী ২০-এ জন পঁচিশ লোক ঢুকে লোক জনকে মারধোর করে নগদে অলঙ্কারে সাড়ে সাত হাজার টাকা নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়।

## ডালহাউসী স্কোয়ারে বোমা ( ১ম )

বাচ্চা ছেলে, কৈশোর ও কাটেনি মাত্র ১৬ বছর বয়স। সাহস সঞ্চয় করে পুলিশের বড় গোছের অফিসার ( ডেনহাম ) কে মারবার জন্য প্রায় দুপুরে ( ১৯১১ ) মার্চ ২-রা (৪-৪৫ মিঃ ) ডালহাউসি স্কোয়ার ( বিনয় বাদল দীনেশ বাগ ) বোমা ছুড়েছিল। বোমা সাহেবের ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে পড়ে কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তির পরমায়ুর জোরে বোমা ফাটেনি।

ছেলেটির নাম ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ডেনহাম সন্দেহে পি. ডব্লু. ডির কণ্ট্রাকটর মিঃ কাউলের গাড়ীতে বোমা ফেলে। আরোহীর পায়ের কাছে পড়ে। পরীক্ষায় দেখাযায় যে দুর্দ্দান্ত শক্তিশালী বোমা। অকুস্থানেই ননীগোপাল ধরা পড়ে।

মার্চ ৯ ই হাইকোর্ট স্পেশ্যাল সেসনে ননীগোপালের নামে মামলা ওঠে। অপরাধ মেনে লওয়ার ২৭-এ মার্চ তার ১৪ বছরের দ্বীপান্তর বাসের সাজা দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে চন্দননগর চুঁচুড়ার কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ননীগোপালের মুখ থেকে একটি কথাও আদায় করা যায়নি। সুতরাং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ক্রমে মুক্তি দেওয়া হয়।

কিশোর ননী গোপাল সেলুলার জেলে কর্তৃপক্ষের

অত্যাচারের বিরুদ্ধে অমানুষিক দৈহিক সহ্য শক্তি ও দুর্দ্দমনীয় মনোবল দেখিয়েছে।

### সুয়াইকর ডাকাতি

ময়মনসিংহের মদনগঞ্জ থানার অখ্যাত গ্রাম সুয়াইকর। ধনীলোকেদের বসবাস আছে বলে কোনো "দুর্নাম" ও নেই। কিন্তু (১৯১১) মার্চ ৩১-এ জন ১৫ সশস্ত্র যুবক নন্দনকুমার পালের বাড়ী থেকে ১২০০ টাকা লুঠ করে নিয়ে সরে পড়ে।

### লক্ষ্মণকাটি ডাকাতি

বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী থানা এলাকায় অবস্থিত এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম লক্ষ্মণকাটিতে কয়েকজন বিত্তশালী লোকের বাস। (১৯১১) এপ্রিল ২২-এ মধ্যরাত্রে প্রকাণ্ড একদল, সংখ্যায় ৩০ জনও হ'তে পারে, রাখালচন্দ্র ধুপীর বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর লোক বাধা দিতে চেষ্টা করে নিষ্ফল হয়। অলঙ্কার বাদে কিঞ্চিদধিক ১০,০০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়েছিল।

### চারহাসা ডাকাতি

অনুমান ২৫।৩০ জন লোক ময়মনসিংহের কোতোয়ালী থানার চারহাসা গ্রামের তরীপ সেখের বাড়ী মধ্যরাতে আক্রমণ করে ও কিঞ্চিদধিক দু হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়।

### সরারচর ডাকাতি

গ্রামটির নাম সরারচর, বাজিতপুর থানা, ময়মনসিংহ; সেখানে জন দশেক সশস্ত্র যুবক (১৯১১) জুলাই ২৭-এ ভগবান চন্দ্র ভূঁইয়ার বাড়ী আক্রমণ করে।

এ সম্পর্কে জিতেন্দ্রকান্ত লাহিড়ীকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হয়। ডাকাতির অভিযোগে আসামীকে (১৯১১) সেপ্টেম্বর ২৩-এ পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

### সিনহেয়ার ডাকাতি

সিনহেয়ার (ঢাকা মাণিকগঞ্জ থানা) গ্রামের গায়ে প্রায় বিশটি যুবক সহ (১৯১১) সেপ্টেম্বর ৫-ই রাত্রি ৭টা ও ৮টার মধ্যে একটা নৌকা এসে লাগল। পূর্ব্বকল্পনা মত তারা দুটো দলে ভাগ হয়ে পড়ে। একটা দল চললো পোষ্ট অফিসের দিকে আর একটা দল যুধিষ্ঠির মণ্ডল আর বলাই মাড়োয়ারীর গদির দিকে রওনা হয়ে যায়। হৈ চৈ একটা উঠ্‌লো, কিন্তু পোষ্ট অফিস থেকে প্রায় ৪০০ টাকা আর দুই গদি থেকে ৭,৫০০ টাকা সংগ্রহ করে ডাকাতরা চলে যায়।

### কুলিয়াচর ডাকাতি

এবার ময়মনসিংহ বাজিতপুর থানার কুলিয়াচর বাজার হ'ল লক্ষ্যস্থল। মস্তবড় দল, ডাকাত সংখ্যা ৩৫ বা ৪০ জন হবে। ১৯১১ অক্টোবর ৩-রা একেবারে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। পোষ্ট অফিস, পাট বিক্রয় কেন্দ্র, দু'জন সাহাদের গদি সবই একই সময় আক্রান্ত হয়। তোড় জোড় যতটা সে হিসাবে লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ নিতান্ত কম, অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক তিন হাজার টাকা;

### বালিয়াগ্রাম ডাকাতি

ধনের অপবাদে রংপুর কুড়িগ্রাম থানার যদ্ধি ব্যাপারীর বাড়ী আক্রান্ত হয় ১৯১১ নভেম্বর ৬-ই-রাত্রি দু'টায়। গহনা শ' দুই টাকা, আর নগদে হাজার খানেক টাকা খোয়া যায়।

### চৌপল্লী ডাকাতি

বিত্ত যেমন ছিল, তেমনি তাকে লুকিয়ে রাখবার বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল নোয়াখালির চৌপল্লী থানা ও গ্রামের শ্যামাকান্ত

আইচের। জন পঁচিশ যুবক ১৯১১ ডিসেম্বর ৩১-এ বাড়ী চড়াও হয় রাত্রিকালে। বহুতর ভীতিপ্রদর্শন ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও সে বাড়ী থেকে শ'দুই টাকার বেশী সংগ্রহ করা যায়নি।

ত্রিপুরা গ্রাম ও থানা বড়কান্তার একটা ডাকাতি হয় এবং শ' দুই টাকা লুঠ হয়। পুলিশ একে রাজনৈতিক ঘটনা বলে।

## পুলিশ ও গুপ্তচর হত্যা

কিছু অস্ত্র শস্ত্র সঞ্চিত হয়েছে, মনেও সাহস গজিয়েছে এবং তার ফল স্বরূপ সাতটি পুলিশ ও গুপ্তচর সন্দেহভাজন লোক নিহত হয়েছে।

## শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৯১১ ফেব্রুয়ারী ২-রা। কলকাতার সিকদার বাগান লেনে গোয়েন্দা বিভাগের শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আবাসস্থল। পৌনে ৮টা নাগাদ শ্রীশ এক বন্ধুর সাথে বাসায় আসছে, এমন সময় খুব কাছে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে একজন গুলি ছোড়ে। বুলেট তার লিভারের কাছে প্রবেশ করে। শক্তিমান পুরুষ গুরুতর আহত হয়েও সে বেশ খানিকটা দূরে কাকার ডাক্তারখানায় পৌঁছায়। তখনই তাকে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে শ্রীশ ইহলোক ত্যাগ করে।

## মনোমোহন দে

ঢাকার মনোমোহন দে পাইকারী দরে পুলিশের পক্ষে সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা ষড়যন্ত্র আর মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলায় সে বড় সাক্ষী। এপ্রিল ১০-ই রাত্রি ১১টার সময় সময় মনোমোহন বাড়ীতে (রাউতভোগ, ঢাকা) আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। বাইরে থেকে তার নাম ধরে কে ডাকছে; মনোমোহনের মনে সন্দেহ ও ভয় জন্মেছে, ফলে দরজা বন্ধ করে সে বাড়ীর মধ্যে বসে রইল। তখন আগন্তুকরা কুড়ুল দিয়ে দরজা ভেঙ্গে জোর করে তার ঘরে ঢোকে এবং বিছানা মধ্যেই তাকে রিভলভার থেকে তিনবার গুলি করে। একটা বুলেট তার বুকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়।

## রাজকুমার রায়

ময়মনসিংহের গোয়েন্দা বিভাগের সাব ইন্সপেক্টর রাজকুমার রায় (১৯১১) জুন ১৯ সন্ধ্যার পর একজন সঙ্গীর সঙ্গে এসে থানার সামনে নিজ বাসায় ঢুকতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ পিছন থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। সাক্ষী (কোর্ট ইন্সপেক্টর) দেখতে পেলেন একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

## রসুল দেওয়ান, আমেরি দেওয়ান ও কালী বিনোদ

সোনারং স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলার সাক্ষী ছিল। দফাদার রসুল দেওয়ান আর আমেরি দেওয়ান। ১৯১১ জুলাই ১১-ই আঁধার নেমে এলে একজন লোক এসে রসুলকে বাইরে ডাকে এবং আসার সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনটে গুলি মারে। রসুল চীৎকার করে বলে যে কে মেরেছে সেটা সে দেখছে এবং দরকার হলে সনাক্ত করে দিতে পারে। তখন আততায়ী ফিরে এসে আরও তিন চার বার গুলি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে রসুলের মৃত্যু ঘটে।

এ একই রাত্রি এবং অনুরূপ উপায়ে বাড়ী থেকে ডেকে দরজায় এনে দফাদার আমেরি দেওয়ান আর সরকারী পক্ষের পাইকারী সাক্ষী কালীবিনোদ চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয়। আমেরি গুলি দ্বারা আহত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

কালীবিনোদকে ছোরা দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করা

হয়। চার দিন হাঁসপাতালে যন্ত্রণা ভোগের পর জুলাই ১৫ই মারা যায়।

### মনোমোহন ঘোষ

বরিশাল পহরের উপর পুলিশ ইন্সপেক্টর মনোমোহন ঘোষকে (১৯১১) ডিসেম্বর ১১-ই গুলি করে হত্যা করা হয়। কেবল এই কাজের জন্য ঢাকা থেকে হত্যাকারীরা এসেছিল এবং কার্যসিদ্ধি হলে স্বস্থানে প্রস্থান করে।

## বাঙলার বাইরে

### এ্যাস হত্যা

শান্ত শিষ্ট মাদ্রাজ স্রোতের বাইরে থাকতে পারেনি। ১৮৯৭ তে মহারাষ্ট্র সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে; ১৯০৯ তে পুনরাবৃত্তি। বাঙলায় ঘটে গেল ১৯০৮ তে, যদিও আন্দোলনের অশান্তভঙ্গি আগে থেকেই প্রকট হয়েছে। মাদ্রাজে একটু বিলম্ব হয়েছে, আর একটাই হয়েছে। পাঞ্জাব বাঙলা তোলপাড় হয়ে গেল, উত্তর প্রদেশ খানিকটা দোলা খেলো, বিহারে বাঙলার প্রভাব. বায়ু হিল্লোলে জলের মন্দমধুর তরঙ্গ দেখা গিয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলের কথা আলোচনার স্থান এটা নয়।

১৯১০ এ টিউটিকোরিণ (তুতিকরিণ) এ যুবকদের মধ্যে দেশের দুর্দশা নিরাকরণের পথ ভাবতে ভাবতে ভারত মাতা এসোসিয়েসন সংস্থা গড়ে ওঠে। টেনকাসি, সেনকোট্টা পুলানুর প্রভৃতি স্থানে স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেরই মধ্যে ভাব বিনিময়ের ফলে টিন্নেভেলির (টিরুনেলভেলি) কালেক্টর উইলিয়াম এ্যাসকে হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গুপ্ত সমিতির যুক্তি যে এ্যাস-স্বদেশী জাহাজ কোম্পানীকে দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়ে ধ্বংস করেছেন আর জাতীয়তাবাদী নেতাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড দিয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছেন।

যেমন মতলব তেমন কাজ। তোড়জোড় সব পূর্ণাঙ্গ করা হলো। এ্যাসের বদলির হুকুম মাত্র এসেছে। তিনি তিরুনেলভেলি থেকে মনিয়াচ্চি জংশন ষ্টেশনে গাড়ী বদল করবার জন্যে সস্ত্রীক অপেক্ষা করছেন। তাঁর গন্তব্যস্থানে যাবার গাড়ী এসে দাঁড়ালে তিনি পূর্বের গাড়ী থেকে নেমে সদ্য আগত গাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন। এমন সময় কামরার মধ্যেই গুলি এসে তাঁর বাঁদিকে কণ্ঠার হাড়ের নীচেই বুকের মধ্যে প্রবেশ করে। হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত হলেও তাঁর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আততায়ীকে তাড়া করে চলে প্ল্যাটফর্মের লোকেরা, নিকটে যেতে কারও সাহস হয়নি। অবশেষে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে এসে এক শৌচাগারে প্রবেশ করে আততায়ী আত্মহত্যা করে। অপর কয়েকজনকে ধরে বিচার চলে সকলেরই হ্রস্ব দীর্ঘ কারাবাস ঘটে।

## অপমৃত্যু

### চারু ঘোষ

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয়েছিল বেশ কতকগুলি লোককে আইনের নামে কয়েদী করে রাখার জন্য। হাইকোর্ট বাদ সেধেছিল, পুলিশ ষড়যন্ত্র প্রমাণ করতে পারেনি। সুতরাং প্রায় সবাই ফস্কে গিয়েছিল।

এই মামলা সম্পর্কে চারুচন্দ্র ঘোষকে ১৯১০ মার্চ ২৪-এ গ্রেপ্তার করা হয়। তখন চারু অত্যন্ত অসুস্থ। স্বাস্থ্যের দুরবস্থার জন্য জামীনে তাঁর মুক্তির জন্য ব্যর্থ আপীল করা হয়। মরণাপন্ন অবস্থায় ১৯১১ জানুয়ারী ৪-ঠা পর্য্যন্ত তাঁকে নিত্য আদালতে হাজির থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের রায়ে মামলার দিন হাজির হওয়ার যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পান।

এ অবস্থা যখন চলছে তখন চারুর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয় এবং জামীনে মুক্তির জন্য আবার দরখাস্ত

করা হয়। রায় প্রকাশিত হবার আগেই ১৯১১ এপ্রিল ১৮-ই চারুচন্দ্র ইহধাম পরিত্যাগ ক'রে গভর্ণমেণ্টকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দেন।

## চূড়ান্ত আত্মত্যাগ

বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনের নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীদের মধ্যে বহু সুসন্তানের পরিচয় পাওয়া গেছে। যেখানে সহকর্ম্মীর জন্য অকাতরে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে দধীচির কীর্তিকেও ম্লান করে দিয়েছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। তবে পার্থক্য একটু আছে। দধীচির দান শিক্ষিত এমন কি দূর পল্লীর অশিক্ষিতের কাছে অপরিজ্ঞাত নয়, দেবতারা জানতেন এবং তার প্রচার করতে কৃপণতা করেননি। আর এ ক্ষেত্রে তার কোনো পরিচয়ই কারও জন্য রেখে যাওয়া হয়নি। যদি কেউ সাক্ষী থেকে থাকেন, প্রকাশ হলে নানা বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনায় অতি মহান্ আত্মত্যাগের কাহিনীকেও সম্পূর্ণরূপে গোপন করে রেখে যেতে হয়েছে।

দলপুষ্ট করবার জন্য বা কোনও নবীন আগন্তুকের আগ্রহাতিশয্যে তাকে দলে ভর্ত্তি করতে হতো এবং যথাকালে উপযুক্ত বিবেচিত হলে দলীয় কার্যে নিয়োগ করাই ছিল রীতি। ১৯১১ সালে এক যুবককে বৈপ্লবিক কাজে শিক্ষা-নবিশী করবার জন্য পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামের নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী আর শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায় এক নবীন যুবককে সঙ্গে করে চলেছেন লক্ষ্যস্থানের দিকে। পথ পড়েছে জঙ্গলাকীর্ণ ভাদরা গ্রামের মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যা সবে মাত্র পার হ'য়ে গেছে। বেশ খানিকটা যাবার পর দেখা গেল পথের পাশের ঝোপ থেকে এক বাঘ লাফ দিয়ে যুবকের ওপর পড়বার জন্য প্রস্তুত। নরেন্দ্র সেটা লক্ষ্য করেছেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। বাঘ লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমিষে তিনি দুপক্ষের মাঝ-খানে পড়ে যুবককে ধাক্কা মেরে ফেলে ছিলেন আর বাঘ তাঁর ওপরে পড়লো; যুবক রক্ষা পেয়ে গেল। বাঘের সঙ্গে নরেন ও অবিনাশের অসম সংগ্রাম বেঁধে গেল। গোড়াতেই নরেন্দ্র মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হওয়ায় সেই স্থানেই দেহত্যাগ করলেন। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়ের পিঠে বাঘের থাবার দুই প্রকাণ্ড ক্ষতচিহ্ন পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে আজও বর্ত্তমান।

বাঘ তার শিকার ফেলে প্রস্থান করলে পর নরেনের মৃত দেহ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। জঙ্গলের মধ্যে কোনও রকমে একটা কবর খুঁড়ে তার মধ্যে ফেলে অবিনাশ ও যুবক প্রস্থান করলেন। প্রচার করে দিতে হ'লো যে নরেন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন।

## মিলিত বাঙলা

বাঙলা-বিভাগ নিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, শেষটা দাঁড়ালো বিদেশী শাসনের সর্ব্বক্ষেত্রের প্রতি বিদ্বেষ। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পেরেছিল যে পার্টিশন রদ না-হ'লে বাঙলা অশান্তই থাকবে এবং ঝামেলা বেড়েই চলবে। সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটু তোষণের পথ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কাল তখন সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে হিসাবে ভাল মনেই বা চাপে পড়েই হ'ক সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড ১৯১০ মে ৬-ই দেহত্যাগ করলে তস্য পুত্র পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাট হয়ে বসলেন। মৃত সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিতে ভারতের শোকজ্ঞাপন ও নূতন সম্রাটের সিংহাসন অধিরোহণ উৎসবে যোগদান করে বড়লাট হার্ডিঞ্জ ১৯১০ নভেম্বর ১৮-ই ভারতে পদার্পণের পর সুসংবাদ দেন যে ভারতের শাসন সংস্কারের কিছুটা আসন্ন। পরেই সম্রাট ১৯১১ ফেব্রুয়ারী ৬-ই লাটের উক্তির সমর্থন জ্ঞাপন করেন। আগষ্ট ২৩-এ ভাঙা বাঙালা জোড়া লাগার সম্ভাবনার সংবাদ ভারতে পৌঁছাব। পরেই মার্চ ২৬-এ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভারতে উপস্থিত থেকে ১৯১১ ডিসেম্বর

১২-ই দরবার অনুষ্ঠিত হবে বলে সংবাদটা সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়। সম্রাট লণ্ডন থেকে রহনা হন নভেম্বর ১১-ই এবং বোম্বাইতে অবতরণ করেন ডিসেম্বর ২-রা।

সাড়ম্বরে দরবার অনুষ্ঠিত হল। দ্বিধা বিভক্ত বাংলা জুড়ে দিয়ে এক "প্রেসিডেন্সী" তে পরিণত করা হয় এবং বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসামকে কে কেটে নিয়ে যথাক্রমে এক জন ছোট লাট (লেফ্‌টাণ্ট গভর্ণর) ও এক জন চীফ কমিশানারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

একে মডারেটদল এক বিরাট জয় বলে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন বিশেষ স্তিমিত হল না।


## খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

| | |
|---|---|
| শ্রীগীতা | ৭·৫০ |
| শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম | ৭·০০ |
| ভারত-আত্মার বাণী | ৫·০০ |
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১·৫০ |
| কর্মবাণী | ১·২৫ |
| Soul of India Speaks | 5·00 |

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসাগর | ২·২৫ |
| মানুষের মত মানুষ | ·৭৫ |
| শিশু রামায়ণ | ·৬২ |
| শিশু মহাভারত | ·৭৫ |

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

| | |
|---|---|
| বাংলার ঋষি | ৩·০০ |
| বাংলার মনীষী | ১·৩০ |
| বাংলার বিদুষী | ২·০০ |
| বীরত্বে বাঙালা | ১·৫০ |
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২·০০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালা | ৪·০০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১·৫০ |
| রবীন্দ্রনাথ | ১·২৫ |
| যুগাচার্য বিবেকানন্দ | ১·৫০ |
| আচার্য জগদীশচন্দ্র | ২·৫০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১·৫০ |

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

হিংসা চাইনা

"অনুকরণে ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না। পরিবর্তন আনতে হলে স্বকীয় উদ্যমে আস্থাশীল হতে হবে। হিংসা বা অরাজকতায় পরিবর্তন আসে না, আসে শৃঙ্খলায়, সৌহার্দ্যে আর সুস্থ পরিবেশে।"

—ইন্দিরা গান্ধী

# তরুণের স্বপ্ন

## ( ১৯২৮ )

রবি রায়

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকাশিত হয়। ১৯২১-২৭ এই ছ' বছরে সুভাষচন্দ্রের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে 'তরুণের স্বপ্ন' রচিত হয়। 'তরুণের স্বপ্ন' ধারাবাহিক রচনা অথবা প্রবন্ধগুচ্ছের সংকলন নয়, ছাত্র জীবনে অসাধারণ কৃতি এক তরুণ আই. সি. এস, অফিসারের জীবনচর্যার নব রূপায়ন, তরুণ, প্রিয়দর্শন সুভাষ, জীবনের সব সুখ আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়ে লাঞ্ছিতা ভারতমাতার মুক্তির সঙ্কল্পে নিজেকে দেশমাতার চরণতলে উৎসর্গ করার ইতিবৃত্তে এই গ্রন্থের উপাদান। তেরোখানি মূল্যবান পত্র ও তিনটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষা থেকে আরম্ভ করে এই আত্মত্যাগী পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম সাধনার পরিকল্পনা ও জীবনের একমাত্র স্বপ্নের প্রতিফলন আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রন্থের আরম্ভ হয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লেখা একখানা চিঠি দিয়ে, ১৯২১ সনে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতের রাজনীতিতে অপরিচিত যুবক সুভাষচন্দ্র সুদূর ইউরোপ থেকে তদানীন্তন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা দেশবন্ধুর কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে প্রথম চিঠিতে জানালেন তার ইচ্ছা, দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে চাইলেন দেশমাতৃকার সেবা করার অধিকার। সুভাষচন্দ্র তখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Moral Science Tripos পরীক্ষার্থী। ইতিপূর্বে ( ১৯২০, আগষ্ট ) তিনি আই. সি. এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র এই চিঠিতে যেমন নিজের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে দেশবন্ধুর কাছে তুলে ধরেছিলেন, দেশসেবায় তাঁর ভূমিকা কি হবে তা দেশবন্ধুকে স্থির করে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেও নিজের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশে কংগ্রেসের মাধ্যমে তিনি দেশের কাজ করতে চান। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের যে তরঙ্গমালা সারা দেশের জনসাধারণের হৃদয়কে মথিত করে তুলেছে, তার স্পন্দন স্বদেশ থেকে বহুদূরে ইউরোপের মৃত্তিকায় বসবাসকারী ভারতীয় তরুণ-চিত্ত অনুভব করে উতলা হয়। সুভাষচন্দ্র চিঠিতে দেশবন্ধুকে জানালেন এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে অক্সফোর্ডের এক তরুণ মাদ্রাজী তার এখানকার পড়াশুনা স্থগিত রেখে দেশে ফিরে গিয়েছে সম্পূর্ণভাবে দেশমাতার সেবার জন্য। কেম্ব্রিজ থেকে তিনিও ফিরে যেতে প্রস্তুত, দেশমাতার মুক্তি-সংগ্রামে আই. সি. এস এর গোলামী ছুঁড়ে ফেলে দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প—"মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর"। দেশে ফিরে এসে 'জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবরের কাগজ প্রণয়ন এবং প্রকাশ, গ্রাম্য-সমিতি

স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ইত্যাদি' কাজের দ্বারা নতুন জীবনে প্রবেশে অভিলাষী, ঐ পত্রের মধ্যে তিনি কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে বহু ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করে বহু প্রস্তাব সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর প্রস্তাবগুলির মধ্যে Indian Currency & Exchange সম্বন্ধে কংগ্রেসের স্বচ্ছ নীতি নির্ধারণ, দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে তার (কংগ্রেসের) আচরণ, পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার সম্বন্ধে কি অভিমত, অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের উন্নতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত, এর জন্য অনতিবিলম্বে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একটি বাড়ীর প্রয়োজন। কংগ্রেসের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ গুলি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রয়োজন কিছু স্থায়ী কর্মী, এই কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করবেন। বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করবেন। পরে কংগ্রেসের অধিবেশনে এইগুলি আলোচনা হবে এবং একটি সঠিক নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

মনে রাখতে হবে সুভাষচন্দ্র এই চিঠি লেখার সময় ভারতের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন সংশ্রব তাঁর নেই, দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। ছাত্র জীবন তখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি। তথাপি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও কংগ্রেসের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন, দেশের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও অকপট ভালবাসা তাঁকে দেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। তাই স্বদেশ সেবার সঙ্কল্প জানিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লেখা এই চিঠিতে একজন দেশপ্রেমিক যুবকের ভাবাবেগের প্রাবল্য দেখি না, চব্বিশ বছর বয়সের এক স্বর্ণ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত দেশ-নায়কের প্রগাঢ় রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় পেয়ে অবাক হই।

দেশবন্ধুর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে ২রা মার্চ, ১৯২১ সনে কেম্ব্রিজ থেকে পুনরায় এক চিঠি পাঠান। প্রকৃতপক্ষে এই চিঠি প্রথম চিঠির পুনরাবৃত্তি। দেশের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী সুভাষ আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। এই চিঠিতে আই. সি. এস এর পদ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, প্রথম চিঠির ন্যায় এখানেও সুভাষচন্দ্র দেশের কাজে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। অবশ্য এইগুলির মধ্যে বিশেষ নতুনত্ব ছিল না, আর সেইজন্যই সুভাষচন্দ্রকে নিশ্চিত লক্ষ্য পথানুসারী এক দৃঢ় প্রত্যয় যুক্ত মহানায়ক রূপে চিহ্নিত করতে মনে দ্বিধা জাগে না।

দেশের যুবসম্প্রদায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাযজ্ঞে ঋত্বিক হতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'তরুণের স্বপ্ন' প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। এই প্রবন্ধটির নামানুসারে মূল গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে, যদিও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি লেখার মধ্যে রয়েছে তরুণ প্রাণের স্বপ্ন ও সাধনার অভিব্যক্তি। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছেন, উচুপদের সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করে দেশসেবার মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন আর্থিক দারিদ্র্য তাঁকে মহান করে তুলেছে—হৃদয়কে করেছে ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত, স্বদেশকে ভালবাসার অপরাধে—রাজনৈতিক কারণে প্রথম কারাবাসের অভিজ্ঞতা (১০-১২-২১) সঞ্চয় করেছেন, জেল থেকে ছাড়া পাবার (সেপ্টেম্বর, ১৯২২) করেক মাস পরেই ১৯২৩ সনে এই প্রবন্ধটি লেখেন। ছাব্বিশ বৎসরের যুবক সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন—অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন যৌবন সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের কাছে মুক্তির পথ খুলে দিয়েছে নিজের বুকের রক্তের তর্পণে, যৌবনের ডাকে-গতানুগতিকতাকে ভাঙ্গার আহ্বানে অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণের সম্মতি থাকেনা, নবীন—সৃষ্টি ছাড়া পাগল, যৌবন লাভ করেন প্রাজ্ঞের আশীর্বাদ, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা. সুভাষচন্দ্রের কথায়. 'অতৃপ্ত আকাঙ্খার

উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমেপড়ি আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাদপদ হই না। আমাদের তাণ্ডব লীলার অন্ত নাই, কারণ—আমরা অবিরাম গতি' সত্যান্বেষণ যৌবনের ধর্ম, স্বাধীনতা তার জীবন, তাই জীবনকে রক্ষা করার জন্ত—ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্ত যৌবন যুগে যুগে রক্ত ঢেলেছে,—'মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবন ধারণই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতার জন্ত আমরা যুগে যুগে হাসিতে হাসিতে রক্ত দান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্ত আসিয়াছি, কি সমাজনীতি কি ধর্মনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।' তরুণের এই মহৎ স্বপ্ন কখনোই ধরার ধূলায় হারিয়ে যেতে পারেনা, বিশেষ করে কোন দেশে জরা যখন আবির্ভূত হয়, কোন জাতির ললাটে বার্ধক্য যখন রেখা এঁকে দিতে উদ্যত যৌবন তখন তা প্রতিরোধ করার জন্ত ফুঁসে ওঠে, ভারতের তরুণ সম্প্রদায় আজ তাদের যৌবনের উত্তাপে পরাধীনতার আবর্জনাকে পুড়িয়ে দিক, নতুন প্রভাতের সোনালী আলোয় ভারতের মৃত্তিকা ভরে উঠুক—এই আকাঙ্খা আলোচ্য প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।

এর পরের প্রবন্ধটি নানা দিকথেকে উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশ থেকে বহুদূর—সুদূর বর্মার মান্দালয় জেলে তিনি বন্দী, পরিচয়ের মাত্র চারবছরের মধ্যে এইবছরই (১৯২৫) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাপ্রয়াণ করেছেন। গুরু নেই, কিন্তু তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে হয়ে। যোগ্যতম শিষ্য সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশের তরুণদের উদ্দেশ্যে 'দেশের ডাক' দিলেন মান্দালয় জেল থেকে। 'দেশের ডাক' (ডিসেম্বর, ১৯২৫) মূলত দেশের মুক্তি যজ্ঞে বাঙালী তরুণদের আত্মদানের উদ্দেশ্যে তরুণ নেতার উদাত্ত আহ্বান,—

'বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্ত প্রস্তুত আছ, এসো, মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারা যন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্ত নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত জীবিত থাক, তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি স্বদেশ সেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহলীলা সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর পর স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে।'

'দেশের ডাকে'র মধ্যে সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তি আন্দোলনে বাংলাদেশের তথা বাঙালীর দায়িত্ব অপরিসীম বলে উল্লেখ করেছেন, এই মুক্তি-সংগ্রামে বাঙালীকেই অগ্রণী হতে হবে। ভারতের ইতিহাসের সব থেকে কলঙ্কময় অধ্যায় খুললে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চদশকের শেষের দিকে (১৭৫৭) বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় নয় হলেও কতিপয় বাংলার অধিবাসীর চরম বিশ্বাসঘাতকতায় বণিক ইংরেজ ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠা করেছিল রাজশক্তি। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য বাঙালীর সেই আত্মঘাতী কাজ—দেখে গভীর লজ্জায় ও বিপুল গ্লানিতে ভাগীরথীর—সকল দুঃখ তাপ হরণকারিণী গঙ্গার জলে অন্তর্হিত হয়েছে। সুতরাং পূর্বপুরুষের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুকের রক্ত দিয়ে উত্তরপুরুষকেই করতে হবে—'বাঙলার নর-নারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'দেশের ডাক' প্রবন্ধে ভারতের অতীত ইতিহাসের কাহিনী যেমন উপস্থাপিত করা হয়েছে, তেমনি বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বাংলার বিশিষ্টতাকেও সুন্দরভাবে

তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর নবভারত নির্মাণে বাঙালীকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। বৈচিত্রময়ী ভারতের মধ্যে সঠিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব—'জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (cultural synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙালীর আছে'। পৃথিবীর দিকে দিকে যখন পরাধীনতার গ্লানি থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য যুব-শক্তি সর্বস্বপণ করে লড়াই করছে, যখন দূর দূরান্ত থেকে স্বাধীনতার মঙ্গল শঙ্খ শোনা যাচ্ছে ভারত কি তখন অন্ধকারে থাকতে পারে? বাঙলার তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি তাই তাঁর ডাক—দেশের ডাক—'ওগো বাঙলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি।...তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চলবে না।...ভারতের নব জাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের "রাখি" পরিধান করে মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্বা ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।'

'গোড়ার কথা' প্রবন্ধের মধ্যে ভারতবর্ষের বাণী সুভাষচন্দ্র শুনিয়েছেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে নিজেকে এইভাবে বিলিয়ে দেবার প্রেরণা কোথা থেকে আসে 'গোড়ার কথা'র মধ্যে তার উত্তর মিলবে। জাতি হিসাবে ভারতবাসীর বিশ্বের কাছে দেবার মত কি আছে তার জবাবও 'গোড়ার কথা' প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

সৃজনী শক্তি জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে, ব্যক্তি-মানুষ যেমন জীবন-নাট্যের চার পর্ব অতিক্রম করে (শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্ধক্য) মৃত্যু মুখে পতিত হয়, জাতির জীবনও ঠিক সেই খাতে প্রবাহিত হয়। তবে ব্যক্তি-মানুষ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য এই যে মৃত্যুতে মানুষের দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেলেও জীবাত্মা কখনো মরে না। কিন্তু কোন জাতি যদি তার সৃজনী শক্তি হারিয়ে ফেলে, যদি তার শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতাকে ভুলতে বসে তাহলে বুঝতে হবে সেই জাতি মরতে বসেছে, তার পুনর্জীবনের কোন আশা নেই। ভারতের ভাগ্যদেবতা জাতির ললাটে দুর্ভাগ্যের মসীরেখা এঁকে দিলেও, এক গভীর অন্ধকার আমাদের বর্তমান জীবনকে দিশেহারা করলেও আমরা মরতে পারি না। কাল রাত্রির এই অমানিশা কেটে গিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে। সেই মহৎ ভবিষ্যৎ এর জন্য—নূতন ভারত সৃষ্টির জন্য আমাদের কঠোর সাধনা করতে হবে। এই 'নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। নিঃশেষে জীবনদান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা এরূপ সাধক হবে তাদের সম্পদ থাকবে কেবল অন্তরের আত্মবিশ্বাস, আদর্শানু-রাগ ও আনন্দ।'

শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। কিন্তু সেই সময়ে (১৯২৫-২৬) নেতৃত্বের মোহ ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বাঙলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজেদের মধ্যে এই লড়াইএর ফলে আমরা ক্রমশ দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ছি অনুভব করে সুভাষচন্দ্র জাতির কাছে—বিশেষ করে বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে দেশ সেবার 'গোড়ার কথা' নিবেদন করলেন। তিনি বললেন, 'অন্তরের শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর হতে পারে না। তাই অবিশ্বাসরূপ গৃহশত্রুকে সর্বাগ্রে জয় করতে হবে, তাহলেই বাইরের শত্রুকে আমরা জয় করতে পারব। আজ বাঙালীকে আবার দুর্জয় আত্মবিশ্বাস লাভ করতে হবে। আদর্শে বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস—এই

বিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের বিশ্ববিজয়ী হতে হবে।'

সুভাষচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন তরুণ বাঙলা তার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে। দেশের এই দুঃসময়ে নবীন জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে অগ্রসর হবে। দিকে দিকে তিনি তরুণের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। বাঙলা দেশের নওজোয়ানরা আত্মস্থ হয়ে, নিজের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে সফলকাম হবে এই বিশ্বাস তিনি অন্তর থেকে পোষণ করেন। দেশের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে 'গোড়ার কথা' এই প্রবন্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে সেনানীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন।

'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে যে সব পত্র সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে একাধারে প্রবাসী বাঙালীর প্রাণের আর্তি, দেশ সেবকের তীব্র স্বদেশানুরাগ, দেশনায়কের সুচিন্তিত অভিমত, বাস্তবানুসারী ব্যক্তির পরিকল্পনা ও কবি-ভাবুক মানুষের কল্পনার অনুপম সমাবেশ ঘটেছে। মনে রাখতে হবে একটি ছাড়া অন্য সব চিঠিই লেখা হয়েছিল ব্রহ্মদেশের মান্দালয় থেকে অথবা ইনসিন জেলে। চব্বিশ বৎসরের আই, সি, এস, ভারতের রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুভাষ মাত্র চার পাঁচ বছরের ব্যবধানে আঠাশ উনত্রিশ বছর বয়সে সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। দেশবন্ধুর ইচ্ছানুসারে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মসচিব নিযুক্ত হ'ন (১৯২৪)। চিত্তরঞ্জন এইসময় 'কর্পোরেশনে'র মেয়র ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রধান কর্মসচিবরূপে কাজ করার সুযোগ বেশীদিন হ'ল না। ১৯২৪ এর অক্টোবর মাসেই তাঁকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। আলিপুর, বহরমপুর প্রভৃতি জেল ঘুরতে ঘুরতে তাঁকে শেষ পর্যন্ত বার্মার মান্দালয় জেলে পাঠান হয়। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের তখন পর্যন্ত এটাই ছিল দীর্ঘ কারাবাস (১৯২৪-২৭)। মান্দালয়ের জেলে থাকাকালীন বাঙলার প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন (১৯২৬) জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস) কর্তৃক উত্তর কলকাতার অমুসলমানদের জন্য আসনে (প্রাদেশিক আইনসভা) সভ্য পদ প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়েছেন জানতে পেরে সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে তাঁর কেন্দ্রের (উত্তর কলকাতা) ভোট দাতাদের উদ্দেশ্যে এক নিবেদন পত্র (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬) পাঠিয়ে দেন। এই আবেদন পত্রে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে কারান্তরালে থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কারণ সম্পর্কে নিজের বক্তব্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, দেশসেবার ক্ষেত্রে অধিকতর কর্মপ্রয়াসের সার্থক রূপায়নের উদ্দেশ্যেই তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। দেশের স্বাধীনতালাভই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুভাষচন্দ্র তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখলেন, 'আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন—স্বরাজ লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকতে পারি।'

অবশ্য সুভাষচন্দ্রের এই নিবেদন পত্রটি উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের কাছে পৌঁছায়নি, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের এই চিঠি আটক করেন, শুধু এই চিঠি কেন নির্বাচন সংক্রান্ত পরবর্তী সব কয়টি লেখা তাঁদের হাত থেকে বাঙলার মানুষের কাছে পৌঁছায় নি—উদ্দেশ্য সুভাষচন্দ্র যেন কোন ক্রমেই নির্বাচনে জয়ী হতে না পারেন, জনগণের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হন। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাঙলার তরুণ দেশনায়ক সুভাষ বিপুল ভোটাধিক্যে বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভায় সভ্য নির্বাচিত হন, নির্বাচনে জয়লাভ করলেও তাঁর কারামুক্তি ঘটল না।

এখন যে চিঠিটির উল্লেখ করছি বর্তমান ভারতের জটীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দেশবন্ধুর তিরোধানের পর বাঙলাদেশের রাজনীতি তথা সমাজনীতিতে এক অসহনীয় অবস্থা বিরাজমান, শুধু তাই নয় সঙ্কীর্ণ দলাদলি বাঙালীকে ক্রমেই পঙ্গু করে তুলেছে তা সুদূর মান্দালয় জেল থেকে অনুভব করে এবং বাঙলা দেশ থেকে বিভিন্ন সুহৃদের লেখা চিঠি থেকে জানতে পেরে দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই চিঠি লেখেন। ভূপেন বাবু দক্ষিণ কলকাতার আর একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান, বালক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সমিতির মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং ক্রমশঃ সমাজসেবার প্রকৃত কাজ থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে দেখে এই প্রতিষ্ঠান গঠন করে সুভাষচন্দ্রকে পত্র-যোগে জানান। দীর্ঘদিন কারাবাসে সুভাষচন্দ্র শ্রান্ত, শরীরের অবস্থাও বেশ খারাপ, বাঙলাদেশের এই ভাঙনে তাঁর মানসিক শান্তিও হরণ করেছে, ক্ষমতা লাভের এই মোহ লক্ষ্য করে তিনি গভীর বিষাদে লিখলেন, 'উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই," এই ক্ষমতা-লোলুপ রাজনীতিক-বৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্মী কি বাঙলায় আজ নেই ?.....আজ বাঙলার অনেক কর্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও—কর্মচারীর পদ দাও—অন্ততঃ পক্ষে কার্যকরী সমিতির সভ্য করিয়া দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি—নর-নারায়ণের সেবা ব্যবসাদারী, contract-এ কবে পরিণত হইল ?" বাঙলার মঙ্গলের জন্য—ভারতের স্বাধীনতা পিয়াসী সর্বত্যাগী এই মহানায়ক দেশের চরম দুর্গতি দেখে ক্ষণিকের জন্য ভাবাবেগের প্রাবল্যে ভেঙ্গে পড়েন, 'দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা, ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—তাই অনেক সময় ভাবি—চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্যজগতের সহিত সকল সম্পর্ক শেষ করিয়া দিই। পারিতো দেশবাসীর পক্ষ হইতে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব'। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলিয়ে নেন। অনাগত স্বর্ণময় ভবিষ্যৎ ভারতের যিনি কাণ্ডারী হবেন তাঁকে সব suffering-এর কাঁটাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে 'রক্ত গোলাপ' সৃষ্টি করতে হবে। সুভাষচন্দ্র ঐ চিঠির শেষে ভূপেন বাবুর সমিতি গঠনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমিতির পক্ষে দেশের লোকের মঙ্গলের জন্য কি কি কাজ করা সম্ভব হবে সেই সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। সেবাশ্রম পরিচালনার কাজে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। যদিও একটি সংগঠন ভেঙ্গে দুটি সংগঠনের পরিণত হওয়াতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, এবং তিনি মুক্ত থাকলে কিছুতেই ঐরূপ ঘটতে দিতেন না, তবুও বাস্তব দিক বিবেচনা করেই সমাজ কল্যাণে প্রয়াসী এই সংগঠনকে মূল্যবান পরামর্শ দিতে দ্বিধা করেন নি।

দেশবাসীর তথা রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের নৈতিক অধঃপতন কি ভাবে রোধ করা সম্ভব এবং কেমন করেই বা প্রকৃত সৎ কর্মী বর্তমান অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দেশ সেবার প্রেরণা পাবে তার বিবরণ দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির অন্যতম কর্মী শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লিখিত চিঠির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, 'রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোন বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য এবং ত্যাগ—এই দুইটি আদর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। রাজনীতিক আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ, কখনও পঙ্কিল; সব দেশে

এইরূপ ঘটিয়া থাকে।' তাই সুভাষচন্দ্রের অভিমত ক্ষমতা-সর্বস্ব এই রাজনীতির প্রতি লক্ষ্য না রেখে বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের স্রোতে গা না ভাসিয়ে প্রকৃত কর্মীর সমাজ সেবা কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। নিজের মনের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করার জন্য স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দেবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমের ভাব জাগাতে হবে। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি ও প্রেমের সোপান, জয় করতে হবে দুর্বলতাকে —ভয়কে, 'ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্ত্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলি স্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। মনের প্রফুল্লতা মানুষের সমস্ত মলিনতাকে দূর করতে পারে। ভারতের ঐতিহ্য ও সাধনায় একনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্র ভারতের শাশ্বত আদর্শানুসারী শান্তির পথিক। তিনি ঐ পত্রে লিখলেন, 'প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) দুই বেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, ও হৃদয়ের মধ্যে শান্তি অনুভব করবে।'

সুভাষচন্দ্র নিজেও বুঝি এইভাবে চিত্তের প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন, বিদেশের জেলের নির্জন সেলে দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে বন্দীজীবন ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে সঠিক কোন অভিযোগ নেই, মুক্তি যে কবে হবে তা স্বয়ং, বড়লাটও জানেন না। শুধু এটুকুই যথেষ্ট যে সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া না পেলে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর মঙ্গল হবে। জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কুখাদ্য গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটেছে, তথাপি স্থিতধী, মানসিক প্রশান্তিতে মগ্ন হরিচরণ বাগচীকে লিখলেন, 'মুক্তির কথা আমি আর ভাবি না-তোমরাও ভাবিও না। ভগবানের কৃপায় আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি, প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি-এরূপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়'। (মান্দালয়ের জেল ৬-২-২৬)। কি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তির অধিকারী হলে এরকম চিঠি লেখা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। এরপর সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হওয়াতে ১৯২৭ সনের গোড়ার দিকে তাঁকে বর্মার ইনসিন জেলে (রেঙ্গুন) পাঠান হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য, এই সময় সুভাষচন্দ্রের শরীর ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল, ভালকরে চলা ফেরা এমন কি চিঠি লিখতেও তাঁর কষ্ট হতো। সুভাষচন্দ্রের কিছু ভালো মন্দ হলে জনগণের রোষ সরকারের উপরে বর্তাবে। তাই সরকার সুভাষচন্দ্রের মুক্তির কথা ভাবছিলেন। তবে মুক্তির পর সুভাষচন্দ্র যাতে বাঙলাদেশ বা ভারতবর্ষের কোন স্থানে না গিয়ে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে চলে যান সেই রকম অভিলাষ পোষণ করেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব করা হ'ল তিনি যদি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করাতে রাজী থাকেন তাহলে সরকার আপত্তি করবেন না। সরকারের বিনা অনুমতিতে সুভাষচন্দ্রের ভারতে প্রত্যাগমন নিষিদ্ধ। স্বভাবতই সুভাসচন্দ্র এই ধরণের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর রোগমুক্তি ঘটুক ভারতসরকার অন্তর দিয়ে চান না, আসলে তাঁকে তারা দেশছাড়া করতে বদ্ধপরিকর। একবার সুভাষ-চন্দ্রকে ইউরোপে চালান করতে পারলে আর কিছুতেই তাঁকে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হবেনা। যদিও তিনি বলশেভিক নন, তবুও ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চক্রান্তে তাঁকে বলশেভিক নেতা রূপে চিহ্নিত করে তাঁর ভারতে প্রবেশের পথ চিরতরে রুদ্ধ হতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, এখনই মুক্তি না পেলে তাঁর রোগজীর্ণ শরীর আর এই দেহকে ধরে রাখতে পারবে না তা তিনি বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু সেইজন্য তাঁর কোন গ্লানি নেই, শঙ্কা নেই জন্মভূমির

অন্ত মৃত্যুকে বরণ করার মত গৌরবের আর কি আছে? রেঙ্গুনের ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল থেকে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭ সনে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর কাছে তাঁর কারামুক্তির জন্ত সরকারের প্রস্তাব যে স্বাধীনতাপ্রিয় মর্যাদাসম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতেপারে না, মূল্যবান যুক্তি দিয়ে তা বুঝিয়ে শেষে লিখলেন, 'বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্ত নির্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ, কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি :—

"গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।"

বাস্তবিকই সুভাষের কোন চিন্তা নেই, হাসিমুখে তিনি বর্তমান অবস্থাকে বরণ করে নিয়েছেন। দুরন্ত ক্ষয় রোগ মৃত্যুর বেশী তো আর কিছু উপহার দিতে পারবেনা। নাই বা যেতে পারলেন কারার বাইরে। দেশের মধ্যে থেকে স্বদেশসেবা বুঝি বা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। যে আদর্শের সুভাষকে বাধ্য হয়ে বাংলার কোমল মৃত্তিকার পবিত্র স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে এখানে প্রাচীরের অন্তরালে (ইনসিন জেল) থাকতে হচ্ছে, তা বাস্তবে রূপায়িত হতে না দেখে গেলেও তাঁর কোন দুঃখ থাকবেনা, কারণ আদর্শ অবিনশ্বর—তা একদিন না একদিন সার্থক হবেই, পরদিন ৫-ই এপ্রিল তদানীন্তন আত্মশক্তি পত্রিকার সম্পাদক গোপাললাল সান্যাল মহাশয়কে গভীর প্রশান্তিতে লিখলেন, 'এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণে সুদূর পরাহত হইতেছে সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগ-শূন্ত হইয়া আসিতেছে, অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবন তরী ভাসাইয়া দেয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশীদিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্বশান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, "We must live wholly from within." এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমরা বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে'।

(ক্রমশঃ)

# সুভাষবাদ

পবিত্রকুমার ঘোষ

## মার্ক্সবাদ ও সুভাষবাদ : ২

### ডায়ালেকটিক

গ্রীক দার্শনিকরা ডায়ালেকটিকের সূত্র উদ্ভাবন করলেও জার্মান দার্শনিকরাই আধুনিক কালের দর্শনচিন্তায় ডায়ালেকটিক তত্ত্বের প্রবর্তক। কাণ্টের দর্শনেই ডায়ালেকটিক তত্ত্ব পুনর্জন্ম লাভ করেছিল, হেগেল ঘটিয়েছিলেন তার বিকাশ এবং কার্ল মার্ক্স হেগেলের কাছ থেকেই ডায়ালেকটিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) লাইবিনিজ ও উলফের ভাবধারার অনুসারী হয়ে যুক্তিবাদে আস্থাশীল ছিলেন, সে অবস্থায় প্রথম আঘাত লাগে হিউমের রচনা পড়ে। তাঁর পরিণত চিন্তা ইয়োরোপীয় দর্শনে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত করে।

কাণ্টের মতে বহির্বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদ্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা শুধু আমাদের মধ্যে সংবেদনা জাগায়; তার মধ্যে রূপ, শৃঙ্খলা, পারিপাট্য আরোপ করে আমাদের মন। দেশ ও কালের ধারণা আমরাই সরবরাহ করি, কারণ তা আছে বিশ্বে নয়, আমাদেরই মনে। Things-in-themselves, যা আমাদের সংবেদনার কারণ তা অজ্ঞেয়ই থেকে যাবে, কারণ তা পদার্থ নয়, দেশ ও কালে মূর্ত্তও নয়। দেশ ও কালের ধারণা ধারণাই মাত্র এবং আমরাই তার জনক। না, আরও গভীর ভাবে দেখলে দেশ ও কাল ধারণাও নয়—তা আমাদের সংবিতের স্বাক্ষর। কাণ্ট এখানে ব্যবহার করেছেন Anschauung শব্দটি, যার ইংরেজি অনুবাদ intuition, কিন্তু বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে 'ইনট্যুইশন' শব্দটি কাণ্টের ব্যবহৃত শব্দের ব্যঞ্জনা বহনে অক্ষম। অন্তশ্চক্ষু বা অন্তর্দৃষ্টি শব্দটি এক্ষেত্রে অনেক বেশি সুখকর ও পর্যাপ্ত।

কাণ্ট বলছেন যে thing-in-themselves বা noumena, দৃশ্যগোচর নয়, কিন্তু বিশ্বের সেটাই আসল সত্তা; যা দৃষ্টিগোচর হয় তা phenomena. ফ্যামেনা সংবেদনা জাগায় আমাদের অন্তর্দ্বারে, আমরা একটা রূপ বা ফর্ম—যা আমাদেরই মধ্যে সর্বদা বর্তমান—তার মাধ্যমে ঐ সংবেদনায় সাড়া দিই, আর এরকম তিনটি ফর্ম আছে: দেশ, কাল ও কারণ (cause).

অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উৎস নয়, কারণ জ্ঞান অন্তর্নিহিত না থাকলে অভিজ্ঞতা কি অর্থবহ হত কোনোদিন? গরুকে গরু এবং গাছকে গাছ বলে চিনতে পারি কারণ গরু ও গাছের জ্ঞান আমাদের ভিতরেই রয়েছে; "General truths, which at the same time bear the character of an inward necessity, must be independent of experience,—clear and certain in themselves" (Critique of Pure Reason) এমন কি এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয়, বরং অভিজ্ঞতাই জ্ঞান-নির্ভর, জ্ঞানের ভেলা ছাড়া অভিজ্ঞতা দাঁড়াত কোথায়?

জ্ঞান এল কোথা থেকে—সত্যের বোধের উৎস কী? আমাদের মনের গঠনই এমন, মনের ক্রিয়াপদ্ধতিই এমন যে সত্যের বোধ সেখান থেকেই উৎসারিত হচ্ছে। মন পরিষ্কার শ্লেটের মতো জিনিস নয় যে অভিজ্ঞতা ও সংবেদনা ইচ্ছা মতো লিপি তাতে লিখে দেবে। নানা মানসিক অবস্থার যোগফল বা সমষ্টিও মন নয়। মন এমন একটা সক্রিয় সত্তা যা সকল sensation কে রসায়িত করে রূপান্তরিত করে idea-য়। মন এমন একটি "organ which transforms the chaotic multiplicity of experience into the ordered unity of thought."

বিশ্বজগত যে আমাদের মনের সৃষ্টি, অর্থাৎ মন না থাকলে বিশ্বজগতের অস্তিত্বই থাকে না—এ বক্তব্য কাণ্টের নয়। জগৎ আছে, আমরা তাকে দেখি বা না দেখি। মানুষ যখন ছিল না তখনো জগৎ ছিল, পারমাণবিক বোমায় সব মানুষ মরে গেলেও জগৎ থাকবে। কিন্তু সে তো মানুষের জগৎ নয়, আমাদের কল্পিত জগৎ নয়—সে যে কী তা আমরা জানি না। কারণ জগতের যে ছবিটা আমাদের চোখে ভাসে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেবার সময় সে ছবিটাকে নিয়েই আমারা বিদায় নেব। কারণ এই জগতে দুটি জগৎ রয়েছে, একটা প্রকৃত জগৎ আর একটা মানবিক জগৎ অর্থাৎ মানুষের দ্বারা রূপারোপিত জগৎ। প্রকৃত জগৎ সম্পর্কে এইটুকু শুধু নিঃসঙ্কোচে, অসংশয়ে বলা যায় যে সে জগৎ আছে, থাকবে। তার বেশি আমরা বলতে পারি না, কারণ সেই প্রকৃত জগৎকে ত আমরা কোনোদিন দেখিনি, দেখা সম্ভব নয়; জানিনি, জানা সম্ভব নয়। তা অচেনা, অধরা, অনায়ত্ত।

আমরা যাকে চিনি সে আমাদের নিজস্ব জগৎ—আমরাই তার স্রষ্টা। প্রকৃত জগৎ—reality বা noumenon কী তা জানিনা; কিন্তু ঐ জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারে যে সংবেদনা জাগায়—সহস্র পথে সহস্রভাবে সে আমাদের ধাক্কা দেয়, কিন্তু সব ধাক্কায় আমরা সাড়া দিই না, কোনটায় সাড়া দেব বা না দেব তা স্থির করে আমাদের মন, এবং যখন সাড়া দিই তখনই সংবেদনা জাগে—সেই সংবেদনাকে দেশ, কাল ও কারণ এই পূর্বপোষিত বোধের সাহায্যে আমরা পরিপাটি রূপ দান করে জগতের যে ছবি সৃষ্টি করেছি, সেই আমাদের পরিচিত জগৎ; তার অতিরিক্ত আমরা জানিনা, না বিজ্ঞানের সাহায্যে, না কল্পনার সাহায্যে। "It remains completely unknown to us what objects may be by themselves and apart from the receptivity of our senses. We know nothing but our manner of perceiving them; that manner being peculiar to us, and not necessarily shared by every being, though, no doubt, by every human being." (Critique of Pure Reason)

কাণ্ট বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে এইভাবে লক্ষ্য করেছিলেন দুটি সত্তা—noumenon ও phenomenon; রিয়্যালিটি ও অ্যাপিয়ারান্স,—অগোচর ও গোচর। প্রতিটি জিনিস এই দ্বিবিধ সত্তার অধিকারী। গোটা বিশ্ব জুড়ে চলেছে এই দ্বৈত সত্তার লুকোচুরি, দ্বন্দ্ব, সংঘাত; আর সেই ধারা অনুস্যূত হয়েছে মানবজীবনে—কি ব্যক্তিতে, কি সমাজে।

কারণ প্রতি মানুষেরও মধ্যে আছে দুজন মানুষ,—একজন অন্তরঙ্গ পুরুষ, আর একজন দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত সাংসারিক মানুষ। আমাদের প্রাত্যহিক কাজ কারবার, চেনাশোনা ঐ দ্বিতীয় জনকে নিয়ে, কারণ প্রথম জন আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু প্রকৃতিলোকে রিয়্যালিটি বা নুমেনন সত্তা অ্যাপিয়ারান্স বা ফেনোমেনন সত্তার ওপর কী দাবী করছে তা আমরা জানি না—কারণ ঐ নুমেনন ইন্দ্রিয়াতীত; আইডেন্টিফিকেশন ছাড়া জানার অন্য উপায় নেই। কাণ্ট বলেন জানা যায় না, কারণ ঐ

আইডেন্টিফিকেশনের রহস্য তাঁর অজানা, অনধিগম্য। বেদ যাঁদের বলেছেন কবি, ভারতের সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মতে, জানা যায়—কারণ বিশ্বপ্রকৃতিরও অন্তর্লোকের সঙ্গে আইডেন্টিফিকেশন সম্ভব ;—চিন্তায় বা কল্পনায় নয়, যোগে, প্রেমে। যাই হোক, কাণ্টের কথাতেই ফিরে আসা যেতে পারে।

তাহলে, কাণ্টের মতেই, মানুষেরই মধ্যে রয়েছে আর একজন অধরা মানুষ. প্রকৃত মানুষ, authentic মানুষ। আর অনবরত সে আমাদের প্রাত্যহিক সত্তার ওপর দাবী করছে, তার মতো হতে ; তার মন্ত্রণা ও নির্দেশ শুনতে, তাকে অনুসরণ করতে। যখন বুঝি যে মিথ্যা কথা বললে লাভ হবে, তখনো মিথ্যা কথা বলতে পারি না, কিংবা ইতস্ততঃ করি, কিংবা মিথ্যা বলে লাভবান হবার পরও অনুশোচনা করি কেন? কারণ ঐ ভিতরের মানুষটি মিথ্যা বলা চায় না, অপছন্দ করে, সে আমাদের সত্য বলতে প্রেরণা জোগায়, আদেশ করে। সে আদেশ যে অগ্রাহ্য করিনা তা নয়, বরং প্রাত্যহিক জীবনে অন্তরপুরুষের নির্দেশ অমান্য করাটাই ঘটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কারণ সংসারের হাটে অত বিশুদ্ধ, আপসহীন, অনমনীয় আদর্শবাদী থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু সেটা আনন্দের কথা নয়, দুঃখেরই কথা। কাণ্টের মতে আমরা যে ভালো হব, ভালো কাজ করব, সৎ হব, কর্তব্য পালন করব—কেন? লোকে ভালো বলবে কিংবা কোনো লাভ বর্তাবে বলে? না, আদৌ তা নয়। কারণ অন্তর থেকে সৎ হবার, কর্তব্য পালনের নির্দেশই যে সতত আসছে সে নির্দেশ অনুসরণ করাতেই আমাদের পরিপূর্ণতা, সার্থকতা, আনন্দ। অন্তরের সে নির্দেশ অনুসরণ করতে গেলে লাভের বদলে আপাতিক ক্ষতি হয়তো জুটবে, হয়তো সংগ্রামেই শেষ হবে জীবনের আয়ু ও শক্তি, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা ফিরবে পোষা বেড়ালের মতো পায়ে পায়ে কিন্তু ওরই মাঝে আনন্দে উচ্ছল হবে জীবনের পানপাত্রখানি। সুভাষচন্দ্র বলেছেন পরম ত্যাগের মধ্যেই পরম শান্তি—আদর্শের জন্য দুঃখ বরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অক্ষয় আনন্দ ;—একেবারে কাণ্টের মনের মতো কথা। "Morality is not properly the doctrine how we may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness "( Critique of Practical Reason ) এবং "Let us seek the happiness in others ; but for ourselves, perfection—whether it brings us happiness or pain. ( The Metaphysical Elements of Ethics ).

ঐ perfection শব্দটিই কাণ্টীয় নীতিতত্ত্বের চাবিকাঠি। মানুষের নুমেনন সত্তা তার ফেনোমেনন সত্তার ওপর যা দাবী করছে তার সারাৎসার হচ্ছে পারফেকশন। তোমার রুগ্ন, দুর্বল, ক্লীব, ভীরু, অজ্ঞান রূপ ছেড়ে তুমি হয়ে ওঠ সবল, তেজস্বী, শক্তির আধার, নির্ভীক, জ্ঞানী, ক্ষমতাবান। কেন? কারণ হে বহিরঙ্গ মানবসত্তা, তুমি পশু রয়েছ, কিন্তু তোমাকে হতে হবে দেব সদৃশ, দেবতাই।

বিবেকানন্দ বলতেন অভয় হওয়াই দেবতা হওয়া। কাণ্টের কথাও তাই। নীতিশাস্ত্র মেনে চললে, কয়েকটা ভালো ভালো কাজ করলেই আমাদের ওপর আমাদের অন্তরপুরুষের দাবী শেষ হয়না—বরং ঐ ধরণের ভালো কাজ করার চেয়েও যদি শুধু বলিষ্ঠ হওয়া যায়, জাগ্রত হওয়া যায়, আপোষহীন সংগ্রামের পথে চলা যায় তবেই আসে পারফেকশন সিদ্ধি। কাণ্ট বলছেন সেই সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হবার ফলে যদি দুঃখ আসে, মৃত্যুও আসে তাকে বলবনা জীবনের অপচয়, ব্যর্থতা বা অন্ত। কারণ জীবন প্রবাহিত হয় জন্ম-মৃত্যুর দুকূল ছাপিয়ে, এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে, প্রসারিত হয় এক অধ্যায় থেকে আর এক অধ্যায়ে। এই খণ্ড জীবন এক বৃহৎ জীবনেরই খণ্ড ; তাই ভীত হোয়োনা ;—এই হচ্ছে কাণ্টের বাণী। অমরত্বের

আধারে বিধৃত এই খণ্ড জীবন মানুষকে দেওয়া হয়েছে সৌন্দর্যোপভোগের জন্য নয়, অন্তরের শাশ্বত, গূঢ় পুরুষের আহ্বানে এক বস্ত্রে চিরকালের মতো নোঙর কেটে যাত্রা করার জন্য।

কিন্তু সংসারের শত পাঁকে বাঁধা মানুষ অভিসারী হয় কই? হয় না কারণ তার ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে সে অদৃশ্য পুরুষের হাতছানিতে আস্থাশীল হতে পারে না। সে খতিয়ে দেখে তার ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, শ্রীবৃদ্ধি ও ক্ষতির সম্ভাবনা। এই খানে সূত্রপাত তার স্ববিরোধের। তার অভীপ্সার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা মেলেনা, প্রেরণার সঙ্গে অ্যাম্বিশান মেলেনা, বিবেকের সঙ্গে চাতুরীর গরমিল বাধে, কর্তব্যবোধের সঙ্গে আয়াসচিন্তার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির হৃদয়রঙ্গমঞ্চে নিয়ত চলছে এই নাটকীয় সংঘাত—কখনো কখনো তার ফলে হৃদয়ের ক্ষতমুখে রক্তও ক্ষরিত হচ্ছে। কাণ্ট সান্ত্বনা দিয়েছেন যে এই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংগ্রামই প্রগতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সঙ্গী।

বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং বিশেষত মানবজীবনে কাণ্ট এই যে দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করেছিলেন ডায়ালেকটিক তত্ত্বের পুনর্জন্ম এ থেকেই ঘটেছিল। হেগেল এই সূত্র থেকেই ডায়ালেকটিক তত্ত্ব প্রসারিত করেন এবং মার্ক্স ঐ তত্ত্ব আহরণ করেছিলেন হেগেলের কাছ থেকে।

কাণ্টের দর্শনের সকল দিক আমরা আলোচনা করিনি, আমরা শুধু মূল সূত্রটুকু অনুসরণ করেছি,—অধিক এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কাণ্ট জার্মাণ দর্শনকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শন চিন্তায় এনেছিলেন যুগান্তর। শোপেনহাওয়ার ও নীটশে, ফিকটে, শেলিং ও হেগেল—এমনকি কবি শিলার ও গ্যয়টে এবং বীঠোফেন—জার্মান ভাবুকমণ্ডলী অনুপ্রাণিত, প্রভাবিত হয়েছিলেন কাণ্টের দর্শন দ্বারা; কারণ কাণ্ট এনেছিলেন এক নতুন প্রজ্ঞার বাণী, যা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অপরিচিত ও অভাবিতও। তবু মনে হয় কাণ্ট যা অনুভব করেছিলেন সব প্রকাশ করতে পারেননি, যা বলতে চেয়েছিলেন সব বলেননি—১৭৬৬ সালে মোসেস মেণ্ডেলসনকে তিনি এক চিঠিতে লিখেওছিলেন সেকথা: "It is indeed true that I think many things with the clearest conviction···which I never have the courage to say; but I will never say anything which I do not think." কিন্তু আরও মনে হয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল তার উপযোগী প্রকাশক্ষম ভাষাও তিনি খুঁজে পাননি;—যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন তা Morality ও নয়, Categorical Imerative ও নয়, কিন্তু ভাবের উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে এই দীন শব্দগুলিই তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেজন্য কাণ্টের দর্শনের সারাৎসার ইয়োরোপের চিন্তাবিদদের অনধিগম্যই রয়েছে মনে হয়, যেমন তাঁদের কাছে আজও অনুদ্ঘাটিত রয়েছে বাইবেলের বাণী। কার্ল মার্ক্স জার্মান দর্শনের ধারা থেকেই আহরণ করেছেন তাঁর চিন্তাধারা, কিন্তু ধৈর্যের অভাব বা অহম্মন্যতা বা অন্য কোনো কারণে বিকৃত করেছেন সেই ধারাকে, এনেছেন বিভ্রান্তি। ডায়ালেকটিক তত্ত্বকে তিনি সোজাভাবে পায়ের উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন আর তাতেই ঘটেছিল বিপত্তি। জীবনে জীবনে অনুস্যূত যে দ্বন্দ্ব কাণ্ট উপলব্ধি করেছিলেন এবং হেগেল দিয়েছিলেন যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা, মার্ক্স সুবিধাবাদী প্রয়োগে সেই দ্বন্দ্বতত্ত্বকে ম্লান করে দিয়েছেন। এবং এইখানেই ছিল সুভাষচন্দ্রের আপত্তি। দ্বন্দ্বতত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল—কিন্তু তা কাণ্ট ও হেগেলের অনুসরণে; পুরাপুরি একমত না হলেও ঐ তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি তাঁর সায় ছিল। মার্ক্স দ্বন্দ্বতত্ত্বের যে অবৈধ ও ভ্রান্ত প্রয়োগ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র তা মানতে পারেননি। পরে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

জর্জ উইলহেলম হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) কাণ্টের

ম্যুমেনন ও ফেনোমেননের তত্ত্বকে সরাসরি আক্রমণ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁর দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে, যাকে তিনিই নাম দিয়েছিলেন ডায়ালেকটিক। এই বিশ্বচরাচর, যা দৃশ্যমান, গোচর, যাকে আমরা প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব করতে পারি কাণ্ট তাকে যে গৌণস্থান দিয়েছিলেন হেগেলের তাতে আপত্তি ছিল এবং এই দৃশ্য জগতের অন্তরালে কোন লুক্কায়িত রিয়ালিটি আছে যা মানুষের পক্ষে অজ্ঞেয়—একথাও হেগেল স্বীকার করেননি। তিনি রিয়ালিটি বলতে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকেই গ্রহণ করেছেন, যা দৃশ্যমান তা অলীকও নয়, মাত্র অ্যাপিয়ারান্সও নয়। ম্যুমেনন ও ফেনোমেননের দ্বন্দ্ব তাই হেগেলের মতে বাতিল।

ইন্দ্রিয়গম্য যে জগত তা সত্য, কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে, তাকে ধারণ করে, বিরাজ করছে সামগ্রিক বা পরম সত্য। হেগেলের মতে যা দেখি, যা আছে, যা অনুভব করি তা সবই সত্য, কিন্তু নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে সত্য। যা সত্য, কারণ সন্তানের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত। সন্তানের সম্পর্ক আছে তার বাবার সঙ্গে। বাবাও পৃথিবীতে স্বয়ম্ভূ নয়। প্রতিটি বস্তু অজস্র সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বের সঙ্গে আবদ্ধ। কাউকে জানতে গেলে তাকে তার সহস্র সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করে সেই সম্পর্কজাল সমন্বিত ভাবে তাকে জানতে হবে—নইলে জানা সম্ভব হবে না। যেহেতু কোনো বস্তু বা ব্যক্তিই জগত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই বিচ্ছিন্ন করে তাকে জানতে গেলে বিকৃত জানা হবে বা আংশিকভাবে জানা হবে, পরিপূর্ণভাবে নয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল খুব বিরক্তির সঙ্গে হেগেলের এই মতটিকে উপস্থিত করে বলেছেন:

মনে করুন আমি বললাম: "জন জেমসের বাবা"; হেগেল বলবেন: 'আপনি এই কথাটা যদি বুঝতে চান তবে প্রথমে জানুন যে জনই বা কী জেমসই বা কী। জন কী তা জানতে হলে জানতে হবে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য কারণ ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিলে অন্যদের থেকে তাকে পৃথকভাবে চেনাই যাবে না। কিন্তু তার সব বৈশিষ্ট্য জানতে হলে জানতে হবে আরও বহু লোক ও জিনিসকে, তার পিতা-মাতার সঙ্গে স্ত্রীর, সঙ্গে পুত্রকন্যার সঙ্গে, তার সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য জানতে হবে; নাগরিক হিসাবে সে ভালো না মন্দ তা জানতে হবে, সে কোন দেশের অধিবাসী তাও জানতে হবে। এই সমস্ত কিছু জানলে তবেই আপনি বলবেন যে 'জন' শব্দটি দ্বারা কাকে বোঝানো হচ্ছে। এইভাবে 'জন' শব্দটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে ক্রমে ক্রমে আপনাকে বিশ্ব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে, এবং আপনার মূল বিবৃতি পরিণতি লাভ করবে বিশ্ব সম্পর্কে একটা সামগ্রিক বিবৃতিতে—জন ও জেমস মাত্র এই দুটি ব্যক্তির কথা বলেই পার পাবেন না।

রাসেল বলছেন এ ভাবে কোনো কিছু সম্পর্কেই জানতে গেলে বিড়ম্বনাই বাড়বে—জন ও জেমস সম্পর্কে কোনো কথা বলতে গেলে বিশ্ব তোলপাড় করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সত্যই কি প্রয়োজন নেই?

হেগেল বলছেন বিশ্বপ্রকৃতি একটা স্থির বস্তু নয়, দেশে ও কালে অবস্থিত একটা আদি বস্তু সমন্বিত পিণ্ড নয়। বিশ্বপ্রকৃতি আসলে হচ্ছে বিশ্বপ্রবাহ—এর আদিও নেই, অন্তও নেই—দেশে ও কালের দ্বারা আবদ্ধ নয়, এমন কি দেশ ও কালে অবস্থিতও নয়; দেশ ও কাল ও কারণ—টাইম, স্পেস ও কজ—বিশ্বপ্রবাহের আত্ম-প্রকাশ তথা আত্ম-উন্মীলনের মাধ্যম মাত্র। কথাটা লক্ষণীয়;—বিশ্ব-প্রবাহ নিজেকে সতত প্রকাশ করতে চাইছে, প্রকাশই তার অন্তর্নিহিত স্বভাব বা ধর্ম। কারণ রিয়ালিটি নিজেকে লুক্কায়িত করতে চায় না, গোপনতা তার স্বভাব নয়;—তার ভিতরের সংবেগ তার ক্রম-উন্মীলনের পক্ষে; পরম সত্য ক্রমশই নিজেকে উন্মীলিত করছে। এই জগতে

যা দেখি, যা আছে প্রত্যেকেই মূর্ত হয়েছে সেই উন্মীলনের ধারায়, এসেছে বিশ্বপ্রবাহের অঙ্গীভূত হয়ে। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বপ্রবাহকেই নদী রূপে কল্পনা করে লিখেছিলেন :

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা ওঠে জেগে;
ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষে নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।
(বলাকা, ৮নং কবিতা)

প্রবাহই জীবন, প্রবাহই জগৎ, প্রবাহই সত্য, রিয়ালিটি। কিন্তু এই প্রবাহ উচ্ছৃঙ্খল নয়, পারম্পর্যহীন নয়,—গতির মধ্যেও আছে নিয়ম, শৃঙ্খলা, পারম্পর্য, পারিপাট্য। অন্তর্নিহিত সঙ্গতি বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে সুরক্ষিত; এই প্রবাহ যেন আবার একটি বলয়, নিটোল সামগ্রিকতা, প্রতিটি অংশের যেখানে সার্থক ও মহিমাদীপ্ত স্থান রয়েছে; প্রতি অংশই অপরিহার্য, নিরুপম,—এবং সকল অংশকে বিধৃত করে মহা পরিপূর্ণতা বিরাজমান।

বিশ্বপ্রবাহ যে সত্তার আত্মপ্রকাশ—সেই সত্তাটি কী? হেগেল তারই নাম দিয়েছেন, Idea, Absolute, Reality, Spirit ইত্যাদি। এই পরম সত্তা কোনো পদার্থ নয়, আবার লুক্কায়িত ও অজ্ঞেয়ও নয়;—বিশ্বপ্রবাহের ভিতরেই এঁর পরিচয় গ্রহণ করতে হবে, ইনি তার অতিশায়ী ও অগম্য নন। কিন্তু এঁর আত্মপ্রকাশের ধারা দ্বান্দ্বিক,—তাই বিশ্বপ্রবাহের অন্তর্নিহিত যে সঙ্গতির কথা বলেছি তা আসলে দ্বন্দ্বের সঙ্গতি; সুষমার ভিত্তি সংগ্রাম, হাঁ-এর সঙ্গে না-য়ের, অস্তির সঙ্গের নাস্তির, প্রস্তাবের সঙ্গে প্রতিবাদের। Being-এর ভিতর থেকেই জাগবে তার প্রতিবাদ Non-being; কিন্তু এ দুয়ের দ্বন্দ্ব পূর্ণতা পাবে, পরিণতি লাভ করবে সমন্বয়ে Becoming-এ। আবার becoming নতুন ভাবে প্রস্তাব রূপে, being রূপে যখন উপস্থাপিত হবে—তখন তারও আবার প্রতিবাদ জাগবে। nonbeing রূপে। যেমন ভারতীয় দর্শনে দ্বৈতের কল্পনার প্রতিবাদে এসেছে অদ্বৈতের কল্পনা—আবার দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সংঘর্ষের পর সমন্বয় সাধিত হয়েছে দ্বৈতাদ্বৈতবাদে। এটাই হেগেলের সুপ্রসিদ্ধ থিসিস, অ্যান্টিথিসিস তারপর সিন্থেসিসের মতবাদ; যে সিন্থেসিস আবার থিসিস রূপে নতুন অ্যান্টিথিসিসের জন্ম দেয়।

এই পদ্ধতিটাই ডায়ালেকটিক, যুক্তির রীতি মাত্র নয়, বিশ্বপুরুষের, অ্যাবসলিউটের আত্মপ্রকাশের তথা আত্মোন্মীলনের এটাই পদ্ধতি। তাই সংগ্রামই বিকাশের কানুন, শর্ত, অপরিহার্য রীতি। এই সংগ্রাম রক্তক্ষয়ীও হয়। জগতে যখন পশুর রাজত্ব ছিল তখন তার মধ্যে মানবজীবন ও মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পশুর সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে নামতেই হয়েছে, আর সে সংগ্রাম বিনা রক্তপাতে উদ্ঘাপিত হয়নি। অহিংসা ও হিংসাতত্ত্বের ঝগড়াটা নেহাৎই জোলো; কারণ আসল প্রশ্নটা সংগ্রামের, যাকে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই—আর সে সংগ্রাম হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক হবে সেটা নির্ভর করে স্থান, পরিবেশ, প্রয়োজন ও শক্তি সাম্যের ওপর। হেগেল বলেছেন : "The history of the world is not the theatre of happiness; periods of happiness are blank pages in it, for they are periods of harmony."—তাহলে হার্মনি, সুষমা, শান্তি, একমাত্র কাম্য নয় জীবনে, কারণ একটা বিশেষ

স্থিতির ক্ষণে ঐগুলি বিরাজ করতে পারে; কিন্তু স্থিতিই চিরস্থায়ী হয়না, গতির দোলা আবার স্থিতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গতিই আনে বিকাশ, জীবনকে করে সমৃদ্ধ—অবশ্যই যন্ত্রণার মূল্যে, দুঃখের মূল্যে। কাঁটার বুন্তেই ফোটে জীবনের রক্তগোলাপ, আবার সে রক্তগোলাপ নিয়ে মশগুল হয়ে বসে থাকার উপায় নেই, কারণ গোলাপও বাসি হয়ে যায়, জীবন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে; আবার শবের শিয়রে বসে স্তব্ধ হয়ে থাকা জীবনের স্বভাব নয়; মৃত্যুর তোরণ পার হয়ে জীবন ছুটে চলে নতুনতর জীবন ও নতুনতর মৃত্যুর অভিসারে:

জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

তাই হেগেল বলছেন: "The nature of spi it may be understood by a glance at its direct opposite—Matter. As the essence of matter is gravity, so on the other hand, we may affirm that the substance, the essence of spirit is freedom···Matter has its essence out of itself; spirit is self-contained existence."

স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, বন্ধনবিহীন এই স্পিরিট বা আইডিয়া বা অ্যাবসলিউট; পদার্থ যেন এর ঠিক বিপরীত, কারণ সে বদ্ধ ও সীমিত, তার মর্মকেন্দ্র তার ভিতরে নয়, কারণ মর্ম কেন্দ্রই হচ্ছে স্পিরিট; ফলত স্পিরিটই একমাত্র স্ব-নির্ভর স্বয়ম্পূর্ণ; পদার্থ অপূর্ণ ও পরনির্ভরশীল, তাই স্বাধীন নয়।

স্পিরিটের আত্ম-অভিব্যক্তির ধারায় মূর্ত হয়েছে পদার্থ, তাই সে স্ব-নির্ভর নয়। পদার্থের অসম্পূর্ণতা এখানে যে সে আত্ম-সচেতন নয়, চেতনা তার মধ্যে সঙ্কুচিত, অবগুণ্ঠিত।—বিকাশের তারতম্যে জীবজন্তু পদার্থের চেয়ে উন্নততর, কিন্তু তাদের মধ্যেও চেতনা কুণ্ঠামুক্ত নয়। চেতনার সেই বিকাশ ঘটেছে মানুষে যে স্তরে চেতনা আত্মচেতনার পরিণত হয়; মানুষের মধ্যে চেতনা স্বয়ংবেদ্য, হারানিধি খুঁজে পেয়েছে নিজেকে, তাই চেতনার স্বরূপলক্ষণ যে স্বাধীনতা তা মানুষের আছে। মানুষই পারে স্বাধীন মুক্ত স্বনির্ভর হতে,—যদি অবশ্য সে বাস করতে শেখে চেতনার সাম্রাজ্যে।

হেগেলের দার্শনিক মতবাদের সকল দিক—যেমন তার রাষ্ট্র, সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ডায়ালেকটিক তত্ত্ব, হেগেল যাকে পরম সত্তার, পরম ভাবের, ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণের আত্মপ্রকাশের মৌল পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেছিলেন। ডায়ালেকটিক তত্ত্বের সাহায্যেই তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন ইতিহাসকে, যেমন মার্ক্সও করেছেন। কিন্তু হেগেল বলেছিলেন যে Zeitgeist বা যুগচেতনা বা Spirit of the Age এক এক যুগের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করে; মার্ক্স বলেছেন যে অর্থনৈতিক উৎপাদনের তাগিদই ইতিহাসকে গতি দান করে। সুভাষচন্দ্র হেগেলের মতেরই সমর্থক, মার্ক্সীয় মতের নয়। কারণ তাঁর আত্মচেতনার দর্পণে প্রতিবিম্বিত যুগচেতনার সত্য অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হতে পেরেছিলেন এই কারণে যে তাঁর আত্মচেতনা মার্জিত, স্বচ্ছ ছিল আত্মোপলব্ধির ফলে, যা ভারতের সকল গভীর পুরুষদেরই বৈশিষ্ট্য। কার্ল মার্ক্স আত্মোপলব্ধির পথে যেতেই প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ ইয়োরোপীয় ঐতিহ্যই সেপক্ষে অনুকূল নয়। কাণ্ট ও হেগেল ধর্মের অনুভবকে তাই ভাষায় প্রকাশ করতে বিফল হয়েছিলেন, কাণ্ট ও হেগেলের বক্তব্য তাই ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের কাছেও মূলত অবোধ্যই রয়ে গেছে। দশ খণ্ড বই লেখার পর বিষাদ-গ্রস্ত হেগেল তাই বলেছিলেন: 'কেবলমাত্র একজন লোকই আমাকে বোঝে, কিন্তু এমনকি সেও বোঝে না।' মরমের

বেদনা মরমিয়াই বোঝে,—ভাষায় সে অনুভব প্রকাশ করা যায়না, বিশেষত ইয়োরোপীয় ভাষা সমূহ সে বিষয়ে আরও অক্ষম। মার্ক্স হেগেলের চিন্তারাশিতে চমৎকৃত ও সেই চিন্তার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ; হেগেলের প্রভাবমুক্ত তিনি কখনো হননি। ফলে মার্ক্স নিজেকে সগৌরবে পরিচায়িত করেছেন হেগেলের শিষ্যরূপে ; গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছ থেকে জগৎ, জীবন ও ইতিহাস ব্যাখ্যার চাবিকাঠি ; কিন্তু সেই চাবিকাঠির স্বরূপ ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি বিফল হয়েছেন। পরম আইডিয়ার আত্মপ্রকাশ তত্ত্বকে ছাটাই করে দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছিলেন শুধু ডায়ালেকটিক তত্ত্বকে ; আর সে তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছিলেন বস্তুর ক্ষেত্রে, যে বস্তু সম্পর্কে হেগেল আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলো যে সে স্পিরিটের বিপরীত, অর্থাৎ, বদ্ধ, সীমিত, অপরিচিতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই বস্তুর মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে, কারণ বিকাশের তাগিদ তার মধ্যেও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু বস্তুর মধ্যে চেতনা প্রায় লুপ্ত বা তামসগ্রস্ত বলে, ডায়ালেকটিক ও সেখানে আবৃত, সীমিত, আচ্ছন্ন ; বস্তুর ব্যাখ্যায় ডায়ালেকটিকের প্রয়োগ তাই অতি সতর্কভাবে করতে হবে। সুভাষচন্দ্রেরও এই ছিল মত। মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিকের বদলে হেগেলের ডায়ালেকটিকের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত বেশি। হেগেল অন্তর্দৃষ্টি তথা প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে ডায়ালেকটিকের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন ; মার্ক্সের কাছে ওটা হয়ে দাঁড়ায় সমাজে বিপ্লবের অনিবার্যতা বোঝাবার একটা হাতিয়ার মাত্র। মার্ক্স দর্শনকে প্রয়োগ করেছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে যুক্তিজাল বিন্যস্ত করার উপায় রূপে ; তাঁর দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা ও বক্তব্যে সাময়িক প্রয়োজনের ওপর ঝোঁক সেজন্যই এসেছে। ক্ষুদ্র সত্য বৃহৎ সত্যের রূপ ধরে স্ফীত গর্বে আত্মহারা হয়েছে মার্ক্সীয় মতবাদে ; সাময়িক প্রয়োজনবোধ ব্রহ্মাণ্ড রহস্যের উদ্ঘাটনের স্পর্ধা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে মার্ক্সের অসহিষ্ণু চিন্তারাশির মধ্যে। ফলে ইয়োরোপীয় দর্শনে কাণ্ট ও হেগেল যে নতুন প্রজ্ঞার ধারা, মরমিয়ার ধারা নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন হেগেলশিষ্য মার্ক্স তাকে বিপথচালিত, বিকৃত ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামির ফল এরকম মারাত্মক হয় অনেক সময়।

( আগামীসংখ্যায় নতুন অধ্যায় )

# কণ্ঠভরা বিষ



মিহির মুখোপাধ্যায়

## কুড়ি

আনন্দিরাম মুখুজ্জের বৈঠকখানা ঘরে বসেছিল ভারতচন্দ্র। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছিল। যদিও এখন আর ঠিক দুপুর নেই। পরিপাটি স্নানের পর খেতে খেতে দুপুর ঘুরে গেছে। তথাপি বাইরে এখনো বেশ ঝাঁকালো রোদ। আষাঢ়ের বেলা। সহজে রোদ ফুরোয় না। বর্ষাকালের ওই এক মুস্কিল। যতক্ষণ মেঘ বৃষ্টি বাতাস রইল, ততক্ষণ বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। তারপর যেই মেঘ কেটে গেল, রোদ ফুটল, অমনি আবার অসম্ভব গুমোট। আর কৃষ্ণনগর বেশ গরম জায়গা।

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আস্তে আস্তে হাত পাখা নাড়ছিল ভারতচন্দ্র। তিনখানা তক্তাপোষ জুড়ে মস্ত ফরাস পাতা। আশে পাশে আরো কয়েকটি তাকিয়া। দুপুরবেলা ঘুমোবার অভ্যেস নেই। কিন্তু এমন গুরু ভোজনের পর কিছুক্ষণ না গড়িয়ে নিলে আর ভাল লাগবে না।

অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর আয়োজন করেছিলো রাজবাড়ির জামাই আনন্দিরাম মুখুজ্জে। মল্লিকা ফুলের মত বাসমতি চালের ভাতের সঙ্গে শুক্তো থেকে শুরু করে তিনরকমের মাছ, রুইমাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, পোলাউ, মাংস, চাটনি, পায়েস, দই, সন্দেশ, আম, কাঁঠাল, কলা। খেতে খেতে মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের এই দুর্দিনের মধ্যেও চন্দননগরের মতই কৃষ্ণনগরেই সুখসমৃদ্ধির অভাব নেই।

পানের খিলি হাতে নিয়ে এলেন আনন্দিরাম—এই যে রায় মশাই, পেট ভরেছে তো, গরীবের ঘরে খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন তো—

—কি যে বলেন, অপূর্ব রান্না, এ খেলে তৃপ্তি হবে না কার—বলতে বলতে সোজা হয়ে বসলো ভারতচন্দ্র। এক জোড়া পানের খিলি মুখে দিল। রূপোলি তবক মোড়া পান। আনন্দিরামের মুখেও বোধ হয় জোড়া খিলি। মশলার গন্ধে ভুরভুর করছে। অন্দরের দরজার দিকে মুখ করে আবার হাঁক দিলেন আনন্দিরাম—ওরে পঞ্চা, পঞ্চা, তামাক দিয়ে যা—

—আজ্ঞে, আমার কিন্তু তামাকের অভ্যেস নেই—ভারতচন্দ্রের জবাব শুনে বড় বড় চোখ করে তাকালেন আনন্দিরাম—সে কি মশাই, আপনার তামাকের অভ্যেস নেই, তাজ্জব করে দিলেন দেখছি, আপনি দেখছি এখনো নাবালক রয়ে গেছেন, তামাক না খেলে এই বয়সে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় কি করে, আর কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে বুদ্ধি খুলবে কেন আর বুদ্ধি না খুললে জীবনে উন্নতি করবেন কি করে, এই অভ্যেস আপনার এতদিনে কিছু হ'ল না, তামাকটি ধরুন, দেখবেন চড়চড় করে উঠে যাবেন—বলতে বলতে ভুঁড়ি দুলিয়ে হো হো করে হাসলেন আনন্দিরাম। তারপর আবার ডাক দিলেন—পঞ্চা, ওরে পঞ্চা—

বালক ভৃত্য পঞ্চানন দু'টি গড়গড়ায় তামাক সাজিয়ে নিয়ে এল।

পনেরো ষোল বছরের গোলগাল শ্যামলা রঙ ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ, চটপটে আর সবসময় হাসিমুখ। আনন্দিরাম বললেন—পঞ্চার হাতে সাজা তামাক খেয়ে দেখুন, কখনো ভুলতে পারবেন না, আমি নিজে ওকে শিখিয়েছি গড়গড়ার নলটি হাতে ধরিয়ে দিল পঞ্চানন। তাকিয়া ঠেস দিয়ে আয়েস করে টানতে লাগল ভারতচন্দ্র। মন্দ লাগছিল না। আবার বললেন আনন্দিরাম—কোথাকার তামাক বুঝতে পারছেন কিছু—

—আজ্ঞে না, তামাক টেনে জায়গার নাম বলে দেব, এতবড় পণ্ডিত আমি নই—বলতে বলতে সামান্য হাসল ভারতচন্দ্র। আনন্দিরামও হাসলেন। তারপর বললেন—এটি গয়ার উৎকৃষ্ট অম্বুরী তামাক, কাশীর জর্দা, গয়ার তামাক আর কেষ্টনগরের সরভাজা এর আর তুলনা নেই, অনেকে বিষ্ণুপুরী তামাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আমার ঘরেও মজুত আছে, তবে আমি গয়ার তামাকই পছন্দ করি, আমার ঘরে সব সময় ভাল জিনিস মজুত রাখি, কেষ্টনগরের বাজারের সবচেয়ে সেরা জিনিস, বুঝলেন, তামাক বলুন, পান বলুন, জর্দা বলুন, মাছ বলুন, মাংস বলুন, তরিতরকারি. দই, মিষ্টি, ওই মহারাজার জন্য যা যাবে, আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে আমার বাড়িতেও তাই আসবে—

—তা'তো বটেই আপনি হলেন রাজবাড়ির জামাই, আপনার সঙ্গে কার কথা—ভারতচন্দ্রের এই মন্তব্যে কিন্তু তেমন প্রীত হলেন না আনন্দিরাম।

কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন স্বরে বললেন—রাজবাড়ির জামাই বলে ভাববেন না, মহারাজার অনুগ্রহের উপর ষোল আনা নির্ভর করে আমি সংসার চালাই, আমার নিজেরও কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, ওই যে করালী মাঝির নৌকায় এলেন আপনি, ওই করালী হল আমাদের প্রজা, ওর মুখেই তো আপনার সব খবর শুনলাম—

—আরে না, না আমি সেরকম কিছু ভেবে বলিনি—তাড়াতাড়ি জিভ কেটে অপ্রতিভমুখে বললো ভারতচন্দ্র—আপনি ভুল বুঝবেন না—

—না, আপনাকে ভুল বুঝব কেন, আপনি নতুন মানুষ, আপনার আর দোষ কি, এখানকার অনেকেই এরকম মনে করে, অথচ তারা ভুলে যান, অনন্ত মুখুজ্জে কিংবা বলরাম চাটুয্যের মত আমি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহোদর ভগ্নীর স্বামী নই, আমার স্ত্রী হলেন মহারাজার পিসতুতো বোন—তারপর এফপলক এদিক ওদিক দেখে নিয়ে গলা নিচু করে আবার বললেন—আমার শ্বশুর শ্যামসুন্দর চাটুজ্জে হলেন মহারাজার পিসেমশাই, বুড়ো এমন হাড় কিপটে যে হাত ফসকে একটা কানা কড়িও বেরোয় না—বলতে বলতে আবার আগের মতোই সহজ সুরে হো হো করে হেসে উঠলেন আনন্দিরাম। হালকা হাসির হাওয়ায় অস্বস্তি, কুণ্ঠা আর ক্ষোভের বাষ্পটুকু পর্য্যন্ত উড়ে গেল।

—আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন রায়মশাই, আমিও ভেতরে গিয়ে সামান্য গড়িয়ে নেব, এটি আমার বরাবরের অভ্যাস, একটু দিবানিদ্রা না হলে—বলতে বলতে ফরাস ছেড়ে উঠলেন আনন্দিরাম—রোজ শোবার পর পা টিপে দেয় পঞ্চা, দিনে রাত্রে দুবার, পঞ্চা পা না টিপলে আমার ঘুমই আসবে না, ওর এমন মোলায়েম হাত, তামাক সাজা, কাপড় কুচানো, তেলমালিশ আর পা টেপা, এই কাজে ওর আর জুড়ি নেই, আমি নিজে তালিম দিয়েছি, দেবে নাকি আপনার পা টিপে, ওরে পঞ্চা. পঞ্চা—

—আরে না, না—প্রায় আঁতকে উঠলো ভারতচন্দ্র—ওসব অভ্যেস আমার নেই, পা টিপলে আমার ঘুমই আসবে না, আমার চাকর রঘুনাথ মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করে দেখেছে, আমার খুব অস্বস্তি হয়—

—সে কি মশাই, আপনি রাজবাড়ির ছেলে, চাকর দিয়ে পা টেপানোর অভ্যেস নেই, এসবতো বনেদী ব্যাপার—

—আজ্ঞে রাজার ঘরে জন্মেছিলুম বটে, তবে দশবছর বয়স

থেকেই দেশছাড়া, রাজবাড়ির সঙ্গে কোন সাশ্রব নেই, সেজন্ত বনেদী অভ্যেসগুলি ঠিক আয়ত্ত করতে পারিনি—

—আশ্চর্য কাণ্ডতো, আপনার সব কথা শুনতে হবে, রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার এখানে পাশার আড্ডা বসে, গল্পগুজব হয়, অনেকে আসেন, সকলের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব, সে সময় আপনার গল্প শুনব, কি বলেন—

আনন্দিরামের প্রস্তাব শুনে জবাব দিল ভারতচন্দ্র—নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে বলবো না তো আর কার কাছে বলবো—

— তা'হলে আপনি এখন বিশ্রাম করুন, বিকেলে কথা বলবো, আপনার যখন যা দরকার হয় বলবেন, নিজের ঘরের মত মনে করবেন, ওরে পঞ্চা' রায়মশাইর যখন যা দরকার হয় দেখবি, এখন চল আমার সঙ্গে—

আনন্দিরামের গড়গড়াটি হাতে নিয়ে পেছন পেছন চলে গেল পঞ্চানন।

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে রইল ভারতচন্দ্র। হাতে গড়গড়ার নল।

সামনে খোলা দরজার বাইরে আষাঢ় মাসের মেঘলা দুপুর। অলস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে গড়গড়া টানছিল ভারতচন্দ্র।

পরশু সকালে অধর মাঝির নৌকোয় চেপেছিল। তারপর প্রায় দুটো দিন দুটো রাত নৌকোয় কেটেছে। পরশুর আগের দিন সকালবেলা ফটিকচাঁদ এসে ডেকেছিল। সোজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল।

আপ্যায়নের সুরে বলেছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ—আসুন, রায়মশাই, আপনার জন্তই অপেক্ষা করছি—

—আমি তো নিজেই আসছিলুম, আপনি এত সকালে তলব দিলেন, কি ব্যাপার—

—এই দেখুন, নবাববাহাদুরের দরবার থেকে এক লক্ষ টাকা দাবী করে চিঠি দিয়েছে, ইংরেজ কুঠি ডাচ কুঠিতেও এরকম চিঠি গেছে, ইংরেজ কোম্পানীর কাছে নাকি তিরিশ লক্ষ চেয়েছে, ইংরেজদের না হয় বড় ব্যবসা আছে, তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আমরা একলক্ষ টাকা দেব কোথা থেকে—

তুলোট কাগজে লেখা পাকানো পত্রখানি হাতে নিল ভারতচন্দ্র।

পাশেই অপ্রসন্নমুখে দাঁড়িয়েছিলেন জগমোহন দত্তমশাই। চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে চিঠিখানি খুলে ধরল ভারত। নবাববাহাদুরের পক্ষ থেকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ পত্র দিয়েছেন। চিঠির ভাষা খুব সহজ সরল। কোন বাক্যচ্ছটা কিংবা বাগাড়ম্বর নেই। চোস্ত ফারসীতে লেখা পাকা ব্যবসায়ীর চিঠি।

চিঠির উপরে নবাববাহাদুরের পাঞ্জার ছাপ, চিঠির শেষে জগৎ শেঠের স্বাক্ষর, শিলমোহর। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

মহামান্ত নবাববাহাদুর যখন সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা রক্ষার জন্ত মারাঠা বর্গীদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, সেই দুঃসময়ে ফরাসী কোম্পানীর নিকট হইতে কোনপ্রকার সাহায্য পাওয়া যায় নাই। অপর পক্ষে মহামান্ত নবাব বাহাদুর এরূপ সংবাদ অবগত আছেন যে, ওই সময় ফরাসী কোম্পানী অধিক মুনাফার লোভে মারাঠা দুশমনদের নিকট গোলাবারুদ বিক্রয় করিয়াছে। এই জঘন্ত অপরাধের জন্ত সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সমগ্র এলাকার মধ্যে ফরাসী কোম্পানীর সকল প্রকার বাণিজ্যের অধিকার বাতিল করা হইল। যতদিন পর্য্যন্ত না নবাববাহাদুরের তোশাখানায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জমা দেওয়া হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে।

চিঠিখানি বার দুই মনোযোগ দিয়ে পড়ে মুখ তুলে বলেছিল ভারতচন্দ্র—এ যে মারাত্মক চিঠি—

—আর বলেন কেন—নড়েচড়ে বসেছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ—আমি এর একটা জবাব মুসাবিদা করেছি, আপনি ফরাসীতে তর্জমা করে দিন, কাল এই চিঠি নিয়ে শশধর চলে যাবে

কাশিমবাজার, সেখানকার কুঠির কর্তা মঁসিয়ে ল-সাহেব যা ভাল বুঝবেন করবেন। আজ গোলোকপতি বেঁচে থাকলে আমি এতটা ভাবতুম না, আপনি বোধহয় শুনেছেন গোলোকপতির খবর—দেওয়ানজীর কথার জবাবে বিষণ্ণমুখে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল ভারতচন্দ্র।

তারপর চিঠির জবাবের তর্জমা হ'ল। তারপর দেওয়ানজী নিজেই দু'খানি চমৎকার পরিচয়পত্র লিখে দিলেন। একখানি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। আরেকখানি দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রর নামে। যাবার আগে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ—আমি কায়স্থ-সন্তান আপনাকে আশীর্বাদ করার স্পর্ধা আমার নেই, অধিকারও নেই, তবে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি, মা জগদম্বা আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন, আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক, উচ্চশিক্ষিত মহৎ বংশের সন্তান আপনি, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আপনি যথাযোগ্য সমাদর পাবেন—

তারপর জগমোহন দত্তকে হুকুম দিলেন দেওয়ানজী—কাল খুব সকালে অধর মাঝির নৌকোয় রায়মশাইও যাবেন, অধরকে বলে দাও, যাবার পথে ওকে নবদ্বীপের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে যাবে, শশধরকেও বলে রেখো—

আজ আর দত্তমশাই অযথা হয়রান করার সুযোগ পেলেন না। মুখ কালো করে দেওয়ানজীর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এসে ভারতচন্দ্রকে লক্ষ্য করে কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন জগমোহন—তা'হলে সত্যই চললেন আমাদের ছেড়ে—

—তাইতো মনে হচ্ছে—মৃদু হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল ভারতচন্দ্র।

দত্তমশাইর মুখের চেহারা দেখে তার বেদম হাসি পাচ্ছিল। পেছন পেছন এসে ফটিকচাঁদ এই প্রথম হাত পেতে বললো—চলে যাচ্ছেন, রায়মশাই, আমাদের কিছু বখশিশ দিয়ে যান—ফটিকচাঁদ, সাধুচরণ, বৃন্দাবন। তিনজনেই এসে দাঁড়িয়েছে।

—এখনতো আমার কাছে কিছু নেই ফটিক, তুমি বরং ওবেলা আমার বাসায় এসো—

চিঠি দু'খানি হাতে নিয়ে যেন পাখির মত হাওয়ায় উড়ে এসেছিল ভারতচন্দ্র।

কিন্তু গোন্দলপাড়ায় রামেশ্বর মুখুজ্জের বাড়ির কাছে এসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। রোয়াকের সামনে দাঁড়িয়ে ছোড়দা' দয়ারাম রায় কথা বলছেন রামধনের সঙ্গে।

—একি ছোড়দা', তুমি—বলতে বলতে পায়ের ধুলো নেবার জন্ত নিচু হয়েছিল ভারত। জীবনে বোধহয় এই প্রথম। মাত্র দুই বছরের বড় দয়ারাম। দুইভাই একসঙ্গে খেলা করেছে, মারামারি করেছে। কিন্তু পায়ের ধুলো নেবার কথা কোনদিন মনে হয়নি।

আজ প্রায় সাতবছর পরে হঠাৎ ছোড়'দাকে দেখে প্রথমেই কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে এক রকম নিজের অজান্তেই যেন নীচু হয়েছিল ভারতচন্দ্র।

তাড়াতাড়ি ছোটভাইকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললো দয়ারাম—আরে থাক থাক, কেমন আছিস—

—এই আছি একরকম, তারপর তুমি হঠাৎ এলে কেন—

—এলুম তোকে নিয়ে যাবার জন্ত, বাড়ি ফিরে চল আমার সঙ্গে—

দয়ারামের কথা শুনে সোজাসুজি কোন জবাব দিল না ভারত। কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রামধন। দুইভাই এর প্রতিটি কথা গেলার জন্ত হা করে আছে।

তাকে লক্ষ্য করে বললো ভারত—রামধন, দাদার জন্ত জলপানের ব্যবস্থা কর, আর দুপুরে উনি আমার এখানে খাবেন, তোমাদের ভাঁড়ার থেকে চালডাল যা দেবার দিতে পারো, নয়তো আমি টাকা দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে এনে দাও—

—একি বলছেন, আপনি কিনতে যাবেন কেন, আমি সব যোগাড় করে দিচ্ছি—ব্যস্তভাবে যাবার জন্ত পা বাড়াল

রামধন। পেছন থেকে বললো দয়ারাম—ওহে কি নাম তোমার এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারো—

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই, ওরে ভগীরথ, বামুনের হুকোয় তামাক দিয়ে যা—হাঁকডাক করতে করতে চলে গেল রামধন।

ভারত ডাকলো—এসো ছোড়দা', ঘরে এসে ব'সো—

ঘরের ভেতর তক্তাপোষে বসতে বসতে বললো দয়ারাম—তুই এই ঘরে থাকিস, এই বিছানায়—

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল ভারত—এ আর কি দেখছো, এর চেয়েও খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম, গাছতলায় শুয়ে বহুরাত কাটিয়েছি, এতো অনেক ভাল—

—এরকম কষ্ট করে থাকার কোন মানে হয় না, তুই আমার সঙ্গে বাড়ি চল, বাবা তোকে দেখতে চেয়েছেন, মাতো শেষ দিন পর্য্যন্ত তোর কথা বলেছেন, তোর জন্ত চোখের জল ফেলেছেন—

—মা চলে গেলেন চৈত্র মাসে—ম্লান হেসে বলেছিল ভারত—আর আজ প্রায় তিনমাস পরে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে এলে, এখন আর গিয়ে কি হবে, কার কাছে যাব, আর কারো জন্ত আমার কোন—

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো দয়ারাম। আমতা আমতা করে বললো—তা' তুই কোথায় আছিস আমরা কিছুই জানি না, রঘুর কাছে খবর পেয়েছিলুম, খানাকুলে নাকি তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তাকে তো সেখানেই পাঠিয়েছিলুম, তারপরতো রঘুরও কোন খবর নেই, মাসখানেক আগে সে ফিরে গেল, তার মুখে শুনলুম তুই এখানে আছিস, বাবা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, রঘুই সঙ্গে করে নিয়ে এল—

—রঘু তোমার সঙ্গে এসেছে নাকি, কোথায় সে—

—গঙ্গার ঘাটে নৌকোয় রয়েছে, তুই নাকি রেগে আছিস, তাই তোর সামনে আসতে ভয় পাচ্ছে—

—ইচ্ছে করে কি আর রাগ করি, ছেলেটা এমনিতে ভাল, আমার খুব অনুগত—

—হ্যাঁ বড্ডো ভালবাসে তোকে—

—কিন্তু ছোড়দা,' ওর গোয়ার্তুমির জন্ত একেক সময় এমন বিপদে পড়েছি যে, আর ইচ্ছে হয় না ওর মুখ দর্শন করি—

এমন সময় তামাক সেজে আনল ভগীরথ।

ভারত বললো—ভগীরথ, ইনি আমার দাদা, আমার এখানে খাবেন, তুমি চাল ডাল ধুয়ে, উনুন সাজিয়ে দাও—

—আজ্ঞে আমি দিচ্ছি সব যোগাড় করে—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ভগীরথ। তামাক টানতে টানতে বললো দয়ারাম—আবার রান্নাবান্নার ঝামেলা করছিস কেন, চল, এইবেলা বেরিয়ে পড়ি, সন্ধ্যের আগেই শ্রীরামপুরের ঘাটে পৌঁছে রান্নার যোগাড় করবো, এবেলা বরং নৌকায় দই চিড়ের ফলার হবে—

ছোড়দা বরাবর ওইরকম। বড় সরল, স্বল্পে সন্তুষ্ট আর সবাইকে বড় সহজে বিশ্বাস করে। ছোড়দা ধরেই নিয়েছিল, সে নিজে যখন নিতে এসেছে, তখন ভারতচন্দ্র অবশ্যই যাবে। ছোটবেলা কোনদিন যে কথার অবাধ্য হয়নি, আজও নিশ্চয়ই সে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

কিন্তু সেই বালকবয়সের পর যে এতগুলি দিন-মাস-বছর কেটে গেছে। দু'জনের জীবন ধারা যে সম্পূর্ণ বদলে গেছে, সে কথা যেন ছোড়দা'র খেয়ালই নেই।

ছোড়দা' যেন এখনো এই উত্তরতিরিশের মধ্যযৌবনেও সেই বাল্যকালের মধ্যে রয়ে গেছে। এমন মানুষের মুখের উপর কোন অপ্রিয় সত্যকথা বলতে পারা যায় না।

সামান্ত ইতস্তত: করে বললো ভারতচন্দ্র—তুমি বরং আজকের দিনটা থেকে যাও ছোড়দা—

—আরে না, এখন ধান রোয়ার সময়, এবার বর্ষা কেমন দেরিতে নামল, আমাদের খাসের জমি যা আছে আমি আর মেজদাই দেখাশোনা করি, আমি না থাকলে মেজদা' একা সবদিক সামলাতে পারবে না, আমার আর দেরি করার উপায় নেই—ঘন ঘন হুঁকোতে কয়েকটা টান দিয়ে আবার

বললো দয়ারাম—তুই তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে, আর দেরি করে লাভ কি—

দয়ারামের মুখের দিকে তাকিয়েছিল ভারতচন্দ্র। কত নিশ্চিত বিশ্বাসে বলছে। এরকম সরল স্বভাবের মানুষকে নিরাশ করতে বড় কষ্ট হয়।

তথাপি নিরুপায়ের মত বলেছিল ভারতচন্দ্র—আমাকে মাপ করো ছোড়দা,' আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়—

—কেন তোর অসুবিধেটা কি, বাবা তোকে দেখতে চান, বড়দা' যেজদা' বড়বৌদি সবাই তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন, আমি নিজে তোকে নিয়ে যেতে এসেছি, এখন আর তোর অভিমান করে এভাবে দূরে থাকার কি যুক্তি আছে, খুলে বল আমাকে—একটু সময় চুপচাপ থেকে আস্তে আস্তে বলেছিল ভারতচন্দ্র—একটা কথা বলছি, কিছু মনে করো না ছোড়দা,' তোমরা সবাই আমাকে যেতে বলছো, কিন্তু তোমরা সকলেই জানো আমি বিবাহিত, রঘুর মুখে বোধহয় শুনেছো আমার একটি ছেলে হয়েছে, কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্রের কথা তো তোমরা কেউ বলছো না, তাদের নিয়ে যাবার কথা কেউ ভাবছো না, অন্ততঃ তোমার মুখ থেকেও তাদের কথা একবারও জিজ্ঞেস করতে শুনলাম না, আমি নিচু বংশে বিয়ে করেছি এটা আমার অপরাধ নয়, আমার স্ত্রীরও কোন অপরাধ নয়, আসলে এটাকে আমি কোন অপরাধ বলেই মনে করছি না, কিন্তু বাবা কিংবা বড়দা' কি চান আমি জানি, আমি যদি এখন স্ত্রীর সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে তাদের কাছে ফিরে যাই আর তাদের মনোমত কোন পাত্রীকে বিয়ে করি, তা'হলেই তারা আমাকে খুশি মনে গ্রহণ করবেন, কিন্তু তা' আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার স্ত্রীপুত্রকে ফেলে আমি তোমাদের কাছে ফিরে যেতে পারবো না, তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা ছোড়দা—উত্তেজনায় ভারতচন্দ্রের কর্সা মুখশ্রী রক্তিম হয়ে উঠেছিল। আর দয়ারামের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে জবাব দিয়েছিল সে—তুইও আমাকে ভুল বুঝিস না, ভারত, আমার উপর বড়দা' বড়বৌদি আছেন, বাবা রয়েছেন, তাদের কথার বাইরে আমি যাব কি করে, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাড়িয়ে বলেছিল দয়ারাম —তা'হলে আমি যাই, একটা কথা বলে যাচ্ছি আজকাল দেশের যেরকম অবস্থা হয়েছে, চারিদিকে যেরকম খুনোখুনি, মারামারি কাটাকাটি চলছে, তুই যেখানেই থাকিস, সাবধানে থাকিস, আর সম্ভব হলে মধ্যে মধ্যে খবর দিস—

—তুমি আজকের দিনটা থেকে গেলে পারতে ছোড়দা' —

—না আমার আর এখানে অপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই—

বিবর্ণ বিষণ্ণমুখে দয়ারামের সেই চলে যাবার দৃশ্যটা যেন চোখের উপর ভাসছিল ভারতচন্দ্রের। এখন আনন্দিরাম মুখুজ্জের বৈঠকখানা ঘরে সে বসে রয়েছে।

বাইরে শেষ দুপুরেই যেন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

আষাঢ়ের আকাশ জুড়ে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হ'ল।

(ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

# জাপানের দিনগুলি

## বারীন বর্দ্ধন

কুরাতা সেন্‌সেই পিউরিটান ধরণের লোক। হালে খ্রীষ্টান হয়েছেন। প্রতি রবিবারে গির্জায় যাওয়া আসা করেন এবং সময় অসময়ে জাপানীদের সমাজগত দোষত্রুটির কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। জোড়হাতে নমস্কারের ভঙ্গীটা দেখে রীতিমত উচ্ছ্বসিত হয়ে বারবার বললেন—এই সবচেয়ে ভাল। একএকবার বলছেন আর জোড়হাতে আমাদের দিকে ফিরে চাইছেন। ভাবটা এমন যে ক্ষমতা থাকলে হয়ত তক্ষুনি দেশে আইনজারী করে করজোড়ে নমস্কারের ভঙ্গী চালু করে দিতেন।

এবার কুরাতা সেনসেইর শরণাপন্ন হলাম হিরোসিমা —নাগাসাকির প্রোগ্রাম তৈরী করে দেবার জন্য। কুরাতা সেনসেই টোকিওর বাসিন্দা। তবুও যতটা সম্ভব Travel Guide দেখে প্রোগ্রাম তৈরী করে দিলেন। যাতে হিরোসিমা পৌঁছে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য সেখানকার বিশপের নামে একটা পরিচয়পত্রও সঙ্গে দিলেন।

ভ্রমণ করা জাপানের মাটিতে অতি সহজ ব্যাপার। ভ্রমণ তালিকা নিয়ে সোজা চলে এলাম জাপান ট্রাভেল ব্যুরোর অফিসে। ব্যুরোর লোকেরাই হোটেল থেকে সুরু করে কখন কোন্ ট্রেন কোথায় পৌঁছুবে এবং তক্ষুণি দ্বিতীয় ট্রেণ পাওয়া যাবে কিনা—সব নিখুঁত ভাবে চার্ট করে এঁকে দিল। টিকিট সম্বন্ধে খোঁজ করতেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন যে টোকিও থেকে সব জায়গা ঘুরে আবার ফিরে আসার জন্য রিটার্ণ টিকিট জাপান ট্রাভেল ব্যুরোতেই পাওয়া যাবে।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের মত। অন্যদের তুলনায় কথাবার্ত্তার ধরণ রুক্ষ। তবে অল্পবয়সীদের মত একজনের সঙ্গে কথা শেষ না করেই আরেকজনের তদারকে ব্যস্ত হয়ে পড়েন না। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আরও দু'তিনজন অন্যদের কথাবার্ত্তার জবাব দিচ্ছে। প্রয়োজনমত তৈরী করে দিচ্ছে সাত, দশ বা পনর দিনের ভ্রমণ তালিকা।

জাপান ট্রাভেল ব্যুরোর অফিসে ঢুকে প্রথমটা হক্‌চকিয়ে গেলাম এতগুলো চোস্ত্ ইংরেজী জাপানীভদ্রলোক দেখে। কার কাছে গিয়ে আমাদের তালিকাটি দেখাব ভাবছি, এমন সময় বুড়ো ভদ্রলোকটিকে দেখলাম এককোণে দাঁড়িয়ে। একা এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলেই যে নজরে পড়েছিল, তা নয়। ভদ্রলোকটির বিশেষত্ব ছিল তাঁর চশমা। ঠিক এই ধরণের চশমা এর আগে দেখিনি। চশমার কাচ দুটো ঝুলছে ছোট ছোট কব্জার উপর। যখনই ভদ্রলোক কারুর সঙ্গে কথা বলেন, কাচ দুটো ঠেলে কপালের উপর তুলে ধরেন। কাগজপত্র পড়বার সময় আবার টেনে নামিয়ে আনেন চোখের সামনে।

ঝুঁকে ট্রেনের গাইড্ দেখছিলেন। আমি আর ডাক্তার আগরওয়াল ধীরে ধীরে কাউন্টারের দিকে এগোতেই ভদ্রলোক চশমার কাচদুটোকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে

কাউন্টারের ধারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের প্রয়োজন।

কুরাতা সেন্‌সেইর লেখা কাগজটা সামনে খুলে ধরলাম। ভদ্রলোক চশমার কাচ দুটো এবার নামিয়ে এক নজরে সবটা দেখে নিলেন। বেড়াবার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে বললেন আর সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিলেন হোটেলের। এই জাপান ট্রাভেল ব্যুরোর আওতায় আছে বহু ধরণের হোটেল। এবং দর্শনীয় সমস্ত জায়গায় দু পাঁচটা করে এই হোটেল ছড়িয়ে রয়েছে। ব্যুরোর যে কোন অফিসে টাকা জমা দিয়ে কুপন কিনে সবাই রওয়ানা হয় দেশ দেখতে। নির্বাচিত হোটেলে গিয়ে ঐ কুপন জমা দিলেই এক মুহূর্তে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে এবং কথাবার্তার রকম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে এরা শুধু দেশ দেখেই খুশী। খাওয়া বা থাকার আড়ম্বরে এরা পক্ষপাতী নয়। তাই যখন জিজ্ঞাসা করলাম দক্ষিণ জাপানের হোটেলে কত খরচ পড়বে এবং যদিও আমরা চারজন তবু ছোট হলেও দুটো ঘর এবং বড় হলে একটা ঘরেই থাকা চলবে কিনা, বুঝে নিলেন আমাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য এবং উপদেশের ভঙ্গীতেই বললেন—ইউরোপীয় কায়দার হোটেলে না থেকে জাপানী সরাইখানাতে থাকুন। তাহলে একটা ঘরে সবাই থাকতে পারবেন এবং খরচও পড়বে কম।

কথাটা আমার এবং ডাক্তার আগরওয়ালের মনে ধরল। হিসেব করে দেখলাম যা আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়ে কিছু সস্তাই পড়বে। তবুও আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্যই জিজ্ঞাসা করলাম - দেখুন, সাধারণত আমরা থার্ড্ ক্লাশেই বেড়াব। তবে যেখানে চলার পথে রাত এসে পড়বে সেখানে কিন্তু স্লিপার বার্থের ব্যবস্থা চাই।

আমাদের অবস্থা এবার ভদ্রলোক পুরোপুরি বুঝে নিলেন। কোন ভূমিকা না করেই বললেন—আপনারা নিশ্চয়ই এখানে পড়াশুনা করতে এসেছেন। যদি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সার্টিফিকেট্ আনতে পারেন তবে ট্রেনের ভাড়া আরও সস্তা হবে। আপনারা ছাত্র কন্‌সেসন পাবেন।

—কন্‌সেসনের হার কত?—সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার আগরওয়াল প্রশ্ন করল।

—জাশনেল রেলওয়ে এবং ষ্টিমার ওয়েতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কন্‌সেসন।

উত্তরটা শুনে অবাক হবারই কথা। দশবছর আগে ছাত্রজীবন পার করে দিয়ে এসেও যদি সেই ছাত্রজীবনের সমস্ত সুখসুবিধা উপভোগ করা সম্ভব হয় তবে সে আনন্দের জোয়ার আমাদের মত ভুক্তভোগীদের কাছেই ধরা পড়ে। স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন মাষ্টারমশাইদের তাড়নায় এক একসময় বিতৃষ্ণা এসে যেত এই ছাত্রজীবনের উপর। সেই ছাত্রজীবন নিয়ে একদিন ক্লাশে বসে প্রবন্ধ লিখছি। সুরুতে মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কার কিরকম ধারণা। সবাইর উত্তরের সারমর্ম ভেবে এই ধারণাই হয়েছিল যে ছাত্রদের চোখে ছাত্রজীবন মানেই বিভীষিকার রাজত্ব। কেবল মাষ্টারমশাই তার বর্তমানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিগতজীবনের ঘটনাবলী মিলিয়ে জোরালো গলায় বুঝিয়ে ছিলেন ছাত্রজীবনের মাহাত্ম্য। তখন তা একেবারেই ভাল লাগেনি। প্রতিবাদের সাহস থাকলে হয়ত তাই করতাম। দশ বছর পরে জীবনের মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে টের পেলাম মাষ্টারমশাইর উচ্ছ্বাসের কারণ। আজ আমার কাছে ছাত্রজীবনের সব আনন্দই আছে। আছে সমস্ত উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা হৈ হল্লা। কেবল দূরে সরে গিয়েছে সকাল সন্ধ্যার তাড়না। ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছে বছর বছর বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশের দায়িত্ব।

পরদিনই স্কুল থেকে সার্টিফিকেট্ নিয়ে এলাম এবং দুপুরের শেষে আবার গেলাম ব্যুরোর অফিসে। আর কিছু

বলতে হলনা। ভদ্রলোক টিকিট কেটে এনে হোটেল থেকে সুরু করে বিদেশীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যাদি বুঝিয়ে বললেন অনেকক্ষণ ধরে এবং আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে অনুরোধ করলেন আমরা যেন কোন অসুবিধা হলেই ব্যুরোর স্থানীয় অফিসে গিয়ে তাদের সাহায্য নিই।

উত্তর জাপান পরিক্রমার পর বেড়াবার ব্যবস্থা আর নূতন করে করতে হলনা। কেবল দু'একটা দরকারী জিনিষ নেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিষ একেবারে ছেটে ফেলা। হোটেল বা সরাইখানা—যত নগণ্য বাসস্থানই হোক না কেন, বিছানা বা ঘুরে বেড়াবার জন্যে জুতো বা পরবার কিমোনো—কোনটাই সঙ্গে করে বইতে হয়না জাপানে। হোটেল থেকেই তার ব্যবস্থা করা হয়। দিনক্ষণ দেখেই হয়ত বেরোতাম নিজের দেশে। তবে এখানে বোহেমিয়ানদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধু আনন্দ আহরণের জন্য। যে আনন্দ অসীমের মতই বিমুক্ত। বাধা মানেনা কোন শাসনের বা অপেক্ষা রাখেনা কোন রাজনীতি বা আচারব্যবহারের। তাই একদিন ঝড়জলের রাতে ট্যাক্সী চেপে চারটি প্রাণী চলে এলাম টোকিও ষ্টেশনে। জলকাদার মাঝেই বেরিয়ে পড়লাম দাক্ষিণাত্য বিজয়ে। হিরোসিমা—নাগাসাকির বিভীষিকাময় রূপ উদ্‌ঘাটন করতে।

আগেই ঠিক করা ছিল যে রাত্রির যাত্রাগুলো সব হবে স্লিপিং কোচের মাধ্যমে। হোক্কাইদো ঘুরে স্লিপিং কোচের মহিমা জেনে গিয়েছিলাম। হাকোদাতে—ওতারুর অভিজ্ঞতাটা পুরুষমানুষ হয়েও আমাদের কাছে এমন এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যে স্কুলের সার্টিফিকেট দিয়ে স্লিপিং কোচের কোন কনসেসন্ পাওয়া না গেলেও খরচটা গায়েই লাগল না।

হিরোসিমা—নাগাসাকী বেড়াবার প্রোগ্রাম তৈরী করতে গিয়ে এত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে গাড়ী টোকিও ছাড়বার পরেও সঙ্গী মহিলা দু'জন নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ ফুটে বলতে পারেননি প্রতীক্ষমান ভ্রমণ সুরু হল কিনা। ইলেকট্রিক ট্রেন একে একে ইউরাকুচো, শিম্বাসি পেরিয়ে যখন ছুটতে লাগল ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে, একমাত্র তখনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দু'জনে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—যাক, এবার রওয়ানা হওয়া গেল।

এ গাড়ীতে সোজা চলেছি আমরা ওসাকা এবং পরের দিন ও রাত কাটিয়ে আমরা রওয়ানা হব বেপ্পুর দিকে।

স্লিপিং কোচ হওয়ার জন্য ঘুমের ব্যাঘাত হলনা কারুরই। বরং অতি আরামে ট্রেনের দোদুল্যমান কামরায় অনভ্যস্তদের নাসিকাগুঞ্জনও কানে ভেসে আসতে লাগল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। যখন খেয়াল হল দেখি গাড়ী কিয়োতো ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছে। আর ফেরীওয়ালার দল প্রাতঃকালীন চা এবং খাবার নিয়ে হেঁকে যাচ্ছে—ওবেনতো, ওচা।

রাতে হোষ্টেল থেকেই খেয়ে বেরিয়েছিলাম। পথের মাঝে একমাত্র সবুজ ভেলভেটের গদীতে ডানলোপিলোর বালিশে মাথা রেখে ঘুমোনো ছাড়া আর কোনই পরিশ্রম করতে হয়নি। শুধু চা শুনলে হয়ত আপার বার্থ থেকে নেমেই পড়তাম ঐ ভোরে। কিন্তু ওচার পুরোপুরি অর্থ এবং বেনতোর সামগ্রী অজানা ছিলনা বলে একটু মাথা তুলেই আবার শুয়ে পড়লাম। সূর্য্যোদয়ের দেশের লোকেরা সূর্য্যোদয়েই হয়ে পড়ল কর্মব্যস্ত। ট্রেনের একদিকে ছিল টয়লেট্ বাথরুম ইত্যাদি। ঘন ঘন আনাগোনা সুরু হল সে দিকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতমুখ ধুয়ে এসে সবাই বসে পড়ল "বেনতোবাকো" হাতে নিয়ে। ছোট, চৌকোনো বাক্স। চারভাগের তিনভাগই সাদাভাতে ঠাসা। আর একভাগে রয়েছে শুকনো মাংস। একপাশে রাখা আছে চপ্‌ষ্টিক্। একই ধরণের জাপানী খাবার। কাঠির ফাঁকে ঝরঝরে ভাত পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই ভাত কিছুটা চট্‌চটে। খাওয়া সুরু হয়ে গেল বেনতো এবং ওচা।

ওসাকা জাপানের বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। স্কুলে ভূগোল পড়তে গিয়ে বহুবারই শুনতে হয়েছে কেন ওসাকাকে মানচেষ্টার অব্ দি ইষ্ট্ বলা হয়। কাজেই কমর্সিয়াল সিটি কলকাতার সঙ্গে ওসাকার বহু মিল রয়ে গিয়েছে। ষ্টেশন প্ল্যাট্ফর্ম লোকে লোকারণ্য। কারো গায়ে ধাক্কা না দিয়ে দু'পা এগোনো রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভিড় দেখে চটে যাবার মত পরিবেশে আমি বড় হইনি। আর ডাক্তার আগরওয়াল বা সঙ্গী মহিলা দু'জন দেশের থার্ড-ক্লাশ কামরায় বহুবার চলাফেরা করেছেন। কাজেই ভিড়ের চাপে কোনই অসুবিধা বোধ হচ্ছিল না।

কিন্তু একটা ব্যাপার বড়ই অস্বস্তিকর মনে হল। যতটা না ভিড় তার চেয়ে বেশী ভিড় যেন আমাদের চার পাশে। সাধারণ ভিড় চলমান। আর আমাদের আশেপাশের লোকেরা যেন চলার ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য থেমে যাচ্ছে। কি ছেলে, কি মেয়ে—সবই যে যার দিকে চলে যাচ্ছে সত্যি। কিন্তু যেতে যেতে ও এক পাঁক ঘুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে। বড়ই গোলমেলে মনে হল। ঠিক করলাম এর পরের জন যখনই ফিরে তাকাবে তখনি ধরে জিজ্ঞাসা করবে কৌতূহলের কারণ।

কিন্তু আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না। গেটে টিকিট দেবার একটু আগেই ইংরেজী ধরণের পোষাক পরা এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেসা করলেন—আপনার কোত্থেকে আসছেন?

আমার এবং ডাক্তার আগরওয়ালের পরণে ছিল কোট প্যাণ্ট্। কাজেই জাপানীদের কাছে তা একেবারেই অদ্ভুত মনে হয়নি। ওদের কৌতূহল হয়েছে মহিলাদের শাড়ী দেখে। আগরওয়াল গৃহিণী এবং মিস্ ফিলিপস্—দুজনেরই পরণে ছিল ভারতীয় শাড়ী। কৌতূহল মিটিয়ে দিয়ে একেবারে বেরিয়ে এলাম ওসাকার পথে।

টোকিওর হোষ্টেল থেকে রওয়ানা হবার আগের দিনই ওসাকা হোষ্টেলের অধ্যক্ষের নামে একটা পরিচয়পত্র সঙ্গে এনেছিলাম যাতে একদিন এবং একরাত সেখানে কাটাতে কোন অসুবিধা না হয়। ছোট ছোট ট্যাক্সী সার বেঁধে একদিক থেকে গেটের কাছে চলে আসছে। আবার লোক ভর্ত্তি করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাত্রী-দলের মধ্যেও কোন ধাক্কাধাক্কি নেই কে আগে ট্যাক্সি চড়বে তাই নিয়ে। যে যার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে আর দু'মিনিটেই বেরিয়ে পড়ছে গন্তব্যস্থলের দিকে। এমনি একটি ছোট ট্যাক্সিতে করে আমরা রওয়ানা হলাম পুরোনো "হোটেল নানিওয়ার" দিকে।

ওসাকা হোষ্টেল আগে ছিল আমেরিকান সৈন্য-বিভাগের একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেল। যুদ্ধের পর একে করা হয়েছে ছাত্রাবাস। তাই ট্যাক্সির ড্রাইভাররা একে চেনে "হোটেল নানিওয়া" নামে। নানিওয়া নাম শুনেই ট্যাক্সি একটা মোড় নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল সহরের দক্ষিণ দিকে। চওড়া রাস্তা। কলকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মতই পাথর আর সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী হয়েছে যানবাহন চলাচলের পথটি। ষ্টেশন থেকে পাঁচমিনিটের রাস্তা। তাই ব্রেক্ফাষ্টের সময়টা পার হবার বেশ আগেই এসে পৌঁছুলাম হোটেল নানিওয়ায়।

বিদেশী যে সব ছাত্র ওসাকা থেকে পড়াশুনা করে তারাই থাকে হোটেল নানিওয়ায়। আর থাকে আমাদের মত ক্ষণস্থায়ী, ভবঘুরের দল যাদের পুঁজিপাটা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছোট্ট কোর্ট-ইয়ার্ড। শাড়ী গিয়ে দাঁড়াতেই এক জাপানী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে ঢুকে পড়লাম নানিওয়ার লাউঞ্জে।

পাশেই অফিসের কাউণ্টার। সকালেও একজন অপেক্ষা করছে ভোরের আগন্তুকদের জন্য। সঙ্গিনী দু'জনকে লাউঞ্জে বসিয়ে আমি আর ডাক্তার আগরওয়াল পরিচয় পত্রটি সঙ্গে করে এগিয়ে গেলাম কাউণ্টারের দিকে।

দাঁড়িয়ে রয়েছি। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন উর্দু মেশান হিন্দীতে ডেকে বলল—এই যে, আপনারা কখন এসেছেন?

ফিরে দেখি দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে পাকিস্থানের জাফর। ছিপ্‌ছিপে ধরণের চেহারা। টেক্সটাইল সম্পর্কে শেখবার জন্যে জাপানী সরকারের বৃত্তি নিয়ে এসেছে মাস দু'তিন আগে। প্রথম কয়েকদিন টোকিও ছাত্রাবাসে ছিল এবং সেই থেকেই আলাপ পরিচয়। চেনা মুখ দেখে এগিয়ে গেলাম। নিজেদের আগমনের কারণ সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আপনাদের ছাত্রাবাসে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা আছে কি?

কাউন্টারের লোকটিও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। প্রশ্নটা শুনে সে মাথা নেড়ে বলল—এখানে তো মেয়েদের থাকার কোনই ব্যবস্থা নেই। তবে যদি অধ্যক্ষমশাই রাজী হন তা হলে একটা খালি ঘরে দু'একদিনের ব্যবস্থা হতে পারে।

অধ্যক্ষমশাইকে সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়ে দিল কাউন্টারের লোকটি। আর আমাদের নিয়ে গেল বসবার ঘরে। জাফর ছেলেটি বেশ মিশুক। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক কম। টোকিওতে শুনেছিলাম ওর মা ছিলেন বাঙ্গালী এবং বাবা বিহারের সম্পন্ন মুসলমান। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় চলে গিয়েছে সবাই। আমাদের বসবার ঘরে রেখে ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলে গেল। আর যাবার আগে জানিয়ে গেল নিজের ঘরের নম্বর। মিনিট দশেকের মধ্যেই অধ্যক্ষমশাই এলেন এবং ঢুকতে গিয়ে সবাইকে আনত হয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। যদিও গাড়ীতে কারোর কোনই কষ্ট হয়নি, তবুও ট্রেনের পোষাকে সারা সকাল এভাবে বসে থাকতে একেবারেই ভাল লাগছিলনা। তাছাড়া ভদ্রমহিলাদের থাকার ব্যবস্থা নিয়েও আমরা ভাবছিলাম।

অধ্যক্ষমশাই ঢুকতেই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিলাম পরিচয়পত্রটি এবং পড়বার জন্য এক মিনিট সময় দিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, মহিলাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা হবে কি!

নীচের দিকে তাকিয়ে অধ্যক্ষমশাই মাথা নাড়লেন এবং পরে মুখ তুলে বললেন—দেখুন, এই ছাত্রাবাস খুবই হালফ্যাসানের। কিন্তু মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা একেবারেই নেই। তার চেয়ে এক কাজ করুননা? কাছেই Y. W. C. A. আছে। মহিলা দু'জন সেখানেই থাকতে পারেন। খাওয়াদাওয়ার সময় এখানে চলে আসবেন।

কথাটা সবারই পছন্দ হল। অধ্যক্ষমশাইও টেলিফোনে Y. W. C. A.-র একটি ঘর ঠিক করে দিলেন। অধ্যক্ষমশাই মধ্যবয়স্ক। অনেক কথাবার্তা হল তার সঙ্গে। দক্ষিণ জাপানের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো নিয়েও কিছু বললেন। একটু পরেই ভদ্রলোক আগরওয়ালের মেয়ের দিকে তাকিয়ে শিশুসুলভ ভঙ্গিমায় হেসে বললেন—নমস্তে।

ভারতীয়রা সাধারণত জাপানে পড়তে গিয়ে থাকেন টোকিওর ছাত্রাবাসে। ওসাকার ছাত্রাবাসে তাদের বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই 'নমস্তে' কথাটা শুনে আমি এবং ডাক্তার আগরওয়াল দু'জনেই এক সঙ্গে বলে উঠলাম—আপনি কোনদিন ভারতে ছিলেন কি?

(ক্রমশঃ)

স্মৃতিকথা

# "যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে"

কণা রায়

জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে গিয়ে প্রথমেই লাভের যে বড় অঙ্কটার দিকে চোখে পড়ে সেটা হ'ল সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের পুণ্য সান্নিধ্য।

খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে—গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারে কোন্ এক অদৃশ্য ফাটলের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক হাওয়া কিছুটা প্রবেশ করেছিল, যার ফলে বড়দের মধ্যে সবসময় চাপা উত্তেজনা ও গোপন আলোচনা চলত। আমাদের বাড়ীতেই গড়ে উঠেছিল একটি মহিলা সমিতি ও পাঠাগার। সেখানে বহুসংখ্যক মহিলা আসা যাওয়া করতেন। লাঠি খেলা, ছোড়া খেলা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নানারকম 'তথাকথিত' নিষিদ্ধ বই ও কাগজ পড়া হত।

মফঃস্বল সহর—খুব সহজেই পুলিশের দৃষ্টি পড়ল সমিতির উপর। পুলিশের নজরে আসার বাড়ীর সকলকে বেশ কিছুটা দুর্ভোগ ভোগ করতে হ'ল। পাঠাগারের বহু বই পুলিশ হস্তগত করল—ফলে সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরিবারের মধ্যে বাইরের নানারকম খবরের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ বন্ধ হ'লনা, গোপনে সবই চলতে লাগল। এরই কিছুদিন পর সম্ভবতঃ ১৯৩৯ সাল, একটি ইংরাজী পত্রিকা এসে পৌঁছুল আমাদের বাড়ীতে, নাম "ফরওয়ার্ড ব্লক"। বাড়ীর একটি ছোট ঘরে গুরুজনদের অলক্ষ্যে সেটি লুকিয়ে রাখা হ'ল। অদম্য কৌতূহল নিয়ে একসময় পত্রিকাটি উল্টে-পাল্টে দেখলাম। ১০ বছরের মেয়ের পক্ষে সব কিছু বোঝা সম্ভব ছিলনা তবে অন্যান্য সাধারণ পত্রিকার চেয়ে যে এটা স্বতন্ত্র সেটুকু বুঝেছিলাম। সেই সঙ্গে শুনেছিলাম কতকগুলো নাম—তার মধ্যে একটি 'লীলা রায়'।

তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল, এই নাম শুনতে শুনতে বড় হ'লাম এবং ক্রমে ক্রমে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। যতই জানলাম ততই আগ্রহ বাড়তে লাগল তাঁকে দেখবার জন্য। ১৯৪৯ সাল, ২৩ শে জানুয়ারীর ভোরে উৎসব মুখরিত কলকাতায় এসে যখন পৌঁছলাম তখন প্রথমেই মনে হ'ল এতদিনে হয়ত লীলাদিকে দেখবার সুযোগ পাব। প্রথম যেদিন দেখলাম, মনে আছে, সেদিন এই অপূর্ব্ব শ্রীময়ী ও মহিমান্বিত দেবীমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে অপার বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর দীর্ঘ ২১ বছর ধরে নানা ঘটনা ও কাজের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে কাছে এসেছি—লীলাদি হয়েছেন 'দিদি'। যত কাছে এসেছি, যত জেনেছি, ততই বিস্ময় বেড়েছে। মনে হয়েছে একই মানুষের মধ্যে এত গুণের সমাবেশ কি করে সম্ভব? দিদির রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলনা বললেই চলে। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মহিলা সংহতি' প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আমার ক্ষুদ্রশক্তি দিয়ে যতটুকু সম্ভব কাজ করবার চেষ্টা করেছি। আর এই কাজকে উপলক্ষ্য করেই গড়ে উঠেছে স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক।

দিদির কথা লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত ঘটনাগুলিই আজ বেশী করে মনে পড়ছে। যেখানে যে অবস্থাতেই দেখা হোক না কেন ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তাই আগে হ'ত।

তারপর কাজের কথা। সামান্য অসুস্থতা বা কোনও রকম মানসিক অ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই দিদির চোখ এড়িয়ে যেতনা। আমার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য সব সময়েই উদ্বেগ প্রকাশ করতেন ও নানারকম উপদেশ দিতেন। মাঝে মাঝে যখন বেশীরকম অসুস্থ হয়ে পড়তাম, সমস্ত কাজ ফেলে দেখতে আসতেন। আমার মত সাধারণ একজন কর্ম্মীর কাছে এ যে কত বড় পাওয়া কী করে বোঝাব!

১৯৬১ সাল—ইলেকশানের প্রস্তুতি চলছে চারিদিকে। দিদি সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। সেই সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম। কয়েকটা দিন পর, সেদিন ছিল ২৫ শে ডিসেম্বর, সন্ধ্যাবেলা দিদি এলেন আমাকে দেখতে। ভাবতে পারিনি এত ব্যস্ততার মধ্যেও দিদি আসবেন। এসে প্রথম কথাই বললেন—'তোমার দুর্ঘটনার খবর ঠিক সময়েই পেয়েছি কিন্তু কিছুতেই সময় করে তোমাকে দেখতে আসতে পারছি না সেজন্য নিজেকে ভয়ানক অপরাধী মনে হচ্ছে। আজ জোর করেই সব কাজ ফেলে বেড়িয়ে পড়েছি।' কত বড় মহৎ প্রাণ হ'লে একজন সাধারণ কর্ম্মীর জন্য এভাবে চিন্তা করতে পারেন তাই ভাবি। শুধু আমার জন্যই নয়, ছোট বড় প্রত্যেকের জন্য সমান মমতা ছিল দিদির। যে লোকটি দিদির বাড়ীতে কাজ করত তার টাইফয়েডের সময় দেখেছি, দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে তার সেবা করতে। তাকে হাসপাতালে দেওয়ার কথা বলেছিলেন দু'চারজন, উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার আত্মীয়-স্বজন কারও হ'লে কি করতাম?' এর পরে আর কথা চলে না।

সাধারণ মানুষের দুঃখ ও দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তে দেখেছি দিদিকে। দেশ বিভাগের পর লক্ষ লক্ষ পরিবারকে যে দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে তার প্রতিকারের জন্য একদিকে যেমন সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন, অসুস্থ শরীরে চিকিৎসকের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করে কারাবরণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অসীম মমতা নিয়ে এই সব ছিন্নমূল পরিবারগুলিকে বাঁচাবার জন্য, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বার বার ছুটে গিয়েছেন। দিদির কাছে ছিল সকলের অবারিত দ্বার। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বহুলোক যাতায়াত করত তাঁর বাড়ীতে। অসীম ধৈর্য্য নিয়ে প্রত্যেকের কথা শুনতেন এবং যতক্ষণ না কোনও ব্যবস্থা করতে পারতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত অস্থির হয়ে থাকতেন, আহার বা বিশ্রামের কথা মনে থাকতনা। দিদির কাছে একবার যে এসেছে সে কিছু সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে। কাউকে কখনও একেবারে নিরাশ হয়ে ফিরতে দেখিনি।

অপূর্ব্ব মমতাময়ী দিদি কিন্তু অন্যদিকে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কোনওরকম অন্যায়কে যেমন জীবনে মেনে নিতে পারেননি, তেমনি কারও কোনও অন্যায়, কাজে এতটুকু ত্রুটি বা গাফিলতী কখনও ক্ষমা করেননি। সেখানে তিনি ছিলেন নির্ম্মম বিচারক। কিন্তু সেইসঙ্গে দেখেছি, যাকে তিনি অন্যায়ের জন্য ভৎর্সনা করেছেন তীব্র ভাষায়, তারই দুঃখে নিজে দুঃখ পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।"

এরই মূর্ত প্রতীক ছিলেন দিদি। কত অল্পে আমরা ধৈর্য্য হারাই, কত সামান্য কারণে, বোঝার ভুলে অকারণ অশান্তির সৃষ্টি করি নিজেদের মধ্যে। অথচ দিদি কী অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে নিয়ে কাজ করেছেন। যে কোনও সমস্যার সহজ সমাধান করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল দিদির। কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় সহজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেছি যে অমুককে দিয়ে কিছু হবেনা, অমুক একেবারে কাজের অনুপযুক্ত। কিন্তু দিদি কখনই সেকথা বলতেন না, বলতেন—'মানুষ তৈরী করতে শেখো। তোমার

পছন্দমত মানুষ তোমার কাছে আসবে আর তাকে নিয়ে তুমি কাজ করবে এ কখনও হয়না। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, সেগুলি সংশোধন করে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়।' এই মানুষ গড়ার কাজে দিদির ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। অবাক হয়ে দেখেছি যাদের একেবারে কাজের অনুপযুক্ত বলে মনে হ'ত, দিদির শিক্ষায় তারাই পরে কত বেশী কাজের লোক হয়েছে।

দিদি আর আমাদের মধ্যে নেই। সমস্ত কথা, সমস্ত ঘটনা আজ শুধু অতীতের স্মৃতি। রোগে, শোকে আর সেই কল্যাণহস্তের স্পর্শ আমরা পাবনা। মানুষ অমর নয়—দিদি যে চলে যাবেন তার বহু সঙ্কেত আমরা পেয়েছি তবুও যেন বিশ্বাস করিনি। আজ তাই মনে হয়—কত কথা বলার ছিল, বলা হ'ল না, কত কথা শোনার ছিল কিছুই শোনা হ'লনা। চারিদেকে আজ শূন্যতার হাহাকার, ২১ বছরের স্মৃতি এর কতটুকু ভরিয়ে রাখতে পারবে জানিনা।

দীর্ঘ ২৯ মাস ধরে হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন দিদি। মনে হত কোনও বৃহত্তর কল্যাণের সাধনায় ধ্যানমগ্না এক তপস্বিনী। প্রতিদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছি। কেবিনের দরজায় হাত রাখলেই মনে পড়ে যেত ছোটবেলার একটি ঘটনা—এক ভদ্রলোক মৃত্যুশোকের আঘাতে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে বছরে একবার আসতেন সবাইকে দর্শন দিতে। লোকালয়ের বাইরে দেবস্থানে ২।১ দিনের জন্য ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটিয়ে যেতেন। বহুলোক তাঁকে দর্শন করতে যেত। আমরা ছোটরাও বড়দের সঙ্গে যেতাম। গুরুজনরা বারবার সাবধান করে বলতেন—'গোলমাল কোরোনো, দর্শন করেই চলে এসো।' দিদির কেবিনের দরজায় দাঁড়ালেই আমার মনে হত অলক্ষ্যে থেকে কেউ যেন বলছেন—'গোলমাল করে যেন ধ্যানভঙ্গ কোরোনা।' নিঃশব্দ পায়ে বেড়িয়ে আসতাম আর আশায় থাকতাম ধ্যানভঙ্গের। কিন্তু অমৃতলোক থেকে যাঁর আহ্বান এসেছে, পৃথিবীর কোন্ মায়া তাঁকে ধরে রাখবে?

জন্মান্তরে আমরা বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাস করি আত্মার অমরত্বে। জানিনা কতজন্মের সাধনার মধ্য দিয়ে আবার আমরা দিদির কাছে পৌঁছব—কোনওদিন পৌঁছতে পারব কিনা!

স্মরণীয় ১১ই জুন—আলোর রথে চড়ে চলে গেলেন দিদি। প্রণাম করলাম সেই পথিক আত্মাকে আর প্রার্থনা করলাম পুনরাগমনায় চ। মনের গভীরে ধ্বনিত হতে লাগল:

"মৃত্যুই জীবনের শেষ নহে
শোনাও
অনন্তকাল ধরি অনন্তজীবন
প্রবাহ বহে।"

# কোনো কোনো বৃক্ষ থাকে *

(শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পদ্মভূষণ মহোদয়কে নিবেদিত)

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কোনো কোনো বৃক্ষ থাকে—
মাটির গভীরে যার শত লক্ষ শেকড়ের যৌন তপস্যায়
আঁধার বিদীর্ণ করে ঊর্দ্ধায়িত শাখা প্রশাখায়
শুধুমাত্র আকাশের সূর্যকে গ্রহণ করে না।
পরন্তু, সমস্ত সূর্যঋণ, মৃত্তিকার দেনা
শোধ করে সমৃদ্ধ বীমায়।
যতটুক নিয়েছে সে তার চেয়ে ঢের বেশি ফিরিয়ে দেয়
—হৃদয়ের মুগ্ধ মমতায়ঃ
ফুল দেয়, ফল দেয়, পথিকেরে ছায়া দেয়
সবুজ পাতায় তার বিপন্ন হাওয়ার বিষ পরিশ্রুত করে।
ভালোবাসা ভরা তার প্রত্যহের জীবন চর্যায়
জীবন রচনা করে নন্দিত প্রণয়।

কোনো কোনো পাহাড় থাকে সানুদেশে, উপত্যকার
যে কেবল গভীরতম অরণ্য রচনা করে না,
না, শুধু শুভ্র স্বচ্ছ আদিগন্ত তুষারের পুষ্পগুচ্ছ নয়,
পরন্তু সে অনির্বাণ হৃদয় গলিয়ে
নদীকে জন্ম দেয় নিরন্ত উৎসধারায়ঃ
সূর্যসমতলে তারা বয়ে যায় সমুদ্র-সন্ধানে,
জলের অমেয় শিল্পে, সবুজের সমারোহে,
ফসলের সোনায় সোনায়
দুই কূল ভরে দিয়ে আতিথ্যের আনন্দ সংলাপে
সৃষ্টির শত লক্ষ সম্ভাবনায়।
কোনো কোনো পাহাড়ের থেকে জানি এরকম নদী নেমে
আসে।

কোনো কোনো নক্ষত্র থাকে— যারা শুধু জ্বলে জ্বলে
শেষ হয়ে যায় না আকাশে।
পরন্তু, যাদের উজ্জ্বল আলো পৃথিবীতে ধীরে নেমে আসে,
পৃথিবীকে আলো দিয়ে যায়।
প্রতিবেশী হয়ে যারা সুখদুঃখ স্বপ্ন সাধনায়
অন্ধকার পৃথিবীর পথগুলি দীপ্ত আলোকিত করে রাখে।
হাত ধরে নিয়ে চলে সম্পন্ন দূরের বিভাসে।
তাদের হৃদয় থেকে—দুই একটি জলের বিন্দু
দুই একটি নীল জল ঝরে পড়ে মর্ত্যের মাটিতে
কখন যে মুক্তা হয়ে ওঠে।

আপনি সে ক্বচিৎ বৃক্ষ, অনেক নদীর উৎস, বিরল পাহাড়,
আলোক প্রত্যয় আপনি, আপনি সেই নক্ষত্র-প্রতিভা।
আপনার প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে এই সব উজ্জ্বল উপমা
তখন আর নিছক তারা উপমা থাকে না।
সত্য দীপ্ত হয়ে ওঠে আমাদের সকলের অভিজ্ঞতায়
আমাদের মর্মময়ী মানসের মুগ্ধ উপকূলেঃ
কারণ, আমরা অনেকে সেই সমৃদ্ধ ছায়ায়
বিশ্রাম নিয়েছি। কারণ, আমাদের অনেকের
বহতা নদীর জলে তাঁর
অবাক অমিত উৎস। কারণ, আমাদের পথে পথে
এখনো সে নক্ষত্র-আলোর
বিচ্ছুরণ, কারো শুক্তি মুক্তা হয়ে গেছে।
আমাদের শিক্ষক আপনি আপনাকে প্রণাম।
জ্যেষ্ঠ বাঙালীর আপনি মহোত্তম স্থায়ী প্রতিনিধি
আপনার উদ্দেশ্যে রাখি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।
ভারতবর্ষের আপনি অনন্ত একক একজন
আপনাকে প্রণাম।
বিশ্বপৃথিবীর আপনি আপনাকে প্রণাম।

* আশ্বিন ১৩৭৭ সংখ্যায় কবিতাটি ভুল ছাপা হওয়ার দরুণ পুনরায় মুদ্রিত হল। এজন্য আমরা দুঃখিত। — জঃ সঃ

## এমন কবিতা চাই : জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী

এমন কবিতা চাই যা নীল শিরায়
নীলপদ্ম জাগাতে পারে,
আর নীল অরণ্য—বুকের ভিতরে
নীল পাহাড়, নীল নদী—
গান গেয়ে দাঁড় টানে পেশী
বাজারে ছিন্ন সবজিতেও জীবন : আকাশ,
সপ্তর্ষিশুদ্ধ আকাশ ছিঁড়ে আনতে চাই
নিজের কাছে,
নইলে আর মন ভরেনা-এখন।
কী অদ্ভুত ভাঙাগড়ার
নিরন্তর সৃষ্টি,—
সৌরজগতের পর সৌরজগৎ,—
নির্জ্জনতায় বিমুগ্ধ আত্মার
ধ্যান ভাঙে, ধ্যান গড়ে
সেই একজনই,—
যার কাছে 'তোমাকে ভালোবাসি'—বলে
নিজের তটস্থ সর্ব্বশেষ কবচকুণ্ডলও
দেয়া যেতে পারে—
এক চোখে কামনা—এক চোখে প্রেম
নিয়ে
এক এক আত্মঘাতী আকাঙ্খায়
সপ্তর্ষিশুদ্ধ আকাশ দুলে ওঠে—
—এমন কবিতা চাই আমার।


**অনিল আচার্যের**
**সময়োপযোগী দুইটি বই**

**সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০**

"…সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" … ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০**
( তৃতীয় সংস্করণ )

"…নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।**

পাওয়া যাবে :
জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড,
কলি-৪৭ (ডাকে)
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

পূর্বপ্রকাশিতের পর

# জাতীয়তার রূপান্তর

দীপঙ্কর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নাইট হুড্' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া দেশপ্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া গেলেন। বাংলার বিপ্লবীগণও এমন অযথাতম বর্বর হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুরতাকে নীরবে সহ্য করিলেন না। ইংরাজ-রাজের এই কাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার প্রবল উত্তেজনায় বিপ্লবীদের মধ্য হইতে অনেকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

চট্টগ্রামের জালালাবাদের যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজের সঙ্গে সে-এক ভীষণ যুদ্ধ। স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিপ্লব অধ্যায়ের সঙ্গে যাহারা কিছুমাত্র জড়িত তাহারা এ ইতিহাসকে একটা পবিত্র অধ্যায় বলিয়াই মনে করেন। এ-যুদ্ধে বহু বিপ্লবী প্রাণ হারাইল, গুলির আঘাতে কত মুমূর্ষু বিপ্লবীর অন্তিম ইচ্ছা সন্ধ্যার আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে।

শহীদদের রক্তে চট্টগ্রামের পথ রক্তিম। এ-বেদনা বুকে চাপিয়াই ১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল এক মহাশ্মশান তাহার অসংখ্য লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া শহীদদের নশ্বর দেহগুলি চিরদিনের জন্য চক্ষুর আড়ালে ভস্মীভূত করিয়া লইল। দেহ তাহাদের অন্তর্হিত হইল বটে কিন্তু সেই মহাশ্মশানের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মাঝে স্পষ্ট অক্ষরে ফুটিয়া উঠিল কয়েকটী অগ্নি-অক্ষর,—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক; বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মধ্যমণি সূর্য সেন, যিনি মাষ্টারদা নামে অভিহিত তাঁহার বিপ্লব কাহিনী এখানে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিষয় বস্তু না হইলেও তাঁহার তেজ-বীর্য ভরা মনের যে পরিচয় তিনি স্বীয় হস্তে একখানি চিঠিতে রাখিয়া গিয়াছেন এখানে তাঁহার সেই অন্তিম বাণী-বাহক অবিস্মরণীয় চিঠিখানি উদ্ধৃত করা হইতেছে। চিঠিখানির তারিখ ১৯৩৪ সালের ১১ই জানুয়ারী, সন্ধ্যা ৭টা। স্থান চট্টগ্রাম জেল: Ideal and unity is my farewell message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door. Mind is soaring towards Eternity. This is the time for 'Sadhana', this is the time for preparation to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of the days as well.

Sweet remembrance of you all, my dear brothers and sisters break the monotony of my life and cheer me up. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment what shall I leave behind for you? Only one thing, that is my dream—a golden dream—a dream of free India. How auspicious a moment it was when I first saw it.—Through-

out my life most passionately and untiringly I have pursued it like a lunatic, I know not how far I proceed towards the fulfilment of my dream. I know not when I am compelled to stop my pursuit to-day' If hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your fellow followers as I do to-day. Onwards my Comrades, onward—never fall baek. The day of bondage is disappearing and dawn of freedom is ushered in. Be up and doing. Never be disappointed. Success sure, God bless you.

Never forget the 18 th April 1930, the day of Eastern Rebellian in Chittagong. Keep ever fresh in your memory the fights of Jallalabad, Jalda, Chandernagor and Dhalghat. Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the altar of India's freedom.

My earnest appeal to you—there would be no division in our organisation. My blessings to you all inside and outside jail.

Long live revolution.

Bandemataram.

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাও ইংরাজের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভিযান। অস্ত্র লইয়া অস্ত্র সংগ্রহ করা, ইহার চাইতে দুঃসাহসিক কার্য তখনকার পরিবেশে কল্পনারও বহির্ভূত। কিন্তু তখনকার বিপ্লবী যুবকগণের নিকট অসম্ভব বলিয়া কিছুই ছিল না। বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত বুড়িবালামেও বাঘাযতীন ও তাঁহার অনুগামীদের দুঃসাহসিক রক্ত-রাঙা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এ-যুদ্ধ স্বাধীনতা পিপাসায় পিপাসার্ত যুবকগণের রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। দেশের বিপ্লবী ও নেতৃবর্গের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বুড়িবালামের এ-যুদ্ধ এক পবিত্র স্থান অধিকার করিয়া অগ্নিযুগের ইঙ্গিতময় স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।

এই বিপ্লবযুগের তিন পথিকৃত বিনয়, বাদল আর দীনেশ, যাহাদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গময় জীবনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে জাতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের স্মৃতিকে মনের মন্দিরে চির জাগ্রত রাখিবার জন্য বাহ্যিক প্রচেষ্টাও কম লক্ষণীয় নহে। কলিকাতার প্রাণকেন্দ্র, কর্ম-বহুল ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করিয়া তাঁহাদেরই নামে নামকরণ করা হইয়াছে "বিনয়-বাদল-দীনেশবাগ।"

এই দেশপ্রেমিক ত্রিরত্নের অন্যতম দীনেশ গুপ্ত ফাঁসির পূর্বে তাঁহার মা-কে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে:

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
কলিকাতা
৩০ শে জুন, ১৯৩১

মৃত্যুকে আমরা এত ভয় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ-যেন ছোট ছেলের জুজু বুড়ির ভয়।

যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দুইদিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য?

যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব?—ভুল, ভুল—মৃত্যু মিত্র রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে।

আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নমু

[ আমি সুভাষ বলছি: শৈলেশ দে, পৃঃ ২৬০ ]

পূর্বে নাইট হুড্ পরিত্যাগ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিয়েছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অগ্নিযুগের সেই দিনগুলিতে অন্য আর একজন কবি তাঁহার অগ্নিবীণায় রুদ্র ঝঙ্কার তুলিয়া বিপ্লবীদের মরণছন্দে নিত্যানন্দে চলিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আজও মনের কোণে তাঁহার সেই সুর ভাসিয়া ওঠে, এক-মাথা ঝাঁকড়া চুলে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়া, হারমোনিয়ামের বুক চিড়িয়া, তাহার বিপ্লবের সুর তোলা,—কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল করবে লোপাট · আগুন জ্বালো ··আগুন জ্বালো ·· যতসব বন্দীশালা·····

কিন্তু শুধু কবিদের কথা উল্লেখ করা হইলে সাহিত্যিকদের প্রতি অবিচার করা হয় কারণ সাহিত্যিকগণও পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন না। পৃথিবীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সমস্ত দেশের সাহিত্যিকদের অবদানের মতই এদেশের সাহিত্যিকগণও তাহাদের লেখনীর মাধ্যমে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গকে দেশের দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে সাহায্য করিয়াছেন।—তাহাদের মধ্যে এখানে অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার 'পথের দাবী' বইখানিকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। বাধাতেই বেগের সৃষ্টি। পুস্তক নিষিদ্ধ করিলেই লেখকের মনকে স্তব্ধ করা যায়না। কথোপকথনের মাধ্যমে তাহার মনের অগ্নিজ্বালা পথ করিয়া বাহির হইয়া আসে। এখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মহাত্মাগান্ধীজীর কথোপকথনের একটু অংশ উল্লেখ করা যাইতেছে :

গান্ধীজী শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "But why dont you believe that the attainment of Swaraj will be helped by Spinning ?

দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়াছিলেন বাংলার শরৎচন্দ্র, I think attainment of Swaraj can only be helped by Soldiers not by spiders.

এখানেই থামেননি শরৎচন্দ্র। পাল্টা প্রশ্ন করিয়াছিলেন আপনার মতে তাহলে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র ?

উত্তেজিত হয়ে জোরগলায় গান্ধীজী জবাব দিয়েছিলেন : সে বিষয় আমার দ্বিমত নাই। সশস্ত্র বিপ্লবে যারা বিশ্বাসী তারা ভ্রান্ত—

গান্ধীজীর মুখ থেকে এধরণের উক্তি শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন তীব্র প্রতিবাদে, শত্রু শব্দের অর্থ কি ? মত বিরোধেই যদি শত্রুতা বোঝায়, তা হলে যদি কেউ আপনাকেও শত্রু বলে আখ্যা দেয়—আপনার ব্যক্তিগত আপত্তি থাকা উচিত নয় কি।·····বিপ্লবী অর্থে এই সন্ত্রাসবাদী দলকে আমি শ্রদ্ধা করি—কারণ তারাও দেশকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই তো জীবনের সবচেয়ে যা কিছু প্রিয়, সবই উৎসর্গ করে দেয় বুলেটের সামনে। এই যে এদের ত্যাগ, এই যে এদের আদর্শ—এটা হয়তো আপনার মতে ভ্রান্ত হ'তে পারে কিন্তু দেশের শত্রু এরা হল কেমন করে ?

[ অধ্যাপক দিলীপ ঘোষ রায় রচিত 'গান্ধীবাদ কি অচল' ? নিবন্ধ হইতে গৃহীত সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৮ ]

ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার অগ্নিযুগের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া উপরে যে ক্ষুদ্র চিত্রটী অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহাতে এখনও আর একটি দিকের কাহিনী সংযোজিত করিতে বাকী রহিয়াছে। সেদিকটী বাংলার ছাত্রধারার আন্দোলনের দিক।

বাংলার সৌভাগ্য এই যে, ছাত্রগণ অজানা পথে বাহির হইলেও তাহারা আপন আপন ইচ্ছামত এলোমেলো পথে চলিয়া সময়ের অপব্যবহার করে নাই। উপযুক্ত সৈন্যের

মত ছাত্রগণের শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা এবং নেতার আজ্ঞাকে বেদবাক্যের মত পালন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাহাদের ছিল। একমাত্র এই কারণেই ছাত্রসমাজের নিকট নেতাগণ যখন যাহা চাহিয়াছেন তখনই তাহারা তাহা পাইয়াছেন। ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলনের সময় বলিয়াছিলেন,

"Education may stop but Swaraj cannot."

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই।"

[ রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫৮৮-৯২ ]

ছাত্রগণের এমন মানসিক প্রস্তুতি কি কারণে সম্ভব হইয়াছিল তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে ইহাই স্পষ্টতর হইয়া ওঠে যে, মা যদি তেমন উপযুক্ত না হয় তবে এমন ছেলে তৈয়ারী হয় কেমন করিয়া? অর্থাৎ বাংলার এই বিপ্লবী ছাত্রগণ মায়ের বুকের পীযুষ ধারার সংগে এমনই এক অসীম শক্তি, সাহস সঞ্চয় করিয়াছে যাহা তাহাদের উত্তর জীবনে সর্বাবস্থায় অকুতোভয় করিয়া তুলিয়াছে। ছাত্রদের এই শক্তি তাই মায়ের দান।

সুতরাং অগ্নিযুগের অগ্নি-শিখা, বাংলার নরনারী, মা-বোন, যুবক-যুবতী এবং ছাত্রসমাজের পূর্ণাঙ্গ আত্মাহুতিতে সমৃদ্ধ ছিল। কলিকাতা পুলিশের তখন পুলিশ কমিশনার ছিল টেগার্ট সাহেব। তাহার চোখে এ-বিপ্লবের চিত্রটী অনেকের চাইতে বেশী করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বাংলার বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া তাহার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না এবং যে কোন প্রকার কলা-কৌশল অথবা বল প্রয়োগ করিয়াও বিপ্লবীদের শায়েস্তা করিয়া বাংলা-দেশের বিপ্লবের ধারাকে স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এক সময়ে বিলাতে তাহার এক বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে-বক্তৃতায় সে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গালবাজি করিতে ছাড়ে নাই। ১৯৩২ সালের ৩রা নভেম্বর "রয়েল এমপায়ার সোসাইটীর" এক সভায় স্যার চার্লস টেগার্ট ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, যদি একথা বলা যায় যে, এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই, যেখান প্রধান প্রধান নেতাদের অধীনে কোনও একজন বিপ্লবী নাই, তবে নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন করা হইবে না। ইহার ফল হইতেছে এই যে, এই সমস্ত নেতাদের আদেশক্রমে যুবকগণ বর্ত্তমানে হত্যা করিতেছে এবং পুলিশ এই সমস্ত যুবকদের সন্ধান পাইতেছে না।

টেগার্ট সাহেব এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক ধারা বিবৃত করেন এবং বলেন যে, ইহা মূলতঃ হিন্দু আন্দোলন। প্রথমতঃ ইহা বালগঙ্গাধর তিলকের অনুপ্রেরণার জন্ম দেখা দেয় এবং ক্রমে ইণ্ডিয়া হাউজ সোসাইটি, আমেরিকায় শিখ-আন্দোলন এবং বাংলা দেশে বারীন ঘোষের কার্যকলাপের জন্ম ইহা প্রসার লাভ করে।

[ অতীতের পৃষ্ঠা হইতে ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা
তাং ৪।১২।৫৭ ]

টেগার্ট সাহেবের মুখে এমন কথা বা বিপ্লবীদের সম্বন্ধে এমন গালমন্দ টেগার্ট সাহেবের অতি অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি কারণ পুলিশ কমিশনার হিসাবের বাংলার ছাত্র এবং যুবক-গণের বিপ্লবী রক্ত ও মৃত্যুভয়হীন দৃঢ়মনের পরিচয় সে পাইয়াছে। টেগার্ট সাহেব এবং ইংরাজেরা এ-বিদ্রোহকে অরাজকতা ও অপবিত্র ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়াই অভিহিত করিয়াছে কিন্তু ভারতবাসী তাহা মনে করিবে কেমন করিয়া? সে সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একটি উক্তি বিশেষ স্মরণীয়, "আজ পূর্ববঙ্গে এমন কোন গৃহ নাই, এমন কোন পরিবার নাই, যেখানে অন্ততঃ একজন বালক বা যুবক দেশান্তরিত হয় নাই।"

[ দেশবন্ধু স্মৃতি ঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃঃ ১৬৯ ]

কিন্তু পূর্ববঙ্গই নহে পশ্চিমবঙ্গেও এ-কথাটী সমপরিমাণে প্রযোজ্য অর্থাৎ অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর দল উভয়

সংস্কার উদ্দেশ্যই এক। সেখানে যে সকল যুবকবৃন্দ জাতির মুক্তির জন্য জীবনপণ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের প্রশান্ত মন, তাহাদের ঘর-বাড়ী সমগ্রদেশের সর্বত্র বিরাজিত, তাহাদের মা বাংলার সব মা,—তাহাদের বোন বাংলার সব বোন এবং দেশই পবিত্র তীর্থস্থান। তাহাদের মানসিক গঠনও নূতন ধাতুতে গঠিত। তাহাদের চিন্তা, ধ্যান ও সাধনা সবই জনগণের কল্যাণের জন্য। তাহারা যেন কবি কামিনী রায়ের বিখ্যাত কবিতাটির মূর্ত প্রতীক :

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে ॥

নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ, বিলাস-বাসনা, নামযশ তাহাদের চিন্তার বাহিরে,-কর্মপ্রচেষ্টা শুধু একমুখী 'দেশহিতায়'। তাইতো তাহারা বৈপ্লবিক কর্মধারার পথে চলিয়াও সাধন-ভূমির এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও গোপনে যে বীরত্বপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা সমগ্র দেশের বিশেষতঃ যুবকবৃন্দের অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। কনডেমড্ সেল হইতে মৃত্যুপথযাত্রী প্রদ্যোতের লেখা গোপনপত্র তার মা পঙ্কজিনী দেবীকে :

যুগ যুগ ধরে তুমি যে অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন-সহ্য করে এসেছ, মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মতো মার খেয়েছ তারই বিরুদ্ধে তোমার মনে যে বিদ্রোহের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে যাচ্ছিল সেই পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ-ই আমি।

[আমি সুভাষ বলছি : শৈলেশ দে, ৪৮]

স্কুলের ছাত্র ছিলেন প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য। তাহার ফাঁসি সম্বন্ধে তখন যাহা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :

শুক্রবার ২৯শে পৌষ ১৩৩৯

ইংরাজী ১৩-১-৩৩

১২ জানুয়ারী মেদিনীপুর, ভোরপাঁচটায় সবশেষ।

ডগলাস হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্যের ফাঁসি অদ্য প্রত্যুষে পাঁচটায় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

## ফাঁসির পূর্বে

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, প্রদ্যোৎ ভোর বেলা স্নান করে। স্নান করিবার পর সে গীতাপাঠ করিতেছিল এমন সময় ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। তাঁহার দুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভেতর লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহারা গিয়া দেখেন যে প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। অবিলম্বে তাঁহাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতে বলা হয়। সে অবিচলিত পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চের উপর গিয়া ওঠে; তৎপর ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করিয়া জল্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে.....

[অতীতের পৃষ্ঠা থেকে আনন্দবাজার তাং ১৩-১-৭০]

বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক প্রদ্যোৎ। ইহারা ধ্বংসের নটরাজ আর সৃজনের বিশ্বকর্ম্মা। সনাতন পথকে আঁকড়াইয়া না থাকিয়া নূতনের সাধনায় মত্ত ও প্রমত্ত এই বিদ্রোহীগণ গিরিগুহা, কান্তার-মরু প্রান্তরের মধ্য হইতে দেশের মহা দৈন্যকে দূরীভূত করিয়া রবিকিরণের সহস্রাধারে শতদলের বিকাশপ্রাপ্তির মত মানুষের আত্মচেতনাকে স্বাধীনতার স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। এখানে এই বিপ্লবীদের সংগে ইহাদের একই অঙ্গনে না দাঁড়াইয়াও মিস্ মারগারেট নোবেল, যিনি আমাদের এই ভূমিতে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত, তাঁহার অবদানও চিরস্মরণীয়। ইংরাজ কবি বলিয়াছিলেন,

"The East is East and the West is West
The twin shall never meet."

স্নেহময়ী ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিলে এ-কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়। কারণ, বিদেশিনী এই শিখাময়ী নিজের জন্মভূমির কথা ভুলিয়া ভারতভূমিকেই স্বীয় জন্মভূমির অধিক ভালোবাসিয়া ইহার সার্বভৌম উন্নতির জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় যে, তাঁহার নিজস্ব সত্তাকে জাতির কল্যাণের পবিত্র হোমশিখায় প্রজ্বলিত রাখিয়া স্বামীজীর বাণীকে তাঁহার চিন্তাকালে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছেলেন। সে কাজে তাঁহার দ্যোতনা, উদ্দীপনা কলুষমুক্ত মহাতপস্বিনীর অথচ সতীত্বে, ব্রহ্মচর্যে এবং একনিষ্ঠায় ভারতীয় নারীর পূর্ণ প্রতীক সীতা সাবিত্রী আর গার্গীর অনুগামিনী। আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রোষদীপ্তিতে প্রজ্জ্বলিতা অগ্নিশিখা, দৃপ্তা সিংহিনী। সারাভারতব্যাপী বিস্তৃত তাহার বিশাল মনের সামান্য একটু পরিচয় তাহার একটি উক্তির মধ্যে বিরাজিত, কথার মধ্যে বিন্দুতে সিন্ধুর পরিচয়ের মত নিবেদিতার সমগ্র মনের পরিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারকে নিবেদিতা দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "Never lower your flag to a foreigner"-একটি কথায় সারা মন প্রকাশিত। তাঁহার এই মনই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছে। ১৯০৫ সালে সক্রিয় ভাবে বারানসী কংগ্রেসে তাঁহার যোগদান এবং প্রয়োজন মত অন্তরালে থাকিয়া অসংখ্য বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ভারতের রাজনীতিতে, বিশেষ করিয়া নবীন বাংলার নবজাগরণে তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। বারানসী কংগ্রেসের কার্যবিবরণী কোন এক ইংরাজ দর্শকের ছদ্মনামে নিবেদিতা প্রতিদিন তদানীন্তন ষ্টেটসম্যান সম্পাদক র‍্যাটক্লিককে পাঠাইতেন। ঐ প্রতিবেদন ছিল সুষ্ঠু, —কংগ্রেসের দোষ-ত্রুটির নিখুঁত সমালোচনা এবং ঐ সমালোচনার মাধ্যমে নিবেদিতা বিশ্বকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন বিষয় নিয়া যে মতভেদ উহা তাহাদের রাজনৈতিক দলাদলি হইতে উদ্ভূত মনোমালিন্য নহে। তিনি ভারত ভূমিকে এবং তাহার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে কতখানি শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন নিবেদিতার উপরোক্ত সমালোচনার মধ্যেই তাহা লুক্কায়িত রহিয়াছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁহার প্রাণ তাই তাহার দোষ ত্রুটি তাঁহার অন্তরে আঘাত হানিয়াছে এবং উহা সংশোধনের জন্য ছদ্মনামে সংবাদপত্রে নিখুঁত সমালোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতাকে আমরা আমাদের চাইতেও বেশী করিয়া পাইয়াছি তাঁহার পূর্ণ প্রভায়, তাঁহাকে পাইয়াছি অধ্যাত্ম সাধনার মূলকথায়, পাইয়াছি 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'। জীবন তাঁহার বিবেকানন্দের কল্যাণ-বানীর পরিপূর্ণরূপ, অবিকল প্রতিচ্ছবি। পাশ্চাত্যের কন্যার প্রাচ্যের কল্যাণময়ী শতদলে বিকশিতা শুভ্রাবর্ণা নিবেদিতা। যেমন গুরু তেমন শিষ্যা। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে দিব্যচক্ষে আঠারোটি সূর্য প্রজ্বলিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই দিব্য প্রভাবেই স্বামীজী চিনিয়াছিলেন নিবেদিতাকে,—তাই নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর নিজ হস্ত প্রজ্বলিতা একটা পবিত্র দীপশিখা। অর্থাৎ অন্যভাবে বলাযায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছার পরিপূর্ণরূপ স্বামীজী এবং স্বামীজীর মানসকন্যা গার্গীরূপিনী সন্ন্যাসিনী নিবেদিতা। [ক্রমশঃ]

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

## মতামত

সুভাষচন্দ্র প্রথম খণ্ড পড়ে ভাল লাগলো। অন্যান্য জীবনী থেকে এর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনার পরিচয় দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন লেখক। এই পরিকল্পনা যথার্থ বলে মনে হয়। সুভাষচন্দ্র কবি, দার্শনিক বা ধর্মগুরু নন। তিনি দেশনেতা। তাই দেশের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর নেতৃত্বের বনিয়াদ গড়েছে। সুতরাং তাঁকে জানতে হলে দেশ ও কালকেও জানা চাই। কবি এবং দার্শনিককে তাঁদের জীবনের মধ্যেই জানা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অসামান্য দানের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বিস্তৃত জীবনীই তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারে।

এই প্রথম খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ জীবনীর যে আভাস পাওয়া গেল তা আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। দেশ ও কালের প্রভাব কিভাবে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে লেখক তা সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে "শিবচেতনার জাগরণ" অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনারীতি বিষয় বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ছাপা বাধাই সুরুচিসম্মত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'জাতীয় গ্রন্থাগার'

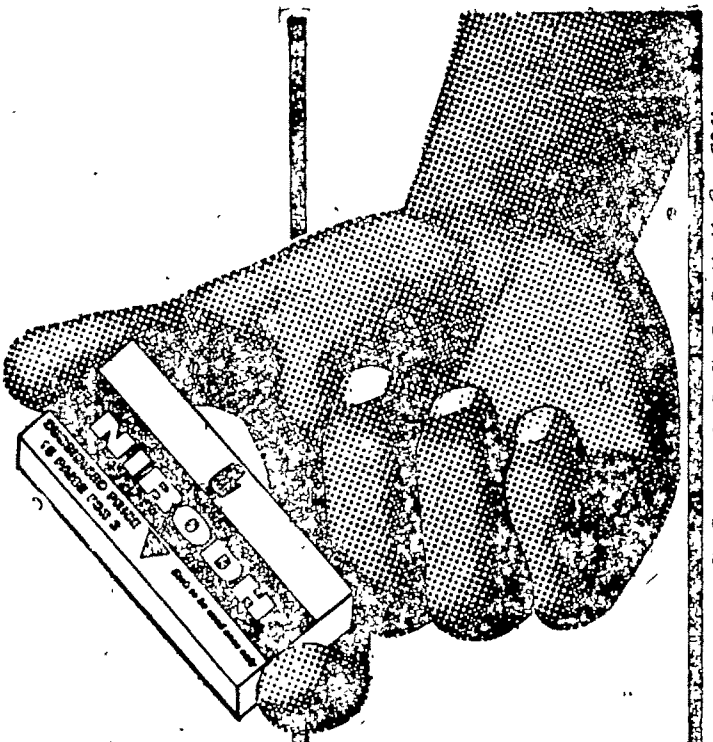


মাত্র
5টি পয়সা
খরচ করলে
আপনি আপনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন!

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্যে
উন্নত ধরণের
রবারের জন্মনিরোধক
15 পয়সায় 3টি

সহকারী সাহায্যে কাম করা যায়।

**সময়ের ব্যবধানে সন্তান উৎপাদনের জন্যে**

আজকাল, নিজের ইচ্ছে মাফিক্ সময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না। আপনি যখন চাইবেন, তখনই আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। নিরোধ আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।

**মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যে**

জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার বছরের সময়ে শিশুর যত্ন নেওয়া উচিত—তাহলেই ওরা ভালো ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তারেরা মত দিয়ে থাকেন। সন্তান প্রসবের পরে হৃতস্বাস্থ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও কিছু সময় দরকার। নিরোধ ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম স্থগিত রাখতে পারেন।

নিরোধ (কণ্ডোম) পুরুষদের জন্যে উন্নত ধরণের রবারে তৈরী জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে, তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয় না। নিরোধ সব জায়গায় পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, মণিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ বিপণী, পানের দোকান আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়।

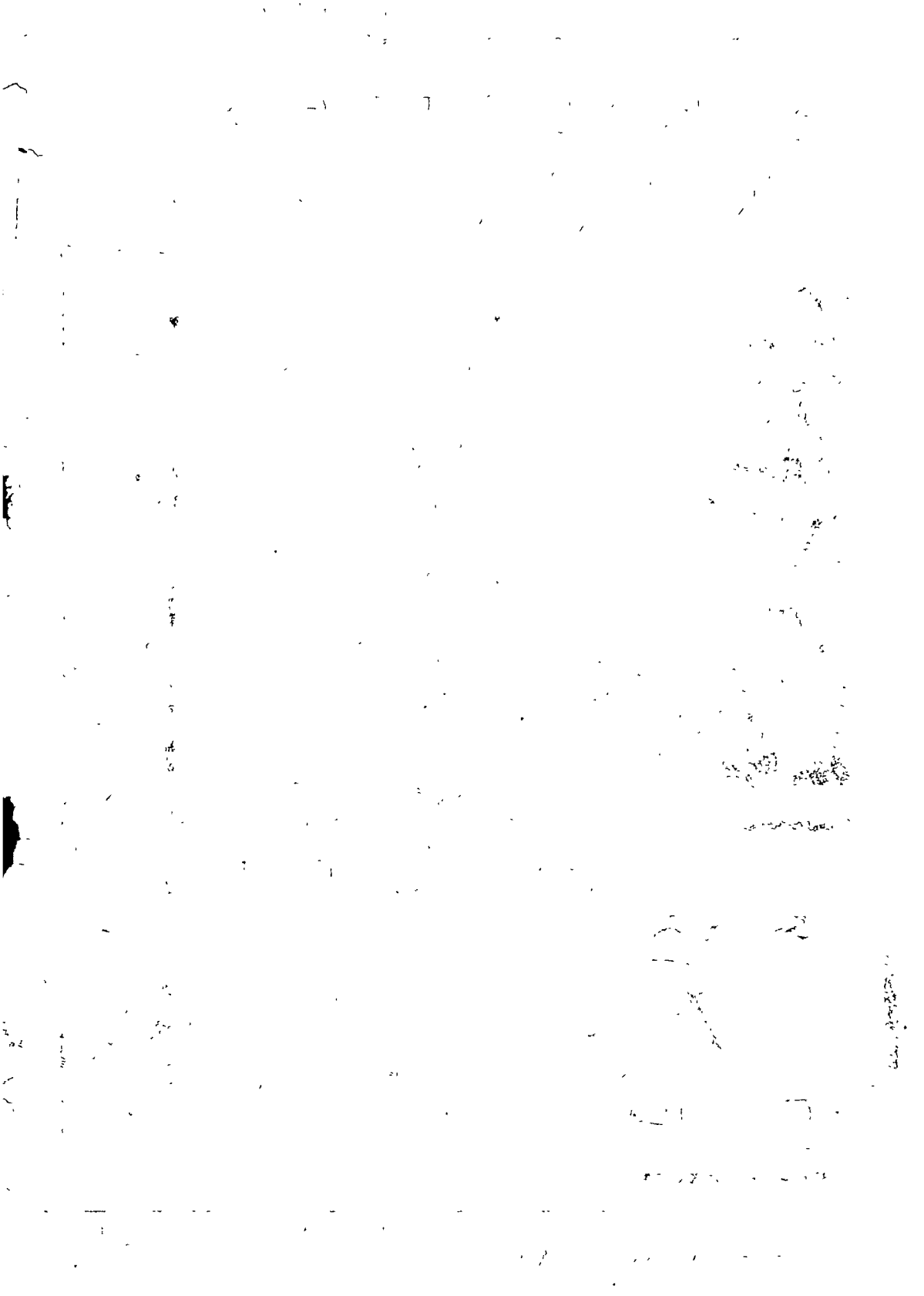

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

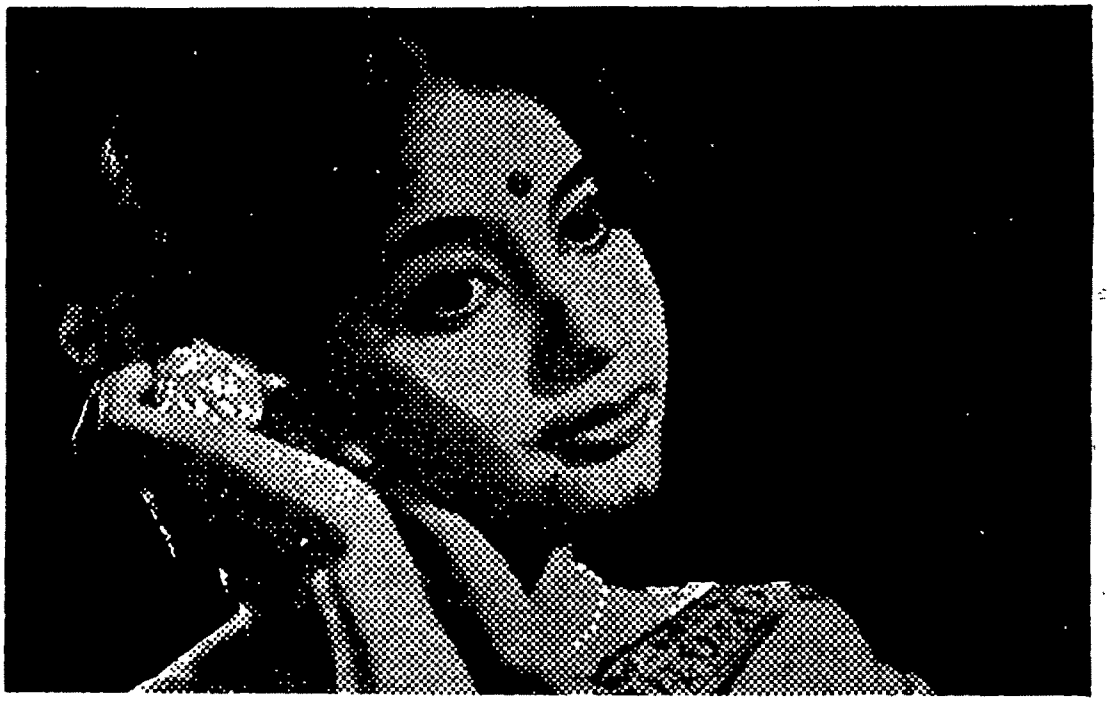

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৩

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একান্ত অতি আধুনিক অপরাগ

SBC-1/65


Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·70
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

অগ্রহায়ণ

১৩৭৭

# জয়শ্রী

প্রতিষ্ঠাত্রী – সম্পাদিকা :-
লীলা রায়

'নেতাজী প্রসঙ্গে কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

## সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং

নেতাজীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে তার বৈপ্লবিক পরিকল্পনার কথা এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করার প্রয়াস আজ পর্যন্ত কোনও লেখকের মধ্যে দেখিনি। —দেশ

এমন একখানি বই সহজেই আমাদের হাতে আসবে তা যেন ভাবিনি।....এমন অভিজ্ঞ, অনুসন্ধিৎসু ও বিচারশীল লেখক বর্তমানে অল্পই আছেন। যুগবাণী

দাম ৬·০০ বাধাই ৭·০০

নন্দ মুখোপাধ্যায়

**নেতাজী থ্রু জারমান লেনস্** (এ নিউ ডিসকভারী) বইটিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে একটি দুষ্প্রাপ্য দলিল বললে অত্যুক্তি হয় না। —দেশ

দাম ৩·০০

শচীন্দ্রনাথ বসু

**প্রাগৈতিহাসের মানুষ** : রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

সৃষ্টি থেকে সভ্যতা পর্যন্ত মানুষের কাহিনী ৮·০০

পবিত্রকুমার ঘোষ : সুভাষচন্দ্র ৯·০০, অনিল রায় : নেতাজীর জীবনবাদ ১·৫০, সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ ২·৫০, গান্ধীবাদ অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ ০·৫০, What Netaji Stands for ০·৫০, সুভাষচন্দ্র বসু : বিপ্লব কি ০·২০, নেতাজীর বাণী ০·২০, Revolution What it is ০·২৫ বঙ্গ আমার জননী আমার : সুভাষচন্দ্র বসু ০·২০, লীলা রায় : এ আমরা সইব না ০·১৫, সুনীল দাস : ভূমিসমস্যা ০·২০ কালীচরণ ঘোষ : মাতৃমন্ত্র, দেশাত্মবোধক সংগীত সংকলন ১·৫০, শচীন্দ্রনাথ বসু : শনিবারের সন্ধ্যায় ৬·০০, বিশ্বসভ্যতায় বাংলার বিশেষ দান : সুভাষচন্দ্র বসু (যন্ত্রস্থ)।

জাতীয়তাবাদী গ্রন্থপঞ্জী ০·১৫

**নেতাজী সম্বন্ধে জানতে হলে 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকা পড়ুন**

**প্রকাশক** : জয়শ্রী প্রকাশন, ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিঃ ২৬।

**প্রাপ্তিস্থান** : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯;
বোস এণ্ড সন্স, পি ২১/২২ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১;
সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া ষ্টেশন।

# সূচীপত্র

জয়শ্রী : অগ্রহায়ণ : ১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৬৪৫ | সুভাষবাদ ( প্রবন্ধ ) | পবিত্রকুমার ঘোষ | ৬৪৭ |
| কাত্যায়নী ( কবিতা ) | প্রভাকর মাঝি | ৬৫২ | কণ্ঠহরা বিষ | মিহির মুখোপাধ্যায় | ৬৮৫ |
| শৈশবে ফিরে যাব কবিতা | গৌরী বসু | ৬৫২ | ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) | | |
| বিস্ফোরণ : ( ধারাবাহিক রচনা ) | কালীচরণ ঘোষ | ৬৫৩ | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( স্মৃতি-তর্পণ ) | কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত | ৬৯৩ |
| তরুণের স্বপ্ন ( প্রবন্ধ ) | রবি রায় | ৬৬১ | জাপানের দিনগুলি | বারীন বর্ধন | ৬৯৫ |
| দাম স্তর আর মজুরির চলমান সিঁড়ি ( অর্থ নৈতিক প্রবন্ধ ) | অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য | ৬৭১ | ( ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী ) | | |


সম্পাদক : সুনীল দাস


পৌষ ১৩৭৭

জয়শ্রী নেতাজী সংখ্যা

বিশেষ আকর্ষণ

'গান গেয়ে যে খুঁজি তোমায়'—চারণিক

সুভাষবাদ। পবিত্রকুমার ঘোষ

নেতাজীর অপ্রকাশিত ভাষণ

৩৫ বর্ষ ০ অষ্টম সংখ্যা ০ অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

# সম্পাদকীয়

## 'জয় বাঙলা'

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনে পূর্ববাংলায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের পুনরভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে 'পূর্ববাংলা' আজ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে 'বাংলা জাগো' 'জয় বাঙলা' ধ্বনিতে মুখর, পূর্ববাংলায় বাঙালীর নবজাগরণের যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আওয়ামী লীগকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে, তার দুরন্ত বেগ পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করে অতি প্রবলভাবে পশ্চিম বাংলায় তথা ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে নবজাতীয়তাবাদের ঢেউ সৃষ্টি করবে, যে তরঙ্গের আঘাতে পশ্চিম বাংলায় ধ্বংসের আবিলতা অপসৃত হয়ে নূতন জীবনের বনিয়াদ রচিত হবে।

কিন্তু পূর্ববাংলায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের পুনরভ্যুত্থান পূর্ববাংলার জীবনে নূতন বিপদের সঙ্কেতও এনে দিয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ গত তেইশ বছর যে দুর্বার সংগ্রামে বাঙালী মানসকে অপরাজেয় করে তুলেছে, সেই সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায়েও যে তা উত্তীর্ণ হবে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় সেই প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে। পূর্ববাংলায় ৩০০ নির্বাচিত সদস্য-বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের ১৬২ টি আসনের ১৫৩টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ১৬২টি আসনের ৯টি ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত এলাকায় আগামী জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নির্বাচন মুলতুবী আছে। এই ১৫৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ ১৫১ আসনে জয়ী হয়েছে; আর দুইটি আসনের একটিতে পাকিস্তান ডেমক্রেটিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী একটি করে আসন পেয়েছেন—একটি ময়মনসিংএ ও অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামে। এ ছাড়া পূর্ববাংলা থেকে ৭জন মহিলা, ১৬২ জন নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক মনোনীত হবেন। বলা বাহুল্য এই ৭টিই আওয়ামী লীগের পক্ষভুক্ত হবেন।

পূর্ববাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিগন্ত আচ্ছন্ন করেছে। পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশে ৬০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন, তার মধ্যে পূর্ব বংলায় ৩০০ শত। এ ছাড়া এই প্রাদেশিক বিধান সভা-গুলিতে ২১ জন মহিলা মনোনীত হবেন, তাদের মধ্যে ১০ জন হবেন পূর্ব বাংলা বিধান সভায়। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক বিধান সভার ৩০০ আসনের মধ্যে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার ২১টি আসনের নির্বাচন মুলতুবী রয়েছে। অবশিষ্ট ১৭৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ ১৬৮টি আসনে জয়ী হয়েছেন। অবশিষ্ট এগারোটি আসনে স্বতন্ত্র, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খাঁ)

জামাত-এ-ইসলামী ও নিজাম এ-ইসলামী জয়ী হয়েছে। পূর্ববাংলায় যে দলগুলি সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের আওয়াজ তুলে পূর্ববংলার রাজনীতিকে বিষাক্ত করে সেখানে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন ও বিতাড়নে গত তেইশ বছর অব্যাহতভাবে সচেষ্ট ছিল তারা যেমন পর্যুদস্ত হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের শরিকরূপে যে দলগুলি জাতীয়স্বার্থবিরোধী বিধ্বংসী ভূমিকায় নিযুক্ত থেকে পূর্বাঞ্চল ভারতে ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী ছিল, তারাও পরাজিত হয়েছে। পূর্ববাংলার আত্মস্বাতন্ত্র্যের জন্য মুজিবর রহমানের ছয় দফা দাবী, সংখ্যালঘু সমেত পূর্ববাংলার সকল নাগরিকের সমানাধিকারের ও নিরাপত্তার স্বীকৃতি, আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি পূর্ববাংলার জনমানসে নূতন আশার সঞ্চার করে, তাদের দাবী পূরণে আরও দৃঢ়পণ করে তুলেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল জাতীয় পরিষদে এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার ফলে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিণতিতে পূর্ববাংলার মানুষের সামনে আবার নূতন সংঘাতের যে প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার অন্তিম পর্যায়ে পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কিনা সে প্রশ্ন আজ বাস্তব সম্ভাবনার রূপ নিয়েছে। লণ্ডনের টাইমস পত্রিকা সাম্প্রতিক নির্বাচনে পাকিস্তানের দুই অংশে যে বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিয়েছে তার অন্তিম সম্ভাবনার উল্লেখ করে এই কারণেই বলেছেঃ "carve up the country into two separate political kingdoms."

দেড় বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে। জাতীয় পরিষদে এই অংশের ১৩৮ আসনের মধ্যে ১১৯টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮১টি আসন পেয়ে, তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাণকেন্দ্র পশ্চিম পাঞ্জাবে ৬২টি এবং সিন্ধুতে ১৮টি আসন পেয়ে এই দল পশ্চিম পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলীম লীগের বিভিন্ন অংশগুলি, জামাত-উল-উলেমার দুই শরিক, জামাত-এ-ইসলামী, ওয়ালী খাঁর মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সামান্য কয়েকটি আসন পেয়েছে। এই অঞ্চলে স্বতন্ত্রপ্রার্থীরা ১৫টি আসন পেয়েছে। পাকিস্তানের এই অংশে মহিলাদের জন্য জাতীয় পরিষদে নির্দিষ্ট ৬টি আসন ভুট্টোর দলের দখলে যাবে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি পাঞ্জাবের ১৮০টি আসনের মধ্যে ১১৩টিও সিন্ধুর ৬০টি আসনের মধ্যে ৩২টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এই দল তিনটি আসন পেয়েছে ও বেলুচিস্থানে ২০টির মধ্যে কোনো আসন পায় নাই। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওয়ালী খাঁর ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির দল ৪০টি আসনের মধ্যে ১২টি আসন পেয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্থানে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নাই।

পাঞ্জাবে ভুট্টো শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই পায় নাই, বহু প্রতিষ্ঠাবান নেতাদেরও পরাজিত করেছে। কোয়াকুম খাঁ মুসলীম লীগের, কাউন্সিল মুসলীম লীগের, কনভেনসন মুসলীম লীগের এবং মাওদুদীর গোড়া ধর্মীয় দল জামাতে-ইসলামীর প্রভুত্ব পর্যুদস্ত করেছে। তাছাড়া পাঞ্জাবের রাজনীতিতে জমিদার, পুঁজিপতি ও ফৌজী প্রভাব ম্লান করে দিয়ে মধ্যবিত্তের প্রভাব স্থাপিত করেছে।

ভুট্টো আয়ুবের দক্ষিণ হস্তের ভূমিকা থেকে তাসখন্দ চুক্তির পর আয়ুব-বিরোধী ভূমিকা নিলেও, ভুট্টো ভারত-বিদ্বেষী, ভারত-আক্রমণের প্ররোচক, চীনের সমর্থক, সমাজবাদের ধুয়া তুলেও ইসলামের একান্ত বাহক। 'ইসলামী সমাজতন্ত্রে'র

ধ্বনি তুলে একদিকে ভুট্টো চীনা আধিপত্যের প্রচারকরূপে এবং সামরিক শাসনের আপাত-বিরোধীর ভূমিকায় পশ্চিম পাকিস্তানের মনচিন্তের সমর্থন সংগ্রহ করেছে, অপরপক্ষে ইসলামের ধ্বনি তুলে পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মান্ধতার পোষকতা করেছে। তার ভারত-বিদ্বেষও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তির একাংশের সমর্থন ও সহানুভূতির উদ্রেক করেছে এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের দাবী জানিয়ে আওয়ামী লীগের স্বাতন্ত্র্যের দাবী এবং পাকিস্তানের উপর পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনসংখ্যার আধিপত্যের সম্ভাবনার বিরোধিতায়, পশ্চিম পাকিস্তানের সকল স্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে পাকিস্তান পিপ্‌লস পার্টির পশ্চাতে সংহত করতে সক্ষম হয়েছে।

জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুললেও, আওয়ামী লীগের স্বাতন্ত্র্যের দাবী ও কেন্দ্রে বাঙালীর আধিপত্য পাকিস্তানের বেসামরিক রাজনৈতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তি কিছুতেই স্বীকার করে নেবে না। ছয় দফা দাবী থেকে মুজিবর রহমানের পক্ষে পেছোবার আশাও সুদূরপরাহত মনে হয়। তাছাড়া, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার অভিযোগ পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। নির্বাচনী সভা গুলিতে এই বৈষম্য, অনাচার ও অবিচারের হিসাব দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ উচ্চকণ্ঠ হয়ে বলেছে ১৯৫৬ সাল ও ১৯৬১ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে মাথা পিছু আয় যথাক্রমে শতকরা ৪০ ও ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, গত ১৮ বছরে প্রাপ্ত ৫·৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পূর্ব-পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা অধ্যুষিত সামরিক বাহিনীর পেছনে জাতীয় আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ ব্যয় হয়, জাতীয় বাজেটের শতকরা ৯০ ভাগ পূর্বপাকিস্তান থেকে আদায় হলেও তার শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়, সেনাবাহিনীতে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ, কেন্দ্রীয় চাকুরীতে শতকরা ১৫ ভাগ, অথচ এরাই পাকিস্তানের জন সংখ্যার ৫৬ ভাগ।

এই পটভূমিকায় পূর্ববাংলার অবমানিত জাতীয়তাবোধ বিপ্লবের বেগে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাকিস্তানের সংবিধান রচনায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহাখান শর্ত দিয়েছেন যে জাতীয় পরিষদ উদ্বোধনের ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা সম্পন্ন করতে হবে এবং সংবিধানে পাকিস্তানের সংহতি অটুট থাকা চাই। সুতরাং আওয়ামী লীগের আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী ভুট্টোর ইসলামী সমাজবাদ ও ভারতবিদ্বেষ এবং প্রেসিডেন্টের শর্ত মিলে যে বৈপরীত্যের ত্রিভুজ রচনা করবে, তার অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বে সংবিধান রচনা স্বার্থসন্ধদের পক্ষে অসম্ভব করে তোলার অবাধ অবকাশ থাকবে। মুজিবর রহমান ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী, এবং কাশ্মীর সমস্যাকে জাতীয় সমস্যার মর্যাদাদানের বিরোধী। সুতরাং কাশ্মীর সমস্যাকে জাতীয় সমস্যার স্বীকৃতির সর্তে মুজিবরের আত্মস্বতন্ত্র্যের দাবী মেনে নেবার অবকাশ ভুট্টোর নেই। তাছাড়া, মুজিবরের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং ফলে সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ গুরুতররূপে হ্রাস পাবে—এই আতঙ্কে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তির একাংশ মুজিবরের ঐতিহাসিক সাফল্যকে বানচাল করে দেবার জন্য সর্বদাই উদ্যত থাকবে এবং ভুট্টো মুজিবরের অনমনীয়তার কাছে পরাজিত হলে এই সামরিক জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানে প্ররোচনা দিয়ে আবার আর একটি পাক-ভারত সংঘাতের সূচনায় অগ্রণী হতে পারে। যে কারণেই হোক না কেন—ইয়াইয়া খানের কূটনীতির ফলে, কিম্বা সামরিক সংঘাতের ফলে, কিম্বা ভুট্টোর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের অনমনীয়তার ফলে—যদি সংবিধান রচনায় বিঘ্ন ঘটে, পূর্ব বাংলায় যে জাতীয়তাবাদের

পুনরুত্থান প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। ইতিমধ্যে চীনের অনুগামী ভাসানী, মুজিবরের পথ দুর্গম করবার জন্য এবং সামরিক শাসকদের দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ দেবার জন্য স্বাধীন পূর্ববঙ্গের ধ্বনি তুলেছে। পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদীরা বৈদিশিকশক্তির অনুচরদের প্ররোচনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য বৈদিশিক শক্তির প্রচ্ছন্ন অভিযানও সুরু হবে। পশ্চিম বাংলার বৈদিশিক শক্তির অনুচরেরা এখানকার মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য এবং মুজিবরের শক্তি হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদের ছলনা করে পশ্চিম বঙ্গকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যোগী হতে পারে। কিন্তু সকল ষড়যন্ত্রের নাগপাশ কাটিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ স্বাতন্ত্র্যের লক্ষ্যে অনিবার্যভাবে পৌঁছাবে। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়। ১৯৭১ সাল ইতিহাসের এই পদচিহ্ন বহন করবার জন্য এগিয়ে আসছে। পূবে সেদিন যে ঝড়ের মাতন উঠবে, পশ্চিম বাংলায় তার কাঁপন লাগিয়ে ভারতবর্ষকে মাতিয়ে তুলবে। 'জয় বাংলা', 'বাংলা জাগো'—এই ধ্বনিতে মুখরিত হবে দুই বাংলার আকাশ-বাতাস।

## লোকসভা বাতিল

২৭শে ডিসেম্বর রাত ৯টায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি চতুর্থ লোকসভা বাতিল করে দিয়েছেন। লোকসভার স্বাভাবিক আয়ুর চৌদ্দমাস পূর্বেই এবারকার লোকসভা বাতিল হয়ে যাওয়ায় কেউ বিস্মিত হয় নাই। কারণ লোকসভার গত শীতকালীন অধিবেশনেই প্রধানমন্ত্রী শীঘ্রই রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা বাতিল করবার পরামর্শ দেবেন, এই গুঞ্জন সুরু হয়েছিল এবং রাজন্যবর্গের স্বীকৃতি বিলোপ করে রাষ্ট্রপতির আদেশ সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দেবার পর প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রাজন্যবর্গের ভাতা ও বিশেষ অধিকার বিলোপ সম্পর্কে লোকসভার বিরোধীদলগুলির অধিকাংশ একমত থাকলেও সাংবিধানিক পথে এই বিশেষ অধিকারগুলি বিলোপের জন্য আনীত বিল রাজ্যসভায় একটি ভোটের ভগ্নাংশে বাতিল হয়ে যাবার পরক্ষণেই রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে এই অধিকারগুলি বাতিল করা হলে সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের ও পার্লামেণ্টকে অগ্রাহ্যের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে রায় দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাংবিধানিক বিচ্যুতি কার্যত তীব্রভাবে নিন্দিত হয়। সুতরাং সরকার পক্ষ থেকে অবিলম্বে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে রাজন্যদের অধিকার বিলোপে দ্রুত অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, না হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধনের দাবীতে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হবার দায়িত্ব ছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেষোক্ত পথই বেছে নিয়েছেন, যদিও লোকসভা বাতিলের বেতারভাষণে রাষ্ট্রপতিকে ঐ পরামর্শদানের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রধান মন্ত্রীর সরকার ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের ভাঙনের পর সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল, সেকথা প্রধানমন্ত্রী তার বেতার ভাষণের স্বীকার করেছেন। সংখ্যালঘু সরকারকে পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য অন্যান্য এমন দলের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, যার সাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদবিরোধী এবং প্রচ্ছন্নভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী, এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগে জাতীয়স্বার্থবিরোধী, প্রশাসনের শক্তিসংহতি বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তহাতে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালীরূপ দিতে কালহরণ করে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার

সহায়তা করেছে। সেদিক থেকে এই সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভার বহুপূর্বেই পরিবর্তন হয়ে কেন্দ্রে একদলীয় সরকারের পরিবর্তে সমভাবাপন্নদের শক্তিসমাবেশে সরকার গঠিত হওয়া উচিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী সেদিকে পূর্বেই অগ্রণী হতে পারতেন এবং ব্যর্থ হলে বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগ করে দিতে তার পদত্যাগ করা উচিত ছিল। বর্তমান সময় নূতন নির্বাচনের জন্য বেছে নেবার আরও চাপ শাসক কংগ্রেসের উপর এসে পড়েছিল। পর পর দুই বছর ভাল ফসল হওয়া সত্ত্বেও গত এক বছরে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, রপ্তানিতে ঘাটতি, রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি, রেলে ৭০ কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা ইত্যাদি কারণে আগামী বছর বাজেটে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভবনা রয়েছে, সেই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। তার উপর ১৯৭১ সালে খরা হলে দেশ আরও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তাছাড়া উত্তর প্রদেশ ও বিহারে সরকার শাসকদলের হাতছাড়া হয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও স্থির নয়। সুতরাং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হবার পূর্বেই শাসক কংগ্রেস নূতন নির্বাচনের ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে ভাগ্যের সঙ্গে জুয়াখেলার ঝুঁকি নেবার যে প্রবণতা রয়েছে, তার দলের নেতৃত্বে অনিচ্ছুকদের অমত সত্ত্বেও সেই প্রবণতা জয়ী হয়েছে। অবশ্যি অর্থমন্ত্রী চ্যবনের আগামী আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা করেছে।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকারের পরামর্শে লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতি একটি নজীর সৃষ্টি করলেন। অতঃপর কোনো সংখ্যালঘু সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা। রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তে উত্তর প্রদেশে সংখ্যালঘু চরণ সিং সরকারের রাজ্যপালকে পরামর্শ দেবার অধিকার বিলম্বে হলেও স্বীকৃতি পেলো।

## নির্বাচনী কৌশল

আসন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী কৌশলের পায়তারা চলেছে কিছুদিন যাবৎ। এবার শিয়রে শমন এসে গেছে, সুতরাং কাল বিলম্ব না করে বিভিন্ন দলকে তাদের কৌশল নির্দ্ধারণ করতে হবে। কেরালার নির্বাচনের পর শাসক কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মুসলীম লীগ ভোট কেরালার এই ছক জাতীয় স্তরে প্রয়োগ করার কথা ভাবলেও, শাসক কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ দেখা দেবার ফলে তা সম্ভব হয় নাই। শাসক কংগ্রেসের মধ্যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর, কংগ্রেস ও সি. পি. আই. জোট রচনার প্রবণতা থাকলেও জগজীবন রামের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয় নাই। মুসলীম লীগের সঙ্গে জোটের প্রশ্নটি সামুহিক বিরোধিতার ফলে চাপা পড়ে গেছে কিন্তু সি. পি. আই এর সঙ্গে রাজ্যস্তরে জোটের প্রস্তাব কংগ্রেসে মোটামুটি অনুমোদন পেয়েছে। শাসক কংগ্রেস, প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গেও জোটের পরিকল্পনা করেছে; তাছাড়া রাজ্যস্তরে বাংলা কংগ্রেস, ডি. এম. কে এবং এই ধরণের পার্টির সঙ্গে তারা হয় জোটে না হয় আসনের সমঝৌতায় আবদ্ধ হবে। অর্থাৎ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য শাসক কংগ্রেসের দিক থেকে কোনো নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে জয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে মোটামুটি রাজনৈতিক বিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম কৌশল গ্রহণে শাসক কংগ্রেস উদ্যত হয়েছে।

বিরোধী কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতাচ্যুতি, প্রসঙ্গত গণতন্ত্রের সুরক্ষা। তাদের আশু লক্ষ্যসাধনের জন্য এই দল উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে সংযুক্ত বিধায়ক মন্ত্রীসভা গঠন করলেও তাদের নির্বাচনী সমঝৌতায় সংযুক্ত বিধায়ক দলের প্রতিফলনে তারা ব্যর্থ

হয়েছে। সংযুক্ত বিধায়ক দলের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় ক্রান্তি দল এবং সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি, বিরোধী-কংগ্রেসের নির্বাচনী' সমঝৌতার সঙ্গী হতে স্বীকৃত হয় নাই। ভারতীয় ক্রান্তি দল, বিরোধী কংগ্রেস-জনসংঘ-স্বতন্ত্র জোটে যোগ দেবেনা জানিয়ে দিয়েছে। সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে এই নির্বাচন জোটে যোগদানের বিপক্ষে মত থাকার দরুণ, তারাও সরাসরি এই জোটে যোগ না দিয়ে হয়তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দলের সঙ্গে সমঝৌতা করে ইন্দিরা-বিরোধিতার লক্ষ্যে স্থির থাকবে। এই দলের কেরলে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে জোট রয়েছে।' সেই ছক পশ্চিম বঙ্গেও প্রসারিত করবার জন্য সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির কয়েকটি বিশিষ্ট নেতা প্রকাশ্যে সুপারিশ করেছেন। বিরোধী কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘের জোটও অত্যন্ত শিথিল-ভিত্তিক। এই তিনটি দলের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের স্বাজাত্য তেমন নেই, তেমনি রাজনৈতিক অন্তিম উদ্দেশ্যও এদের ভিন্নতর। তাই এরা 'এক আসনে, এক প্রার্থী' এই নীতির ওপর জোট বেঁধেছে। এর চাইতে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর এরা দাঁড়াতে পারে নাই।

প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি গত বরোদা সম্মেলনে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে 'তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার' প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জোটের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অথচ, লোকসভার অনেক গুরুতর প্রশ্নে শাসক কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে এই দল বাধ্য হয়েছে। সমাজবাদী দলগুলির আদর্শগত ভিত্তিতে মিলনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং এদিক থেকে সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট এবং প্রজা সোস্যালিষ্ট—এই দুই দলের নেতৃত্বই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। আদর্শগত মিলনের পরিবর্তে এই দুই দল আপাত-সুবিধার ভিত্তিতে রাজনীতির কাঠামো রচনায় ব্যাপৃত আছেন। এই আপাত-সুবিধার ভগ্নস্তূপের চাপে এই দুই দলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে যদি আদর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি এরা বর্জন করে চলেন। অন্তত নির্বাচনের পূর্বে এদের মিলনের সম্ভাবনা নেই।

পশ্চিম বাংলার মার্ক্সবাদীরা লোক-দেখানো জোট বেঁধেছেন। আসলে এই জোটে এরাই একেশ্বর। যারা একান্ত বসম্বদ তারাই এই জোটে স্থান পেয়েছে। আর একটি জোটের আটটি দলের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ রয়েছে। এদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস, ইউ, সি—এই দুই মার্ক্সবাদী দল—দুই কংগ্রেসেরই বিরোধী। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ দল কম্যুনিষ্ট পার্টির দুই মুখো নীতি এই জোটে অস্থৈর্য এনেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ শাসক কংগ্রেসের 'প্রগতিশীলদের' সঙ্গে সমঝৌতায় প্রতিশ্রুত হলেও, তাদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা আট পার্টির অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে বার বার ছলনা করে বোঝাতে চাচ্ছেন যে আটপার্টির দুই কংগ্রেস বিরোধী নীতিতেই তারা স্থির রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে, না হোক আসন ভাগাভাগি এদের করতেই হবে লোকসভার নির্বাচনে, সেক্ষেত্রে বিধানসভার নির্বাচনেই বা সে ব্যবস্থা হতে বাধা থাকবে কেন? বাংলা কংগ্রেস পশ্চিম বঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক জোট গঠনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, পশ্চিম বঙ্গের পি. এস. পি, এস. এস, পির একটি অংশ তাদের এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু শাসক কংগ্রেসের একাংশের কম্যুনিষ্ট প্রীতির জন্য সেটা সম্ভব কিনা সন্দেহ। সেক্ষেত্রে বাংলা কংগ্রেস আট পার্টির সমীপবর্তী হতে পারে। পশ্চিম বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহকে প্রতিরোধের জন্য একটি জাতীয়তাবাদী মোর্চা গঠনের অপরিহার্যতা দেখা দিয়েছে। এই জোট গঠনে ব্যর্থতা জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির সর্বনাশ সাধন করবে এবং পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক জীবনের অবসান ঘটাবে। আপাত-সুবিধার সুযোগ সন্ধান না করে পশ্চিম বাংলার জাতীয়তাবাদী দলগুলির কাছে নির্বাচনের প্রাক্কালে এই অমোঘ আহ্বান এসেছে। জাতীয়তাবাদী

জোট ছাড়া অন্য কোনো জোট পশ্চিম বাংলার পক্ষে আত্মবিধ্বংসী।

## মূল্য বৃদ্ধি

১৯৭০ এর নভেম্বরে পাইকারী মূল্য সূচক ১৮১·২ অঙ্কে পৌঁছে. এক বছরে শতকরা ৭·৩ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, অথচ ১৯৬৯-৭০-এ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০ কোটি টনে পৌঁছে উৎপাদনের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। খাদ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্কট, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুরুতর অবস্থা ঘোষণা করেছে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় চার কোটি টনের বেশী চাল উৎপাদিত হয়ে এ-বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছে, গম উৎপাদিত হয়েছে দুই কোটি টনের বেশী, অথচ খাদ্যশস্যের পাইকারী মূল্যসূচকের উর্ধগতি অব্যাহত রয়েছে। এই সূচক ১৯৬৯ নভেম্বরে ১৯২·৬ থেকে ১৯৭০ এর নভেম্বরে ২০৫·৫ এ পৌঁছায়। মূল্যবৃদ্ধির অব্যাহতগতি নুন, ডাল, তরকারী, সরিষার তেল, সুতীবস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য পণ্যকেও রেহাই দেয় নাই। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষের দৈনিক ৭০ পয়সারও কম ব্যয়ক্ষমতা। সুতরাং শহরের ও গ্রামের দরিদ্র এবং নির্দিষ্ট আয়ের মানুষদের জীবনে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ কি দারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা সহজে অনুমান করা যায়। এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে সরকারের কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছেনা। মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলি যদি দূর করতে সরকার তৎপর না হয় তবে আর্থিক বিপর্যয় অনতিবিলম্বে সর্বব্যাপী হবে। চতুর্থপ্ল্যানে শিল্পউৎপাদন-এর হার শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগ অনুমিত হলেও এ যাবৎ শতকরা পাঁচভাগের সীমা অতিক্রান্ত হয় নাই। রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্য থাকলেও এ বছরের ছয়মাসে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প উৎপাদনে ক্রমাগত ঘাটতি, প্রতি বছরে শতকরা দশভাগ নোটের যোগান বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছে। তাছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি নূতন পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ বেতনবৃদ্ধির ফলে রাজস্বে ঘাটতি পড়বে এবং এই ঘাটতি হয় নূতন ট্যাক্স বসিয়ে না হয় কাঁপাই মুদ্রা দিয়ে পূরণ করতে হবে। যার ফলশ্রুতি আর এক দফা মূল্যবৃদ্ধি।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের ১২,৮০০ কোটি টাকার তহবিলে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের সম্পদে শতকরা ১২·৫ ভাগ ঘাটতি পড়বে। এ-কারণে প্ল্যানের আকার খর্ব করলে, উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিয়ে আবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। উৎপাদনে ঘাটতি, দেশে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করবে। এমনিতে প্রতি সপ্তাহে প্রায় একলক্ষ নূতন লোক কর্মেচ্ছুদের দলবৃদ্ধি করছে। সরকার বছরে পাঁচলক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তাতে বড়জোর পাঁচ থেকে সাত সপ্তাহের কর্মেচ্ছুদের কর্মসংস্থান হতে পারে। পুরোনো বেকারদের এবং অবশিষ্ট নূতন কর্মেচ্ছুদের হতাশায় দিন গুণতে হবে।

মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা—উৎপাদনের সমস্যা, বেকারের সমস্যা, জীবনমানের সমস্যা, পরিকল্পনার সমস্যা—এক কথায় একটি সর্বাত্মক সমস্যা। আজ প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেয়ে পরিকল্পনার সার্থকতা ব্যর্থ করে জাতীয় জীবনে সঙ্কট সৃষ্টি করছে। সরকারের উটপাখীর নীতি বর্জনের সময় এসেছে। অন্যথায় গোটা অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের জীর্ণ বনিয়াদও।

## চটকল ধর্মঘট

পশ্চিম বাংলার চটকলগুলিতে ১৮ দিনের ধর্মঘটের সমাপ্তি হয়েছে। এই ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকেরা, এ বছর মূল বেতনের

শতকরা ৬ ভাগ, আগামী বছর শতকরা সাড়ে ছয় ভাগ এবং তার পরের বছর শতকরা ৭ ভাগ বোনাস পাবে। এ-ছাড়া শ্রমিকদের জন্য গ্রাচ্যুইটির নীতি গৃহীত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বেতন কমিটি গ্রাচ্যুইটির পরিমাণ নির্ধারণ সাপেক্ষে এ বছরের ১লা ডিসেম্বর থেকে প্রতি বছর কাজের জন্য বার দিনের গ্রাচ্যুয়িটি শ্রমিকদের দেওয়া হবে। এ-ছাড়া ষাট হাজার বদলি কর্মীর সাময়িক কর্মচ্যুতির সময় কত ভাতা প্রাপ্য হবে বেতন কমিটি তা ছয় সপ্তাহের মধ্যে স্থির করে দেবেন। এই আঠার দিনের বেতন সম্পর্কে চুক্তিতে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এই প্রশ্নটি শ্রমিক ও মালিকদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অনুমান করা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য শ্রমিকদের এ-বিষয়ে অনেকটা বঞ্চিত হবে।

ইতিপূর্বে কলকাতা বন্দরের ডিঙ্গি-মাঝিদের ৬৬ দিনের ধর্মঘট এবং ষ্টেভেডোর শ্রমিকদের ২২ দিনের ধর্মঘটে পাটশিল্পের কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, তার ফলে ভারত সরকারের রপ্তানির আয়ে ঘাটতি পড়েছে এবং বৈদেশিক বাজারে পাটশিল্প পিছু হটেছে। এবারকার ধর্মঘটে ৪৮০০০ শ্রম-দিবস নষ্ট হয়ে ৬৩ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন হ্রাস হয়েছে। ফলে উৎপাদনে ২১ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানিযোগ্য। ১৯৬৯র ধর্মঘটের পর এবারকার ধর্মঘট মালিক এবং শ্রমিক দুই পক্ষই এড়িয়ে যেতে পারলে জাতীয় অর্থনীতি এত শীঘ্র আর একবার বিপন্ন হোতো না। এই মীমাংসা সম্ভব ছিল বলে আমরা মনে করি।

২৮. ১২. ৭০

## কাত্যায়নী : প্রভাকর মাঝি

এই আছে এই নেই, পদ্ম পত্রে আয়ু টলোমলো—
বড়ো তাড়া, তাই দ্রুত প্রাণের পেয়ালা নিচ্ছি ভরে
আমার আকণ্ঠ তৃষ্ণা রূপ ছেড়ে অরূপের নয়,
নিংড়ে নেবো রুধিরাক্ত জীবনের যা কিছু নির্যাস।

তাৎক্ষণিক সুখ ফেলে ব্রহ্ম-স্বাদ পেতে চাইনে কো—
ফিরে যাও হে মৈত্রেয়ী অনন্তে জীবনে নেই লোভ।
সব কটা ইন্দ্রিয়ের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছি,
বলো যে জিজ্ঞাসু তাকে,—কাত্যায়নী বাঁচতে চেয়েছিল।

অর্থ চাই, খ্যাতি চাই, পার্থিব সম্পদ আরো আরো,
আত্মাকে উপোসী রেখে পরমার্থে প্রয়োজন নেই।
কন্যা জায়া মাতা রূপে ফুটে উঠবো পরিপূর্ণা নারী
অমরত্ব অবাস্তব অমৃতেরও করি নে কামনা।

তার পর শেষ অঙ্কে চোখ দুটোতে নামলে অন্ধকার
জীবনকে ফাঁকি দিইনি এই থাকবে সান্ত্বনা আমার।

## শৈশবে ফিরে যাব : গৌরী বসু

আমার মনের মধ্যে একটা বাড়ির নক্সা আছে
বেশ সাইজ মাফিক সব ঘরগুলো
হাল্কা সবুজ দেওয়ালে সাদা বর্ডার টানা
গ্রীল দেওয়া জানলায় কি হাওয়া, কি হাওয়া
দরজার বটলগ্রীন পরদা দুলছে, শুধু দুলছে।
এমনি সাজানো বাড়ি আমার মনে আছে
সামনে ছোট্ট একটা ফুলের বাগান
ইতস্তত: বেলী, চামেলী, গন্ধরাজ আর হাস্নুহানা
এবং জানলার কাছ বরাবর
একটা শিউলি গাছ অবশ্যই থাকবে
যে আমাকে শরৎ মনে করিয়ে দেবে
যে আমাকে নিয়ে যাবে অস্ফুট শৈশবে।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস

ধারাবাহিক রচনা

# বিস্ফোরণ : ১৯১২

কালীচরণ ঘোষ

**সংক্ষিপ্তসার :**

বৈশুণতেওয়ারী,— মহেন্দিগঞ্জ,— আয়নাপুর,— কুশাঙ্গল,— বীরাঙ্গল,— কাকুরিয়া,— পানাম,—প্রতাবপুর,— ডাকাতির প্রচেষ্টা (কুমিল্লা),—লাঙ্গল বাঁধ,—কোনা,—হত্যাকাণ্ড : সুকুমার চক্রবর্ত্তী, সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, রতিলাল রায়,—রাজধানীর রঙ্গ,—ষড়যন্ত্রের প্রসার।

বিপ্লব আন্দোলন কিছুটা উৎপাত সৃষ্টি করেছে এবং ইংরেজের টনক নড়েছে বলা যেতে পারে, কিন্তু এ সময় জনমতের যে সামান্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বঙ্গভঙ্গ রদ ও ভারতীয় বিধান পরিষদের যৎসামান্য সম্প্রসারণ প্রভৃতি তার পিছনে কংগ্রেসের দাবীকে প্রধান স্থান দিতে হয়।

বিপ্লবীদের সে দিকে মন দেবার অবকাশ ছিল না। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, পুলিন প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্র হতে স্থানান্তরিত হওয়ায় স্থানীয় নেতাদের হাতে আন্দোলন পরিচালনার ভার গিয়ে পড়ে। এঁদের মধ্যে অনেকেই অসমসাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দায়িত্ববোধের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করে বয়োকনিষ্ঠরা এগিয়ে এসেছে।

দলের নেতা এবং সাহসী সহচর অনেকেই জেলখানায় বন্দী, সাধারণের মনে ত্রাস তার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাহলেও পূর্ব্ববাঙ্গলার নানা জেলায় বৈপ্লবিক ঘটনার বিরাম ছিল না। সংগ্রামের চিন্তা ক্রমেই নতুন নতুন যুবকদের মধ্যে যে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটা ছোট বড় ডাকাতি এবং কয়েকটা খুন থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঢাকা ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে উৎপাত অবাধে চলেছে। কুমিল্লার ডাকাতির ষড়যন্ত্র উপলক্ষ করে গভর্ণমেণ্ট বেশ কয়েকজন কর্মীকে লম্বা কারাবাসের ব্যবস্থা করেছিল।

অর্থ লুণ্ঠনের সঙ্গে অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টাও চলতে থাকে।

## বৈশুণতেওয়ারী :

ঢাকার বৈশুণতেওয়ারী (থানা ও গ্রাম) হরলাল সাহার বাড়ীতে (১৯১২) জানুয়ারী ২৩-এ প্রায় জন পনেরো লোক রাত্রি ১০ টার সময় চড়াও হয়ে হাজার তিনেকের মত টাকা নিয়ে উধাও হয়।

## মহেন্দিগঞ্জ :

ফেব্রুয়ারী ১০-ই বাখরগঞ্জের মহেন্দিগঞ্জ থানার সহাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের বাড়ী থেকে একটি

দো-নলা গাদা বন্দুক এবং শ' আড়াই টাকা চুরি যায়। যথারীতি এ অপরাধের কোনো কিনারা হয় নি।

**আয়নাপুর :**

ঢাকার ঘেওর থানার আয়নাপুর গ্রামে (১৯১২) ফেব্রুয়ারী ২-রা তে অনুষ্ঠিত ডাকাতিতে ধনী ব্যবসায়ী গোপেশ্বর সাহার বাড়ী থেকে অলঙ্কার ও নগদে সাত হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়।

**কুশাঙ্গল :**

অর্থ অপেক্ষা বন্দুকের দিকে যে ডাকাতদের লক্ষ্য বেশী সেটা বোঝা যায় বাখরগঞ্জ জেলার কুশাঙ্গল গ্রাম ও থানার অবস্থিত জানকীনাথ পালের বাড়ী থেকে এপ্রিল ১৭-ই একটি সরকারী বন্দুক চুরির ঘটনা থেকে। বন্দুক পেয়েই লুণ্ঠনকারীরা খুশি, টাকা পয়সার দিকে আর নজর দেওয়া প্রয়োজন হল না।

**বীরাঙ্গল :**

একটু বড়রকমের ডাকাতি হয়েছিল বাখরগঞ্জের বীরাঙ্গল গ্রামে ১৯১২ মে ২৩-এ ধনী ব্যবসায়ী কালীকুমার সাহার বাড়ীতে। এখানে ডাকাতদের সঙ্গে বাড়ীর লোকের ভাল রকম সংঘর্ষ হয় এবং গৃহস্বামী ও তাঁর ভাই গুরুতর আহত হন। পঞ্চাশের বেশী ডাকাতদের লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ আট হাজার টাকার মত।

**কাকুরিয়া :**

বহু বহু ক্ষেত্রে ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে ডাকাতদের নিরাশ হ'তে হয়েছে ; বিপদের ঝুঁকি ত সব সময়ই বিদ্যমান। বাখরগঞ্জ মহেন্দিগঞ্জ থানার কাকুরিয়া গ্রামে মনিরুদ্দিন সেখের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল ১৯১২ এপ্রিল ১৯-এ। মাত্র ষাটটি টাকার মত লাভ হয়েছিল-বলে প্রকাশ।

**পালাম :**

লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য দিয়ে বিচার করতে গেলে ঢাকার নারায়ণগঞ্জ থানার পানাম গ্রামে রাত্রি ১টার সময় গৌরচন্দ্র সাহার বাড়ীতে ১৯১২ জুলাই ১১-র ডাকাতির স্থান ওপরে গিয়ে ওঠে। উভয় পক্ষেই আহত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। গৃহস্থের একজনের অবস্থা একটু গুরুতর হয়ে পড়ে। ডাকাতদের সংখ্যা ত্রিশ বা আরও কিছু বেশী হতে পারে। নোট ছিল ৯,৯০০ টাকার, নগদ ৫,০০০ টাকা, ২৫ খানা গিনি এবং ২৫০ খানা সোনার মোহর। একুনে প্রায় ২০ হাজার টাকা খোয়া যায়।

**প্রভাবপুর :**

জন পঁচিশ যুবক রাত্রি ১১ টা নাগাদ ১৯১২ জুলাই ১৫-ই বাখরগঞ্জ জেলার কোতোয়ালি থানার দিগেন্দ্র নারায়ণ রায়ের বাড়ীতে হানা দিয়ে কমবেশী সাড়ে সাত হাজার টাকা নগদ ও অলঙ্কারে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এখানে দস্তুরমত খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায় এবং ডাকাতদের দু' দুজন খুব গুরুতর ভাবে আহত হয়।

**ডাকাতির প্রচেষ্টা (কুমিল্লা)**

চারিদিকের উপদ্রবে পুলিশ অত্যন্ত সজাগ হয়ে পড়েছে এবং কোনো সন্ধান পেলে সূত্রধরে বিপ্লবীর খোঁজে চারিদিকে তোলপাড় করে ছাড়তো। অনেক সময় নিরাশ হতে হয়েছে, আবার কখনও টানা জালে দু'চারটা রুই কাতলা ধরা পড়ে হিংসাত্মক আক্রমণ প্রচেষ্টা বানচাল করতে সমর্থ হয়েছে।

কুমিল্লার এক ঘটনা এ ব্যাপারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯১২ অক্টোবর ২৭-এ কোতোয়ালী থানার সাব ইন্সপেক্টর

টের পান শশীভূষণ ভট্টাচার্যের পুত্র এক পত্র পেয়েছে যে আগামী নভেম্বর ১-লা কোনো এক বাড়ীতে ডাকাতি হবে।

পুলিশের টনক নড়ে উঠলো। চারিদিকে গুপ্তচর গোয়েন্দা পুলিশ সতর্ক প্রহরা রাখার ব্যবস্থা হ'লো। নির্দিষ্ট তারিখে কতকগুলি লোককে গভীর রাত্রে মোক্তার দুর্গাচরণ পালের অন্ধকার বাড়ীতে ঢুকতে দেখা গেল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পুলিশ দেখল যে আর নতুন লোক কেউ যাচ্ছে না।

বাড়ী ঘেরাও হ'ল; তন্ন তন্ন খানাতল্লাসী সুরু হয়ে গেল। এক যায়গায় শিকার সংখ্যায় দাঁড়িয়ে গেল বারো জন। বাড়ীর মধ্যে থেকে ডাকাতির মাল মশলা, মুখোশ, লাঠি, বড় হাতুড়ি, দুটো রিভলভার, একটা ·১২ কামান, টোটা, বারুদ, ছোরা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হলো। তাছাড়া কয়েকজনের নাম ও তাদের কার কাছে কি হাতিয়ার প্রভৃতি দেওয়া আছে তার তালিকা পাওয়া গেল। বারোজন সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি আর আনুষঙ্গিক সব ছেঁকে নিয়ে পুলিশ মহানন্দে মোক্তার বাড়ী থেকে রওনা দিল।

মাস কয়েক ধরে পুলিশ খুঁটি নাটি তল্লাসী শেষ করে তের জনকে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য হাজির করে। মামলা চলার কালে প্রমাণের অভাবে একজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯১৩ মার্চ্চ ১২-ই দায়রা জজ বারো জনের প্রত্যেককে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। একযাত্রায় পৃথক ফল তাঁর মনঃপূত হ'লো না।

দণ্ডিত আসামীরা হাইকোর্টে আপীল করলেন। শুনানী শেষ হ'ল হাইকোর্ট জুলাই ১১-ই রায় দিয়েছিল। দু'জন মুক্তি পান আর—

(১) প্রদ্যুম্নকুমার দে রায়, (২) হরিচরণ শীল, (৩) রমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, (৪) কাঁলাচাঁদ দে রায়, (৫) কুমুদবন্ধু নাগ, (৬) রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) দেবেন্দ্রনাথ বণিক (৮) নয়নরঞ্জন বসু (৯) সর্ব্বকান্ত (ওরফে ব্রজেন্দ্রলাল) চক্রবর্ত্তী, (১০) প্রভাস চন্দ্র কর্মকার এই দশ-জনের পূর্ব্ব দণ্ড বহাল রেখে দিয়েছিল।

**লাঙ্গলবাঁধ:**

ঢাকার নবাবগঞ্জ থানা গ্রাম লাঙ্গলবাঁধ গৃহস্বামী পিয়ারী মোহন নন্দী। জন ১৫ যুবক (১৯১২) নভেম্বর ১৪-ই হাজির হয়ে হাতুড়ি মেরে দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে ভিতরে চলে যায়। মালিকের নিকট লোহার সিন্দুকের চাবী আদায় করে অলঙ্কার ও নগদে হাজার ষোলো টাকা নিয়ে সরে পড়ে। ধর্মপ্রাণ লোক তারা, যাবার সময় "হর, হর, বম্ বম্" ধ্বনি দিয়ে অন্তর্ধান হয়। যাবার সময় বোমা ফাটায় আর বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ে কয়েকটা।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতির কোনো কিনারা করতে পারে না। মামলা মোকদ্দমা হ'ল না। এ ক্ষেত্রে পরিণতি একটু নাটকীয় রকম ঘটেছিল। ঢাকা উয়াড়ির এক রায় বাহাদুর, এ্যাসিট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদাধিকারী, পুত্র গিরিন্দ্রমোহন দাসের গতিবিধিতে একটু সন্দিহান হয়ে পড়েন। ১৯১২ নভেম্বর ২৭-এ পিতা গিরীন্দ্রকে ডেকে তার বাক্স খুলতে আদেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সমিতি ও তাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সব প্রকাশ করে বলতে হুকুম করলেন। পিতা একেবারে নাছোড়বান্দা। সুতরাং নিরুপায় হয়ে গিরীন একদিনের সময় চেয়ে নিল।

পর দিন (নভেম্বর ২৮-এ) গিরীন্দ্র এক সহকর্ম্মী সঙ্গে করে হাজির; আর রায় বাহাদুর হাজির করলেন পুলিশ সুপারিণটেণ্ডেণ্টকে। বাক্স খোলা হলো সকলের সামনে, দেখা গেল বহু কার্তুজ, বারুদ, গুলি আর টোটা, তৈরীর সরঞ্জাম। এর সঙ্গে লাঙ্গলবাঁধ ডাকাতিতে লুণ্ঠিত বহু রূপার গহনা।

বিচার আরম্ভ হয় ১৯১৩ ; রায় বেরুলো জানুয়ারী ২-রা ফেব্রুয়ারী ২২-এ, অস্ত্র আইনে দেড় বছর আর ডাকাতির মাল রাখার জন্য পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় গিরীন্দ্রের।

**কোনা :**

টাকার দিক থেকে অত্যন্ত ছোটখাটো ব্যাপার ; লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ এক শত নয়। ঘটনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দশ-বারো জন ছেলে নভেম্বর ১৮-ই ঢাকা শ্রীনগর থানার অন্তর্গত কোনা গ্রামের পোষ্ট অফিসে হানা দিয়ে পোষ্ট মাষ্টারকে ভয় দেখিয়ে চাবি আদায় করে। ছোট পোষ্ট অফিস, টাকা পয়সা কিছুই পাওয়া যায় নি বল্লেই হয়।

**মেদিনীপুরে হত্যা-প্রচেষ্টা :**

গুপ্তচর বলে কাকেও সন্দেহ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মেদিনীপুরে সহরের আবদুর রহমান বলে একজন পুলিশে বিপ্লবীদের সম্পর্কে গোপন সংবাদ সরবরাহ করার গুজব রটে। ডিসেম্বর ১৩-ই সন্ধ্যার সময় তার বাড়ীতে বোমা পড়ে। রহমন সাহেবের কপাল ভাল, কেউ আহত হয় নি।

**হত্যাকাণ্ড :**

মেদিনীপুরের চেষ্টা বিফল হলেও অন্যান্য স্থানে কয়েকটা খুন হয়েছে।

ঢাকা জেলার চাঁদারফুল গ্রামের সুকুমার চক্রবর্ত্তী গুপ্তচর বলে বদনাম রটে যায়। বিপ্লবী যুবকরা তাকে হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করবার পরামর্শ করে। সুযোগও জুটে যায়। ঢাকা সদরে পুলিশকে তথ্য সরবরাহ মানসে সুকুমার ( ১৯১২ ) ফেব্রুয়ারী ১১-ই বাড়ী থেকে রওনা হয় পরের দিন সহরে পৌঁছুবে। তার সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি। ১২-ই তারিখেই তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ একটা জনমানবহীন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

এসে জুটেছিল প্রথম দিকে, কিন্তু পরে দলত্যাগ করেছে, সেরূপ উদাহরণ অনেক ছিল। তাদের কোনো হানি হয়নি, সামান্য "ভীতু" নাম ছাড়া। যারা একেবারে ডিগবাজি খেয়ে পুলিশের কবলে গিয়ে পড়েছে, স্বভাবতঃই তাদের ওপর আক্রোশ পড়বার কথা।

কুমিল্লাতে ফেণীর অধিবাসী সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী এই দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত। একদিন বিপদ তার ঘনিয়ে এল। কয়েকটা দিন ধরে তার পাত্তা পাওয়া যায় না ; আত্মীয় ও 'আপন জন' পুলিশ তার খোঁজ করতে লেগে গেল। জুনের মাঝামাঝি সারদার মুণ্ডহীন গলিত শব আবিষ্কৃত হ'ল। বেশ কিছু দূরে এক পুষ্করিণীর মধ্যে তার ছিন্ন মুণ্ড পেয়ে বোঝা গেল এটি 'সমিতির' প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের গোপন সংবাদ রাখা, গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ঢাকার এক হেড কনষ্টেবল রতি লাল রায় কিছুদিন থেকে একটা নির্দ্দিষ্ট এলাকায় প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরে বেড়াত। পাঁচ দিন চৌকী দেবার পর রতিলাল উর্দ্ধতন অফিসারকে মহা আনন্দে জানিয়ে দিলে, যে সে কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ স্থানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। মনে বড় আশা এইবার একবার জালে ফেলতে পারলে একটা সুনাম হবে, ভাগ্য ফিরে যাবে।

এই অবস্থায় ( ১৯১২ ) সেপ্টেম্বর ২৪-এ রতিলাল বিকালের দিকে ঢাকা গোপাল নগর অঞ্চলে এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। সেখান থেকে বেরুতে বেরুতে সওয়া সাতটা বেজে গেল। মন্থর গমনে রতিলাল বাড়ীর দিকে চলেছে, এমন সময় মিনিট দশেকের মধ্যে পিছন দিক থেকে অজ্ঞাত আততায়ী ঝুলনবাড়ী লেনে রিভলভার দ্বারা রতিলালের পিঠে গুলি করে আর সঙ্গে সঙ্গে

তার মৃত্যু ঘটে। তাঁর "স্বদেশী ডাকাত" ধরিয়ে দেবার কাজ চিরকালের জন্য মিটে যায়।

যখন ১৯১১ ডিসেম্বর ১২-ই বাঙ্গলা, বিহার, ওড়িশা এবং আসামের নব রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের কথা প্রচার করা হয়, তখন থেকে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ দেবার তোড়জোড় চলতে থাকে। কার্য্যতঃ পার্লামেন্টে ১৯১২ জুন ২৫-এ নতুন বিল পাশ করার পর, আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন শাসন ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়। বাঙ্গলার লাট, তাঁর শাসন সভা, আইন সভা, সভ্য সব মিলে এক বিরাট সোরগোল গড়ে তোলে। মডারেটরা বিশেষ আনন্দিত হন, কিন্তু উগ্রদল আর ক্ষান্ত হতে পারে নি। তার প্রমাণের কোনো অভাব ছিল না।

রাজধানীর রঙ্গ ঃ

ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করে মিন্টো যখন বিদায় নিলেন, তখন শাসন সংস্কার ভারতের ওপর চেপে বসেছে। সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচক রূপ গ্রহণ করছে। সে সবের কুফল ঢাকবার কতকটা চেষ্টা হচ্ছে ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড়া দিয়ে। দরবারের হাঙ্গামা চুকেছে বছর খানেক আগেই; দিল্লীতে রাজধানী হ'ল সেটা সাড়ম্বরে প্রচার করার কাজ বাকী।

তোড়জোড় ভাল রকমেই চলছে, মন কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন, বাঙ্গলা হয়ত এখন সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের আয়োজন চলছে। সারা উত্তর ভারতে ফল্গুর স্রোত বইছে বাঙ্গলা থেকে পাঞ্জাবেরও সীমানা ছাড়িয়ে। বোমা যাচ্ছে বাঙ্গলা থেকে, অন্ততঃ শিক্ষাটা দস্তুর মত রপ্তানী হচ্ছে। বোমা প্রস্তুত প্রণালী সম্বলিত একই ফর্মুলা রাজা বাজার (কলকাতা), দিল্লী, লাহোরে পাওয়া যাচ্ছে। শক্তিশালী ঘাঁটিও সব গড়ে উঠছে। নির্ভীক, আত্মভোলা বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাহীন যুবকের দল ধীরে ধীরে ফাঁসি কাষ্ঠের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সকল কেন্দ্রের নির্ধারিত নেতা আছেন, আর সবার ওপরে রয়েছেন রাসবিহারী বসু। সব মিলে স্থির হয়েছিল এক নির্দিষ্ট দিনে বিরাট অভ্যুত্থান; কিন্তু সেই দিন, জার্ম্মানীর ভাষায় der tag, আবির্ভূত হবার আগের ঘটনাও বিপ্লবী ইতিহাসেরও এক বিরল দৃষ্টান্ত। একাধারে এবং একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুর্জ্জয় সাহস, অটুট স্থৈর্য্য, স্থির লক্ষ্য, আত্মগোপনে কুশলতা প্রভৃতি গুণের সমন্বয় সাধারণতঃ দেখা যায় না। অথচ ১৯১২ ডিসেম্বর ২৩ এ বড় লাট হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে যে বোমা ফেলা হয়, সেইটাই এ সকলের মিলন ক্ষেত্র।

বিরাট আয়োজন। সপত্নী লাট চলেছেন দিল্লীকে ভারতের প্রধান নগরী বলে ঘোষণা করতে। নগরী তখন পাঞ্জাবের লেফ্‌ট্যাণ্ট গভর্ণরের শাসনে। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে, এটাই হ'ল পূর্ব্ব বৎসরে সম্রাটের নির্দ্দেশের ফল।

স্পেশ্যাল ট্রেনে করে লাট ও পত্নী বেলা ১১ টায় দিল্লী স্টেশনে এসে পৌছুলেন। ভারতের বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও আশপাশের রাজন্যবর্গ, তাদের প্রতিনিধি দল; সামরিক অসামরিক প্রধান রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ, পুলিশ, সৈন্য ও দেহরক্ষীর দল, ব্যাণ্ড ও আর কত কি। গণনাতীত দর্শক, হাতী ঘোড়া, যানবাহন মোটর সব মিলিয়ে লোকে লোকারণ্য। রাস্তার আশ-পাশের বাড়ীর ওপর মানুষ ভর্ত্তি, তিল ধারণের স্থান নেই। শীতের মিঠে রোদ আলো আর আরাম বিতরণ করছে। দেখে মনে হবে ভারতবর্ষে দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অভিযোগ কিছুই নেই।

পত্নীসহ লাট হার্ডিঞ্জ ট্রেন থেকে নেমে এলেন। যথারীতি অভ্যর্থনা হ'ল। করমর্দ্দন, বাক্য ও শিষ্টতা বিনিময়, পরিহাস, সৌজন্য ছড়িয়ে পড়েছে; ওধারে

পুরাতন ফোর্ট থেকে হচ্ছে তোপধ্বনি। ব্যাণ্ড বেজে উঠলো আর ইংরেজ পরিচালিত কাগজওয়ালাদের মতে "ভারতের জাতীয় সঙ্গীত" অর্থাৎ Rule Britannia"র সুর ভেসে উঠলো।

পঞ্চাশটি হাতী ; তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশালকায় এবং শিক্ষিতকরী ফরিদকোট দরবার থেকে এসেছে। তার সজ্জা ও আভরণের তুলনা কোথাও দেখা যায়নি। তার পিঠে বিরাট হাওদা, লাট ও পত্নী তাতে বসলেন। অপরগুলির ওপর মর্য্যাদা অনুযায়ী রাজন্যবর্গ ও সরকারী বেসরকারী মাননীয় সম্ভ্রান্ত অতিথিকুল।

সঙ্কেত ধ্বনি হলো, বিরাট মিছিল চলতে শুরু করলো। শ'তিনেক গজ পথ যাবার পর লাটের হাতী চাঁদনী চকে ঘড়ি-ঘরের কাছে এসেছে, অপর পাশে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বিরাট অট্টালিকা। কাতারে কাতারে দুপাশে লোক দাঁড়িয়ে তন্ময় হ'য়ে মিছিল দেখছে। উৎসাহ আনন্দের সোরগোল সারা অঞ্চলকে মুখরিত করে ফেলেছে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এক বিরাট শব্দ দিগন্ত প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। একবার নিমিষের জন্য মনে হয়েছিল খুব নিকটে হাজার খানেক পটকা কেউ একসঙ্গে ফাটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিছিল কিছু সময়ের জন্য থেমে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক বিস্ময়বিমূঢ়। মিনিটখানেক পার হবার পর মধ্যেই বোঝা গেল লাটের হাওদা লক্ষ্য ক'রে কে একটা বোমা ফেলেছে ; কিছুটা হলদে ধোঁয়া উঠছে।

মোটা পুরু রূপোর চাদরমোড়া হাওদার খানিকটা উড়ে গেছে। ছত্রধারী বলরামপুর রাজ্যের মহাবীর সিং মারা গেছে এবং হাওদার গায়ে তার প্রাণহীন দেহ ঝুলছে। লাট পত্নী হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়ে গেলেন, কিন্তু ত্বরিতে আপন আসনে সোজা হয়ে বসলেন। চোখে ধোঁয়া আর ধোঁয়া, কাণে লেগেছে তালা, একটা অস্বাভাবিক বিহ্বল ভাব। সম্পূর্ণ সম্বিৎ ফিরতে বেশ কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল।

ছত্রধারীর পর ভীষণভাবে আহত হয়েছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ নিজে। হাওদার বাইরের পিঠে বোমা ফেটেছে। তাঁর দেহের নানাস্থানে বোমার মধ্যস্থিত লোহার টুকরো প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ দাবনা (shoulder blade) র আঘাতটা কিছু গুরুতর। দৈর্ঘ্যে চার ইঞ্চি প্রায় ঘাড় আর গভীরতায় হাড় পর্য্যন্ত। পেশী সব ছিন্ন ভিন্ন। ঘাড়ের আরও একস্থানে বড় আঘাত চিহ্ন। দেহের অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ দক্ষিণ পাছায় অনেকগুলো লোহার টুকরো গভীর মাংসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে।

হাতী দাঁড়িয়ে গেছে। লাট বলে উঠলেন সঙ্গিনীকে "মনে হচ্ছে একটা বোমা" বলেই "চলো" বলে মিছিল এগিয়ে যাবার আদেশ যে দিলেন সেটা প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। লাট পত্নী ততক্ষণে সমস্ত অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন। মিছিল থামাতে বলে নিকটস্থ উচ্চপদাধিকারী অফিসারদের বল্লেন যে আঘাতের গুরুত্ব বিবেচনায় লাটকে হাতি থেকে নামিয়ে সদ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বিরাটকায় হাতি, রোগীর দেহের ওজন এবং ক্ষতের অবস্থা বিবেচনায় তাঁকে নামিয়ে মোটরে তোলা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার হলো না। তবে শেষ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুরূপে যে হলো সেটা বেশ বোঝা গেল।

আরও দুটি লোক বোমার টুকরোর আঘাতে প্রাণ দেয়। হাওদার মোটা কাঠ ও রূপোর পুরু চাদর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে লাটের প্রাণ রক্ষা করেছে।

আততায়ী ধরবার জন্য খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। পথের ওপর এত ঘন মানুষ দাঁড়িয়েছে যে তার মধ্যে থেকে ছুড়ে ফেলার দূরত্বের মধ্যে হাত তুলে একটা মারাত্মক, অর্থাৎ নিতান্ত ছোট আকারের নয়, বোমা ফেল্লে নিশ্চয়ই কারও নজরে পড়তো। গুজব ছড়িয়ে পড়লো পাঞ্জাব ন্যাশনাল

ব্যাঙ্কের দোতালায় বারান্দা থেকে পড়েছে। সেখানেও উপস্থিত লোকদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাদ চলেছিল। কিন্তু বোমা কাকেও ফেলতে দেখেছেন এ কথা কেউ বলতে পারলেন না। ভৌতিক কাণ্ড।

আসামী ফেরায়। ধরে দেবার পুরস্কার স্বরূপ লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি ছড়িয়ে পড়লো। শেষ পর্য্যন্ত সব বাদ সাদ দিয়ে গভর্ণমেণ্ট থেকে মোট এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়। এ টাকা বেঁচে গেল। আসামীর সন্ধান কেউই দিতে পারলেন না। সাজা হওয়া দূরের কথা কেউ ধরাও পড়লো না। ঘটনার পর থেকে লোকমুখে বসন্ত বিশ্বাসের নামই আততায়ী বলে প্রচলিত ছিল। এর কিছুদিন পরে সিঙ্গাপুর অঞ্চলে রাসবিহারী বসু এক বক্তৃতায় দাবী করেন যে তিনি স্বহস্তে এই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। সমস্যা জটিল ছিল, জটিলতর হ'ল মাত্র।

এর পরই লাহোরে ১৯১৩ মে ১৭-ই লয়েল গার্ডেনে এক বোমা ফাটে এবং একজন সাইকেল আরোহী, সরকারী পিয়ন, তার ফলে নিহত হয়। তখন কাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। পরে সূত্র ধরে কয়েকজনকে ১৯১৪ সালে সন্দেহক্রমে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হয়। রাসবিহারী ফেরারী আসামী। অপরাপর তিন জন আসামীর সঙ্গে অবাধ বিহারী, আমীর চাঁদ, বাল মুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসকে বিচারশালায় কাঠগড়ায় খাড়া করা হয়েছিল। নিম্ন আদালত সব পার হয়ে ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১০-ই পাঞ্জাব চীফ কোর্ট প্রধান আসামীদের ফাঁসির হুকুম দেন। প্রিভি কাউন্সিল আপীল নাকচ করে ১৯১৫ মার্চ্চ ১ লা। আর মে ১১-ই আম্বালা জেলে ঐ চারজনের ফাঁসী হয়ে যায়—হাডিল হত্যা প্রচেষ্টার এই পরিণতি ঘটে।

### ষড়যন্ত্রের প্রসার :—সরকারী দুশ্চিন্তা

দুটি বিপ্লবী আস্তানায়—কুমিল্লা ১৯১২ নভেম্বর ১-লা ও ঢাকা ওর,ড়ি ১৯১২ নভেম্বর ২৭-এ তারিখে দুটি বিপ্লবী আস্তানায় অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে গভর্ণমেণ্ট বেশ একটু বিচলিত হয়ে ওঠে। ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রায়ই এসে পৌছুচ্ছে, তার মধ্যে আবার এতগুলি শিক্ষিত ও সরকারী উচ্চপদাধিকারী কর্ম্মচারীদের বাড়িতেও, অর্থাৎ কি না "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা"—হিংস্যাত্মক কার্য্যের জন্য প্রস্তুতির অনুপ্রবেশ এখন খানিকটা নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি বিপ্লব অধ্যুসিত জেলায় জাঁদরেল পুলিশ কর্ম্মচারীরা মিলিত হলেন ১৯১৩ সালের এক সময়। ভদ্রঘরের সন্তান কর্তৃক ডাকাতি ও খুনখারাপি ছিল আলোচ্য বিষয়। মারাত্মক ঘটনা ছাড়া হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুস্তক পত্রিকা অতি গোপনে প্রচার করার মধ্যে তাঁরা অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় লক্ষ্য করেন এবং প্রায় হতাশভাবে বলেন যে ধর-পাকড় জেল-জরিমানা এ তরঙ্গ রোধ করতে পারছে না, বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ সমানে অনুসৃত হচ্ছে ("The revolutionary movement is active as ever), আর চলছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সমগ্র ঢাকা বিভাগ, খুলনা ও কলকাতায়।

প্রশ্ন হ'ল, পার্টিশান ত চলে গেছে এবং আশাও করা গিয়েছিল পূর্ব্ববঙ্গে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকাণ্ডে ভাঁটা পড়বে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি সুসংবদ্ধ আর সরকারী গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য অতি দক্ষ এক বিভাগ বর্ত্তমান ("enquiries into these cases showed very clearly that a society possessing an excellent organisation coupled with a trained intelligence department is at work.")

সব বিচার করলে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে কেন্দ্রীয় এক সংস্থা সব পরিচালনা করছে। যুবকদের মধ্যে অসন্তোষ ও রাজানুগত্য বিলোপের চেষ্টা হচ্ছে অপর লক্ষ্য। ("great efforte were being made to tamper with the loyalty of the youth of the country and to spread the spirit of disloyaity and anarchy among them.") (ক্রমশঃ)

# চাও সুদ চাও?

বছরে

# 7%!

7 বছরের
জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (4র্থ ইস্যু)

সঞ্চয়ের একটি উত্তম প্রস্তাব।

করযুক্ত সিকিউরিটি এবং অন্যান্য জমার সুদ সমেত 3000 পর্যন্ত সুদের টাকায় কর দিতে হবে না।

বিশদ বিবরণীর জন্যে আপনার বাড়ীর কাছের পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

dayp 70/371

ধারাবাহিক আলোচনা

# সুভাষচন্দ্র ও ভারত-চিন্তা

রবি রায়

[ ইতিহাসের এক চরম সঙ্কটময় অবস্থায় ভারত আজ উপনীত। বহু শতাব্দীর জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যজ্ঞভূমির পবিত্র বহ্নিশিখা আমাদের সীমাহীন লোভ ও নির্লজ্জ বর্বরতার বিষাক্ত নিশ্বাসে বার বার কেঁপে উঠছে।

মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই বীর সেনানায়ক সুভাষচন্দ্র বসু শুধুমাত্র একটি বিশেষ যুগের বন্দিত মানুষ নয়, অথবা আমাদের জাতীয় জীবন-ইতিহাসের কোন কোন বিশেষ অধ্যায়ের পুরোধাও নন, সুভাষচন্দ্র স্বয়ং ভারত-চিন্তা ও সংস্কৃতির চলমান স্রোতধারা। তাঁর প্রায় পঁচিশ বৎসর (১৯২১—৪৫) প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সংগ্রামী জীবনের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও ভারতের স্বপ্ন ও সাধনা, মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের বনিয়াদ কোন পদ্ধতিতে দৃঢ় হবে সেই সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা কতিপয় গ্রন্থে, তরুণদের ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের ঐসব রচনার আলোকে তমসাচ্ছন্ন ভারত তার নিজের পথকে খুঁজে পাবে, অবিশ্বাসের মরুভূমির বুকে হারিয়ে যাওয়া স্রোতধারাকে উদ্ধার করে বিশ্ব-সংহতির মিলনযজ্ঞে মিলিত হতে পারবে—এই উপলব্ধির পরিণতিতে সুভাষ-ভাবনার পর্যালোচনা। ]

## তরুণের স্বপ্ন : ২

জেলের মধ্যে বাস করে সুভাষচন্দ্র কেবল তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শ বা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধেই ভাবেননি, জেলের সাধারণ অপরাধীদের প্রতি নির্মম ব্যবহার এবং তাদের অমানুষরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জেলখানাগুলির যথেষ্ট অবদান লক্ষ্য করে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। সমাজ-পরিত্যক্ত এই মানুষগুলির কোন ভবিষ্যত নেই হয়ত বা একদিনের ক্ষণিকের দুর্বলতা একটি মানুষকে চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। কারাগার যদি অপরাধী মানুষকে সংশোধন না করে, তার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহলে কর্তব্যকে অস্বীকার করা হয়, মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটে। দীর্ঘদিন কারাবাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করলে সুভাষচন্দ্র এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতেন না। মানবদরদী এই দেশপ্রেমিক আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে কোন সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে অপরাধপ্রবণ হতে পারে না বা অপরাধ করতে পারে না। অপরাধ এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। সুতরাং সমাজের কর্তব্য অপরাধীর প্রতি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে তার রোগের উপশমের জন্য প্রতিষেধকমূলক দণ্ডবিধির প্রচলন করা। ভারতবর্ষের সুদিনে—ভারতের স্বাধীনতালাভের পর সাধারণ কয়েদীদের সমাজ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কারা-শাসনের আমূল সংস্কার অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। এই সম্পর্কে মান্দালয় জেল থেকে ২রা মে, ১৯২৫ সনে প্রিয় বন্ধু

শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখলেন, 'জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাসকালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরও হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, এতদিন জেলে বাস করার পর কারাশাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে।'

তরুণের স্বপ্ন আরম্ভ হয়েছে কেম্ব্রিজ থেকে দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র যে চিঠি দিয়ে ভারতমাতার চরণে জীবন-যৌবন উৎসর্গ করার সঙ্কল্পের বাণী উচ্চারণ করে দেশে ফিরতে চেয়েছেন। ১৯২১ সনের জুনের আগে দেশবন্ধু সুভাষকে চিনতেন না, দেশে ফিরেই দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সক্রিয় রাজনীতিতে ঐ বছরের শেষের দিকে দেশবন্ধু প্রমুখের সঙ্গে প্রথম কারাবাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন (১৯-১২-২১)। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, মাত্র চার বছরের ব্যবধানে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র তথা সকলকে ছেড়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন (১৬ই জুন, ১৯২৫)। এই চার বছরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মাত্র দুই আড়াই বছর তিনি দেশবন্ধুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে ছিলেন, বাকী সময় তাঁকে কারান্তরালে থাকতে হয়েছে। দেশবন্ধুর পরলোক-গমনের সংবাদও সুভাষচন্দ্রকে মান্দালয় জেলে শুনতে হয়। সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধেয় নেতার এই আকস্মিক তিরোধানে গভীর বেদনা অনুভব করেন। দেশবন্ধুর অনুপম চরিত্রের মহৎ গুণাবলীর বহু নিদর্শন তাঁর স্মৃতির পটে ধরা পড়ে নয়নকে বাষ্পাচ্ছন্ন করে তুলল, এই সময় লেখা বহু চিঠিতে তিনি দেশবন্ধুর চরিত্রের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে নিজের বেদনা-বিধুর হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে সুভাষচন্দ্রের দেশবন্ধুর স্মৃতি-চারণের মধ্যে। অবশ্য দেশবন্ধুর পবিত্র স্মৃতিকে কেন্দ্র করে লেখা আরো দু'টি চিঠি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রথমটি বন্ধুবর দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠির মধ্যে (২৫শে জুন, ১৯২৫) সুভাষচন্দ্র এই ব্যথাকে—শোককে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে বা দার্শনিক-সুলভ মনোভাবে দেখতে না পারার কারণ স্বরূপ লিখছেন, 'জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্র্যাজেডী আছে—যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—সে গুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্রকার দুঃখ কষ্টই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি।'

বেশ কিছুদিন ধরেই সুভাষচন্দ্র জেলের সাধারণ কয়েদীদের কথা ভাবছিলেন, সমাজ-পরিত্যক্ত এইসব মানুষগুলিকে কি ভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যায়, কি ভাবে তাদের হৃত মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করা সম্ভব, জেলের প্রতিশোধ-মূলক নিয়মাবলী এবং অমানুষিক অত্যাচারই যে' সাধারণ কয়েদীদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বাধা হয়েছে তা তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। কিছু দিন পূর্বে দিলীপ রায়কে লেখা চিঠিতেই (২রা মে, ১৯২৫) সুভাষচন্দ্র সাধারণ কয়েদী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও কারাগারের নিয়মাবলীর আমূল সংস্কারের প্রতি জোর দেওয়ার বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান চিঠিতেও দুঃখ-বিহ্বল সুভাষ দেশবন্ধুর বিশাল চরিত্রের অসংখ্য গুণাবলী লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা তাঁর সাধ্যের বাইরে বলে উল্লেখ করে কয়েদীদের সম্বন্ধে দেশবন্ধুর সহানুভূতি কেমন ছিল তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে চিত্তরঞ্জনের মানবতার এই সুন্দর দিক কে প্রকাশ করেছেন। ১৯২২ সনে তিনি যখন দেশবন্ধুর সঙ্গে একত্রে জেলে ছিলেন, সেই সময় একজন দাগী আসামীকে দেশবন্ধুর পরিচর্যার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশবন্ধু সেই লোকটিকে এবার মুক্তির পর তার ডেরাতে না ফিরে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে দেখা করার জন্য বললেন। লোকটি কারাবাসের পর দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁর বাড়ীর কাজে নিযুক্ত করলেন। জেল কয়েদী আবার তার স্বাভাবিক জীবনকে ফিরে পেল। দেশবন্ধুর অসামান্য কার্যাবলীর কাছে এই ঘটনা অতিশয় তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর মহত্ত্বকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, মানুষের সীমিত ভাষার দ্বারা যতটুকু সম্ভবপর, দেশবন্ধুর মহান চরিত্রকে তার সাহায্যে কণামাত্রও প্রকাশ করা যায় না। সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনাধিক প্রিয় নেতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সীমিত ভাষাকেও সংযত বাক্যে রূপ দিতে অপারগ হয়েছেন। গভীর শোকে কথা হারিয়ে গেছে, শুধু তাঁর গুরুর এক অনুপম কাহিনী স্মৃতির পটে বিষণ্ণ সন্ধ্যাতারার মত ফুটে উঠল। আলিপুরের বোমার মামলায় দেশপ্রেমিক অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন কালে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের সেই ওজস্বিনী মন্তব্য সুভাষচন্দ্র তাঁর গুরুর ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য মনে করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে নিজের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন—He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and re-echoed etc.

## নূতনের সন্ধান : ১৯৩০

তরুণের স্বপ্ন প্রকাশের দু'বছর পর ১৯৩০ সনে নূতনের সন্ধান প্রকাশিত হয় ১৯২১ থেকে '২৭—এই ছয় বৎসরে একটি মেধাবী তরুণের ব্যক্তিগত সুখ ও সম্মানকে ছুঁড়ে ফেলে পরাধীন ভারতমায়ের শৃঙ্খল ভাঙার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক রূপে উত্তরণের কাহিনী তরুণের স্বপ্নের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই লেখার অধিকাংশই সাগরপারের কোন এক বন্দীশালায় বন্দী-সুভাষচন্দ্রের মুক্ত চিন্তার প্রকাশ অথবা সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে প্রবাসী ছাত্রের দেশের মাটীতে নিজের মাথা লুটিয়ে দিয়ে দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবকরূপে কাজ করার অদম্য ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু দীর্ঘ সাত আট বছর পর নূতনের সন্ধানের জন্য যবনিকা উত্তোলন করলে দেখতে পাওয়া যায় ভারতের শাশ্বত আদর্শের প্রতীক এক তরুণ ভারতপথিককে। বহু বৎসর পূর্বে ঠিক তাঁরই মত আর একজন তরুণ ভারতের বাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার অরণ্যের পত্র কুঞ্জে, পর্বতের গাত্রে, সমুদ্রের তরঙ্গে, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে সেই বীর সন্ন্যাসী উপনিষদের বাণীর দ্বারা অভয় দিয়ে বলেছেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' সেই চিরন্তন পথের আর এক পথিক সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর মর্মের বাণীর পুনরাবৃত্তি করে তরুণ সম্প্রদায়কে বললেন, 'সাহস অবলম্বন কর', বললেন, 'আত্মবিশ্বাসী হও'।

মাত্র এক বছরের সোনালী ফসল 'নূতনের সন্ধান'-এ পাওয়া যায়। ১৯২৯ সনে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, বাংলার রাঙা মাটীর পথ ধরে নদীর মালায় সজ্জিত পূব বাংলার স্নিগ্ধ সবুজ পারে ছুটে গিয়েছেন তরুণ প্রাণের আহ্বান পেয়ে। সাধারণভাবে একবছরের মধ্যে শ্রীহট্ট, হুগলী, মেদিনীপুর, কলকাতা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, পাবনা, খুলনা প্রমুখ স্থানে হয় ছাত্র-সমাবেশে নতুবা যুব-সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশসেবার আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বত্রই সুভাষচন্দ্রের একই আহ্বান।

কবির ভাষায় বললে বলতে হয়,
'অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন।

যোদের পিছনে চিৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণশীল বুড়োরা করিছে তারই স্তব
শিবারা চেঁচাক শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক দল,
জোরু কদম্ চল্‌রে চল।।'

'নূতনের সন্ধান'-এ মোট নয়টি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে, এরমধ্যে সুভাষচন্দ্র চারটি ছাত্র-সম্মেলনে এবং বাকী পাঁচটি যুব-সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন বা পাঠ করবার উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে ছাত্র ও তরুণের কর্মসূচীর মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুব-আন্দোলনের একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। সব পথের লক্ষ্য স্বর্ণময় ভবিষ্যতের দিকে হলেও চলার পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য না'ও থাকতে পারে। তাই পরাধীন ভারতবর্ষে ছাত্র-যুবা-কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতির ভারতের স্বাধীনতা অর্জন একমাত্র লক্ষ্য হলেও, এই অমূল্য স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে তা বহুমুখী।

শ্রীহট্টজেলার সুর্মা উপত্যকা ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ দিয়ে নূতনের সন্ধান শুরু হয়েছে। যদিও সুভাষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত অনিবার্য কারণবশতঃ সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি। ১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে সম্মেলনের উদ্বোধন দিনে সভার সভাপতি সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই লিখিত অভিভাষণটি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে পাঠ করে শোনান হয়। নাতিদীর্ঘ এই অভিভাষান সুভাষচন্দ্র ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি এবং ছাত্রসমাজের প্রকৃত আদর্শ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত স্থাপন করেছেন। বাংলা তথা ভারতের ছাত্র সমাজকে আমাদের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে অপারগ, ছাত্ররা অবহেলিত। দেশকে ভালবাসার কথা বললেও দেশকে প্রকৃত আমরা ভালবাসি না। মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দ্বারা দেশকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যায়। কিন্তু আমাদের সমাজ দীর্ঘদিন ধরে নারী জাতির প্রতি নিপীড়ন চালিয়েছে তার ফলে মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা নেই, মহান আদর্শের সন্ধান আমাদের অজানা। অথচ আমাদের সুমহান ভারতের প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষপর্ব থেকে ভারতের এই অমানিশার পূর্বে প্রদোষকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই তখনকার দিনে আমরা নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করতাম বলে ভারতবর্ষ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। সুভাষচন্দ্র মনে করেন, 'জীবনে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কল্যাণকর—সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি, দেশমাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবন-মনোমোহিনী মাতৃমূর্তিতে।' ছাত্রসম্মেলনে উদাত্তভাবে নারী-বন্দনা স্বভাবতই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির প্রশস্তির প্রত্যক্ষ কারণ কি হতে পারে ছাত্র সমাজের মনে সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্র নিজেই ছাত্রদের এই অ-বলা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন—'নারী-সমাজ যে পর্যন্ত বীরপ্রসূ না হইতেছে, যে পর্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃজাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে না বসাইতেছি, সে পর্যন্ত এ দেশের নারী-জাতি বীরপ্রসবিনী হইতে পারে না।' সুতরাং নারীকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে হবে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার করতে হবে, অবরোধ প্রথা দূর করতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি, স্বাবলম্বী হবার জন্য অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা এমন কি শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম, লাঠি ও ছোরা খেলার ব্যবস্থা, মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে, এই সব পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে হলে ছাত্র ও যুব সমাজকেই অগ্রণী হতে হবে। কারণ এই রকম সামাজিক বিপ্লব বা সংস্কার একদিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব অপেক্ষা কঠিন। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে

থাকে আপামর সর্বস্তরের নিপীড়িত মানুষের শুভেচ্ছা ও সমর্থন, কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের প্রাচীর-প্রমাণ বাধা স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সমাজ। প্রাচীনপন্থী সমাজের প্রতিভূরা কুসংস্কারের বেড়াজালকে সন্তর্পণে আগলিয়ে রাখেন। সামাজিক বিপ্লবের নিমিত্ত যে লড়াই তা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে। সুভাষচন্দ্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের ভূমিকা ছাত্রসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে প্রতিপক্ষের মধ্যে নিজের আত্মীয় স্বজনকে দেখে ক্ষণিকের জন্য অর্জুন বিমর্ষ বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধে অ-মিত্র পরিজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে কার্পণ্য বোধ করেননি।

ছাত্র-সমাজের আদর্শ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে সমাজ তারুণ্যশক্তির গতিকে স্তব্ধ করার চক্রান্তে লিপ্ত। সুভাষচন্দ্রের কথায়,—'আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"—....এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রদিগের দেশসেবার কার্য হইতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন। 'সুভাষচন্দ্রের মতে অধ্যয়নের দ্বারা পরীক্ষায় পাশ ও পরে চাকুরী লাভ হতে পারে, কিন্তু তা কখনোই তপস্যা হতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশ্য ও অধ্যয়নের উদ্দেশ্য এক নয়। ছাত্রদের এই ভ্রান্ত আদর্শের নাগপাশ ছিন্ন করতে হবে। তাদের সাধনা হবে সত্যকে উপলব্ধি করা, দেশ-মাতৃকার চরণে নিজেদের বিলিয়ে দেয়া। রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে তরুণ সুভাষ প্রিয় ছাত্রদলকে তাদের কঠোর সাধনার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ছাত্র-সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; একসূত্রে বাঁধতে হবে শত সহস্র মন। জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের বন্যা জাগাতে হবে, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। সুভাষচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন,—'জাগ্রত ছাত্রশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করিবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর জন্য গৌরবময় আসন লাভ করিবে।'

মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে হুগলী জেলা ছাত্রসম্মেলনের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে ভাষণ দেন প্রকৃতপক্ষে প্রথম ভাষণ অপেক্ষা নূতন কোন বক্তব্য এই ভাষণে পরিলক্ষিত হয় না। সুভাষ এই সম্মেলনেও ছাত্রদের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। এই ভাষণে তিনি ছাত্রদের সম্মুখে ভারতের নব জাগরণের অগ্রগতিতে বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মহানায়করা এই পরাধীন সুপ্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তার চিন্তারাজ্যের নিথর সরোবরে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ঢেউ তুলে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। আমাদের হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থা যখন সমাজপতিদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের অবলম্বন হয়ে প্রায় বিনষ্ট হ'তে চলছিল, মানুষের মানসিক প্রবৃত্তি যখন 'সু'কে পরিত্যাগ করে 'কু'-এর মুখীন, ঠিক সেই সময় এই জাতির ত্রাণকর্তা রূপে ভারতের পূবে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে দেখা দিলেন রাজা রামমোহন রায়। বেদান্তের সোনার কাঠির স্পর্শে জাতির 'সুপ্ত মন' জেগে উঠল। ভারতবর্ষ তার আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু হ'ল, কিন্তু ঘুণ ধরা সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজ-সংস্কার বোধ হয় সম্ভব নয়, গড়ে উঠল নয়া সমাজ—ব্রাহ্মসমাজ। কেশবচন্দ্র সেনের সময় থেকে হিন্দু সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের পার্থক্য প্রকট হয়ে দেখা দিতে শুরু করলো। হিন্দু সমাজের জাগরণের প্রদীপ শিক্ষা জ্বলে উঠল, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে জাগরণের 'প্রথম প্রহরীর' প্রয়োজন ফুরিয়ে এল, কিন্তু এ'ত গেল ভারতের চিন্তারাজ্যে—আত্মিকরাজ্যের বিপ্লবের কথা। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের বাণী কি প্রথম বিবেকানন্দের কণ্ঠ

থেকে শোনা গিয়েছে? স্বামীজীর বাণী রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করলেও বিবেকানন্দ সমাজ সংস্কারের কথা বলেছেন। অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্বের উপর ভাবী ভারতের সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে, 'অদ্বৈতবেদান্তর মতে—"all power is in every one, all knowledge is in every man,"—আত্মিক গুরু বিবেকানন্দের এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই বুঝি ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনেতা নেতাজী সুভাষের কণ্ঠে শুনি, 'all power to the Indian people!' সুভাষচন্দ্রের মতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রথম বাণী শোনা গিয়েছে অরবিন্দের কাছ থেকে। 'We want complete autonomy free from British control.' অরবিন্দের এই বাণীই মুক্তিপাগল তরুণ বাঙালী হৃদয়কে চঞ্চল করে তুলেছিল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'Swaraj for the masses,' ঘোষণা স্বাধীনতাপিয়াসী জাতিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণে প্রেরণা দিল।

ছাত্র-সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র ছাত্র-সমাজকে ভ্রান্ত আদর্শ পরিত্যাগ করে দেশের মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিক হ'তে আহ্বান জানিয়েছেন। এই মুক্তিযজ্ঞে সকলেই যাতে মিলিত হ'তে পারে, সেইজন্য প্রত্যেকের হৃদয়ে দেশপ্রেমের ভাব ছাত্রদেরই জাগিয়ে তুলতে হবে। সুভাষচন্দ্রের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণের মনে দেবশক্তি জাগ্রত করার জন্য, সবকিছু অবহেলা, লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে, তারা যে অমিতবীর্য অমৃতের অধিকারী এই উপলব্ধি সঞ্চার করার জন্য, মাত্র শ' খানেক তরুণ প্রাণকে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন: 'আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভিতর সাড়া আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। অমোঘমন্ত্র বলে এদের জাগাব।···তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনা গে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা তোমরা অমিতবীর্য অমৃতের অধিকারী।' বাংলার তথা ভারতের তরুণ সমাজের কাছে পরম লজ্জার কথা সেদিন স্বামিজীর এই উদাত্ত আহ্বানে বাঙলা তথা ভারতের তরুণ হৃদয়—মাত্র একশ জন তরুণ চিত্তের কাছ থেকেও সাড়া মেলেনি। প্রায় অর্ধশতাধিক বৎসর পরে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে বিবেকানন্দের পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সুভাষ তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়কে বললেন, 'যাও চীনা ছাত্রদের মত—রুশ তরুণদের মত—চাষীর পর্ণকুটীরে ও মজুরদের আবর্জনা পূর্ণ ভগ্ন গৃহে। তাহাদের জাগাও।···সর্বোপরি যাও দলে দলে বাঙলার উপেক্ষিত সমাজের কাছে।' বল—"ভাই এতদিন পরে এসেছি তোমাদের কাছে নূতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মুক্ত করতে—মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য এই কথা তোমাদের বলতে। তোমরা ওঠো, জাগো—এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্যা।"

সুভাষচন্দ্র মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন বিবেকানন্দের বাণী—ভারতের আদর্শ কখনো ভুলুণ্ঠিত হতে পারে না। বাংলার ছাত্রসমাজ, ভারতের ছাত্রদল নিশ্চয় তার ধ্যানের ভারত—স্বপ্নের ভারতকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে। অপরাজেয় ছাত্রশক্তির সাফল্য সুনিশ্চিত।

পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাবে সুভাষচন্দ্র ছাত্র সম্মেলনে যে ভাষণ দেন, আমার ধারণায় যে চারটি ছাত্রসম্মেলনে সুভাষ-চন্দ্রের প্রদত্ত ভাষণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে 'বিশিষ্টতম' বলে চিহ্নিত হতে পারে। যথারীতি দু'মাসের ব্যবধানে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব ছাত্র-সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ দিতে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ইংরেজীতে সভাপতির অভিভাষণ গুণমুগ্ধ পাঞ্জাবের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পেশ করেছিলেন। এ অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বাংলার প্রতি—বাঙালী বিপ্লবীদের প্রতি পাঞ্জাবের গভীর ভালবাসা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

পাঞ্জাবের তরুণদের, বাংলার প্রিয় তরুণকে আহ্বান জানানোর মধ্যে সুভাষচন্দ্র কতকগুলি তাৎপর্য লক্ষ্য করেছেন। নানাদিক থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে এক আপাত-বৈচিত্র্যের মধ্যে সুমহান ঐক্য বা মিল পরিলক্ষিত হয়। ভারতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসকের বলি এই বাংলা দেশ আর বৃটিশ রাজশক্তির দম্ভের শেষ শিকার পাঞ্জাব। বৃটিশ পশুশক্তির সর্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের মানুষদেরই সহ্য করতে হয়েছে। বোধহয় এই কারণেই ভারতের দু'অংশের দু'টি প্রদেশের মানুষ পরস্পর হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করতে ব্যাকুল। পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতের নির্যাতিত মানুষের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছনা, অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করেছে, মহাকালের নির্মম বিচারে 'স্বাধীন ভারত' প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য পরবর্তীকালে তাদের দু'জনকেই কেবল অঙ্গচ্ছেদ করতে হ'ল। 'স্বাধীনভারত'কে লাভ করার জন্য বাংলা তার পূর্ব এবং পাঞ্জাব পশ্চিম অংশকে বিসর্জন দিয়েছিল। আমাদের পুরাণে আছে দানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের রক্ষা করার জন্য দধীচি মুনি নিজের দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। দধীচির অস্থি দিয়ে নির্মিত অস্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্র দানব-বিজয়ী হয়ে স্বর্গরাজ্যে শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলার দধীচিদের অপরিসীম ত্যাগের দ্বারা লব্ধ স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে কি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে? মাত্র দু'টি প্রদেশের বিপুল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা জীবনের স্বর্ণ তোরণে পৌঁছাতে পেরেছি? তবে ত্যাগের মহিমা কখনই ব্যর্থ হ'তে পারে না।

সুভাষচন্দ্র পাঞ্জাবের ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তার এই ভাষণে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছেন তাঁর বক্তৃতাতে বহুল পরিমাণে রাজনীতির কথা থাকবে। তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন বর্তমান ছাত্র-আন্দোলন, যা ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা 'দারিদ্রহীন যুবক-যুবতীর একটা লক্ষ্যহীন অভিযান' নয়। বর্তমান ছাত্র আন্দোলন একটি 'ব্যাপকতর যৌবন-আন্দোলনের' অংশরূপে তিনি বিশ্বাস করেন। যৌবনের ধর্ম জীবনের জয়গান করা। পরাধীনতার নাগপাশে টিকে থাকার নাম জীবন নয়। আজ যৌবন চঞ্চল, তাই সে বেঁচে থাকার পথের সন্ধানে দুর্বার। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়, 'স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা, শুধু ইহা রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তি নহে, ইহা অর্থের সমানবিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি বর্জনও সূচিত করে। এই আদর্শকে অবিবেচকেরা হয়ত অসম্ভব বলিবে—কিন্তু প্রাণের ক্ষুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারিবে।'

সুভাষচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির নাম স্বাধীনতা। সদ্যোজাত শিশু যেমন তার প্রথম ক্রন্দনের দ্বারা বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জীবনের সুরকে প্রকাশ করে, তেমনি ছাত্রসমাজ এবং দেশবাসী স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করুক। ইংরেজ কঠোর হাতে ভারতীয়দের পীড়ন করছে। এতে ভীত হবার কারণ নেই। বরং আশান্বিত হ'বার কথা, ওদের ভিত যত দুর্বল হয়ে পড়ছে, শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরবার প্রয়াস তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারের পর সুনিশ্চিতভাবে যেমন প্রভাত আসে, ভারতের পরাধীনতার পর স্বাধীনতার প্রভাত নিশ্চিত ভাবেই আসছে। ভারত স্বাধীন হবে।

ছাত্রসমাজের কাছে সুভাষচন্দ্রের আবেদন মহীয়সী ভারতের সার্থক প্রতিনিধি হবার জন্য ছাত্রদের এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হবে। ভারতের শাশ্বত বাণী যৌবনের দূতরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন। তিনি মনে করেন বিশ্বের মানুষের কাছে যৌবন যুগ যুগ ধরে এই বাণী শুনিয়েছে।

ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে স্বাধীনতার সৈনিক গঠন করার সময় এসেছে। এই সৈনিকেরা শুধুমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামেই যোগ দেবে না। এশিয়া, আফ্রিকা তথা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কাছে স্বাধীনতার বাণী পৌঁছে দেবে, শ্রমিক, কৃষকের ঘরে সাম্যের বাণী শোনাবে, যুবসম্প্রদায়ের কাছে জীবনের জয়গান করবে।

১৯২৯ সনে তরুণের কাছে তরুণ সুভাষের প্রত্যয়পূর্ণ এই ভাষণ যে যুগমানসের ভাবপ্রবণতা নয়, সুভাষচন্দ্রের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস যে পরবর্তীকালে বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি, তার প্রমাণ পাই সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজী' পর্বে উত্তরণের পর বিভিন্ন ভাষণে। যথাসময়ে সেই সম্পর্কে আলোচনা করব।

অমরাবতীতে অনুষ্ঠিত মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ছাত্র-সম্মিলনে সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়ে আমরা একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক এবং সুদক্ষ রাজনৈতিক নেতার সমন্বয় দেখি। দীর্ঘদিন পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থেকে ভারতবাসী আজ মৃত। জীবনের পদধ্বনি তার কাছে অশ্রুত বলেই চলমান জগতের সঙ্গে সে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ-এর উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বললেন, 'elan vital' বা প্রেরণা-দায়িনী শক্তিই যেমন জগতকে কর্মের দিকে, উন্নতির দিকে নিয়ে যায়, আমাদের জাতি হিসাবে উন্নতি করতে হলে এই প্রেরণাদায়িনী শক্তির সন্ধান করতেই হবে। সুভাষচন্দ্র নিজেই প্রেরণাদায়িনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, 'স্বাধীনতার সম্প্রসারণের জন্য, আত্মবিকাশের জন্য যে ঐকান্তিক আগ্রহ —তাহাই এই প্রেরণাদায়িনীশক্তি।' কিন্তু কেমন করে মরা দেশে প্রেরণাদায়িনী শক্তি প্রবাহিত হবে? মরা দেহে কী ভাবে প্রাণের বান ডাকবে? সুভাষচন্দ্র আহ্বান করেছেন যৌবনকে। একমাত্র যৌবনই পারে মৃত জাতির ভিতর সঞ্জীবনী সুধা ঢালতে। যৌবনের পূজারী ছাত্রদলকে আজ জাতির ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র সম্মিলন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রের এই চারটি ভাষণকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য-পথ রূপে বিবেচিত, কংগ্রেসের অন্যতম তরুণ নেতার চিন্তার মধ্যে তার পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও সুভাষচন্দ্র পরবর্তী প্রায় দশ বৎসর কাল কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তথাপি ১৯২৮-২৯ সন থেকেই কংগ্রেসের অহিংসা নীতি এবং কর্মপদ্ধতি চিরবিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন কংগ্রেসের যে বিপুল জনসংযোগ তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তার নীতিকে গতিশীল করতে হবে, দেশের স্বার্থে তার পরিবর্তন দরকার। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে মুক্ত প্রাঙ্গনে তিনি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে দাঁড় করাতে পারেন নি বলেই পরবর্তীকালে নিজেই বেরিয়ে এসেছেন, সে কাহিনী পরিবেশন করার যথার্থ সময় এখনো আসেনি। এখানে 'নূতনের সন্ধান' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের চারটি ভাষণের আলোচনার দ্বারা এটুকু উপলব্ধি করা গেছে যে ভবিষ্যতে যে বিদ্রোহী যুবা সেনাপতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবেন, তার স্ফুরণ শুরু হয়েছে। এইসব ভাষণের মধ্যে কোথাও গান্ধীবাদী এক শান্ত নেতার প্রকাশ ঘটেনি, যদিও সুভাষচন্দ্র তখন প্রত্যক্ষভাবে বার বার গান্ধিজীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং গান্ধিজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের একজন অনুগামী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এইসব ভাষণে চরম আত্মদানের কথা বলেছেন—রক্তদানের কথা বলেছেন। শত্রুকে আক্রমণ এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরোধের ইঙ্গিত আছে। যুবশক্তিকে সংহত এবং মনের ও শরীরের দিক থেকে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। বারবার শক্তিরূপিণী নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা

এবং নারীদের পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের এই ভাষণগুলির মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের কোন মতবাদ ব্যক্ত করা হয়নি, ভারতীয় প্রজ্ঞার অধিকারী দেশমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান সুভাষ ভারতীয় আদর্শের প্রদীপ জ্বালিয়ে ভবিষ্যত পথের সন্ধান দিয়েছেন। যুব-সম্মিলনী-গুলিতে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সুভাষচন্দ্র কোন প্রচলিত মতবাদকেই গুরুত্ব প্রদান করেন নি।

প্রথমে 'ওপার বাংলার' পাবনা যুব সম্মিলনীতে তাঁর সভাপতির ভাষণ বিশ্লেষণ করা যাক। ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের একনিষ্ঠ সেবক সুভাষ 'মহাভারতে'র পথে আগামী দিনের ভারতবর্ষকে অগ্রসর হতে বলেছেন ভারতের যুবসমাজকে অগ্রণী হতে হবে, ভারতের পবিত্র মৃত্তিকার তিলক কপালে ধারণ করে মহাভারতের পতাকাতলে তাদের সম্মিলিত হতে হবে, সর্বপ্রকার নৈরাশ্য, দুর্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্লৈব্য পরিহার করে যুব শক্তিকে শক্ত পথে দাঁড়াতে হবে, দীর্ঘদিনের পরাধীনতার তীব্র জ্বালায় যদি ভারতের দিকে দিকে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা জমে থাকে, তবে তরুণের পূত নয়ন বহ্নিতে পুড়িয়ে ছারখার করতে হবে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—এই বাণীই হোক ভারতের তরুণ শক্তির শাশ্বত বাণী, সুভাষ-চন্দ্রের কথায়, 'The voice of Krishna was the voice of immortal youth।'

সুভাষচন্দ্র এই সম্মিলনে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে বর্তমানে সর্বত্রই বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ বা ism নিয়ে বড় বেশী মাতামাতি করতে দেখা যায়, তিনি যুবসমাজকে ism—সর্বস্ব রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, একটি বিশিষ্ট মতবাদকে আশ্রয় করেই রাজনীতি পরিচালিত হয় তার লক্ষ্য পথে, যুব আন্দোলনের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং একটি যুব সমাবেশে সুভাষচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণ রাজনৈতিক নেতার ঐরূপ উক্তি স্বভাবতই আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে দৃষ্টিকোণ থেকে তরুণদের ইজম্ এর গোঁড়া ভক্ত হতে নিষেধ করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, সব মতবাদই লক্ষ্যপথ ভ্রষ্ট হতে পারে যদিনা তার ভিত্তিভূমিতে খাঁটি মানুষ তৈরী করা যায়, আজকের দিনে খাঁটি মানুষের অভাব বড় বেশী, ভিত যদি দৃঢ় না হয় আদর্শের ইমারত কখনই দাঁড়াতে পারেনা, সুতরাং যুব-আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত খাঁটি মানুষ তৈরি করা। যুব সমাজ কোন্ মতবাদকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতের পরিমানস সমাজ গড়বে? বিশেষ করে বিভিন্ন মতবাদের তরঙ্গমালা যখন ভারতভূমিতে আঘাত করছে এবং এইসব মতবাদ নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা শোনা যাচ্ছে, তখন মতবাদ সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এক্ষেত্রেও বিশেষ কোন মতবাদের পক্ষ অবলম্বন করে কিছু বলেন নি। তাঁর কথায় মতবাদ যা হোক না কেন, তাকে সার্থক করে তুলতে হবে অতীত ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারিদিকের আবহাওয়াকে গ্রহণ করে; অর্থাৎ জাতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। কোন মতবাদই ধ্রুব নয়, সমাজ, পরিবেশ ও যুগের পরিপেক্ষিতে মতবাদ পরিবর্তিত হতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলছেন, 'কার্লমার্ক্সের নীতি কাজে পরিণত করিবার সময় বর্তমান রুশ জাতি বা বলশেভিকগণ এমন পরিবর্তন করতে বাধ্য হইয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে কার্লমার্ক্সের মূল নীতির বিরোধী?'

পরিশেষে তিনি যুবসম্প্রদায়কে শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, গান্ধিজী নয়, স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসূরী বীর সুভাষ তরুণদলকে আদর্শের জন্য, ভবিষ্যত

সুখ, সমৃদ্ধ, স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃশেষে আত্ম-বলিদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে বলেছেন। ভারতের মুক্তিযজ্ঞে উমিচাঁদ, মিরজাফর প্রমুখের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য চাই বলিদান, তরুণের সংগ্রামে ভারত ফিরে পাবে তার হৃতগৌরব, হারানো স্বাধীনতা। তাই বর্তমানে মতবাদের কচকচি নয়, ভারতের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তরুণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং এই একমাত্র মহান আদর্শের জন্য বিবেকানন্দের ভারতের যুবকদের শক্তি সঞ্চয় ও অবলীলাক্রমে প্রাণবিসর্জনে প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরবর্তী অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র ভারতের পরাধীনতার অন্যতম কারণ হিসাবে বলেছেন যে ভারতবাসী সমষ্টিগত সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলেই সমাজ গঠন-বিরোধী বৃত্তি আমাদের মানস ক্ষেত্রে জমেছে এবং জাতীর জীবনকে জরাগ্রস্ত ও শক্তিহীন করে তুলেছে। আমাদের 'সমষ্টিগত সাধনা' (collective Sadhana) করতে হবে। 'সাধনা' শব্দটির নানা অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তি করে থাকেন: সুভাষচন্দ্র 'সাধনার' তাৎপর্য বলতে মানুষের রূপান্তর—মনুষ্যত্বে উত্তরণকে বুঝিয়েছেন। এই রূপান্তর সাধিত হবে বাইরের শক্তির দ্বারা নয়, অন্তরের ব্রত উদ্‌যাপনে। অন্তরের ব্রত বা আদর্শের চরণে আত্মবলিদানে সার্থক হবে মানুষের রূপান্তর তথা ভারতবর্ষের রূপান্তর। যশোর-খুলনা জেলার যুব সম্মিলনে সভাপতির এই ভাষণে সুভাষচন্দ্র যুবসম্প্রদায়কে গতানুগতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে নূতনের সন্ধান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। Spirit of Adventure না থাকার আমরা কেবলই মার খাচ্ছি। ঘরের প্রতি আমাদের তীব্র আসক্তি বাইরের বিশালত্বকে অজানা করে রেখেছে, শক্তি থাকলেও নিজেদের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাব থাকার জন্য আমরা ব্যর্থ জীবন যাপন করছি। যুব-সম্প্রদায়কে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। স্বাধীনতার প্রতি তীব্র আকাঙ্খা অন্তরের মধ্যে পোষণ করতে হবে। ভালবাসতে হবে আপন জন—ভারতবাসীকে। তাহলেই জাতীর জীবনের এই সঙ্কটের অমানিশা কেটে গিয়ে সৌভাগ্যের জ্যোতির্ময় আপন প্রভায় দীপ্তিময় হয়ে উঠবে।


## অনিল রায়ের
## সময়োপযোগী দুইটি বই

**সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০**

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০**

( তৃতীয় সংস্করণ )

"... নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।**

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

# দামস্তর আর মজুরির চলমান সিঁড়ি

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

দাম বাড়ার ফলে মজুরি বাড়ানোর দাবীকে যখন বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয় এবং মজুরি বাড়ানোর পর দাম আবার বেশ খানিকটা বাড়ে, তখন মজুরি আর দামস্তরের এই পরস্পরের পিছনে ছোটার প্রতিযোগিতাকে আমরা তুলনা করতে পারি চলমান কোনো ঘোরানো সিঁড়ির (spiral) সঙ্গে। এই সিঁড়ির কোনো এক ধাপে পা রাখলেই আপনা আপনি পরবর্ত্তী ধাপে পা উঠে যায়; সময়ের ব্যবধানে দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে মজুরি ক্রমশঃ উপরে উঠতে থাকে। আপাততঃ মনে হয় যে দাম বাড়ার ফলে মজুরির প্রকৃত মূল্য যাতে কমে না যায়, তার জন্যে মজুরি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বেড়ে যাওয়াই সঙ্গত। অথচ মজুরি বাড়ালে দামের উপর তার প্রভাব পড়বেই। সুতরাং মজুরিকে স্থির রাখার উদ্দেশ্যেই ক্রমাগত তাকে বাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। দাম আর মজুরির এই অনবরত ছোটাছুটির ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সব শ্রেণীর লোক যাদের আয় দামস্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়ানো সম্ভব নয়। শ্রমজীবীদের মধ্যে যাদের সংগঠনকৌশল বেশী তারা দাম বাড়া সত্ত্বেও নিজেদের জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে ক্রমাগত মজুরি বাড়াবার জন্য চাপ দিয়ে। কিন্তু যারা সংগঠনশক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তারা দাম বাড়ার ফলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে, অন্যান্য শ্রমজীবীদের তুলনায় তাদের অবস্থা বেশ খানিকটা দৈন্যদশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

মজুরির তারতম্য সব দেশেই অল্পবিস্তর থাকে। সাধারণতঃ এই তারতম্য নির্দ্ধারিত হয় বিভিন্ন ধরণের কাজে শ্রমিকের আনুপাতিক যোগান ও চাহিদার ভিতর দিয়ে। শ্রমিকের যোগান আবার অনেকাংশে নির্ভর করে কোন্ কাজে কত দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা ও প্রস্তুতি দরকার তার উপর। সাধারণ নিয়ম হিসাবে বলা যেতে পারে যে যদি কোনো কাজে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য শ্রমিকের বেশীদিনের প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়, তবে আনুপাতিকভাবে সেই কাজে শ্রমিকদের যোগান কম হবে এবং এই শ্রমজীবী গোষ্ঠীর মজুরির হার অন্যান্য গোষ্ঠীর মজুরির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী হবে। কিন্তু মজুরির এই ব্যবধান কালক্রমে সংকীর্ণতর হয়ে আসতে পারে, যদি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের সংগঠনশক্তি মোটামুটি একই পর্য্যায়ের না হয়। সাধারণতঃ দেখা যাবে যে দেশে জিনিষপত্রের দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শ্রেণীর মজুরির প্রকৃত মূল্য কমে যায়। আর নিম্নতর স্তরের শ্রমিকদের মজুরির প্রকৃত মূল্য বাড়ে কিংবা অন্ততঃ অপরিবর্ত্তিত থাকে। সংগঠনশক্তির বিভিন্নতাই এই ধরণের ঘটনার মূলে। এর ফলে বিভিন্ন আয়ের তারতম্য হ্রাস পায় দক্ষ ও সুশিক্ষিত শ্রমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অকুশলী শ্রমিকদের আয় বাড়ে এবং দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে পরিণামে সমাজে দক্ষ শ্রমিকের যোগান কমে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে মজুরি বাড়াতে হচ্ছে দামবৃদ্ধির অশুভ প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য, তবু

সব শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি যেহেতু একই অনুপাতে বাড়ে না, সেই হেতু এই মজুরি-বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতী ( neutral ) করে তোলা সম্ভব নয়। কোন কোন শ্রমিকগোষ্ঠী এর সুবিধাটুকু ভোগ করলেও অন্যান্য শ্রমিক গোষ্ঠীকে তুলনা-মূলকভাবে সুবিধা হারাতে হয়, যার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের আপেক্ষিক যোগান পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতার সমাদর কমে গিয়ে নিছক সংগঠন-শক্তির উপর নির্ভর করবার প্রবণতা বৃদ্ধিপায়।

মজুরি এবং দামস্তর একে অন্যকে অনুসরণ করে বাড়তে থাকবে, এই অনুমান যখন সমাজের মুনাফাজীবীদের কার্য্যকলাপকে প্রভাবিত করে, মুনাফা-শিকারের জন্য বাড়তি মজুত-বস্তু ধরে রাখার কিংবা উৎপাদনের মাত্রা কমিয়ে অথবা উৎকর্ষ হ্রাস করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের প্রয়াস খুবই ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। মুনাফাজীবী শ্রেণীর লোকরা যতক্ষণ এই আশঙ্কা পোষণ করেন যে বাজারের অবস্থা যে কোনো মুহূর্ত্তে খারাপের দিকে যেতে পারে, ততক্ষণ তাঁদের মুনাফার লোভের উপর স্বভাবতঃ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই হয়। কিন্তু যদি তাঁরা বাজার খারাপ হতে পারে এরকম আশঙ্কা একেবারেই পোষণ না করেন, তাহলে সেই নিয়ন্ত্রণ আর কার্য্যকর থাকে না। মুনাফার লোভ তখন সাধারণ বিধিনিষেধের সীমা ছাড়িয়ে যায়। মুনাফা বাড়ানো যায় মজুরি কমিয়ে, এই বিশ্লেষণ আর তখন সত্য বলে ধরা যায় না। মজুরি এবং মুনাফা একসঙ্গেই বাড়তির দিকে চলে।

মজুরি এবং দামবৃদ্ধির অন্যান্য কুফলকে ছাপিয়ে ওঠে বৈদেশিক রপ্তানির উপর এই ক্রমাগত বৃদ্ধির কু-প্রভাব। যদি দেশের দামস্তর একবারমাত্র বৃদ্ধি পায় এবং তারপর স্থির থাকে, তবে রপ্তানির উপর সেই বৃদ্ধির অশুভ প্রভাবকে নানাভাবে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু দাম আর মজুরি যদি, পর পর বাড়তে থাকে এবং একাধিকবার এর পুনরাবৃত্তি হয়, তবে রপ্তানি বাণিজ্যকে তার কু-প্রভাব থেকে বাঁচাবার পথ নেই বললেই চলে। যতক্ষণ উপযুক্ত আভ্যন্তরীণ নীতির সাহায্যে এই পৌনঃপুনিক বৃদ্ধিকে রোধ করা না যায়, ততক্ষণ বৈদেশিক রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। বিশেষতঃ যে সব দেশের রপ্তানি বাণিজ্য নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি জিনিষের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, ক্রমাগত নূতন ধরণের পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবর্ত্তন করার মত উদ্ভাবন-শীলতা যে-সব দেশে নেই, তাদের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হবে অত্যন্ত বেশী। ভারতের মত দেশে রপ্তানি বাণিজ্য মোটামুটি পাট, চা, সুতী কাপড় এই ধরণের সীমাবদ্ধ কয়েকটি জিনিষ নিয়ে। সুতরাং ক্রমাগত দাম ও মজুরি বাড়বার ফলে আমাদের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা যে শোচনীয় হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

## দুই

দামবৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মজুরি বৃদ্ধি কিন্তু শুধু ভারতবর্ষের ঘটনাই নয়। অল্পবিস্তর পৃথিবীর সব দেশই আজ এই রোগের লক্ষণে আক্রান্ত। এই রোগ বিশেষভাবে বর্ত্তমান যুগেরই রোগ, কারণ (১) বর্ত্তমান যুগেই শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনী ক্ষমতা বেড়েছে এবং (২) কিছুদিন আগেও দামবৃদ্ধির ফলে দেশে মুদ্রার যে-সঙ্কট দেখা দিত, বর্ত্তমানে মুদ্রা-প্রসারণের নানা ব্যবস্থা থাকাতে সেই ধরণের সঙ্কট আর এখন দেখা দেয় না। প্রসারণশীল মুদ্রাব্যবস্থা অবশ্য দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু মুদ্রার প্রসার দ্বারা যদি শুধু মজুরিবৃদ্ধি ও দাম বৃদ্ধিকেই সুগম করে তোলা হয়, তাহলে মুদ্রামূল্যের স্থিরতা বলে কিছু আর না-ও থাকতে পারে। দেশের মুদ্রা প্রসারণের নীতি এমন সুবিবেচনার সঙ্গে প্রস্তুত হওয়া দরকার যাতে সেই প্রসারণ প্রকৃতপক্ষে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের বিস্তারেই ব্যবহৃত হয়; কেবলমাত্র দামবৃদ্ধি ও

আনুষঙ্গিক মজুরিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই যেন তার ব্যবহার না ঘটে। কিন্তু বাস্তবে এই ধরণের নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা দিয়ে থাকে। শ্রমজীবী শ্রেণী যদি মালিক পক্ষের নিকট থেকে অতিরিক্ত মজুরি আদায় করতে সক্ষম হয় তা হলে মুদ্রানীতির যাঁরা নিয়ামক তাঁরা প্রায় বাধ্য হয়ে পড়েন মুদ্রাপ্রসারণের দ্বারা সেই অতিরিক্ত মজুরি প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে স্বীকৃতি জানাতে। অর্থাৎ, মজুরি প্রদানের নীতিতে যদি, সংযম মেনে না চলা যায়, তবে মুদ্রানীতির সাহায্যে সংযম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রায়শই সম্ভব হয় না।

সেইজন্য শ্রমজীবীশ্রেণীকে মজুরি সম্বন্ধে কতকগুলি মূল নীতি মেনে চলতে রাজী না করানো পর্য্যন্ত মজুরি ও দামের এই দৌড়-প্রতিযোগিতাকে বন্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আজকাল পাশ্চাত্য সমাজে incomes policy বা আয়-সংক্রান্ত নীতির প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও সব দেশের শ্রমিক-সংস্থা একই রকম সুশৃঙ্খল ভাবে এই নীতি কার্য্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেন বলে এখনও দাবী করা চলে না। তা ছাড়া আইনতঃ স্বীকৃত শ্রমিক-সংস্থাগুলি যদিও বা মজুরির দাবীকে সংযত রাখতে প্রস্তুত থাকে, অপেক্ষাকৃত অসংগঠিত শ্রমজীবীরা ততটুকু সংযম দেখাতে রাজী নাও থাকতে পারেন। কিন্তু আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃ এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে শ্রমিকশ্রেণী যদি একমত হয়ে মজুরিবৃদ্ধি সম্বন্ধে সংযম দেখাতে না পারেন, তা' হলে দাম ও মজুরির এই পৌনঃপুনিক বৃদ্ধিকে রোধ করবার আর কোনো পথ নেই।

(ক্রমশঃ)


## জয়শ্রীর নিয়মাবলী

### গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

### লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।

কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

### কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
পোঃ নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

# সুভাষবাদ

পবিত্রকুমার ঘোষ

## মার্ক্সবাদ ও সুভাষবাদ : ৩

### ইতিহাসের ব্যাখ্যা

কার্ল মার্ক্স তাঁর Critique of Political Economy গ্রন্থের সূচনায় তাঁর ইতিহাস ও সমাজের ব্যাখ্যা সূত্রাকারে উপস্থিত করেছেন এইভাবে :

(১) মানুষ যখন সামাজিক উৎপাদনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করে তখন তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক অনিবার্যভাবে কতগুলি সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হতেই হয়; এই উৎপাদন-সম্পর্কাবলী তাদের উৎপাদনের বস্তুগত শক্তির স্তর অনুসারী হয়ে থাকে।

(২) এই উৎপাদন সম্পর্কাবলীর যোগফলই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে—আর সেই কাঠামোর ভিত্তির ওপর বৈধ ও রাজনৈতিক প্রাসাদ গড়ে ওঠে—সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপও তদনুসারী হয়ে থাকে।

(৩) বৈষয়িক জীবনগত উৎপাদনের পদ্ধতি সাধারণ ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণ ( bedingt ) নিয়ন্ত্রণ করে।

(৪) মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করেনা, বরং বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে ( It is not the conciousness of men that determines their existence, but, on the contrary, their social existence determines their consciousness ).

(৫) সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছলে উৎপাদনের প্রচলিত সম্পর্কগুলির সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে।

(৬) উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের অনুকূল ছিল যে উৎপাদন-সম্পর্ক তা প্রতিকূল ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।

(৭) তখনই আসে সমাজবিপ্লবের সময়।

(৮) অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশাল ওপরতলা কমবেশি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ইত্যাদি। এরকম সর্বমোট ১৫টি সূত্র মার্ক্স উপস্থিত করেছেন, আপাতত সবগুলির উল্লেখ এখানে করা অপ্রয়োজনীয়। মার্ক্স বলছেন যে উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্ক এই দুটি পারস্পরিক অনুকূল অবস্থায় থাকলে সমাজে স্থিতি ও শান্তি থাকে; কিন্তু উৎপাদনের শক্তি বিকশিত হবার ফলে প্রচলিত উৎপাদনের সম্পর্কগুলি বাধাজনক হয়ে দাঁড়ায়, ঐ সম্পর্কগুলি ভেঙে নতুন সম্পর্কজাল রচনার তাগিদ সমাজের অভ্যন্তরে তখন দেখা দেয়—তখনই আসে বিপ্লবের কাল এবং এইভাবে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন দেখা দেয় উৎপাদনের শক্তি বলতে মার্ক্স কী বলতে চেয়েছেন? কোথাও কোথাও তিনি যন্ত্র বা টেকনো-

লজিকেই উৎপাদনের শক্তি আখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলছেন :

In acquiring new productive forces men change their mode of production, and in changing their mode of production, their manner of gaining a living, they change all their social relations. The windmill gives you society with the fuedal lord ; the steam-mill society with the industrial capitalist. (The Poverty of Philosophy p. 119)

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর সেকথাই আরও খোলাখুলি বলেছেন : The bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionizing the instruments of production, and thereby the relations of production, and with them the whole relations of society. (পৃঃ ১৬)

কিংবা আরও স্পষ্টাকারে :

Technology discloses man's mode of dealing with Nature, the process of production by which he sustains his life, and thereby also lays bare the mode of formation of his social relations, and the mental conceptions that flow from them. (Capital, vol I, p. 372 রুশ সংস্করণ)

অর্থাৎ সোজা ভাষায়, মার্ক্স বলতে চান যে টেকনিক তথা যন্ত্রই মানবসভ্যতার একমাত্র নিয়ামক—এমন কি সাহিত্য, রোমান্টিকতা, দর্শন ও ধর্মও ঐ যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তারপরই মার্ক্স ধর্ম ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে earthly core of the misty creations of religion আবিষ্কার করতে পারলেই ধর্মীয় অনুভূতির প্রকৃত সত্যতা জানা যাবে—আর ঐ পার্থিব মর্মবস্তুরও মূল কথা হল উৎপাদনের যন্ত্র।

মার্ক্সের কাছে মানব সভ্যতার, হৃদয় ও মননের বিকাশের তাৎপর্য এর বেশী নেই। যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার তাগিদ মানুষের মধ্যে আনে বৈষয়িক উন্নতি কামনা, কিংবা সমাজের সমস্যার চাপ কিংবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে। যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সমাজকে কখনো কখনো ঢেলে সাজাতে হয়। সেই ঢেলে সাজানোর নামই বিপ্লব, আর তারই অপর নাম প্রগতি। সাহিত্য, দর্শন, আইন, রাজনীতি, এমনকি ধর্ম ও ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্পনাও নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সুপ্রয়োগের তাগিদে সৃষ্ট হয়—যন্ত্রের উৎপাদন—ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টির তাগিদেই এইসব মানসিক ভাব, আইন, কানুন ও বিধিব্যবস্থার আবির্ভাব ও বিবর্তন ঘটে। যন্ত্রের উপযোগী সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি ভিন্ন এদের নিজস্ব কোন মূল্যও নেই। তার অর্থ যে কৃষক হাল চালায় মাঠে, তার ঐ হালটা নিজের মুঠোয় ধরেনি, হালই তাকে চেপে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে ; ঐ চাষী মানুষটির সমস্ত ভাব ও ভাবনা, কল্পনা, অনুভূতি, বিশ্বাস হালের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার জন্য সমর্পিত ; তার মানবসত্তার ভাস্বর মহিমা হাল-ব্যবহারের কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মার্ক্সের এই চিন্তাধারায় মানুষের স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই ; বরং মানুষ যে জন্মদাস সেই কথাটাই বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। ফলত মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও সমাজে স্বাধীনতার স্ফুরণ নিন্দিত, ঘৃণিত ও বাধাপ্রাপ্ত—রাষ্ট্রের তথা সমাজের উৎপাদন-স্বার্থের কাছে সকল মানবিকতা সেখানে বলিপ্রদত্ত। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলতে স্তালিন তিন কোটি রুশ নরনারীকে হত্যা করতে কাতর হননি—এবং তিনি

তাঁর এই পৈশাচিক আচরণের পক্ষে সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন মার্ক্সীয় মতবাদের মধ্যেই।

উইলহেলম লিবকেনেক্ট তাঁর মার্ক্সের স্মৃতিকথায় (Karl Marx: Biographical Memoirs) একদিনের একটা ঘটনার কথা বলেছেন যা থেকে যন্ত্রের ওপর মার্ক্সের শিশুসুলভ ভক্তির পরিচয় মেলে। লিবকেনেক্ট লিখেছেন যে একদিন লণ্ডনের রিজেন্ট স্ট্রীটে একটি প্রদর্শনীতে মার্ক্স বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ দেখতে পান। দেখে তাঁর সে কী উচ্ছ্বাস!—বিপ্লব যেন এসে পড়ল এমনি রোমাঞ্চিত হতে লাগলেন তিনি। বললেন: "এতদিনে সব সমস্যার সমাধান হল—এর ফলাফল হবে অবর্ণনীয়। একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব দেখা দেবে আর তার ফলে অবশ্যই আসবে রাজনৈতিক বিপ্লব—কারণ অর্থনৈতিক বিপ্লব রূপান্তরিত হবেই রাজনৈতিক বিপ্লবে।" আনন্দোচ্ছ্বাসে সেদিন রাত্রে মার্ক্সের ঘুম হয়েছিল কি হয়নি সে বিবরণ অবশ্য লিবকেনেক্ট দেননি।

যন্ত্রই সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের মূলে,—কিন্তু কিভাবে? সেই রহস্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মার্ক্স শরণাপন্ন হয়েছেন ডায়ালেকটিক তত্ত্বের। ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি গ্রন্থ থেকে আগে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তার ১৩ নং সূত্রে তিনি বলেছেন মানব সভ্যতার ধারাকে মোটামুটি পাঁচটি যুগে বা অধ্যায়ে ভাগ করা যায়: এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া ও কমিউনিষ্ট সমাজ। শেষের যুগটি মার্ক্স প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেননি, দেখে গেছেন তার স্বপ্ন। তিনি বলেছিলেন মানুষের প্রকৃত সভ্যতা সুরু হবে কমিউনিজমের যুগ থেকে—ইতিপূর্বের আর সব যুগকে এমনকি তিনি প্রাগৈতিহাসিক আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হননি। স্বপ্ন ও বাস্তব মেলেনা; তাই "প্রকৃত সভ্যতা"র নিদর্শন যেদিন ক্রুশ্চেভ উদ্ঘাটিত করেছিলেন রাশিয়ার কমিউনিষ্ট সমাজে স্তালিনীয় বর্বরতার কাহিনী বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করে, কবরের মধ্যে মার্ক্স হয়তো সেদিন শিউরে উঠেছিলেন প্রকৃত ইতিহাস ও প্রকৃত সভ্যতার স্বরূপ জেনে। না, কমিউনিষ্ট সভ্যতার তুলনায় গ্রীসের দাস ব্যবস্থা অসভ্য ছিলনা—অবশ্য উৎপাদনের দিক থেকে নয়, মানবিকতার দিক থেকে।

যাই হোক ডায়ালেকটিক তত্ত্বের কথায় ফিরে আসি। ঐ তত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য আগেই আমরা আলোচনা করেছি। সমাজের ক্ষেত্রে ঐ তত্ত্বের প্রয়োগ করে মার্ক্স বলতে চেয়েছেন:

রিয়ালিটি বলতে মার্ক্স শুধু ফেনোমেননকেই বুঝেছেন। দৃশ্যমান বস্তু ও ঘটনার যোগফলই রিয়ালিটি—কোনো নুমেনন বা আইডিয়া নয়। মানুষ দ্রষ্টারূপে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, মন বলে কিছু থাকুক বা না থাকুক, এই বিশ্বজগত যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে—আর সেটাই রিয়ালিটি, এর অতিরিক্ত কোনো কিছুর মধ্যে রিয়ালিটির সন্ধান করতে যাওয়া দিবাস্বপ্নের মতো হবে। আর এই বস্তুজগতের গতি দ্বান্দ্বিক—জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে। বিশেষত মানব সমাজে ইতিহাসের গতি চলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণক্রমে; বস্তু বা ঘটনা নিজের স্ববিরোধিতাকে জন্ম দেয়—এবং তার ফলে বস্তুর অন্তর্নিহিত আত্মবিরোধ যে উত্তাপ সৃষ্টি করে তাতে মাত্রাগত পরিবর্তন এক বৈপ্লবিক মুহূর্তে গুণগত পরিবর্তনে পরিণত হয়; এক সমাজ-ব্যবস্থার পরস্পর-বিরোধী উপাদানের মধ্যে সংঘাত বাধে, সেই সংঘাতের তীব্রতা ক্রমে এমন স্তরে পৌছায় যখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে ঐ সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে অন্য এক নতুন সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এইই মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক তত্ত্ব। এঙ্গেলস লিখেছেন: "Dialectics is nothing more than the science of the general laws of motion and development of Nature, human society and thought."

(Anti-Duhring p. 155)। উৎপাদনের প্রচলিত পদ্ধতির অনুকূল সম্পর্কাবলী উৎপাদনের অংশীদারদের মধ্যে গড়ে ওঠে, সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্পর্ক, এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন সংক্রান্ত এমন কি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (association) ও অনুষ্ঠান (institution)। কিন্তু উৎপাদনের শক্তিগুলির বিকাশ বন্ধ হয় না—কারণ নতুন আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্র সমৃদ্ধতর ও অধিকতর উৎপাদনক্ষম হয়—এবং সমাজেও উৎপাদন বাড়াবার তাগিদ থাকে। ফলে উপরোক্ত সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা ম্লান হয়ে আসে। উৎপাদন শক্তির নতুন বিকাশের সঙ্গে ঐগুলি তাল রাখতে পারে না, তাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, ওদের সংঘাতটাও তাই তখন তীব্র হয়ে ওঠে। মার্ক্স বলছেন: "At a certain stage of their development the material forces of production in society come in conflict with the existing relations of production..... From forms of development of the forces of production these relations turn into their fetters. Then comes the period of social revolution." (Critique of Political Economy p. 12)

মার্ক্সের এই ডায়ালেকটিক তত্ত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কতটা মন গড়া পরে সেকথা আলোচনা করছি। একটা বিষয় প্রথমেই লক্ষণীয়। ঘাসে ও পাথরে, জলে ও ফলে, গাছে ও পাথরে, জন্তুতে ও মানুষে সর্বত্র, সকল বস্তুর ভিতর ডায়ালেকটিক তথা আত্মদ্বন্দ্ব নাকি লুকিয়ে আছে, প্রতিটি বস্তুর অভ্যন্তরে এই মুহূর্তের হাঁ, পরমুহূর্তে না-এ পরিণত হচ্ছে—এবং তাদের মধ্যেকার এই হাঁ ও না-এর দ্বন্দ্বই তাদের আত্মবিকাশের কারণ। বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মনে হয় কথাটা শুনলে, কিন্তু এটা কল্পনাই—এবং রহস্য-পিপাসু মনেরই কল্পনা। কল্পনাপ্রবণতা মার্ক্সের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য। তিনি মানবসমাজের গোড়ার একটা আদিম কমিউনিজমের যুগ কল্পনা করেছিলেন যে যুগ ছিল অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত। আবার বর্তমান পুঁজিবাদের যুগের পর এমন এক কমিউনিজমের যুগ আসবে বলেও তিনি কল্পনা করেছিলেন যে যুগে তিরোহিত হবে সমস্ত দ্বন্দ্ব। ডায়ালেকটিক যদি চিরন্তন সত্য হয়ে থাকে তবে তার অবসান হবে কেন ও কি ভাবে? মার্ক্স সে প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কারণ তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন—আর সেই স্বপ্নের অনুকূল যুক্তি খুঁজতে যেয়ে তিনি কল্পনার দৃষ্টি নিয়ে ফিরে চেয়েছেন সুদূর অতীতের দিকে—যখন নাকি ছিল দ্বন্দ্বমুক্ত সুবর্ণময় কমিউনিষ্ট সমাজ। সেই সমাজের মধ্যে একদিন অবশেষে সম্পত্তির বোধ থেকে জাত হল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, স্বর্গচ্যুত হল মানুষ,—আবার দাস যুগ, সামন্ত-তন্ত্রের যুগ ও পুঁজিবাদের যুগের ক্লেশের মধ্য দিয়ে মানুষ ফিরে চলেছে নতুন স্বর্গের দিকে। বাইবেলীয় চিন্তাধারার অনুসরণ ক্রমেই এগিয়েছে মার্ক্সের কল্পনা—সেই paradise lost ও paradise regained-এর তত্ত্ব;—হিব্রু মনের এটাই বিশিষ্ট কল্পনার রীতি। মার্ক্সের সময়ে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা খুব বেশি অগ্রসর হয়নি। তাঁর পরবর্তীকালে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, ইতিহাস-চর্চা ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এত এগিয়েছে যে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণা আজ অচল হয়ে পড়েছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে যে চারটি যুগ মার্ক্স লক্ষ্য করেছেন, ডায়ালেকটিকের ধারা কিভাবে ঐ চার যুগের মধ্যে অনুস্যূত থেকেছে তা তিনি বা এঙ্গেলস যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। প্রথমেই নাকি ছিল আদিম কমিউনিষ্ট সমাজ—কিভাবে সে সমাজ আবির্ভূত

হয়েছিল মার্ক্স সঠিকভাবে তা বলতে পারেননি। এই আদিম কমিউনিষ্ট সমাজ ইয়োরোপে ও এশিয়ার বিকাশের দুটি ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। এই সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, জমি বা সম্পত্তির মালিক ছিল গোষ্ঠী, ব্যক্তি নয়। প্রত্যেককেই পরিশ্রম করতে হত। কৃষি ও হস্তশিল্পই ছিল পেশা—জমি যেমন সকলের, জমির উৎপাদনেও ছিল সকলের অধিকার। এই কমিউনিষ্ট সমাজ ভেঙে পড়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের ফলে। আদিম কমিউনিষ্ট সমাজ ও তার অপূর্ব নরনারীদের সম্পর্কে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত এঙ্গেলস এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি যে কেন সেই সমাজে সেই নরনারীরাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিল—যেমন, কেন আদম ও ইভ প্রলুব্ধ হয়েছিল নিষিদ্ধ ফলের প্রতি, বাইবেল তার জবাব দেয়নি।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব, পরিবার গঠন, লোহার প্রচলন, বাণিজ্যজাত সম্পদ বৃদ্ধি—ইত্যাদির ফলে আদিম কমিউনিষ্ট সমাজ রূপান্তরিত হয়েছিল প্রাচীন দাসপ্রথা-ভিত্তিক সমাজে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস এশিয়ার ইতিহাস তাঁদের আলোচনার পরিধি থেকে বাতিল করে দিয়েছেন এই পর্যায় থেকে,—তাঁরা অতঃপর শুধু ইয়োরোপের ইতিহাস নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁদের ধারণা, এশিয়ায় ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্য বিস্তারের আগে সমাজ ও সভ্যতার আর কোনো বিকাশ হয়নি, ইতিহাসের চাকা এশিয়ায় থেমে গেছে আদিম যুগে, যেমন কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যাওয়ায় হারিয়েছিল গতি, তেমনি। মার্ক্স অবশ্য এশিয়ার ইতিহাস বলতে চীন ও ভারতের ইতিহাসকেই বুঝতেন এশিয়ার অন্যান্য দেশ সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়নি। এশিয়া সম্পর্কে তিনি অধ্যয়নের প্রেরণা পেয়েছিলেন লণ্ডনে বসবাসের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ও কার্যধারা সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে—সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে জীবিকার্জনের চেষ্টা করছিলেন যখন মার্ক্স, তখন ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদকই তাঁর কাছে ভারত ও চীনে ব্রিটিশ শাসন ও কার্যধারা সম্পর্কে লেখা চান। মার্ক্সের ভারত ও চীন সম্পর্কে আগ্রহ ও অধ্যয়ন ওই তাগিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; এশিয়ার সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর কোনোদিন সজীব কৌতূহল ছিল না। সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে জীবিকার্জনের তাগিদ এঙ্গেলসের না থাকায় এশিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন বা আগ্রহ কোনটাই তাঁর হয়নি। ফলত মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের ডায়ালেকটিক তত্ত্বের সাহায্যে মানব-ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার নামে, আসলে ইয়োরোপের ইতিহাসকেই ব্যাখ্যা করেছেন; ইউরোপের ইতিহাসই তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু, এশিয়া, আফ্রিকা বা এমন কি আমেরিকার ইতিহাসও নয়। ইয়োরোপের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার একটা সুবিধা ছিল, কারণ মার্ক্সের সময়ে ইয়োরোপের ইতিহাস বিষয়ে উন্নতমানের কিছু বই ছিল। এশিয়ার কোনো ইতিহাস তখন পাওয়া যেতনা, এমনকি ভারত বা চীনেরও নয়। ভারতের ইতিহাস ইউরোপীয় ভাষায় রচিত হতে থাকে মার্ক্সের পরে—তাও ইয়োরোপীয় লেখকদের দ্বারা, বিশেষত ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস ভারতীয়দের দ্বারা ইংরেজিভাষায় লিখিত হয়েছে মাত্র বর্তমান শতাব্দীতে, তবু এখনো বহু অন্ধকার [illegible] ওপর আলোকপাত হতে বাকি, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাই এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বলে বলা যায়। বস্তুত মার্ক্সের মৃত্যুর পর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার গোটা বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কেই বহু প্রচলিত ধারণাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ও মানব-সভ্যতা সম্পর্কে বহু নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে। ফলে ইতিহাসের গতিধারা সম্পর্কে বহু নতুন ব্যাখ্যার আবির্ভাব ঘটেছে, মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার তুলনায় সেগুলি সমৃদ্ধতর মনে হয়—যেমন স্পেংলার, টয়েনবি, সোরোকিনের ব্যাখ্যা।

এশিয়ার সভ্যতা সম্পর্কে মার্ক্স এক চিঠিতে এঙ্গেলসকে

লিখেছিলেন: the basis of all phenomena in the East···to be the absence of private property in land. This is the real key, even to the Oriental heaven. ( Marx to Engels. June 2, 1853 ) প্রত্যুত্তরে এঙ্গেলস লিখেছিলেন মার্ক্সকে : But how does it came about that the Orientals did not arrive at landed property, even in its feudal form ? I think it is mainly due to the climate···An Oriental government never had more than three departments : finance ( plunder at home) war ( plunder at home and abroad ) and public work ( provision for reproduction )—Engels to Marx, June 6, 853.

ভারতবর্ষের সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে এই মন্তব্যগুলি শুধু সীমাহীন অজ্ঞতারই পরিচায়ক নয়—এগুলি সরাসরি কুৎসা। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করতে ও ভারতে ইংরেজ শাসনের যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ জোগাতে এবম্বিধ মন্তব্যগুলি যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজ শাসক জেলে ভারতীয় বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে মহোৎসাহে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের বই সরবরাহ করত তার অন্যতম কারণ ঐ বইগুলি পড়লে ভারত সম্পর্কে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা জন্মে এবং ভারতীয়দের মনে হীনমন্যতা বোধ সৃষ্টি হয়। মার্ক্স ভারতে ইংরেজ শাসনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে লিখেছিলেন যে ভারতের স্বশাসিত গ্রাম্যসমাজ ভারতের সমস্ত বিকাশ রুদ্ধ করে দিয়েছে। "I believe one cannoti magine a more solid foundation for a stagnant Asiatic despotism. And however much the English may have Hibernicised the country, the breaking up of these primitive stereotypes was the sine qua non of Europeanisation. ( Marx to Engels June, 14, 853 )।

এঙ্গেলস স্বীকার করলেন যে ডায়ালেকটিক তত্ত্ব প্রাচ্যে হার মেনেছিল জলবায়ুর প্রতাপের কাছে—এমনকি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠাই করা সম্ভব হয়নি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের দরুণ। তাহলে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কি সব ক্ষেত্রে টেঁকে না? মার্ক্স আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন যে বাহির থেকে সাম্রাজ্যবাদীর আগমন না ঘটলে ভারতে কোনো প্রগতিই আসত না। তাহলে সমাজের অন্তঃস্থায়ী শক্তিগুলি প্রগতি ও বিপ্লব সব সময় আনে না—আনে বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি? স্তালিন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অন্তে যখন পূর্ব ইয়োরোপের দেশে দেশে রেড আর্মি পাঠিয়ে দিয়ে জোর করে ঐ সব দেশে কমিউনিস্ট সরকার চাপিয়ে দিয়েছিলেন ও মাত্র ১৯৬৮ সালে ব্রেজনেভ চেকোশ্লোভাকিয়ায় পুনরায় পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েত সৈন্যদল—তখন মার্ক্সীয় যুক্তির ভিত্তিতেই তাঁরা তা করতে পেরেছেন, কারণ বিদেশী সৈন্য ও প্রভুত্ব আমদানী করে কোনো কোনো দেশকে প্রগতিশীল করতে হয় মার্ক্স নিজেও এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাহলে ডায়ালেকটিকের স্থান থাকে কোথায়? দ্বন্দ্ববাদ তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নয়? ইংরেজের আগমনের ফলে ভারতীয় সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে সেকথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই পরিবর্তন এসেছে বিদেশীর স্বার্থে, ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে নয়—উৎপাদন শক্তি ও পদ্ধতির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের ফলে তো নয়ই। ইংরেজ স্বীয় স্বার্থে ভারতীয় সমাজের স্থবির দেহে অস্ত্রোপচার করা মাত্র ঐ সমাজ আবার জীবন্ত, চঞ্চল, গতিময় হয়ে উঠেছে—দ্বন্দ্ব এখানে আমদানী করা হয়েছে বাহির থেকে, বাহিরের স্বার্থে, বাহিরের শক্তি দ্বারা। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক

বস্তুবাদ মতে দ্বন্দ্বটা হবে সমাজের অভ্যন্তরে সৃষ্ট—সামাজিক বিকাশের আভ্যন্তরীণ তাগিদে। এক ইয়োরোপ ছাড়া বিশ্বের ব্যাপকতম অংশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় তত্ত্ব কেন প্রযোজ্য হল না?

এমন কি ইয়োরোপের ইতিহাসের বিবর্তনও মার্ক্স ও এঙ্গেলস যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

মার্ক্সীয় মতে আদিম কমিউনিজমের পর ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিল দাস প্রথার যুগ। দাসদের বাধ্যতামূলক শ্রমই তখন হয় গোটা সমাজসৌধের ভিত্তি। এঙ্গেলস আন্টি-ডুরিং গ্রন্থে হিসাব দিয়ে বলেছেন যে দাসপ্রথার চরম বিকাশের যুগে এথেন্স নগরীতে ৯০ হাজার স্বাধীন নাগরিক ও লক্ষ ৬৫ হাজার দাসদের শ্রমের ওপর ভিত্তি করে গ্রীক সভ্যতার সুবর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। করিন্থ ও ইজিনায় ছিল যত জন স্বাধীন নাগরিক তার দশগুণ দাস। স্বাধীন নাগরিকরা কায়িক শ্রমের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত, ভোগবিলাসপূর্ণ জীবন, সাহিত্য ও দর্শনচর্চা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এ সবে মন দিতে পেরেছিল। এঙ্গেলস লিখেছেন: "Without slavery, no Greek state, no Greek art and science; without slavery, no Roman Empire.....no modern Europe.. no modern socialism." (Anti Duhring p. 200)

গ্রীক সমাজ দারিদ্র্য দূর করেনি, অধিকাংশ মানুষকে দাস ও দরিদ্র রেখে সমাজের উচ্চস্তরে সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছে। দাসের শ্রমের ফসল নিয়ে সওদাগর ও ব্যবসায়ী বেসাতি করেছে দূরান্তরে ও ঘরে—আহৃত সম্পদের সাহায্যে আরও কঠোরতর শোষণের বন্দোবস্ত করেছে সমাজে। জমির ওপর সামাজিক মালিকানা উঠে যেয়ে ব্যক্তির মালিকানা প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু দরিদ্র তার জমি রাখতে পারেনি আপন অধিকারে, বন্ধক দিয়েছে বা বিক্রী করেছে। তারপর ভূমিহীন কৃষক পরিণত হয়েছে দাসে। "Such was the pleasant dawn of civiligation among the people of Altica" (Origin of the Family p. 134)—এঙ্গেলস তাই প্রশ্ন করেছেন প্রাচীন যুগের নরনারীদের, আদিম সাম্যবাদ ছেড়ে এসে ব্যক্তিগত মালিকানার আকাঙ্ক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তুমি পেলে কী?—এই দারিদ্র্য, এই দাসত্ব, এই শোষণ এ তো তোমার ব্যক্তিগত মালিকানা চাইবারই ফল?—"You have clamoured for free, full, saleable land. Well, then, there you have it—tu la's voulu, Georges Dandin; it was your own wish, George Dandin." (পৃষ্ঠা ২০৩) এঙ্গেলস বলছেন গ্রীক সভ্যতার পতন হয়েছিল ধনী ও দরিদ্রের সংঘাতের ফলে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দরুণ নয়। তখন ইতিহাসে কর্তৃত্ব করার দাবী নিয়ে বিপুল শক্তিতে এগিয়ে এল রোম। কিন্তু দারিদ্র্যের সমস্যা রোমও মেটায়নি। বরং বিপুল করভার, নানারকম ফন্দীতে টাকা আদায়, অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ, ঘুষ ও দুর্নীতি রোমসাম্রাজ্যের জনগণকে নিষ্পিষ্ট করে দিয়েছিল। কুসীদজীবীরা এত চড়া সুদে টাকা ধার দিত ও সুদ আদায়ের কারণে খাতকের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত—ফলে জনগণ গভীরতর তমসায় প্রবেশ করেছিল। এই অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে গেল বাজার, বিত্তশালীদের বিত্তের উৎস গেল শুকিয়ে, শহরগুলি হল হতশ্রী, ল্যাটিফুণ্ডিয়া অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ খামারে দাসদের দিয়ে কৃষিকার্য করানো অলাভজনক হয়ে গেল, দাসপ্রথা তখন সমাজের পক্ষে একটা বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠল। রোম যখন এইভাবে জনগণের শোষণ ও নিপীড়নের ফলে রক্তক্ষরণে, হতাশ্বাসে ম্লান, বিবর্ণ, দুর্বল হয়ে গেল তখন বর্বরদের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়ল রোমান সাম্রাজ্য। বর্বরগণ রোম জয় করে বিজিত হল রোমের সভ্যতার দ্বারা, দীক্ষা নিল রোমের রাষ্ট্রব্যবস্থার মন্ত্রে, গ্রহণ করল তার আইন ও শৃঙ্খলার বোধ। কিন্তু তারা ফিরিয়ে আনল কায়িক শ্রমের সম্মান, কেননা তাদের

কায়িক শ্রমের অভ্যাসকে তারা পরিত্যাগ করল না, তারা ফিরে গেল জমির কাছে, যন্ত্রের কাছে—সামাজিক উৎপাদনের অংশীদার হল নিজেরাই। এই ভাবে দাসত্ব প্রথার অবসানে প্রতিষ্ঠিত হল সামন্ততন্ত্র।

কিন্তু এঙ্গেলস মূল প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন, দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজে উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্ঘর্ষ কোথায় বেধেছিল, উৎপাদন কলাকৌশলের সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব কিভাবে বিপ্লবকে অনিবার্য করে তুলেছিল সে কথা তিনি বলেননি। গ্রীক নাগর-গণতন্ত্রের অবসানে বাহির থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলবীর্য-শালী রোম; আবার রোমান-সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল বর্বরগণ। ঐতিহাসিক পরিবর্তন, যুগবিপ্লব এনেছিল এই বাইরের শক্তি, গ্রীক বা রোমান সমাজের অন্তঃশায়ী শক্তি নয়। দাসত্ব প্রথার গর্ভে সামন্তপ্রথা জন্ম নেয়নি—দাসত্বপ্রথার মুমূর্ষু দেহের ওপর বর্বরগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে যে অস্ত্রোপচার করে তারই ফলে ইউরোপীয় সমাজ বলবীর্য লাভ করে নবকলেবর ধারণ করেছিল সামন্তপ্রথার আনুকূল্যে। আর দাসত্বপ্রথা দুর্বল হয়েছিল কেন? বাজার সঙ্কুচিত হওয়ায় দাসপ্রথা লাভ জনক ছিলনা বলে। সমস্যাটা তাহলে বাজারের, উৎপাদন-শক্তির বিকাশজাত দ্বন্দ্বের নয়। আর বাজার সঙ্কুচিত হয়েছিল অত্যাচারী সরকারের ও ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে—উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্ঘর্ষের ফলে নয়। এঙ্গেলস ইয়োরোপীয় সমাজের বিবর্তন প্রসঙ্গেও মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে যেতে পারেননি; যেমন পারেননি মার্ক্স নিজেও, কারণ তা প্রয়োগ করা যায়না।

মার্ক্সের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পার্থক্য এই যে মার্কস্ ছিলেন পুঁথি পড়ুয়া পণ্ডিত ও ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা; আর সুভাষচন্দ্র ছিলেন নিজ বীর্যে ইতিহাসের স্রষ্টা। মার্কস্ যদি ইউরোপের কয়েক কোটি শ্রমজীবির মুক্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েও থাকেন তবু বলতেই হবে যে মানবমুক্তির বৃহৎ প্রশ্নটা তিনি এড়িয়েই গেছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার শত শত কোটি শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ, যাদের রক্তের মূল্যে গড়ে উঠেছে আধুনিক ইয়োরোপের সভ্যতা, যার সুফল ইয়োরোপের শ্রমিক শ্রেণীও ভোগ করে—বিশ্বের সেই অধিকাংশ দরিদ্র, শোষিত মানুষের ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্তির সংগ্রামের দিশারী মার্কস্ বা এঙ্গেলস নন। তাঁদের দৃষ্টিতে মানবসভ্যতার মর্মকেন্দ্র ইয়োরোপ; ইয়োরোপের সমস্যা মিটলেই সভ্যতার ব্যাধিমুক্তি ঘটবে। তাই যে কারণে ইয়োরোপে একটার পর একটা সভ্যতা উত্থিত হয়েছে ও আবার অনিবার্য পতনের পর বিলীন হয়ে গেছে কালস্রোতে, মার্কস্ চেয়েছেন সেই কারণটাকে খুঁজে বার করতে ও তার নিষ্পত্তি করতে। তিনি দেখেছেন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ধনী-দরিদ্রের লড়াইয়ের মীমাংসা করতে না পারায়, দরিদ্রের দারিদ্র্যমুক্তি না হওয়ার—তাই নবযুগে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্কটমোচনের উদ্দেশ্যে শোষক ও শোষিতের, ধনী ও দরিদ্রের, মালিক ও শ্রমিকের সংঘাত দূর করে পারস্পরিক মিলনের ভিত্তিতে স্থায়ী, দ্বন্দ্বমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে তিনি চেয়েছেন। ডায়ালেকটিক তত্ত্বে বিশ্বাসী মার্কস্ কল্পনা করেছেন এমন স্বর্গীয় সমাজের, যেখানে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের সংঘাত থাকবেনা, বিপ্লব অপ্রয়োজনীয় হবে, কলাকৌশলের উন্নতি যতই ঘটুক, সেজন্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার উদ্দেশ্যে সমাজের পুনর্বিন্যাস ঘটানোর কোন প্রশ্নই উঠবেনা। তবে কি ডায়ালেকটিক থেকে যাবে?—হ্যাঁ, যাবে—কারণ কমিউনিষ্ট সমাজ হবে দ্বন্দ্বমুক্ত সমাজ। তাহলে ডায়ালেকটিক একটা শাশ্বত সত্য নয়? না, কারণ হেগেল ও বলেছিলেন যে ডায়ালেকটিক শুরু হয়ে গেছে প্রাশিয়ান রাষ্ট্রে।

সুভাষচন্দ্র এই মতকে কখনো সমর্থন করতে পারেননি। মানব-প্রগতির ধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে একটা বিশেষ স্তরে বা সমাজে এসে, একথায় তাঁর সায় ছিলনা। প্রগতির অর্থ যদি হয় মহাসত্যের বা পরম সত্তার ক্রমোন্মীলন তথা ক্রম বিকাশ, কিংবা সৃষ্টির বহু বর্ণ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে অদ্বৈতের আত্মপ্রকাশ—তবে সেই উন্মীলন, বিকাশ বা প্রকাশের ধারা কোন পর্যায়ে এসেই থেমে যায় না। বিকাশের কোনো অন্তিম অধ্যায় নেই। সুভাষচন্দ্র তাই ইতিহাসের মার্কস্‌ীয় ছকে ( horoscope ) বিশ্বাস করতেন না।

এশিয়ার তথা ভারতীয় সভ্যতার রহস্য মার্কস্ বা এঙ্গেলস যে আদৌ অনুধাবন করেননি সুভাষচন্দ্র সে কথাও জানতেন। শাশ্বত সত্যের সন্ধানে ভারতের অভিসার যে তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের মূল প্রেরণা, কোনো ইয়োরোপীয়ই সেকথা উপলব্ধি করতে পারেন না। শুধু ভারতের নয়, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মর্মকেন্দ্র যে সত্যের একটা বিশিষ্ট অনুভূতিকে নিয়ে গঠিত ও ঐ অনুভূতিকে বাস্তবে প্রকাশ করাই যে প্রত্যেক জাতির মৌল আকুতি ও তার সকল কর্ম-ধারার অভীষ্ট লক্ষ্য,—সুভাষচন্দ্র সেকথা বুঝতেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে। সুভাষচন্দ্র যখন নবযুগে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রধান পুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন তখন একথাও তিনি জানতেন যে বস্তুতঃ তিনি সংগ্রাম করছেন এশিয়া, আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা তথা বিশ্বমুক্তির জন্য। তিনি জানতেন তাঁর পদক্ষেপের উপর নির্ভর করবে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ; কারণ একথাও তাঁর অজানা ছিল না যে ইয়োরোপের শ্রমজীবী মানুষের শোষণমুক্তির লড়াই সাফল্য-মণ্ডিত হবে এশিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের ওপর থেকে ইয়োরোপীয় পুঁজিপতিদের শোষণ অপসারিত হলে; তখন মুমূর্ষুদেহ পুঁজিপতিদের অনিচ্ছুক হাত থেকে শ্রমজীবীরা তাদের মুক্তি আদায় করে নিতে পারবে। বাস্তবেও শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে;—ইয়োরোপে যদি শোষণ এখনও বজায় থেকে থাকে তবে তার কারণ এখনও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের শোষণমুক্তি ঘটেনি।

নিজের কর্মের লক্ষ্য ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অতিশয় সচেতন ছিলেন বলে তিনি এও জানতেন যে তাঁর কর্মের পরিধি কোনো একটা খণ্ড দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এমনকি একটা খণ্ড কালের আশু সমস্যা সমাধান করাও তাঁর অন্তিম লক্ষ্য নয়। তিনি জানতেন যে গোটা মানবজাতি যে সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা আবিষ্কার করতে হবে ও সেখানে, সেই স্বভূমিতে স্থিত রেখেই তার বিকাশের তথা অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত করতে হবে। একটা বাধা ক্ষুদ্র কল্পনা, সঙ্কীর্ণ ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী—যা মার্ক্সের ছিল। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যায়—অর্থনীতির উপর একান্ত ঝোঁক তাঁর ছিল না। ইতিহাসের চালকশক্তি অর্থনীতি, রাজনীতি, জলবায়ু, নেতৃত্ব, জাতির চরিত্র,—কিন্তু সর্বোপরি তার আত্মার অভীপ্সা। ব্যক্তির মতোই জাতিরও অন্তরাত্মা আছে, মানবজাতিরও অন্তরাত্মা আছে। তার আকূতি ও লক্ষ্যের অনুসরণেই তার বাস্তব ব্যবস্থা, উদ্যোগ ও ঘটনাসমূহের সন্নিবেশ ঘটে থাকে—জীবনের উত্থান ও পতনের বন্ধুর পথ বেয়েই চলে আত্মার অভিসার—তা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি জাতি ও মানবজাতির ক্ষেত্রেও সত্য। যে জাতি আপন আত্মার ধর্ম আবিষ্কার করতে পারেনা কিংবা মানবজাতির হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজ সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারেনা সেই জাতির পতন এমনকি ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। মিশর, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ধ্বংসের কারণই ঐ। আধুনিক ইয়োরোপের অনেক সভ্যতারই হয়তো ঐভাবে পতন ও অবলুপ্তি ঘটবে। রাশিয়ার বা পূর্ব ইয়োরোপের কমিউনিস্ট সভ্যতা যেমন কোনোমতেই কালজয়ী হবেনা, তেমনি ইংলণ্ডের শোষণধর্মী সভ্যতাও ইংলিশ চ্যানেলের শীতল জলে ডুবল বলে। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করেন আত্মার সত্যে ও

মানবজীবন ধর্মে। যে সভ্যতা জীবনধর্মবিরোধী, বুঝতে হবে আত্মার অনুভবেও সে বঞ্চিত—তার আয়ু ও উপযোগিতা তাই সীমিত হতে বাধ্য। জীবনধর্মের অনুকূল থেকে আত্মার তথা পরম সত্যের আত্মপ্রকাশ ইচ্ছাকে সফল করতে হবে—তবেই আসবে ব্যক্তির, জাতির ও মানবজাতির জীবনযাপনের সার্থকতা, সিদ্ধি, পূর্ণতা। মার্ক্সের শ্রমজীবী জনতার পক্ষে ওকালতিরও স্থান এই ইতিহাসদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে—কারণ শোষণ মানবজীবন সত্য বিরোধী; শোষণের ভিত্তিতে গড়া সমাজ সত্যই টেঁকেনা।

সুভাষচন্দ্র ইতিহাস-দর্শন নিয়ে বই লেখেননি, সে অবকাশ তাঁর ছিল না। কিন্তু সুপ্রাচীন অতীত থেকে দূর প্রসারিত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ইতিহাসের গতি তিনি স্বচ্ছ, মোহমুক্ত দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছিলেন। সেই গতির ছন্দ তিনি অনুভব করেছিলেন নিজের ধমনীতে। মানবজাতির বিবর্তনের স্পন্দন তিনি অনুভব করেছিলেন নিজের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মিশিয়ে—ইতিহাস স্রষ্টার ভূমিকায় নাহলে আসীন হওয়া যায় না। লক্ষণীয় এই যে মার্কেসের ভবিষ্যৎ-বাণীগুলি প্রায় সবই ব্যর্থ হয়েছে, পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাণীগুলি মিলেছে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে সুভাষচন্দ্রের ইতিহাসবোধ ছিল মার্কেসের তুলনায় স্বচ্ছতর। মানবজাতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তাঁর ছিল একটা সামগ্রিক উপলব্ধি—মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যার কাছে একটা হেলেমানুষী তত্ত্ব বলে মনে হয়। [ক্রমশঃ]


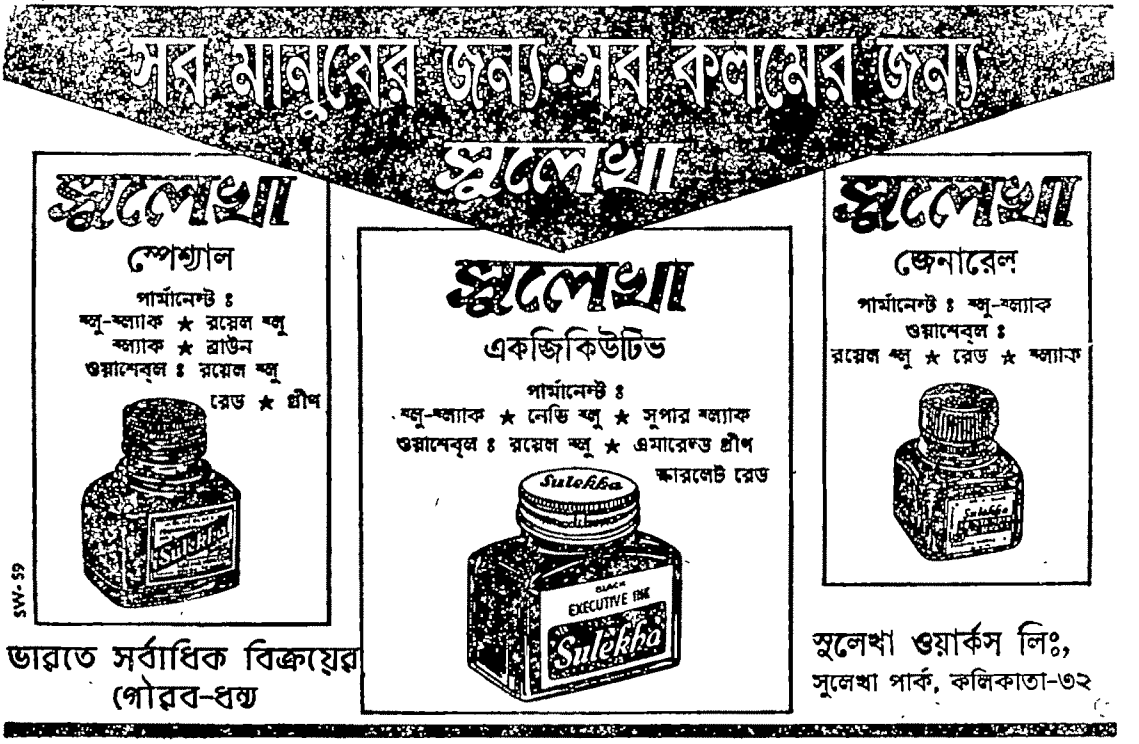

# GOBIND SUGAR MILLS LTD.

## AIRA ESTATE

*Dist.* LAKHINPUR KHERI. (U. P.)

*Manufacturers of*

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

বেতের পেটরার ভেতর থেকে কালোকালো গুলির মত বার করে সকলের হাতে দিলেন গোবিন্দ কবিরাজ মশাই। ভারতচন্দ্রও একটা বড়ি পেল। সামান্য ইতিউতি করে জিজ্ঞেস করল—এটা কি জিনিস ?

—মুখে ভান, মুখে দিয়া ভাখেন—খিতখিত করে হাসলেন কবিরাজ মশাই।

আনন্দিরাম বললেন—উনি তামাকটি পর্য্যন্ত খেতে চান না, এ জিনিস কি ওর সহ্য হবে—

—আরে খান, খান কিচ্ছু হবে না, আস্তে আস্তে চুষে চুষে খান—পরামর্শ দিলেন রাজকিশোর মুখুজ্জে। কিন্তু দ্রব্যটি কি ? সামান্য মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ।

আবার বললেন রাজকিশোর—এ হ'ল কবিরাজী মোদক, মদনানন্দ মোদক, খেয়ে ফেলুন—

বাচস্পতি মশাই বললেন—মদনানন্দ শব্দটির অর্থ জানেন, আপনি তো শুনেছি পণ্ডিত মানুষ—

—আপনি বলুন, আপনার মুখেই শুনি—মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলেও মুখে ভদ্রতার হাসি টেনে বললো ভরতচন্দ্র।

আনন্দিরাম বাধা দিলেন—আপনার মুখ বড় খারাপ, বাচস্পতি মশাই, উনি নতুন মানুষ, প্রথম আলাপে আপনার অশ্লীল অর্থ শুনে কিছু মনে করতে পারেন—

—আরে না, না, আমি রেখে ঢেকে বলবো—হাসি হাসি মুখে বললেন অনুকূল বাচস্পতি

—মদন বর্মের আনন্দ বর্ধক যে মোদক, তাই হল মদনানন্দ মোদক, বেশী মাত্রায় খেলে ঝিমঝিম নেশা হবে, কিন্তু নিয়মিত সেবনে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, সেজন্য আমি এই বুড়ো বয়সেও রোজ সন্ধ্যেবেলা এখানে এসে একটি করে বড়ি খাই—চোখ টিপে হাসলেন, বাচস্পতি মশাই। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিরাম আর রাজকিশোর হো হো করে হেসে উঠলেন। মুখ নিচু করে পেটরার মধ্যে কি সব গুছিয়ে রাখছিলেন গোবিন্দরাম। তিনিও ফোকলা মুখে খিতখিত করে হাসলেন। আর চুপচাপ তাকিয়ে রইল ভারতচন্দ্র। আবার বললেন বাচস্পতি মশাই—আপনার তাজা বয়স, নিয়মিত এই বড়ি সেবন করলে আপনার মদনধর্মের আনন্দ বাড়বে, শক্তি বৃদ্ধি পাবে, আমার তো আর এই বয়সে নতুন করে কিছু বৃদ্ধি পাবে না, আমি শুধু শক্তিরক্ষার জন্য খাই, আমার ভার্যাটি আবার তরুণী কি না—

আবার এক প্রস্থ ভুমুল হাস্যধ্বনির মধ্যে বললেন আনন্দিরাম —আর হাসবেন না, এবার থামুন—

বাচস্পতি কিন্তু থামলেন না—আপনার এমন কন্দর্পকান্তি চেহারা, আপনি রোজ গোবিন্দ কবরেজের বড়ি খাবেন আর আনন্দিরামের সরবৎ, দেখবেন কেষ্টনগরের সব যুবতী আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়বে—

আনন্দিরাম আর রাজকিশোর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। খিতখিত করে উঠলেন গোবিন্দরাম আর বাচস্পতির সারা মুখে নিঃশব্দ ধূর্ত হাসি।

মনে মনে তপ্ত হলেও স্মিত হাসিমুখে তাকিয়ে রইল ভারতচন্দ্র। তাকে নিয়ে এরা তামাসা করছে। ঠাট্টা-মস্করা হচ্ছে। সুযোগ বুঝে একটা জুতসই জবাব দিতে হয়। একখানি শ্বেত পাথরের উপর পাঁচটি শ্বেতপাথরের গেলাসে সরবৎ নিয়ে এল পঞ্চানন। হালকা সবুজ রঙের পানীয়। হাতে নিয়েই বুঝল ভারত, সিদ্ধির সরবৎ। চুমুক দেবার আগে সামান্য ইতস্ততঃ করলো সে। ওরা চারজন চোচো করে এক চুমুকে খেয়ে নিল। রাজকিশোর বললেন—খেয়ে ফেলুন, ভয় পাবেন না—

ভয় পাবার কথাটি যেন খোঁচা মারল। পর পর চারজনের মুখের দিকে তাকাল ভারত। তার সামান্য সামনে বাঁ দিকে ঘেষে বসে আছেন আনন্দিরাম। মুখ নিচু করে পাশা খেলার ছক সাজাচ্ছেন। তারপর রাজকিশোর মুখুজ্জে। শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ গড়ন। মাথায় কুচকুচে কালো বাবরী চুলের বাহার। দুই গালে মোটা জুলপি। চোখে সুর্মা

টানা। খাঁড়ার মত নাকের নিচে একজোড়া পাকানো পালোয়ানী গোঁফ। রেশমী বেনিয়ান, চওড়া পাড় তাঁতের ধুতি। তারপর বসেছেন অনুকূল বাচস্পতি। বেটেখাটো গোলগাল চেহারা আনন্দিরামের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ না হলেও মোটামুটি ফর্সা রঙ। পরিপাটি দাঁড়িগোঁফ কামানো মুখখানি দেখতে ঠিক পাকা আমের মত। মাথার কদমছাঁট চুল সম্পূর্ণ শাদা। পেছনে মোটা টিকি। খালি গায়ে জড়ানো গরদের উত্তরীয়র ফাঁকে এক গোছা উপবীত নজরে পড়ছে। তারপর ভারতের ডানপাশে বসেছেন গোবিন্দ কবিরাজ। ময়লা রঙ। গায়ে আধময়লা ফতুয়া কাঁধে পাটকরা উত্তরীয়, মাথার সামনে মস্ত টাক। পেছনে পাতলা পাকা চুল। দাড়ি গোঁফ কামানো। ভাঙা গাল। সামনের দুটি দাঁত নেই। হাসির সময় জিভের ডগা বেরিয়ে পড়ে। গলার ভেতর খিতখিত শব্দ হয়।

এরা কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট ব্যক্তি। দু'জন রাজপরিবারের জামাই। একজন রাজবাড়ির চিকিৎসক আরেকজন সভা-পণ্ডিত। রোজ সন্ধ্যেবেলা এরা এখানে এসে সিদ্ধি আর মোদক খেয়ে নেশা করেন। আশ্চর্য কাণ্ড। এখানে এদের সঙ্গে বসে রোজ আড্ডা জমাতে হবে। স্থূল রসিকতা শুনে হাসতে হবে। অদৃষ্টে আরো কি আছে কে জানে। আস্তে আস্তে গেলাসে চুমুক দিল ভারত। পেস্তা, বাদাম দেয়া এলাচগন্ধী সরবৎ। খেতে মন্দ নয়। কিন্তু সিদ্ধির নেশা বড় পাজি নেশা। অসম্ভব জলতেষ্টা পায় আর রাক্ষসের মত খিদে। এর চেয়ে বরং মদ্যপান ভাল। বিদ্যাধর বিলিতি মদ খেত। তার পাল্লায় পড়ে সেই আশ্চর্য গায়িকা রূপমঞ্জরীর বাড়িতে কয়েকবার সামান্য মদ্যপান করেছে ভারত। কিন্তু এই বুড়োদের আড্ডায় বসে স্থূল রসিকতার সঙ্গে সিদ্ধি গেলার চেয়ে অমন গায়িকার কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে শুনতে মদ্যপান করা অনেক ভাল ছিল। রাজকিশোর জিজ্ঞেস করলেন—আপনি পাশা খেলতে পারেন রায় মশাই, তা'হলে এগিয়ে এসে বসুন—

—আজ্ঞে আমি তেমন ভাল জানি না, বরং আপনারা খেলুন, আমি দেখি, খেলায় দর্শক তো একজন চাই, আমার না হয় দর্শকের ভূমিকা থাক—

পাশার ছক ঘিরে বসেছেন চারজন। একদিকে আনন্দিরাম আর বাচস্পতি মশাই মুখোমুখি আরেক দিকে রাজকিশোর আর গোবিন্দ কবিরাজ জুটি বাঁধলেন।

দুই করতলের মধ্যে হাড়ের পাশা ঘষে খটখট শব্দ তুলে বললেন আনন্দিরাম—উনি পাশা খেলতে জানেন না বটে, তবে শুনেছি মুখে মুখে কাব্যরচনা করতে পারেন, কি বলেন রায় মশাই—

তাই নাকি বেশ বেশ—বাচস্পতির মুখে আবার ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। বোধহয় নতুন কোন মস্করার মতলব ভেজে বললেন—তা'হলে আমাদের কিছু কাব্য শোনান—

এবার নড়েচড়ে বসল ভারতচন্দ্র। সুযোগ মিলেছে। মোক্ষম জবাব দিতে হবে। একচুমুকে বাকি সরবৎটুকু নিঃশেষ করে গেলাসটা পঞ্চার হাতে ফিরিয়ে দিল। তারপর একটি তাকিয়া কোলের কাছে টেনে নিয়ে সোজাসুজি বাচস্পতির মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো—দীর্ঘ কোন কাব্য এখন শোনাতে পারবো না, আপনাকে দেখে আপনার রসিকতা শুনে ছন্দোবদ্ধ দু'চার পংক্তি মনে এল, তাই বলছি শুনুন,

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে
এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে
ছিটাফোঁটা তন্ত্রমন্ত্র জানে কতগুলি
চ্যাংড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি।

আনন্দিরাম আর রাজকিশোর হা-হা করে হেসে উঠলেন। নেশার জন্য কিনা কে জানে। সামান্য কথার অল্প রসিকতায় দু'জনেই খুব হাসছিলেন। বাচস্পতি কিন্তু

তেমনভাবে হাসলেন না। বোধহয় হাসতে পারলেন না। পাকা আমের রঙ রক্তিম হয়ে উঠল। পন্তের ওই মন্ত গুণ। এই সাধারণ ঠাট্টার কথাগুলি সাদামাটা গদ্যে বললে তেমন তীক্ষ্ণ তীব্র শোনাত না। ছন্দোবদ্ধ শব্দাবলী যেন শব্দভেদী শরের মত একেবারে মর্মভেদ করে যায়। গোবিন্দ কবিরাজ ফোকলা মুখে হেসে বললেন—বাঃ বাঃ বেশ পইদ্য কইলেন, আরে বিদ্যালঙ্কার আপনার বিষয় ঠিকই কইছিলো, আরেকখান শোনান দেখি—

এবার কবিরাজকে এক হাত নিতে হবে। শিকারীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ভারত। খুব শান্ত গলায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল—আপনার দেশ কোথায় ছিল, কবিরাজ মশাই—

—আইজ্ঞা, বাকলা পরগণার সুগন্ধায়, ক্যান ক'ন দেখি

—আমিও তাই অনুমান করেছিলুম, আমি যে মাঝির নৌকোয় চন্দননগর থেকে নবদ্বীপ ঘাট এসেছি, তার দেশও বাকলা পরগণায়, আপনাদের দেশের কাঁইমাই কথা শুনে দুটি পঙ্ক্তি আমার মনে এসেছিল, বলছি শুনুন, শুনিয়াছি সে দেশের কাঁইমাই কথা।

হায় বিধি, সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥

ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়লেন আনন্দিরাম। আর পাশার ছকের উপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে বললেন রাজকিশোর—পায়ের ধুলো দিন, জব্বর বলেছেন, আপনার রসনায় মা সরস্বতীর অধিষ্ঠান—

—আরে আরে কি করছেন—রাজকিশোরের হাতখানি ঠেলে দিয়ে একটু পেছনে সরে বসল ভারতচন্দ্র। সোজা হয়ে বসে আনন্দিরামকে লক্ষ্য করে আবার বললেন রাজকিশোর —দাদা, একি জিনিস জুটিয়েছেন, এ যে মাথা খারাপ করে দেবে দেখছি—

বাচস্পতি আর হাসছেন না। শুধু বলছেন—আরে থামো, ছকটক সব উলটে দিলে দেখছি—

গোবিন্দ কবিরাজ গরগর করে বললেন—আমাগোর গাঙে গঙ্গা নাই ঠিক, কিন্তু আমাগোর গেরামে একান্ন মহাপীঠের এক পীঠস্থানে, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর নাসিকা পড়ছিল সুগন্ধা নদীর জলে, দেবীর নাম সুনন্দা, দেবীর ভৈরব ত্র্যম্বকেশ্বর, শিবরাত্রির সময় মস্ত মেলা হয়, বোঝলেন,

—আহা আমি ঠাট্টা করেছি, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন—

রাগুম না ক্যান, যার গাঙের ষ্যামন ভাষা—

হাসতে হাসতে বললেন আনন্দিরাম—কবরেজ মশাইকে আর কিছু বলবেন না, রোলমুখের ভাষা নিয়ে ওকে বড় ঠাট্টা মস্করা সহ্য করতে হয়, আপনি বরং রাজকিশোর ভায়ার সম্বন্ধে কিছু বলুন—আনন্দিরামের অনুরোধ প্রায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুহাত জোড় করে তাড়াতাড়ি বললেন রাজকিশোর—কবিবর, আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই, আমাকে রেহাই দিন—

—বৃথা ভয় পাচ্ছেন, বিশুদ্ধ ঠাট্টাকে আপনারা এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন—

—কিন্তু আপনার ঠাট্টা বড় মারাত্মক, বাচস্পতিমশাই আর মুখ খুলতে ভরসা পাচ্ছেন না—

—আরে না না, আপনার সম্বন্ধে আমার মারাত্মক কিছু মনে হয়নি, শুধু আপনার ওই মল্লযোদ্ধার মত গোঁফজোড়া দেখে মালঝাঁপ পয়ারে পংক্তি রচনার প্রেরণা পাচ্ছি—মৃদু হাসি-মুখে বললো ভারতচন্দ্র। তারপর এদের বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করল—মালঝাঁপ পয়ার কা'কে বলে জানেন—

মাথা চুলকে জবাব দিলেন রাজকিশোর—আজ্ঞে পয়ার কা'কে বলে জানি, মল্লযোদ্ধাদের মাল কোঁচাও দেখেছি, তবে মালঝাঁপ পয়ার কাকে বলে ঠিক মনে করতে পারছি না, বাচস্পতিমশাই হয়তো বলতে পারবেন—

—আজ্ঞে না আমি জ্যোতিষ চর্চা করি, ছন্দ অলঙ্কারের বিশেষ ধার-ধারিনা, তবে সংস্কৃত ছন্দ তোটক, ভুজপ্রয়াত, পঞ্চচামর,

মন্দাক্রান্তার নাম শুনেছি, কিছু পড়েওছি, কিন্তু বাংলা ছন্দের খুঁটিনাটি অতশত জানি না, পয়ার ত্রিপদীর নাম জানি ওই পর্যন্ত, মালঝাঁপ পয়ারের নাম শুনেছি, কিন্তু বৈশিষ্ট্য ঠিক মনে করতে পারছিনা—বাচস্পতির সরল স্বীকারোক্তি শুনে সামান্য হেসে বললো ভারতচন্দ্র—কেন কাশীরাম দাসের লেখায় পড়েননি, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ছদ্মবেশী অর্জুনের রূপ বর্ণনা, দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি, পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশরে শ্রুতি, এই হ'ল মালঝাঁপ পয়ার, প্রতি পংক্তির চতু আর অষ্টম মাত্রার একই বর্ণের পুনরাবর্তন, রাজকিশোর মুখুজ্জে মশাইর ওই খাঁড়ার মত নাকের নিচে জাঁকালো গোঁফজোড়া দেখে আমার খালি মনে হচ্ছে,

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ডাল ঝাঁকে
ধরি বাণ খরশান হান হান হাঁকে—

এবার ওরা চারজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। তারপর আনন্দিরাম বললেন—এবার খেলা শুরু হোক, আমি দান ফেলছি, দেখুন—

অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা চারজন খেলায় মশগুল হয়ে গেলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মাথা তখন ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। চারপাশের দেয়াল যেন ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। মাথার উপর ঝাড়বাতির আলোগুলি যেন চলমান উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ধীরে ধীরে অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। একখানি কাঁসার রেকাবীতে ক্ষীরের সন্দেশ, ফেনীবাতাসা, তিলের নাড়ু আর এক গেলাস জল এনে সামনে রাখল পঞ্চানন। অসম্ভব জলতেষ্টা পাচ্ছিল। দুটো ক্ষীরের সন্দেশ মুখে দিয়ে ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে নিল ভারত। আনন্দিরাম বললেন—আরো দুটো সন্দেশ খান রায়মশাই, বাতাসা তো মুখেই দিলেন না—

ওরা চারজনেই মিষ্টি খাচ্ছে। খেতে খেতে মুখ টিপে হাসছে। ওই হাসি দেখে খেয়াল হ'ল ভারতের। মিষ্টি খেলে সিদ্ধির নেশা আরো পাকবে। বড় পাজি নেশা। মনে হচ্ছে যেন আস্তে আস্তে দুলতে দুলতে সে উপরে উঠে যাচ্ছে। আবার কারো কথা কানে গেলেই যেন ধুপ করে নিচে পড়ে যাচ্ছে। একি অসম্ভব কাণ্ড আরম্ভ হ'ল। দু'কানের ভেতর যেন ঝিঁঝিঁ ডাকছে। নাকি বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। আস্তে আস্তে বেশ উপরে উঠে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ পঞ্চানন ডাক দিল—পান এনেছি রায়মশাই, এই নিন তামাক—ধুপ করে সে নিচে পড়ে গেল। চোখ মেলে তাকাল। তারপর তাকিয়া ঠেস পান চিবুতে চিবুতে আবার চোখ বুজে আয়েস করে তামাক টানতে লাগল।

ওরা চারজন পাশা খেলায় মত্ত। আনন্দিরামের মুখোমুখি অমুকূল বাচস্পতি আর গোবিন্দরামের মুখোমুখি রাজকিশোর মুখুজ্জে। ভারত বসেছে আনন্দিরাম আর গোবিন্দ কবিরাজের মাঝামাঝি একটু পেছনে। মাত্র আড়াই হাতের তফাত। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন অনেকদূরে বসে রয়েছে ওরা। চার-মূর্তিকে ছোট ছোট পুতুলের মত দেখাচ্ছে।

চোখ বুজে তামাক টানতে টানতে আবার বেশ উপরে উঠে যাচ্ছিল ভারত।

হঠাৎ বাচস্পতি চেঁচিয়ে উঠলেন—চলরে পাশা, চলে যা—

আবার ধুপ করে সে নিচে পড়ে গেল। চমকে চোখ মেলে তাকাল। ঝাড়বাতির আলো পড়ে গোবিন্দ কবিরাজের মাথার টাক চকচক করছে। মুখোমুখি বসে রাজকিশোর গোঁফে তা' দিচ্ছেন। তাঁর বাঁ-পাশে অমুকূল বাচস্পতি সামনে ঝুঁকে পাশার দান ফেলছেন। এই লোকটি তার পেছনে লাগতে চেয়েছিল। খোঁচা মেরে মস্করা করবে ভেবেছিল। তারপর একেবারে চুপসে গেছে। কবিতার কি সাঙ্ঘাতিক শক্তি। বাচস্পতির শেষের দিকের কথাবার্তায় কেমন অসহায় আত্মসমর্পণের সুর। পাকা আমের মত মুখখানি একেবারে চুপসে আমসি হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ খুব হাসি পেল ভারতের। আর হাসির দমকের সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভর্তি পানের রস ঠোঁট উপচে উঠল। কয়েক ফোঁটা পড়ল বুকের বেনিয়ানের উপর। তাড়াতাড়ি একটা পিকদান এনে সামনে ধরল পঞ্চানন। ছেলেটি চতুর। এই সান্ধ্য আড্ডার কাণ্ডকারখানায় অভ্যস্ত।

সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। অনেকখানি পিক ফেলে আরো এক গেলাস জল খেল ভারত। তারপর একটা তাকিয়ায় মাথা রেখে টান-টান হয়ে শুয়েই পড়ল।

দুই কানের মধ্যে যেন একঘেয়ে সুরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। নাকি ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ। শোঁ শোঁ বাতাসের ডাক। অনেক উঁচুতে ঝাড়বাতির আলোগুলি নক্ষত্রের মত জ্বলছে। এক, দুই, তিন চার—

(ক্রমশঃ)


## খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

| | |
|---|---|
| শ্রীগীতা | ৭·৫০ |
| শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম | ৭·০০ |
| ভারত-আত্মার বাণী | ৫·০০ |
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১·৫০ |
| কর্মবাণী | ১·২৫ |
| Soul of India Speaks | 5·00 |

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

| | |
|---|---|
| বাংলার ঋষি | ৩·০০ |
| বাংলার মনীষী | ১·৩০ |
| বাংলার বিদুষী | ২·০০ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১·৫০ |
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২·০০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ৪·০০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১·৫০ |
| রবীন্দ্রনাথ | ১·২৫ |
| যুগাচার্য বিবেকানন্দ | ১·৫০ |
| আচার্য জগদীশচন্দ্র | ২·৫০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১·৫০ |

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসাগর | ২·২৫ |
| মানুষের মত মানুষ | ·৭৫ |
| শিশু রামায়ণ | ·৬২ |
| শিশু মহাভারত | ·৭৫ |

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

# আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

## সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

**সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা** কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের-রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নবেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-1/69

# নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

## কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় তাঁর পটলডাঙা স্ট্রীটের বাসায়। অন্তত চব্বিশ-পঁচিশ বছর কিংবা তারও আগের কথা। লেখক নবেন্দু ঘোষ এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন একই ভাড়াবাড়ীতে দু' তরফা দু'জনের সঙ্গেই আমার পরিচয় তখন থেকেই। ঢাকা থেকে তখন যুদ্ধকালীন সাহিত্য পত্র 'প্রতিরোধ' সম্পাদনা করছি। ঐ বছরের শারদীয় সংখ্যার লেখা সংগ্রহ সূত্রে কলকাতায় এসেছিলাম এবং এই দু'জন লেখকের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ। শারদীয় 'প্রতিরোধে' নবেন্দু এবং নারায়ণ উভয়েই লিখেছিলেন। তখন চল্লিশ দশকের সেই যুদ্ধ ও মন্বন্তর কণ্টকিত দিনগুলোতে সাহিত্যের আদর্শ ও পথ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হ'তো। নারায়ণ সে সময় আমাদের মতোই বয়সে তরুণ; কিন্তু তখন থেকেই তাঁর রচনায় পরিণত মনের ছাপ। একজন শক্তিমান লেখক রূপে তাঁর ধ্যান ধারণায় সমকালীন পাঠক হিসেবে সুস্থ জীবনাদর্শের সন্ধান পেয়েছিলাম। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত তাঁর 'উপনিবেশ' উপন্যাস পড়ে একজন শক্তিমান লেখকের পরিচয় পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। তখন, সেই চল্লিশ দশকের শুরু থেকেই, বেশ কয়েকজন নতুন লেখক সমকালীন তরুণ পাঠকসমাজের ক্রমশই প্রিয় হয়ে উঠছেন। এঁদের মধ্যে নবেন্দু নারায়ণ ছাড়া ছিলেন সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ এবং আরো কেউ কেউ।

তিরিশ দশকের আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। বেশ কয়েকজন শক্তিমান কথাশিল্পীর আবির্ভাব। চল্লিশ দশকেও তাঁরা রীতিমতো সুপ্রতিষ্ঠিত। তৎসত্ত্বেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন সুখের অন্বেষণে পাঠক উন্মুখ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই উন্মুখ পাঠকের কাছে যেন যুগোপযোগী প্রতিশ্রুতি এনে দিতে পেরেছিলেন।

উপন্যাসিক বা গল্পলেখকদের সাধারণত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর, যাঁদের দু'চারটে উপন্যাস বা গল্পের জন্যে লোকে মনে রাখে। তাঁরা লেখেনও হয়তো পরিমাণে কম। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণীর লেখকদের দু'চারটি গল্প বা উপন্যাস দিয়েই বিচার করা যায় না,—তাঁদের সাহিত্যিক পরিচয় ব্যাপ্তিতে, সমগ্র রচনাবলীতে। নারায়ণ এই শেষোক্ত শ্রেণীরই প্রতিনিধি। বস্তুত, নারায়ণের কলমের বিরাম ছিল না। আর লিখতেনও তিনি চার হাত দিয়ে। শুধু গল্প, উপন্যাস নয়—নাটক, প্রবন্ধ রম্য রচনা। শুধু বড়োদের জন্য নয়, শিশু ও কিশোরদের জন্যেও তাঁর পর্যাপ্ত রচনা। কোনো সময়ই বইয়ের প্রকাশক বা পত্রিকার সম্পাদক তাঁর অকৃপণ দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হতো না। নারায়ণের যদি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে তা এই যে তিনি কাউকে বিমুখ করতে পারতেন না। শুধু বহু প্রচারিত কাগজেই তিনি লিখতেন এমন নয়, বহু লিটিল ম্যাগাজিনেও বিনা পারিশ্রমিকে তিনি নিয়মিত লিখতেন। তরুণদের সঙ্গে তিনি অবাধে মিশতে পারতেন; বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে অব্যাহত ছিল তাঁর সসম্মান আচরণ।

বন্ধুদের সঙ্গে কখনো কোনো অসঙ্গত আচরণের নজির আছে বলেও এযাবৎ শোনা যায় নি। এই দিক থেকে তিনি ছিলেন সত্যি অজাতশত্রু।

একজন সফল কথাশিল্পীরূপে নারায়ণ অল্প বয়সেই সুনাম অর্জন করলেও সাহিত্য তাঁর পেশা ছিল না। তাঁর গভীরতর আকর্ষণ ছিল অধ্যাপনায়। ছাত্র হিসেবে যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা উত্তরজীবনেও তাঁকে সহজে ভুলতে পারেন নি। অধ্যাপনার জগতে নারায়ণ তাঁর উদার আচরণ ও মধুর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বছরের পর বছর ছাত্র সমাজকে সম্মোহিত করে এসেছিলেন; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এই সাফল্য অব্যাহত ছিল বলা যেতে পারে।

বাঙলা দেশের মাপকাঠিতে যাকে সাফল্য বলা হয় নারায়ণ সে-সাফল্য অল্প কালের মধ্যেই অর্জন করেছিলেন। অর্থাগমের পথ নিষ্কণ্টক ছিল এবং একাধারে লেখক ও অধ্যাপকরূপে সমপরিমাণ খ্যাতিও অব্যাহত ছিল। কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ছিল তাঁর নিজের স্বাস্থ্য। যখনই দেখা হয়েছে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেই মুখ ম্লান হয়ে যেত। রোগ ভেতরে ছিল; মাঝে মাঝে কাবু হয়ে পড়তেন, চিকিৎসাও চলত। কিন্তু পড়াশোনা লেখা বন্ধ হতো না কখনো। এখন মনে হয়, আর্থিক স্বচ্ছলতা যখন ছিল তখন এতো প্রচুর পরিশ্রম না করলেও হয়তো চলতো। লেখা কমিয়ে দিয়ে, কলেজ ও সাহিত্যসভার বক্তৃতা ইত্যাদি কিছুটা এড়িয়ে চললে হয়তো স্বাস্থ্য কতকটা আয়ত্তাধীন থাকতো, এতো অল্প বয়সেই তাঁকে বাংলা দেশ হারাতো না। সিনেমা এবং রঙ্গমঞ্চের জগতেও নারায়ণ ছিলেন সুপরিচিত; চিত্রনাট্য সংলাপ বা সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক ইত্যাদি তিনি অনেক সময়ই লিখে দিয়েছেন। তাঁর ক্লান্তি ছিলনা আপ্যায়নে, সবরকমের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে তাঁর অবদান ছিল বিস্ময়াবহ। তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নানা দিকে, ফলে কোনদিকে, সাংস্কৃতিক জগতের কোন বিশেষ বিভাগে গভীর মনোযোগী হবার উপায় হয়তো ছিলনা শেষ পর্যন্ত। গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে নারায়ণের অবদান বিশিষ্ট, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরো বেশীমনোযোগী হবার সুযোগ পেলে তিনি হয়তো সমৃদ্ধতর শিল্পসৃষ্টি উত্তরকালের পাঠকদের জন্য রেখে যেতে পারতেন।

নারায়ণ সম্পর্কে বলা যায় তিনি ছিলেন ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইমেনসলি পপুলার' তাই। অংশত রচনাবলীর মাধ্যমে এবং বেশীর ভাগ আচরণের মধ্য দিয়ে পাঠক ও ছাত্রসমাজের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। তাঁর চেয়ে অনেক কম সাফল্যের অধিকারী হয়েও একালের অনেক লেখক অহঙ্কারী ও বাচালে পরিণত হয়েছেন। আর্থিক সাফল্য এবং সাহিত্যিক পরিচিতি হয়তো আরো অনেক লেখকেরই হয়েছে, কিন্তু তাঁরা নারায়ণের মতো কোনো ইমেজ তৈরী করতে পারেননি। এই দিক থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য এবং সাফল্য।

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

# জাপানের দিনগুলি

## বারীন বর্দ্ধন

ভদ্রলোকের চোখে মুখে বুদ্ধি যেন উপচে পড়ছে। একটু হেসেই পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন—কেন বলুন তো? নমস্তে শুনে কি?

—অনেকটা তাই। কারুর নিজস্ব অভ্যর্থনার ভঙ্গী বা ইংরেজী কায়দা ছেড়ে দিয়ে নমস্তে শুনলে আশ্চর্য্য লাগে বই কি! নিশ্চয়ই কোন ভারতীয় বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছেন? —একটু নিশ্চয়তার সুর টেনে বললাম।

এবার ভদ্রলোক বলতে সুরু করলেন—যুদ্ধের সময় জাপানে কনস্তুপশানের খপ্পড়ে সবাইকেই পড়তে হয়েছিল। তা নিশ্চয়ই জানেন। আমিও বাদ যাইনি। তবে যুদ্ধের সুরুতে নয় মাঝামাঝি। আমি এবং আমার সঙ্গীরা সিঙ্গাপুর অবধি যাবার পর থেকেই যুদ্ধে জাপানের ভাগ্য বিপর্য্যয় সুরু হয় এবং সেজন্যে সিঙ্গাপুরের আগে আর যেতে পারিনি। তখনও নেতাজী বোসের আজাদ হিন্দ্ দলের বেশ প্রাধান্য ছিল মালয় এবং সিঙ্গাপুরে; সৈন্যদলের সঙ্গে গেলেও আমি এই আজাদ হিন্দ্ দলে শেষ পর্য্যন্ত যোগ দিয়েছিলাম। সৈন্য বা সামরিক বাহিনীর কেউকেটা হিসাবে নয়। একেবারেই ভিন্নরূপে। আমাকে করতে হত ইন্টারপ্রেটারের কাজ। সে সময় আমি বহু ভারতীয় বন্ধুর সংস্পর্শে আসি এবং তারই ফলে দু'একটা কথা এখনও মনে আছে। যেমন নমস্তে।— বলেই হাসতে লাগলেন।

আগেই বলেছি জাপানীরা চাপা স্বভাবের। উৎসাহ বা উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে কোন অদ্ভুত বা অলৌকিক কাজ করতে তারা কোনদিনই এগিয়ে যায় না। তাই বিদেশের মাটিতে বসে ভরসা করে কাউকে এতদিন আজাদ হিন্দ্ বা নেতাজী সম্পর্কে মুখ ফুটে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। ভদ্রলোক নিজে থেকেই সেই বিষয়ের অবতারণা করাতে জিজ্ঞাসা করলাম —আপনি নেতাজীর খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে গিয়েছিলেন কি?

ভদ্রলোক বুদ্ধিমান। প্রশ্নের ধরণ শুনেই আন্দাজ করলেন এর গতিটা কোন দিকে। তাই মাথা নেড়ে বললেন —নেতাজীর খুব কাছে আমি কোনদিনই যাইনি। আমি ছিলাম মিষ্টার সহায়ের ইন্টারপ্রেটার।

মিষ্টার সহায়ের নামটা খুব জানা বলে মনে হল না। তবুও একেবারে অজানা নয়। যাই হউক, ভদ্রলোকের উত্তর দেবার ভঙ্গী দেখে আর সেদিকে এগোতে ভরসা হল না। ততক্ষণে Y. W. C. A. থেকে টেলিফোন এসে গিয়েছে। সঙ্গিনী দু'জনকে Y. W. C. A. তে পৌঁছে দিয়ে আমি আর ডাক্তার আগরওয়াল ফিরে এলাম হোটেল পানিওয়ায়।

ব্রেকফাষ্টের সময় সাতটা থেকে নয়টা। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকী সে সময় পেরিয়ে যেতে। এদিকে এতক্ষণ আমরা

ব্যস্ত ছিলাম মহিলা দুজনের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে। সে সমস্যা মিটে যেতেই আরেকটি সমস্যা বা রিপু প্রবল হয়ে উঠল। তাই মহিলা দু'জনকে Y. W. C. A. তে রেখে এসে অর্ডার দিলাম বেশ বড় ব্রেকফাষ্টের। প্ল্যান করেছিলাম যে ব্রেকফাষ্ট সেরেই বেরোব ওসাকা প্রদক্ষিণ করতে। এদিকে সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা। অবস্থাটা কোনমতেই আশাপ্রদ নয়। খাওয়া শেষ করার আগেই সুরু হল বৃষ্টি এবং এক নাগাড়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলল এই বর্ষণ। ভেবে দেখলাম, ওসাকাতে যখন পুরো একটা দিন এবং একটা রাত কাটাবার ব্যবস্থা হয়েছে তখন প্রথমটায় ওসাকার আশেপাশে কোন জায়গায় যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত যদিও ওসাকাকে কেন্দ্র করে তার বাইরে যাওয়ার কোন প্রোগ্রামই আমাদের ছিল না।

বৃষ্টির জন্য সবাই বসে আছি লাউঞ্জে। একটু বাদেই একজন জানালা দিয়ে ঘাড় বাড়িয়ে দেখছি বৃষ্টির কোন ছেদ পড়ল কিনা। এমনি সময় একমাথা জল নিয়ে এসে ঢুকল জাফর। চুপ করে সবাই বসে আছি দেখে হাজারে ওয়াটারপ্রুফ ঝুলিয়ে রেখে জাফর আমাদের পাশে সোফায় এসে বসল এবং পরক্ষণেই উর্দুতে বলল—আপনারা দুপুরটা ঘরে বসেই কাটাবেন?

—ঘরে বসে কাটাতে কি কেউ টোকিও থেকে ওসাকাতে আসে? একটু অধৈর্য্য হয়েই বললেন মিসেস্ আগরওয়াল।

—আর তাছাড়া আমাদের প্রোগ্রামের সুরুতেই একটা ভুল হয়েছে। ওসাকাতে প্রায় দেড়দিন থাকব অথচ যা শুনলাম তাতে দেখবার তো খুব একটা কিছু নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে হল এই ওসাকাতে এসে। —আত্মসমালোচনার সুর টেনে বলল ডাক্তার আগরওয়াল।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, আপনি তো এখানে রয়েছেন অনেকদিন। ওসাকা সহর ছাড়া বাইরে কোন দর্শনীয় বস্তু আছে কি? জাফর দিল একটা প্রয়োজনীয় খবর। বলল—এক কাজ করুন না। ওসাকার খুব কাছেই আছে নারা। নারার দাইবুৎসুর নাম শুনেছেন কি? তাছাড়া ডিয়ার পার্ক। পালে পালে হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেতে আসতে মাত্র দু'ঘণ্টা। বৃষ্টি তো ধরে এল বলে। যাবেন তো চলুনা আমি নারা এখনও দেখিনি। এক সঙ্গে হৈ হৈ করা যাবে।

প্রোগ্রামের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলনা কারুরই। তবুও ভাবলাম এত কাছে এসে জাপানের প্রাচীন রাজধানী না দেখে যাবনা। কথা ছিল মার্চের সুরুতে যাব কিয়োতো এবং সেই সঙ্গে ফেরার পথে নারাও দেখে নেব। তৈরী হয়ে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন বৃষ্টি থামবে সেই আশায়।

একটা কথা এখানে বলে রাখি। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি বিশেষ করে যারা শুধু ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন তাদের পক্ষে কোন কিছু বাদ দিয়ে বা পরে দেখব বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার মত বোকামি বোধহয় আর কিছু নেই। যদিও কিয়োতোর সঙ্গে নারার প্রোগ্রাম করেছিলাম, কিয়োতো দেখা এত তাড়াতাড়ি এবং কম সময়ে সারতে হয়েছিল যে ওসাকার সঙ্গে নারা না দেখলে আর কোনদিনই দেখা হয়ে উঠতনা। সেরকম টোকিও থেকে কামাকুরার দূরত্ব প্রায় বিশ মাইল। প্রতিদিন আধঘণ্টা অন্তর ট্রেন চলছে। কামাকুরা থেকে বেড়িয়ে ফিরবার পথে একটা ছোট্ট ব্রোঞ্জের কাল বুদ্ধমূর্ত্তি কিনে এনেছিলাম। হোষ্টেলের এক সিংহলী বন্ধু সেটা দেখতে পেয়ে নিতে চাইল। অতি সাধারণ জিনিষ দামের দিকে থেকে তাই সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিলাম। ভাবলাম, এইতো বিশ মাইল দূরে কামাকুরা। আবার একদিন গিয়ে নিয়ে আসব। তারপর আরও ছয় মাস জাপানে ছিলাম। কিন্তু কামাকুরায় গিয়ে সেই ছোট্ট ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি আর কেনা হয়ে উঠেনি।

নারা ওসাকা থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে জাপানী রাজ-

তন্ত্রের অগ্রগতির মাইলষ্টোন হিসাবে দাঁড়িয়ে। বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান ছিল এই নারা যাকে এক হিসাবে বলা হয় জাপানের সুপরিকল্পিত রাজধানীগুলির প্রথম এবং প্রধান। চীনের রাজধানী চাং আনের ভঙ্গীতে বড় বড় মন্দির এবং বৌদ্ধ শুশ্রূষার সমভিব্যহারে নারা হয়ে উঠেছিল ধনদৌলত ধর্মকর্মের আকর। জাপানী ইতিহাসের এদিকটা শুনতে শুনতে জাফরের সঙ্গে আমরা সবাই যাচ্ছিলাম। ভ্রমণতালিকার বাইরে থাকার দরুণ সময়ও ছিল সংক্ষিপ্ত। তাই সুরুতে গেলাম বাস ষ্টপে ভ্রাম্যমানদের উপযোগী বাসের খোঁজে। বাস আসতেই টিকিট কিনে আমরা উঠে পড়লাম। জাপানী গাইডদের কথা আগেই বলেছি। বাসে গাইডের চাকুরিটা একচেটিয়া করে নিয়েছে এই জাপানী মেয়েরা। বাস চলার সঙ্গে সঙ্গেই কানে ভেসে এল সেই একই রকমের ঝর্ণার সুর। প্রতিটি মোড়ে কি আছে এবং সামনের দিকে কি থাকবে বলে বলে বোধহয় এদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। তাই ড্রাইভারের দিকে পিছন ফিরে হাতে মাইকের চোঙটি নিয়ে যাত্রীদের দিয়ে যাচ্ছে চলার পথের রানিং কমেণ্টারী। বক্তব্যের ভাষা ছিল ওসাকা ঢংএর জাপানী। অর্থাৎ টোকিওমার্কা জাপানীর সঙ্গে তফাৎটা ছিল পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার মত। তাই বোধগম্য হচ্ছিল খুব কম। রাস্তার দুধারে নানা রকমের ঝোপঝাড়। কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই জাপানের ইতিহাসে লেখা এর রাজকীয় সত্তা।

একটা লাল কাঠের গেটের সামনে বাসটা থেমে গেল। আর সবাইকে নামবার অনুরোধ জানিয়ে গাইড দাঁড়িয়ে পড়ল নীচে পাদানীর এক পাশে। বয়োজ্যেষ্ঠদের নামিয়ে দিতে লাগল এক এক করে।

সামনেই বিরাট বাগান। ঝোপঝাড় আর গাছের ছায়ায় অনেকটা পাহাড়ী জঙ্গলের মতই। শুধু পায়ে চলার পথটি ইট দিয়ে বাঁধান বলেই এর আত্মপরিচয় বুঝতে কষ্ট হয়না। তবুও আশেপাশের ভেজা গাছপালা আর কাদামাটি দেখে দেখে মনে হল দর্শনীয় বস্তুটির জন্য এগোতে হবে বেশ কিছু। যাচ্ছিলাম রাস্তার ধার ঘেসে। হঠাৎ যেন ঝোপটা নড়ে উঠল। আর তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি বিরাট শিং। আরও এগিয়ে যেতেই নজরে এল বাদামী রংএর উপর সাদা ছাপ মারা হরিণটি। জনসমাগমের দিকে লক্ষ্য না রেখে বসে বসে ঘাস চিবুচ্ছে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবং পরক্ষণেই একপা, একপা করে এগিয়ে এল খাবারের খোঁজে। পূর্ণবয়স্ক ষাঁড়ের মতই ছিল এর আকার। আমার সঙ্গে ছিল পকেটভর্ত্তি বাদাম ভাজা। হাত তুলে নিয়ে ইঙ্গিত করতেই নিতান্ত গৃহপালিতের মতই মুখ দিয়ে তুলে নিল খোসাশুদ্ধ বাদাম।

নারার বিখ্যাত ডিয়ার পার্ক। কেতাবী অর্থে হরিণের বাগান। নারার কথা বলতে গিয়ে বন্ধুবান্ধবের অনেকে বলেছিলেন এই বাগানের বিশেষত্ব। দুই কি আড়াই মাইল পরিধি নিয়ে এই বাগানটি তৈরী। আর ঠিক পরুমহিষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধুই হরিণ আর হরিণশিশু। আরও এগিয়ে যেতেই দেখলাম আমারই মত এক বিদেশী তিনটি হরিণকে খাওয়াচ্ছে বাদামভাজা। রক্ষককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এই বাগানে রয়েছে প্রায় দেড়শ হরিণ এবং যাতে এরা বাইরে চলে যেতে না পারে বা চুরি না হয়ে যায় তার জন্যে আছে সরকারী রক্ষকের দল। পরিবেশটি বাস্তবিকই মনোরম। হরিণের স্বচ্ছন্দ গতি দেখতে গিয়ে দেরীই হয়ে গিয়েছিল। তাই ছুটতে ছুটতে গিয়ে যখন বাসে উঠলাম তখন দেখি একমাত্র আমরা কয়জন ছাড়া সকলেই নির্দিষ্ট আসনে বসে গিয়েছে। আর গাইড খুঁজতে বেরিয়েছে এই অধমদের।

বাস এবার ছুটে চলেছে নারার সরু সঙ্কীর্ণ পথ ধরে তোদাজি মন্দিরের দিকে। এই তোদাজি মন্দিরেই রয়েছে নারার বিখ্যাত দাইবুৎসু বা বুদ্ধমূর্ত্তি। কাঠের তৈরী বিরাট এই মন্দির প্রায় তিনতলার সমান উঁচু। কিন্তু সাধারণ

মন্দিরের মত এর চূড়া ধীরে ধীরে সুচাল হয়ে পরিণতি লাভ করেনি। সামনে চওড়া বারান্দা এবং তার মাঝখানে বসান আসে ব্রোঞ্জের তৈরী একটি কুণ্ড।

বাইরের বস্তুর চেয়েও আকর্ষণীয় ছিল এই দাইবুৎসু। তাই ঢুকে পড়লাম মন্দিরের কামরায়। ভিতরে ঘন অন্ধকার। কেবল একদিকে ফাঁক দিয়ে আসছে পড়ন্ত সূর্য্যের আলো। কাল ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্ত্তি। তিপ্পান্ন ফিট্ উঁচু এই মূর্ত্তিটিকে তৈরী করতে লেগেছিল দশ বছর। আসল দাইবুৎসর চারদিক ঘিরে রয়েছে কাল আরও গুটিকয়েক ছোট কিন্তু একই ধরণের মূর্ত্তি। সঙ্গে ফ্ল্যাশ্ বাল্ব্ না থাকার দরুণ ছবি তোলা হয়ে উঠলনা। নারা থেকে যখন ওসাকায় ফিরে এলাম রাত তখন সাতটা।

পরদিনই বিকেলে ধরব বেন্দুর জাহাজ। তাই সকালের প্রথম ভাবনা হল সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ওসাকা প্রদক্ষিণ শেষ করা। হোটেল নানিওয়ার রিসেপ্শনিষ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে ভ্রমণতালিকাটা ঠিক করে বেরিয়ে পড়লাম ওসাকার পথে। যাত্রার প্রথম স্থান ওসাকা দুর্গ। একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে উঠে পড়লাম চলন্ত ট্রামে। ট্রামটা অফিসগামী যাত্রীতে প্রায় ভর্ত্তি। বসবার জায়গা নেই একেবারে। আর সারা জাপানে কোথাও নেই মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট আসন। তবুও বিদেশী বলে খাতির পেলাম দু'জনের কাছ থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে তারা জায়গা ছেড়ে দিলেন আমাদের সঙ্গিনী দু'জনকে।

ট্রাম চলছে ওসাকার জনবহুল পথ দিয়ে। ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম বৃহৎ নগর বলেই বোধহয় লোকজন সব ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে এদিক ওদিক যাওয়া আসা করছে। কলকাতার ধর্মতলা ষ্ট্রীটের মতই ব্যস্ত এবং জনবহুল এই রাস্তা। চারিদিকে তাকিয়ে সহরের দৃশ্য দেখছি। ট্রাম ধীরে ধীরে ভরে উঠল কানায় কানায়। এক এক ষ্টপে ট্রাম দাঁড়াচ্ছে আর নিঃশব্দে লোকজন ওঠানামা করছে। একটু পরেই কণ্ডাক্টার এসে ভাড়া চাইল।

জাপানের ট্রামে বিভিন্ন দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া ঠিক করা নেই। যেখানেই যেতে চাই না কেন ভাড়ার হারের কোন তারতম্যতা নেই। ট্রামে আবার ফিরতি টিকেট কাটা সম্ভব। এক সঙ্গে দু'টো অর্থাৎ যাওয়া-আসার টিকিট কাটলে ভাড়া একটু কম। এবং এই টিকিট একবার কেটে যে কোনোদিন যে কেনো রুটে ব্যবহার করা যায়। কণ্ডাক্টার কখনই বিরক্তি মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করবেনা বালিগঞ্জের টিকিট কিনে শ্যামবাজারের ট্রামে কেন উঠেছেন। বহুদিন এমন হয়েছে যে ঐ একটু লাভের জন্য যাওয়া-আসার টিকিট কিনেছি। হয়ত ফেরবার সময় ট্রেনে এসেছি। পরদিন বা তারও পরে ঐ অব্যবহৃত টিকিট দিয়ে আবার ট্রামে চড়েছি।

সে যাক। কণ্ডাক্টার এসে টিকিট চাইতেই পয়সা বার করে বললাম—ওসাকা জো।

—কিন্তু ওসাকা দুর্গের দিকে তো এ গাড়ী যাচ্ছেনা। বলল কণ্ডাক্টার।

—সে কি! বলেই ডাক্তার আগরওয়ালের দিকে ফিরে তাকালাম। ভুল যে আমরা করেছি তা সহজ সরল জাপানীতে বোঝাচ্ছিল কণ্ডাক্টার। আর সেই সঙ্গে উপদেশ দিচ্ছিল কি করে ওসাকা দুর্গে পৌঁছুতে পারি। তবুও উত্তেজনার মুখে আমার বা ডাক্তার আগরওয়ালের বোধগম্য হচ্ছিলনা কিছুই। নেমে যাব ভেবে দরজার দিকে পা বাড়াতেই কোটপ্যান্ট্ পরা বগলে ফাইলের গাদা নিয়ে সিট্ থেকে উঠে পড়লেন আমাদেরই এক সহযাত্রী এবং ভাঙাভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা ওসাকা দুর্গে যাচ্ছেন তো?

ইংরেজী শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—আজ্ঞে হাঁ। আমরা সেখানেই যাচ্ছি। কিন্তু কত নম্বর ট্রামে যেতে হবে বলুন তো?

—চলুন, আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে ভদ্রলোক কাগজপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে নেমে পড়লেন এবং পর মুহূর্তেই ধাবমান একটি খালি ট্যাক্সিকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন গন্তব্যস্থল।

ট্যাক্সিড্রাইভার মাথা নেড়ে বুঝে নেবার ভঙ্গী করতেই ভদ্রলোক আবার ছুটে গেলেন পরের ট্রাম ধরতে। তাড়াতাড়িতে ধন্যবাদ জানান হলনা। তবুও বুঝতে দেরী-হলনা যে ভদ্রলোকটি অফিসে দেরী হবার ঝুঁকি নিয়েও বিদেশীদের সাহায্য করতে তৎপরতার অভাব দেখালেন না।

লণ্ডনের পুলিশম্যানদের সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে নূতন লোকেদের পথ খুঁজে দিতে এদের মত সাহায্যকারী আর দ্বিতীয় নেই। সে হয়ত অতটা অসম্ভব নয়। কারণ পুলিশম্যানদের অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে এটিও একটি। কিন্তু এখানে অর্থাৎ জাপানে সাধারণ পথচারীদের এজাতীয় স্বভাব দেখে অবাক হতে হল। আরেকদিনের একটি ঘটনার কথা বলছি। ডাক্তার আগরওয়ালের এক বন্ধু জাপানে নূতন এসেছেন এবং জাহাজ থেকে নেমেছেন ইয়োকোহামা বন্দরে। জাপান এমনই দেশ যে তাদের নিজেদের ভাষা ছাড়া বাকী সব ভাবপ্রকাশের পক্ষে একেবারেই অচল। হালে অবশ্য অনেকে ইংরেজী শিখছেন। কিন্তু বলতে হয়ত তারা পছন্দ করেন না। তাই আমাদের নূতন আগন্তুকের ইয়োকোহামা পৌঁছে মহা অসুবিধায় পড়তে হল। কোন-রকমে Y. M. C. A. তে মালপত্র রেখে ডাক্তার আগরওয়ালের ঠিকানাটি সম্বল করে বন্ধুটি রওয়ানা হলেন টোকিওর দিকে।

টোকিও ষ্টেশনে পৌঁছে তিনি উঠে পড়লেন শিনজুকুর গাড়ীতে। ভেবেছিলেন শিনজুকুতে নেমে ঠিকানা অনুযায়ী চলে যাবেন ডাক্তার আগরওয়ালের বাড়ী। কিন্তু তার ধারণা ছিলনা যে সারা বিশ্বের নগর পরিকল্পনার এক অদ্ভুত সৃষ্টি এই টোকিও সহর। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সহর হয়েও একটি ছাড়া টোকিওর রাস্তাগুলির কোনই নামাকরণ হয়নি আজ পর্যন্ত। রাস্তারই যখন নাম নেই তখন চিরাচরিত প্রথায় ঠিকানা খুঁজে দেখতে অভ্যস্ত বিদেশীদের যে মহাবিপদে পড়তে হবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ডাক্তার আগরওয়ালের বন্ধুটিও এই অবস্থা। ঠিকানাটি খুলে পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন এর নির্দেশ। ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন। সহযাত্রী ভাঙ্গা ইংরেজীতে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে আরও বিশদ করে জেনে নিলেন তার গন্তব্য-স্থল এবং পরক্ষণেই একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন বন্ধুটিকে নিয়ে।

নাম গোত্রহীন অসংখ্য ছোট বড় চওড়া আর সরু রাস্তার কবল থেকে তার বাড়ীঘর কি করে খুঁজে পাওয়া যায়? প্রশ্নটি অতি স্বাভাবিক এবং উত্তরটাও জানতে চাইবেন অনেকে।

প্রায় প্রতি চৌরাস্তার মোড়ে আছে একটি করে পুলিশ চৌকি। দু'তিনজনে কনেষ্টবল থাকে এই চৌকিতে। আর পথচারীদের পথ বাতলে দেবার জন্য থাকে সে অঞ্চলেরই একটা নিখুঁত মানচিত্র। এত সব থাকতেও বিদেশীর পক্ষে ঠিকানা খুঁজবার প্রধান অন্তরায় হল ঐ ভাষা। জাপানীদের পুলিশ চৌকির উদ্দেশ্য জানা থাকার দরুণ ট্যাক্সীড্রাইভার সোজা চলল নিকটস্থ পুলিশ চৌকির দিকে এবং সমস্ত বিশদভাবে জেনে জাপানী যাত্রীটি কনেষ্টবলের কথা অনুযায়ী এনে হাজির করলেন ডাক্তার আগরওয়ালের বন্ধুকে সেই ঠিকানায়। সকলকে আরও অবাক করে দিলেন জাপানী ভদ্রলোকটি যখন ডাক্তার আগরওয়ালের বন্ধু ভাড়ার টাকা দিতে এগিয়ে গেলেন।

—না না সেকি! এ নিতে পারবনা। বিদেশীদের এখানে এসে অসুবিধা হলে তাকে সাহায্য করাইতো আমাদের কর্তব্য।—বললেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে আর পরক্ষণেই উধাও হয়ে গেলেন ট্যাক্সি চেপে। (ক্রমশ)

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গৌরবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

## মতামত

সুভাষচন্দ্র প্রথম খণ্ড পড়ে ভাল লাগলো। অন্যান্য জীবনী থেকে এর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনার পরিচয় দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন লেখক। এই পরিকল্পনা যথার্থ বলে মনে হয়। সুভাষচন্দ্র কবি, দার্শনিক বা ধর্মগুরু নন। তিনি দেশনেতা। তাই দেশের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর নেতৃত্বের বনিয়াদ গড়েছে। সুতরাং তাঁকে জানতে হলে দেশ ও কালকেও জানা চাই। কবি এবং দার্শনিককে তাঁদের জীবনের মধ্যেই জানা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অসামান্য দানের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বিস্তৃত জীবনীই তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারে।

এই প্রথম খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ জীবনীর যে আভাস পাওয়া গেল তা আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। দেশ ও কালের প্রভাব কিভাবে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে লেখক তা সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে "শিবচেতনার জাগরণ" অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনারীতি বিষয় বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ছাপা বাঁধাই সুরুচিসম্মত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'জাতীয় গ্রন্থাগার'

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

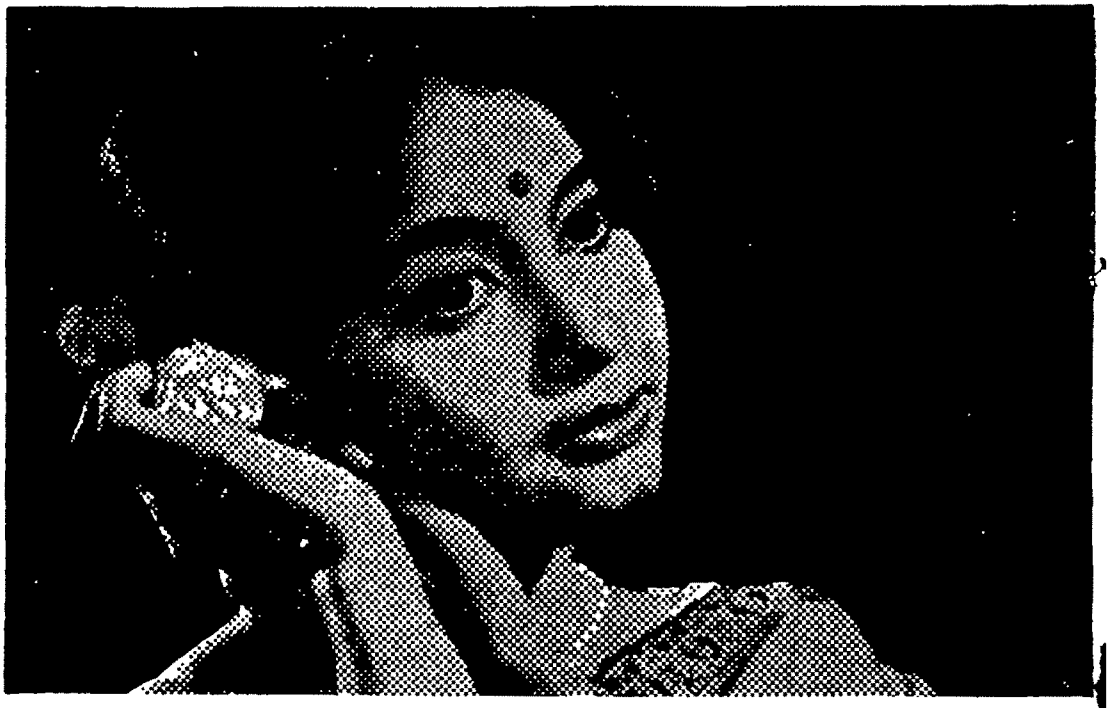

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৩

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

SBC-1/65


Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·70
HEAD OFFICE · JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

ফাল্গুন

১৩৭৭

# ভ য়ী

প্রতিষ্ঠাত্রী – সম্পাদিকা :-
লীলা রায়

...ডিগ্রি নেবার দিন। মঞ্জুদেবী তাঁর সন্তানের বি. এ. পাশের খবরে খুব খুশি হয়েছেন।

সব মা ই চান তাঁদের সন্তানরা ভাল পাশ করুক, দেশের এক হোক।

কিন্তু পরিবার বড় হলে বাপ মায়ের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ছেলে মেয়েদের এই সুযোগ সুবিধে দেওয়া সম্ভব হয়না।

ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা দিতে হলে দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট।

লাল ত্রিকোণ চিহ্নিত পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলি আপনাকে পরিবার নিয়ন্ত্রণের সমস্ত সুযোগ সুবিধে দেবে—নিশ্চয়তায়।

সুকল্পিত পরিবার
সুশিক্ষিত পরিবার

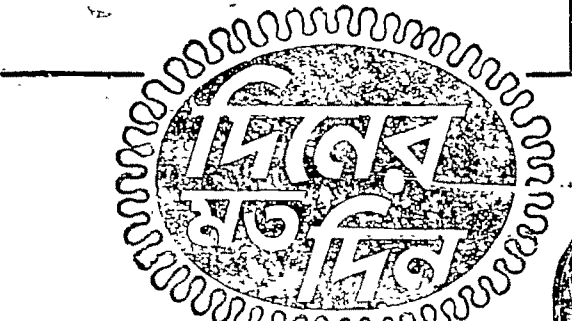

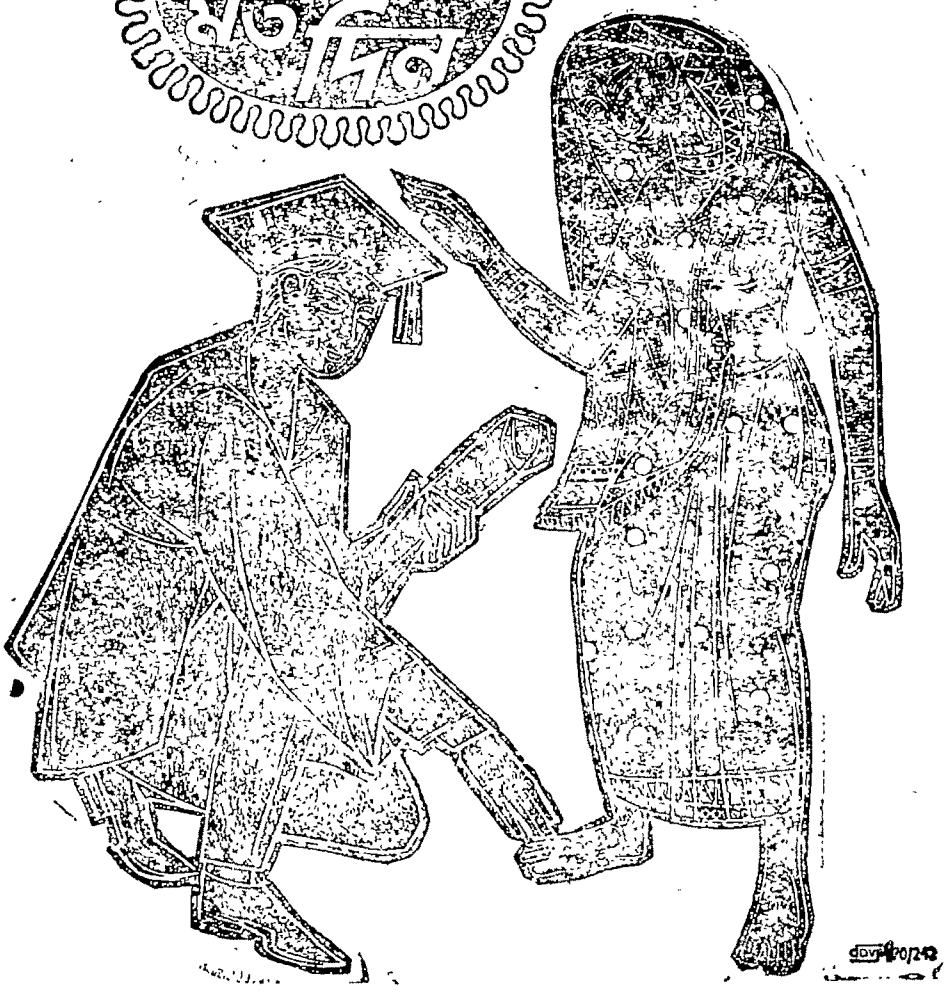

## সূচীপত্র

জয়শ্রী : ফাল্গুন : ১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৮২৩ |
| প্রাচীন ভারতের সাম্যবাদ (কবিতায়) | সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় | ৮২৭ |
| জাগরণ ও বিস্ফোরণ (ধারাবাহিক রচনা) | কালীচরণ ঘোষ | ৮৩১ |
| সুভাষবাদ (প্রবন্ধ) | পবিত্রকুমার ঘোষ | ৮৩৯ |
| সুভাষচন্দ্র ও ভারতচিন্তা (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) | রবি রায় | ৮৪৭ |
| মজুরি নির্ধারণের সঙ্গত নীতি | অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য | ৮৫৭ |
| কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস) | মিহির মুখোপাধ্যায় | ৮৬৩ |



সম্পাদক : সুনীল দাস


## জয়শ্রীর নিয়মাবলী

### গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী [illegible] সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০ ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

### লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়**

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
পোঃ নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

ভারতী

৩৫ বর্ষ ০ একাদশ সংখ্যা ০ ফাল্গুন ১৩৭৭

# সম্পাদকীয়

## লোকসভায় একাত্তরের নির্বাচন

লোকসভার একাত্তরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিস্ময়কর সাফল্য সকল দলের সকল অনুমান ধূলিসাৎ করে দিয়ে নূতন ইতিহাস রচনা করেছে। শাসক কংগ্রেস লোকসভার ৩৫০টি আসন পেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হবে, স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী কিম্বা তাঁর দলের অপর কোনো নেতাও কোনো অঙ্কের হিসাবেই এই সীমানার নাগাল পাননি। তাদের হিসাব বড়জোর সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার সীমানা ডিঙিয়ে কোনো অবস্থাতেই আর ঊর্ধগামী হতে পারেনি। ৫২১ আসন-বিশিষ্ট (৩টি আসনে নির্বাচন পরে হবে) লোকসভার তাই শাসক কংগ্রেসের আসনের অনুমানের উচ্চতম সীমানা ২৬০-এর অঙ্ক তুলেও অতিক্রম করে যায় নাই, যদিও এই সীমানা সম্ভাব্য জয়ের প্রচারে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করবার এবং দলীয় মনোবল বৃদ্ধি করবার কৌশলরূপেই বেশীমাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে। কংগ্রেসের সুদিনে পর পর তিনটি নির্বাচনে এই দলের নিরঙ্কুশ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যথাক্রমে ৩৬৪ (১৯৫২) ৩৭১ (১৯৫৭) ৩৫৮ (১৯৬২) এর সীমানা থেকে অতঃপর ১৯৬৭ সনে প্রবল কংগ্রেস-বিরোধিতার আঘাতে ২৭৯ এর সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নেমে এলে, কংগ্রেসের শক্তি আরও পড়তির মুখে লোকসভায় ক্রম-নিম্নগামী হবে—সে সম্পর্কে কারুর দ্বিমত ছিল না। তারপর কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হলে শাসক কংগ্রেস ১৯৬৯-এ কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যখন আর অন্য-দল-নিরপেক্ষ রইলো না, তখন কেন্দ্রে অতঃপর কোনো দল একক সরকার গঠনে সমর্থ হবে না, এই অনুমানই ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে দানা বেঁধে ওঠে এবং এই অনুমান থেকে ভবিষ্যতে কেন্দ্রে সমমতাবলম্বীদের কোয়ালিশনের অপরিহার্যতা একটি রাজনৈতিক প্রত্যয়রূপে প্রচারিত হয়। গত ২৭শে ডিসেম্বর চতুর্থ লোকসভা বিলুপ্ত হবার সময় শাসক কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল ২২০। এই সংখ্যা মধ্যবর্তী নির্বাচনে আরও হ্রাস পেয়ে নূতন লোকসভায় হীনবল শাসক কংগ্রেস সমমতাবলম্বী দলগুলির সঙ্গে কেন্দ্রে কোয়ালিশন করতে বাধ্য হবে, এই অনুমানের ভিত্তিতেই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাক্-নির্বাচন সমঝোতা করতে অগ্রসর হয় এবং জাতীয় ভিত্তিতে শাসক কংগ্রেস এই ব্যবস্থায় অসম্মত হলেও, বিভিন্ন রাজ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কম-বেশী মীমাংসায় পৌঁছায়। কম্যুনিষ্ট পার্টি তাতে লাভবানও হয়েছে। প্রশ্ন সোশ্যালিষ্ট

পার্টিও এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে শাসক কংগ্রেসের নিকটতর হতে চাইলেও, শাসক কংগ্রেসের ছলনায় প্রায় সকল রাজ্যেই এই দল ব্যর্থতার পর নির্বাচনে চূড়ান্তরূপে পর্যুদস্ত হয়ে কোনোরকমে অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। নতুন লোকসভায় শাসক কংগ্রেসের আর একটি অবলম্বন, তামিলনাড়ুর ডি, এম, কে, শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে শেয়ানে-শেয়ানে মিলেছে। তামিল নাড়ুতে বিধান সভায় একটিও আসন না দেবার সর্তে ডি, এম, কে শাসক কংগ্রেসকে লোকসভায় নয়টি আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কেও শাসক কংগ্রেস যে কিছুটা সন্দিহান ছিল, অন্তত সি, পি, আই এবং ডি, এম, কের সঙ্গে আঞ্চলিক সমঝৌতার মধ্যে তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে।

শাসক কংগ্রেসের এই জয় সামগ্রিকভাবে কোনো নীতির জয়ের চাইতেও একদিকে যেমন ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত জয় আর একদিকে ইন্দিরা-বিরোধী গোষ্ঠির নীতিহীন নেতিবাচক ভোটের সর্বতোমুখী পরাজয়। কংগ্রেসের দ্বিধা-বিভক্তির পর ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণ করে কিম্বা রাজন্যভাতা বিলোপের জন্য অগ্রণী হয়ে সমাজপরিবর্তনের কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচী অনুসরণ করেন নাই। তাছাড়া ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরিণতিতে দেশের অর্থনৈতিক বিন্যাসের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ব্যাঙ্কের সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণে ব্যর্থতায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সমাজবাদী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে নাই। কিন্তু এই সব ব্যর্থতা সত্ত্বেও দেশের অনুন্নত, অনগ্রসর, দরিদ্র মানুষের মনে ইন্দিরা গান্ধীর 'গরীবী হটাও'-এর উচ্চকণ্ঠ প্রচার সমাজের এই বঞ্চিতদের মনে নিঃসন্দেহে নূতন আশার সঞ্চার করে তাদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী এদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করেছেন, কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্তির পর থেকে এবং তার দেড় মাসের অক্লান্ত নির্বাচনী প্রচারের মধ্য দিয়ে, যে তাদের ভাগ্য ইন্দিরা গান্ধীর হাতে নিরাপদ। এ-ছাড়া ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিশ্বাস সৃষ্টিতে ইন্দিরা গান্ধী নিঃসংশয়াতীতভাবে সমর্থ হয়েছেন। এই বিশ্বাস কতটা তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে পুষ্ট করে, কতটা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তার চূড়ান্ত উত্তর আপাতত পাওয়া সম্ভব না হলেও, মুসলীম লীগের ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্তির পর ইন্দিরা গান্ধীর নীতির ফলশ্রুতি কিনা সে-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও, এ-কথা সুস্পষ্টভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষকে স্বীকার করে নিতে হবে যে সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ইন্ধন যুগিয়ে, কিম্বা বিপুল অর্থ ব্যয় করে কিম্বা অন্য কোনো অর্থনৈতিক কারসাজির প্রশ্রয়ে এই বিপুল সাফল্য সম্ভব হোতো না, যদি না দেশের বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর হাতে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ মনে করে বঞ্চনাহীন, শোষণযুক্ত জীবনের তাগিদ বোধ না করতেন। তাদের এই বিশ্বাস সঠিক পাত্রে ন্যস্ত হয়েছে কিনা, ইন্দিরা গান্ধীর প্রচারের ছলনা তাদের ভুলিয়েছে কিনা, 'গরীবী হাটাও'-এর সঙ্কল্প ও সামর্থ সত্যিই তার দলের আছে কিনা, এসব প্রশ্নের বিচার হবে 'গরীবী হাটাও'-এর রূপান্তরের উদ্যোগ, তৎপরতা ও আন্তরিকতা যাচাই হবার পর। যারা ইন্দিরা-প্রতিপক্ষদের পরাজয়কে অলৌকিক কাহিনী রচনা করে—যেমন ভোট পত্রে অদৃশ্য কালির কারসাজি —কিম্বা সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারকে, কিম্বা প্রচুর অর্থব্যয়কে ইন্দিরা গান্ধীর বিপুল সাফল্যের কারণরূপে ব্যক্ত করে পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার চেষ্টা করছেন, তাদের আত্মবঞ্চনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন সুদৃঢ় না করে একতান্ত্রিক মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। এই নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

জাতীয় নেতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন, গরীবের বন্ধুরূপে আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। তার এই জয় যেমন একান্ত-ভাবে তার স্বীয় ব্যক্তিত্বের জয়, তেমনি বিরোধীদের দিক থেকে কোনো নীতিকে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তুলে ধরে জনমানসে সেই নীতিসম্পর্কে দুর্বার সমর্থন সৃষ্টি করে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টিতে চূড়ান্ত ব্যর্থতা ঘোষণা করেছে।

অপরদিকে শাসক কংগ্রেস ৪৪২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫১৮টি আসনের মধ্যে ৩৫০টি আসন পেলেও ( তিনটি আসনে নির্বাচন পরে হবে ), অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ আসন পেলেও, সমগ্র দেশে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৩·৬৪ ভাগ মাত্র ভোট পেয়েছে, অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটে শাসক কংগ্রেসের এই বিপুল সাফল্য হয়েছে। শাসক কংগ্রেস রাজ্যের পর রাজ্যে আসন দখল করেছে, তাদের বিরোধীদলের আসনগুলি বিপুল ভোটে কেড়ে নিয়ে। যেখানে তাদের কোনো ভাল সংগঠন ছিলনা, অপরপক্ষে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বীকৃত সংগঠন ছিলো, সে সব রাজ্যেও বিস্ময়কর সাফল্য তাদের জয়মাল্য পরিয়ে দিয়ে গেছে। উত্তর প্রদেশে এই রকম একটি রাজ্য যেখানে ৭৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭৩টি আসনে তারা জয়ী হয়েছেন যাদের মধ্যে অনেক অখ্যাত, অজ্ঞাত প্রার্থীও রয়েছেন। দিল্লীতে এই ঘটনার বিস্ময়কর পরিণতি দেখা গেছে। সেখানকার সাতটি আসনের মধ্যে ছয়টি জনসঙ্ঘের দখলে ছিল, দিল্লী পৌরসভা জনসঙ্ঘের দখলে রয়েছে, তাদের মজবুত সংগঠন রয়েছে, তা সত্ত্বেও সেখানে জনসঙ্ঘের নামী নেতারা শাসক কংগ্রেসের অখ্যাত-অজ্ঞাত প্রার্থীদের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। বালরাজ মাধোক এবং এম, এল সোঁধীর পরাজয় এইভাবে সংঘটিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ৪৪ আসনের মধ্যে ৪৩টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ( এর মধ্যে একটি আসনে শাসক কংগ্রেসের সমর্থনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী জয়ী হয়েছে ) আসনে জয়, অন্ধ্রে, তেলেঙ্গানা এলাকার বাইরে ২৭টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসনে বিপুল ভোটে জয়, রাজস্থানের ২৩টি আসনের মধ্যে ১৪টি আসনে জয়, বিহারে ৫৩টির মধ্যে ৩১টিতে, হরিয়ানার ৯টির ৭টিতে, পাঞ্জাবের ১৩টির ১০টিতে, আসামের ১৪টির ১৩টিতে, উড়িষ্যার ২০টির ১৫ টিতে জয় শাসকদলের অপ্রত্যাশিত সাফল্যের সূচক। মহীশূর ও গুজরাটে সংগঠন কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও শাসক কংগ্রেস বিস্ময়করূপে সফল হয়েছে। মহীশূরে তারা ২৭টি আসনের সব কয়টি দখল করেছে এবং গুজরাটের ২৪টি আসনের এগারটি দখল করে এই রাজ্যে সংগঠন কংগ্রেসের সমান আসনের অংশীদার হয়েছে। মধ্য প্রদেশে অবশ্য শাসক কংগ্রেস রাজন্তদের প্রভাব খর্ব করে অন্যান্য রাজ্যের মত ঝড়ের বেগে জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই রাজ্যে ৩৭টি আসনের ২১টি তারা দখল করেছে বটে ( নির্বাচনের পূর্বে তাদের আসন ছিল ২০ ) ; জনসঙ্ঘ এই রাজ্যে পূর্বের ৯টি আসনকে ১১টি আসনে বর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তার প্রবল স্রোতের সামনে অন্যান্য দলগুলি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের আসন সংখ্যা পূর্বের ২৪টিতে রাখতে কোনো রকম সক্ষম হয়েছে। ইন্দিরা-দাক্ষিণ্যে তারা পশ্চিম বঙ্গে তিনটি, কেরলে ৩টি, তামিলনাড়ুতে ৪টি, পাঞ্জাবে ২টি, অন্ধ্রে ১টি উত্তর প্রদেশে ৩টি আসন রক্ষা করতে পেরেছে। বিহারেও তারা পাঁচটি আসন পেয়েছে। মার্ক্সবাদীরা কেরলে পূর্বের ৯টির জায়গায় এবার ২টি আসন পেয়েছে, এবার পশ্চিম বঙ্গে পূর্বেকার ৫টিকে বাড়িয়ে তারা ২০টি করেছে, এ ছাড়া তাদের ত্রিপুরায় দুইটি এবং অন্ধ্রে ১টি আসন দখলে এসেছে। পূর্বেকার লোকসভায় জনসঙ্ঘের ৩৫টি কমে ২২টি হয়েছে, এর

মধ্যে মধ্য প্রদেশেই ১১টি, উত্তরপ্রদেশে ১১টির পরিবর্তে ৪টি। সংগঠন কংগ্রেস-এর নির্বাচনের পূর্বের ৬৫টি কমে ১৬তে নেমে এসেছে। তার মধ্যে গুজরাটে ১১টি, উত্তর প্রদেশে মাত্র ১টি, বিহারে ৩টি, তামিল নাড়ুতে ১টি। সারা দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু ছাড়া আর কোথাও তাদের আসন নাই। এস, এস, পির পুরাতন ১৭টি আসন ৩-এ নেমেছে, পি, এস, পির ১৫টি আসন ২-এ; ডি, এম, কের একটি আসন কমে ২৩ হয়েছে এবং স্বতন্ত্রের ৪৪ এসে নেমেছে ৮-এ। আগের লোকসভায় সংগঠন-কংগ্রেস বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছিল, তারপর ছিল স্বতন্ত্র ও জনসংঘ। এবার কোনো বিরোধী দল থাকবেনা, এবং বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে মার্ক্সবাদীদের স্থান প্রথম, দ্বিতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, তৃতীয় ডি, এম, কে। তারপর অন্যান্য দলগোষ্ঠি। প্রাক্তন লোকসভার বহু নেতা পরাজিত হয়েছেন। ফলে যারা লোকসভাকে উত্তপ্ত করে রাখতেন তাদের অনেককেই এই লোকসভায় দেখা যাবে না। সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি, পি, এস, পি, প্রভৃতি দলের অনেক উচ্চকণ্ঠ নেতা ধরাশায়ী হয়েছেন এবং সমাজবাদী আন্দোলনের ভিত্তিমূলও এই নির্বাচনে প্রবলভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সমাজবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে যারা সমাজবাদী নীতি ও কর্মপন্থার নৈষ্ঠিক 'অনুসরণের চাইতে আত্মপ্রচার, ও সুবিধাবাদসর্বস্ব রাজনীতিকেই তাদের উপজীব্য করে তুলেছিলেন তাদের সব চাইতে বেশী। এই নির্বাচন থেকে সমাজবাদী দুইটি দল শিক্ষা গ্রহণ করে যদি সমাজবাদী সংগ্রামকে সংহত করতে অগ্রসর হয়ে, এই বিপর্যয়ের মধ্যেও সমাজবাদী আন্দোলন তার লক্ষ্যপথ খুঁজে পাবে। অন্যথায় সমাজবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে শাসক কংগ্রেসের শিবিরে আত্ম-বিলোপের পরিণতির দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবে।

সংগঠন-কংগ্রেসের নিছক ইন্দিরা-বিরোধী নীতি নির্বাচকমণ্ডলী চূড়ান্তভাবে বর্জন করেছে। তেমনি বর্জন করেছে জনসঙ্ঘদের ও স্বতন্ত্রদলের নেতিবাচক কর্মসূচীকে। এই দুইটি দল স্থিতস্বার্থের পরিপোষকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং নির্বাচকমণ্ডলী তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগকে প্রবলভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতীয়তাবাদের আড়ালে শোষকদের সমর্থনের ভূমিকায় নির্দ্দিষ্ট কোনো দল জনসাধারণের সমর্থন পাবে না, এই নির্বাচনের রায় সেকথাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে।

এবারকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিপুল জয়ের সাফল্যও যেমন এনে দিয়েছে, তেমনি ইন্দিরা গান্ধীকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে। দারিদ্র্যের সমস্যা, বেকারের সমস্যা, উৎপাদনের সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ভূমিসমস্যা দূরীকরণের পথে অতঃপর আর দলের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিবন্ধকের অজুহাত দেখিয়ে নিজের অক্ষমতা ঢাকবার সুযোগ তার রইলো না। কোনো চমক দিয়েও,—যেমন রাজন্যভাতা বিলোপ কিম্বা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ,—দেশের যে অগণিত বঞ্চিত মানুষের মনে সুদিনের আশা জাগানো হয়েছে, তাদের ভুলিয়ে রাখা যাবে না। ১৯৪২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্তও লোকসভায় কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সর্বতোমুখে ব্যর্থতার পরিণতিতে প্রবল কংগ্রেস-বিরোধিতার আঘাতে জর্জরিত হয়ে কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে এবং কংগ্রেস পর পর নির্বাচনে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আগামী এক বছরের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, ইন্দিরা গান্ধীর বর্তমান সাফল্যও সেই পরিণতির দিকে গড়িয়ে যাবে কিনা না জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের মধ্য দিয়ে জাতীয়মানসে নূতন প্রত্যয় সৃষ্টি করে ইন্দিরা গান্ধী সত্যিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় যোজনা করবেন।

## স্বাধীন 'বাংলা দেশ'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় 'বাংলা-

[ শেষাংশ ৮৬৭ পৃষ্ঠায় ]

# প্রাচীন ভারতের সাম্যবাদ

[ পঞ্চসহস্র হইতে সহস্রাধিক বর্ষপর্যন্ত ]

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম হইতে পবিত্র তারা
নহে ছোট বড় কেহ।
সন্তান তারা দেবী ধরণীর
দিব্য তাদের দেহ।

ভেদ করি বাধা তোলে তারা শির।
ঠেলিয়া বিঘ্ন শত।
আসুক সহজে, মোর কাছে সবে
মানুষ যেখানে যত।

ঋগ্বেদ, ৫।৫৯।৬।

পতিত যেজন তুলে নাও তারে
পুনরায় ব্রাহ্মণ!
পাপেতে নিরত যেজন সতত,
মরে গেছে যার মন;
ব্রাহ্মণ! তারে করো জীবন্ত।
করো পুন সচেতন।

ঋগ্বেদ, ১০।৩৭।১; অথর্ববেদ; ৪।৩।১।

মিত্রের চোখে দেখুক আমারে
যত প্রাণী আছে ভবে!
মিত্রের চোখে দেখছি তাদের
দেখছি আমরা সবে।

যজুর্বেদ (বাজসনেয়ি সংহিতা) ৩৬।১৮।

সকলে তোমরা হও সহৃদয়
বিদ্বেষহীন প্রাণ।
সদ্যপ্রসূত বৎস ও গাভী
যথা দোঁহাকার টান,
তেমনি হউক তোমাদের প্রীতি
হৃদিমন একতান।

অথর্ববেদ, ৩।৩০।১।

অমৃতরূপে রয়েছি আমি
বিশ্বভরে জলে স্থলে।
সর্বজীবে, সর্বদেহে
অন্তরীক্ষে, ধরণীতলে!

অযুত চোখে, অযুত কানে
অযুত পদে, অযুত করে—
দেখছি আমি, শুনছি আমি
চলছি আমি কর্ম করে !

দিগ্বিদিকে রয়েছি আমি,
নানান্ রূপে, নানান বেশে ;
পুরুষরূপে, স্ত্রীলোকরূপে,
রয়েছি আমি সর্বদেশে !

কুমার আমি, কুমারী আমি,
বৃদ্ধ আমি যষ্টি করে—
পুত্র কন্যা জনক আমি,
জননী আমি সর্বঘরে !

অথর্ববেদ, ১৯।৫১।১ ; ও
১০।১৮।২৭-২৮ ছান্দোগ্য-
উপনিষৎ, ৭।২৫।১।

এই দেহ দেবালয়
আছে সেথা শিব।
ভগবান বল কারে ?
ভগবান জীব !

মৈত্রেয়োপনিষৎ, ২।১।

অতিগুহ্য ব্রহ্ম যাহা,
তোমাদের বলিতেছি তাই :
মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর
নাই নাই ! কোনোকিছু নাই !

মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩০০।২০।

কহিছেন ভগবান—মন দিয়া শোনো !
সে—বচনে অবিশ্বাস কোরো না কখনো !—
"সকল প্রাণীর মাঝে করি যে বসতি,
অবজ্ঞা করিয়া ভক্ত সে-আমার প্রতি,
করে কাষ্ঠে, পাষাণেতে পূজা-বিড়ম্বনা !
ভস্মে ঢালে ঘৃত ! তারে যজ্ঞ বলিব না !
অতএব প্রাণী মাঝে রহেছি যে-আমি
করো তাহাদের পূজা, মোর পূজাকামী !
হও সমদর্শী, সবে করহ সম্মান !
করো সেবা প্রাণীগণে ! করো সবে দান !

ভাগবতপুরাণ, ৩।২৯।২১, ২২, ২৭।

রয়েছেন তথাগত প্রাণীরূপ ধরি।
কেমনে তাঁহারে আমি অনাদর করি ?

শিক্ষাসমুচ্চয়, অধ্যায় ৭, পৃ, ১৫৬।
মৈত্রীসাধনা, পৃ, ৬। ১

যুগে যুগে সঞ্চিত যা মহাপুণ্যরাশি,
সুগতের পূজা আর তাঁরে অর্থদান।
সত্য ইহা, জেনো সবে, সব দেয় নাশি,
প্রাণীদ্বেষ, প্রাণীহিংসা, প্রাণী-অবমান !

বোধিচর্যাবতার, ৬।১। মৈত্রীসাধনা, পৃঃ ৬।

দহিছে যাহার দেহ, প্রাণ ওষ্ঠাগত,
লোভনীয় ল'ভেও সে খুশি নাহি নয়।
প্রাণীরে বেদনা দিলে তথা, তথাগত,
কিছুতেই তুষ্ট নাহি হন দয়াময় !

শিক্ষাসমুচ্চয়, অধ্যায় ৭, পৃঃ ১৫৬।
মৈত্রীসাধনা, পৃঃ ৭।

দেবমুনিগণ সকলেই প্রায়
নীরবে বিজন বনে,
ধ্যানে রয়েছেন ; অপরের কথা
জাগে না তাঁদের মনে।

আর্ত যাহারা সমুখে আমার
চক্ষে অশ্রুরেখা—
তাহাদের ছাড়ি কোথা যাব আমি
চাহিনা মুক্তি একা।

বালক প্রহ্লাদ
ভাগবত পুরাণ, ৭।৯।৪৩-৪৫।

যাঁহারা আমারে কলঙ্ক দেন
যাঁহারা করেন ক্ষতি,
যাঁহারা হানেন বিদ্রূপবাণ
সতত আমার প্রতি,
তাঁহাদের তরে জাগে প্রার্থনা
অন্তরে নিরবধি ;
তাঁরা যেন পান তথাগত পদ,
তাঁরা যেন পান বোধি !

বোধিচর্যাবতার, ৩।১৬।
মৈত্রীসাধনা, পৃঃ ১৩।

শত্রু কোথায় ? অনিষ্টকারী
কাহারে বলিছ তুমি ?
আমি তো দেখেছি মিত্রে পূর্ণ
রয়েছে মর্তভূমি !

ক্রোধজয়ী ওই ক্ষমা অনুপমা
যাহা আনি দেয় বোধি—
কেমনে লভিতে ? ক্রোধের কারণ
অরি না রহিত যদি ?

লভিবারে যাহা করি প্রযত্ন
সতত সেবিয়া ধর্মে—
তাই দিল মোরে শত্রু আমার
আঘাত হানিয়া মর্মে !

ধর্মেরই মত তিনিও পূজ্য
করি বন্দনা তাঁর।
শত্রুর বেশে বন্ধু আমার
খোলে মুক্তির দ্বার !

বোধিচর্যবতার, ৬।১০০-১১১।
মৈত্রীসাধনা, পৃঃ ২১-২৩

আতুর জনের শিয়রে বসিয়া
জাগিব রাতি,
অনাথের নাথ সাথীহারাদের
হইব সাথী !

দীন দরিদ্র নিঃস্ব জনের
করিব সেবা,
সংসারে হায় অসহায়দের
দেখিছে কেবা।
ধনসম্পদ, ভোগসামগ্রী,
তুচ্ছ দেহ,
সব নিয়ে মোর, সুখী হয় যদি
কোথাও কেহ ;

তাই দিব তারে। দুঃখীর মুখে
ফোটাতে হাসি,
বিতরিব মোর সঞ্চিত যত
কুশল-রাশি।

চাহিনা রাজ্য, চাহি না স্বর্গ,
মুক্তি, মোক্ষ,
চাই হতে শুধু আর্তজনের
সেবায় দক্ষ।

যতদিন রবে বিপুল বিশ্বে
একটি প্রাণী,
বার বার আমি লভিব জন্ম
ধন্য মানি।

সেবায় আমার ফোটে যবে কারো
মুখেতে হাসি,
হৃদয়ে আমার উথলে তখন
যে-সুখরাশি,

তাই তো অমৃত! স্বাদলভি তার
জীবন ধন্য!
তার কাছে ওই তুচ্ছ মোক্ষ,
অতি নগণ্য!

বোধিচর্যাবতার, ৩।৭—১০; ৮।১০৮
শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ, ১৭; পৃ, ৩৬০। মৈত্রীসাধনা, পৃ, ১১ ১৩;
ঐ, পৃ, ৩১।

## ঐতিহাসিক

### অশোক শিলালিপি : ২৬০-২৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

সকল মানুষ সন্তান মোর!
আত্মজ তরে যথা,
সবাকারি তরে অন্তরে মোর
সেইরূপ ব্যাকুলতা।

ঐহিক আর পারলৌকিক
সুখসম্পদ যত,
লভে যাতে তারা, তারি তরে মোর
প্রযত্ন অবিরত।

অশোক শিলালিপি, নং ১৬
পৃথক কলিঙ্গ শিলালেখ, নং ২

ইজিপ্ট সিরিয়া ম্যাসিডোনিয়ায়
সেবক-সেবিকাগণ,
দেশে দেশে আর দিকে দিকে গড়ি
আরোগ্য নিকেতন,

আতুর, অনাথ, দীন দুঃখীরে
সেবিতেছে প্রাণ দিয়া—
মূক প্রাণীদেরো প্রতি করুণায়
পূর্ণ তাদের হিয়া। *

অশোক শিলালিপি, নং ২

১। মৈত্রীসাধনা ( English version : The Path of Universal Love ) pub. Visva-Bharati.

২। প্রাচীনকালে, ঐতিহাসিক যুগে, ২৬০-২৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, সম্রাট অশোকই প্রথম পৃথিবীতে, পশুদের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করেন। বিদেশে, অন্য রাজার রাজ্যে, নিজের অর্থে, অশোক মানুষ এবং ইতর প্রাণীর জন্য, হাসপাতাল এবং ঔষধের জন্য নানারূপ গাছগাছড়ার বাগান (Botanic Garden) তৈরী করান।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস

ধারাবাহিক রচনা

# জাগরণ ও বিস্ফোরণ

১৯১৪

কালীচরণ ঘোষ

সংক্ষিপ্তসার ঃ

কোমাগোটা মারু,—ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র

## 'কোমাগাটা মারু'

ভারতের সমুদ্র-উপকূলে অসংখ্য জাহাজ এসেছে, গেছে। তাদের নাম আজ আর কারও মনে নেই থাকার কথাও নয়। কিন্তু কোমাগাটা মারু নামটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল জ্বল জ্বল করতে থাকবে। ঘটনাটা বাংলার সঙ্গে বিশেষ জড়িত নয়, কিন্তু তার যাত্রীদের রক্তে বাংলার মাটি লাল হয়েছিল একদিন এবং সে দিনটি প্রতি বাঙ্গালী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

ভারতীয় বিদ্রোহ প্রচেষ্টা মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আমেরিকা, মধ্য ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে অল্প বিস্তর মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তার বহিঃপ্রকাশের প্রদীপ্ত চিহ্ন ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়ে গেছে। কানাডা এই প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। সেখানে শিখ অধিবাসী ছিল অনেক এবং বহু বৎসর ধ'রে। তাদের মধ্যে গদর-বীজ উপ্ত হয়েছে আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে। গদর পার্টির প্রচার কানাডার শিখদের মধ্যেও বিপ্লবী মন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল, আর এর সঙ্গে যোগ হয়ে ছিল কানাডা সরকারের আচরণ। কেবল ভারতীয় হওয়ার অপরাধে তাদের নানারকম অবিচার অসম্মানকর আচরণ সহ্য করতে হ'তো, এবং তার সঙ্গে জাতি হিসাবে নিকৃষ্টতার অপবাদ দিয়ে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ছিল কানাডা সরকারের বিশেষ পরিচয়।

উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ক্রমে চেপে আসতে থাকে এবং কোন ভারতীয় আর কানাডায় যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেরূপ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। কানাডা-বাসী শিখরা এর প্রতিকারের চেষ্টা করে বিফল হলে ভ্যাঙ্কুভারে তারা দলবদ্ধ হ'য়ে যথাবিধি ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়।

কানাডা সরকার একটু বিচলিত হয়ে শিখদের দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য নানারূপ অসাধু পন্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করে। এধারে ১৯১০ মে ৯-ই তারা এক আইন পাশ করে যার ফলে প্রত্যেক কানাডা বাসে অভিলাষী ভারতীয়কে দুই শত টাকা নগদ সঙ্গে করে আসতে হবে এবং তার নিজ দেশ থেকে এক টিকিটে সটান জাহাজে এসে কানাডা পৌঁছুতে হবে, পথে এসব যাত্রীর ওঠা-নামা চলবে না।

সকলেই জানতো যে ভারতবর্ষ থেকে ছেড়ে কোনো জাহাজ পথে না থেমে সরাসরি কানাডা যায় না।

পাঞ্জাবীরা তখন বিশেষ অসুবিধায় পড়ে যায়। এ সময় মালয় সিঙ্গাপুরের ধনী কন্ট্রাকটর গুরদিৎ সিং 'কোমাগাটা মারু' নামে এক জাপানী জাহাজ কিনে তাতে ৩৭২ জন যাত্রী নিয়ে কানাডায় ভ্যাঙ্কুভারে পৌঁছান ১৯১৪ মে ২৩-এ। কানাডা গভর্ণমেণ্ট নিজ সৈন্য দিয়ে জাহাজখানা ঘিরে ফেলে যাত্রীদের অবতরণে বাধা দেয়। প্রায় দু মাস এ অবস্থায় থাকার পর কানাডা থেকে জবরদস্তি জাহাজকে কানাডার বন্দর ত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা হয়। দুই দলের সংঘর্ষ তখন অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। শিখদের মারমুখী ভাব দেখে শক্তের ভক্ত কানাডা সরকার খাদ্য পানীয় দিয়ে কোমাগাটা মারুকে ভিন্নস্থানে যাবার অনুরোধ জানায়।

জাহাজ ভ্যাঙ্কুভার ছাড়ে ১৯১৪ জুলাই ২৩ এ। পরে পরে হংকং, কোবে, ইয়োকোহামা প্রভৃতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কোথাও যাত্রী নামতে দেওয়া হ'লো না। ভয়ানক গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠলে ইংরেজ পরিচালিত ভারত সরকার, জাহাজকে কলকাতা আসার নির্দেশ জারি করে।

পথে নানা ঝামেলা কাটিয়ে জাহাজ (১৯১৪) সেপ্টেম্বর ২৮-এ বজ্ বজ্ এসে পৌঁছায়। যাত্রীদের বোঝানো হয় যে সেখান থেকে সবাইকে ট্রেনে করে পাঞ্জাবে পাঠানো হবে। এ সংবাদে গুরদিৎ সিং বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং কারণ জানবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেও বিফল হন। যাত্রীদের জাহাজ থেকে শান্তভাবে নামবার আদেশ দেওয়া হয়। ইতিকর্ত্তব্য নির্ধারণে যখন যাত্রীরা আলোচনায় ব্যস্ত তখন একজন ইংরেজ অফিসার জাহাজে উঠে ১৫ মিনিটের মধ্যে সকলকে জাহাজ খালি করে দিতে বলে। স্বেচ্ছায় না নামলে বুলেট চলবে সে কথা বলতে ভুল হয়নি। প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার করে সময়টা স্মরণ করিয়ে দেওয়া চল্‌লো এবং নির্দ্দিষ্ট কালের শেষে ধাক্কা দিয়ে লাথি মেরে নামাবার চেষ্টা চলতে লাগলো। জাহাজ থেকে জেটিতে যাবার জন্য মাত্র একখানা তক্তা পাতা ছিল, যার সাহায্যে প্রায় তিন শত লোককে নামতে হবে।

ক্ষুধার্ত্ত, বিভ্রান্ত যাত্রীদের বলা হল যে তাদের স্পেশ্যাল ট্রেনে পাঞ্জাব পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে একখানা ট্রেনে জন ষাটেক যাত্রীকে তুলে দিতেই ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন রওনা হয়ে গেল। অবশিষ্ট যাত্রীরা এর কারণ বুঝতে না পেরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে সে সুযোগও পেল না। আদেশ পাওয়া মাত্র দণ্ডায়মান একখানা ট্রেনে না উঠলে বন্দুকের গুলির সাহায্যে সে কাজে বাধ্য করা হবে সে কথাও বলা হ'ল। যখন গভর্ণমেণ্টের হুকুম দেখতে চেয়ে তারা কিছুই পেল না তখন তারা হেঁটে কলকাতার দিকে রওনা হয়ে পড়ে।

উপস্থিত কর্ম্মকর্তাদের সঙ্গে যে পুলিশ ছিল তাদের সংখ্যা ছিল কম সুতরাং বাধা দিতে চেষ্টা করার সুযোগ ছিল না।

বড় রাস্তা ধরে প্রায় তিন মাইল চলে যাবার পর অপর দিক থেকে তিন চারখানা মোটর গাড়ী আসতে দেখা যায়। একজন নিজেকে লাটের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের বজ্ বজ্ ষ্টেশনে ফিরে যেতে বলে এবং তাদের বক্তব্য শুনে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন। মোটরে করে শস্ত্রধারী বহু পুলিশ ইতিমধ্যে এসে পড়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট একটু সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছেন।

সেপ্টেম্বর ২৯-এ রাত্রের অন্ধকার নেমে গেছে; তখন ৭-টা। সকল যাত্রীরা ঘুরে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের কথা উত্থাপন আর না করে তৎক্ষণাৎ আবার জাহাজে চড়ার হুকুম জারি হ'ল। তারা কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ট্রেনে উঠতে চাইলে বলপূর্ব্বক তাদের জাহাজে চড়াবার চেষ্টা চলে। তখন শিখরা মরিয়া হয়ে উঠেছে; জাহাজে তারা ফিরে যাবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (Donald) ডোনাল্ডের হুকুমে

গুলি ছুটতে শুরু হয়ে গেল। নিরস্ত্র শিখ যাত্রী। দু-তিন জনের কাছে স্বল্প পাল্লার পিস্তল ছিল মাত্র। অসমশক্তির দ্বন্দ্ব। বলা বাহুল্য শিখেদের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেছিল কুড়িজন এবং তাদের প্রত্যেকেই আঠ। দুজনকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বাকী আঠারো জন ছিলেন :

অমৃতসর :

(১) টেহল সিং ( হাঁসপাতালে মৃত্যু ), (২) শিব সিং, (৩) ক্কর সিং, (৪) লছমন সিং ও (৫) শিব্বন সিং ;

ফিরোজপুর :

(১) ভগৎ সিং, (২) নারায়ণ সিং (৩) ক্কর সিং ( পিতা শের সিং ) ;

জলন্ধর :

(১) অর্জ্জুন সিং, (২) ইন্দর সিং, (৩) রতন সিং ;

লুধিয়ানা :

(১) ঈশার সিং (২) মস্তা সিং ;

ফরিদকোট :

(১) কাকুর সিং, (২) কেহর সিং ;

নাভা :

ভজন সিং ;

পাতিয়ালা :

চন্নন সিং।

বে-পরোয়া গুলি চালায় শিখ যাত্রীরা ইতঃস্তত: পালিয়ে যেতে থাকে। অন্ধকারে জলে ডুবে মৃত্যু হয় ইন্দ্র সিং-এর।

টেহল সিং ছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় আটজনকে হাঁসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। কড়া পুলিস পাহারায় তারা হাঁসপাতালেই বন্দী ছিল।

দু'শ জনের বেশী লোককে গ্রেপ্তার করা হয় সন্ত-গৃহীত ( যুদ্ধের অজুহাতে ) "অবাঞ্ছিত লোকের অনুপ্রবেশ" আইনে। জন ত্রিশের কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি ; তন্মধ্যে স্বয়ং গুরদিত সিং অন্যতম।

শিখেদের শত্রু পক্ষে ধরে লুধিয়ানা পুলিশের মাল সিং ও সাওয়ান সিং ; কলকাতা পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ইষ্টউড (Eastwood) ; এবং ই. বি. রেলের লোকো সুপারিণটেণ্ডেণ্ট লোম্যাক্স (Lomax).

চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আর ছোটলাট উইলিয়ম ডিউক ছিলেন রয়াল ফিউজিলিয়ার্সের ক্যাপ্টেন মুর (Moore) সমাবিভ্যহারে। মোট লাঠি ও বেয়নেটধারী পুলিশ ও খাস মিলিটারী মিলিয়ে ছিল শ' দুয়ের ওপর। রয়াল ফিউজিলিয়ার্স সৈন্য দল একাই ছিল দেড়শ'।

পলায়মান যাত্রীদের অবস্থা অবর্ণণীয়। রাত্রির অন্ধকারের কিছু সুযোগ থাকলেও সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। ক্ষুধাতৃষ্ণা পথশ্রম উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত প্রাণ। তা হলে কি হয়? ব্রিটিশ রাজশক্তি পরাজয় স্বীকার করতে পারে না। তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলে হতভাগা ভারতকে বশে রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভারত থেকে বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে কামানের খোরাক সৈন্য যোগাড় করতে হবে ; যোগান দিতে হবে। আরও হবে যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সেনাদলের খাদ্য সরবরাহ করতে। সুতরাং ইংরেজ তখন নির্ম্মম নিষ্ঠুর। সুবিচার তখন 'শিকেয়' উঠিয়ে রাখতে হয়েছে।

কিন্তু এর ফল গুরুতর হয়েছিল বলে মনে করাই সঙ্গত। বাংলা ত বটেই, পাঞ্জাব আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। আমেরিকা কানাডা, দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত শিখদের মন তিক্ত হয়ে ওঠে। পরের ক'লৎসর ধরে সেই বেদনা বিক্ষোভ রূপ নেয় বিরাট গুপ্ত ষড়যন্ত্রে, সংগ্রামের প্রস্তুতিতে। এ সম্বন্ধে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদ শেষ করা যাক্—

"The movement which was largely related to economic, social and religious matters veered towards the political in an intensified form. The **Komagata Maru** incident from the beginning to the end will be reckoned as one of those that accelerated the pace of the

freedom movement in India. (The Roll of Honour, p. 269).

## ভারত জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্র

ইউরোপে প্রলয় আরম্ভ করবার আগে জার্মাণ সরকার খোঁজ করছিল জার্মাণীতে অবস্থিত ইংরেজের শত্রুদের। ভারতে ইংরেজ বিদ্বেষ তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সুতরাং সে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং যারা বিপ্লব ঘটাতে পারে বলে মনে হয়েছে তাদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর খবর রেখে চলেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের অন্ততঃ তিন চার বছর আগে থেকেই জার্ম্মাণী এবিষয়ে তার মনোভাব গোপন করতে চেষ্টা করেনি। ভারতের জাতীয় শান্ত আন্দোলন স্বায়ত্তশাসনের দাবী অতিক্রম করে পূর্ণ স্বাধীনতাকামী হ'য়ে ওঠা সম্ভব এবং বঙ্গবিভাগের পর থেকে হিংসাত্মক পথে পরিচালিত হ'তে পারে সে লক্ষণ বাংলায় আগেই অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। তখন জার্মাণীর প্রধান চেষ্টা হ'লো যাতে এ হিসাবে ভারতবর্ষের অন্ততঃ কিছু সংখ্যক বিপ্লববাদীদের সঙ্গে হাত মেলানো সম্ভব হ'তে পারে। মিলনোন্মুখ দুই ধারা যখন এক হবার চেষ্টায় লেগেছে তখন একটিই স্রোতস্বিনী হবে। যখন জার্ম্মাণী আর বাঙালী বিপ্লবীরা মিলতে চাইলেন তখন দুই পক্ষই সুযোগ ও অতি আগ্রহশীল লোকের অভাব হলো না।

গভর্ণমেণ্ট পর্য্যায়ে না হোক নিজস্ব চেষ্টায় ভারতীয় বিপ্লবীরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মাণীর সহযোগিতায় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বাইরে থেকে শক্তিদান করা। এখানে গদর পার্টি ও গদর পত্রিকার উদ্ভব। সংক্ষেপে হলেও স্বতন্ত্রভাবে সে পরিচয় পরে দেওয়া আছে।

জার্মাণীতে যেসব ভারতীয় ছাত্র ছিল তাদের প্রত্যেকের আচার আচরণ, মতিগতি সম্বন্ধে জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখতো। ইংরেজ বিদ্বেষ যাদের প্রবল ছিল এবং প্রকাশ্যভাবে অপরকে সে মনোভাব জানাতো তাদের ওপর লক্ষ্য ছিল বেশী। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে জার্ম্মাণ উচ্চমহলের কর্ম্মচারীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পারস্পরিক সাহায্য সম্বন্ধে একটা প্রারম্ভিক আলোচনা হয়। গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯১৪ সালের শেষ দিকটায়। জার্মাণ পররাষ্ট্র বিভাগের পক্ষে (Wiesendonk) উইজেনডঙ্ক আলোচনা শুরু করেন। তার সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিব জিমারম্যান (Zimmerman) এর সাক্ষাৎ সংযোগ ছিল। হরদয়াল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চম্পকরমণ পিলাই এবং এম, পি, প্রভাকর মিলে এক সংগঠন গড়ে তোলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হেরম্বলাল গুপ্ত, আব্দুল হাফিজ আসেন সিকাগো থেকে; আর বয়কতুল্লা আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর উপকূল (Pacific Coast) থেকে। সর্ব্ব প্রথমে সংস্থার নাম হয় বার্লিণ-ভারত সমিতি (Berlin-India Committee). এখন থেকে Zimmerman, Wiesendonk ও Oppenheim প্রায়ই সব অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করতেন। সর্ত্ত ছিল, যে অর্থ সাহায্য জার্ম্মাণীর কাছে পাওয়া যাবে সেটা ঋণ, ভারত স্বাধীন হলে পরিশোধ করবে; ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে জার্ম্মাণীকে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে; জার্ম্মাণ ইঞ্জিনীয়ার ও প্রফেসর এসে এই দুই ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হবে। যুদ্ধ যখন বেধে গেল তখন ভারতীয়রা জার্ম্মাণীতে বসে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রচার করবার অনুমতি ও সুযোগ সুবিধা চেয়ে প্রস্তাব জানায়। অবশ্য সম্মতি পেতে বিলম্ব হয় না। জার্ম্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে কাজ চালাবার কথা। (Indian Independence League) ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ নামে সংস্থা গঠিত হয় এবং বিশিষ্ট কয়েকটি ছাত্র তামিলনাদ, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বাঙলা প্রভৃতি প্রদেশের যুবকই তাতে স্থান পায়। কেবল প্রচারপত্র দ্বারা ইংরেজে

বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া ও ভারতীয় বন্দী সৈন্যের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করে ইংরেজের শত্রু হিসাবে পরিণত করা এবং অর্থ সাহায্য দিয়ে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত দেশ থেকে পত্র পত্রিকা ছাপিয়ে চারিদিকে পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর বহুলাংশে এসে পড়ে।

এ সবের বাইরে বাঙালী বিপ্লবীরা আরও একটা নতুন পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন। প্রয়োজনের তুলনায় রডা থেকে প্রাপ্ত চোরাই পিস্তলের সংখ্যা নিতান্ত কম। প্রথম দিকেই প্রচুর টোটা পুলিশের হস্তগত হয়, পরে বেশ কয়েকটা পিস্তলও। তা ছাড়া মনে হয়েছে এখানে ওখানে দু চারটে খুন খারাপি করে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হতে অনন্তকাল লেগে যাবে। চাই-ব্যাপক অভ্যুত্থান আর সেজন্য অবশ্য প্রয়োজন প্রচুর আগ্নেয়অস্ত্র।

বিপ্লবী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর জার্ম্মাণ সমর-প্রধানরা আমেরিকা, দূর প্রাচ্যে অবস্থিত তাদের ঘাঁটি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যাংকক, ব্যাটেভিয়া, সাংহাই প্রভৃতি কেন্দ্রে বাঙালী বিপ্লবীরা নির্দ্দিষ্ট জার্ম্মাণ অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সংবাদ পান যে অস্ত্রাদি ভারতে প্রেরণের সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। সমস্ত জাহাজ ভারত অভিমুখে শীঘ্র যাত্রা করবার ব্যবস্থা গৃহীত হ'চ্ছে। এর উপর জার্ম্মাণীর নিকট থেকে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং সাংহাই ও অন্যান্য স্থান থেকে ভারতে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

বাঙালী ও তাদের ভিন্ন প্রদেশীয় সঙ্গীরা জার্ম্মাণীর ভিতরে বসে বাঙলায় বিপ্লবীদের অবারিত কার্য্যকলাপ সমর্থন করতে লাগলেন। আর এদিকে মাত্র কয়েকটি নির্ভীক যুবক নানা উপায়ে ভারত ত্যাগ করে দূর প্রাচ্যে অবস্থিত জার্ম্মাণ কনসাল প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে বিপ্লবী সংক্রান্ত কার্যের ক্ষেত্র প্রসারে যত্নবান হন।

এর পিছনে ছিল যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তিনি চাংড়িপোতার ফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীকে দূর প্রাচ্যে পাঠাবার চিন্তা করতে লাগলেন। ফণীন্দ্র যতীন্দ্রনাথের কাছে ১৯০৭-০৮ সালে দার্জ্জিলিঙে অপর দু'তিনটি যুবকের সঙ্গে গীতার পাঠ গ্রহণ করতেন। ফণীন্দ্র অত দূরে একা যেতে ভয় পান। তখন নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যকে পাঠানো হয় ১৯১৫ এপ্রিলে। নরেন্দ্র সেখানে ব্যাটাভিয়া ও সাংহাইয়ে জার্ম্মাণ কনসালের সঙ্গে দেখা করেন। ফিরে এসে সব খবর পৌঁছে দিয়ে আগষ্ট মাসে ফণীন্দ্রকে নিয়ে যান। এবারও প্রায় সব কাজই একা নরেনকে করতে হয়। ফরাসী হোটেলে থাকাকালে নভেম্বরের শেষে ফণীন্দ্র গ্রেপ্তার হন। তখন তাঁর নাম ছিল উইলিয়ম আর্থার পাইন ( William Arthur Pyne).

এদিকে বাঙলায় বসে স্বতন্ত্রভাবে অস্ত্র সংগ্রহ প্রচেষ্টা চলতে থাকে কলকেতায় শ্রমজীবী সমবায়কে কেন্দ্র করে। তার সঙ্গে জার্ম্মাণ মাল এসে পড়ার সম্ভাবনায় তোড়জোড় খুব জোরাল হয়ে উঠলো। হাতে যথাপরিমাণ অস্ত্র এসে পড়লে বিপ্লবীরা সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

জার্ম্মাণী তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে পূর্ণভাবে। ম্যাভেরিক নামে তৈলবাহী জাহাজ খানা জার্ম্মাণী কিনে নিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে খালি পাঠিয়ে দেয়। গন্য স্থান হ'ল জাভা। পথে অপর এক অস্ত্রবাহী জাহাজ এ্যানি-লারসেন ( Annie Larsen ) থেকে প্রচুর দূর-পাল্লার বন্দুক, টোটা প্রভৃতি তুলে নিয়ে ভারতের দিকে রহনা হবার ব্যবস্থা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে দুই জাহাজের মিলন ঘটেনি। শূন্য ম্যাভেরিক জাভার দিকে চলে যায়। অপর দিকে এ্যানি লারসেন ওয়াসিংটন পৌঁছুলে সেখানকার কাষ্টমস্ অফিসাররা জাহাজ পরীক্ষা করতে উঠে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করে এবং সে সকল অস্ত্র আমেরিকান সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে।

তৃতীয় জাহাজ "হেন্‌রী এস্" (Henry S) ম্যানিলা থেকে সাংহাই যাচ্ছিল বন্দুক গোলা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। সে জাহাজ খানিও এখানে ধরা পড়ে যায় এবং সব মাল পত্র আমেরিকার পক্ষে দখল নেওয়া হয়। মোট কথা এক খানি জাহাজও ভারতবর্ষে পৌঁছুতে পারে নি।

কেবল আগ্নেয়াস্ত্র নয়। বাঙ্গলায় পাঠাবার জন্য জার্ম্মাণী বেশ টাকা বিপ্লবীদের হাতে দিয়েছে। জাভা, মালয়, পেনাঙ প্রভৃতি অঞ্চলে ঘোরাফেরার জন্য খরচ পত্র জার্ম্মাণী যুগিয়েছে। শ্রমজীবী সমবায় ছাড়া নং ৪১ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স নামে টাকা নেবার এক কেন্দ্র খোলা হয়। ১৯১৫ জুলাই হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স পাঁচ শ' টাকা জমা দিয়ে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক-এ এক একাউণ্ট খোলে। ইতিমধ্যে খবর এসে যায় ব্যাটাভিয়ায় হংকং এ্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্ক থেকে টেলিগ্রাফিক নির্দ্দেশে আট হাজার গিল্ডার (guilder)-এর বদলি মূল্য হিসাবে দশ হাজার টাকা কলকেতার সাংহাই ব্যাঙ্কে ১৯১৫ জুলাই ১৩-ই থেকে এসে পড়ে আছে। সুতরাং এই টাকা উঠিয়ে নেবার জন্য ব্যাঙ্কে নিজ নামে একাউণ্ট খোলা প্রয়োজন। এ ছাড়া ব্যাটাভিয়ার চ্যাটার্ড ব্যাঙ্ক তাদের কলকেতা কেন্দ্রে আগষ্ট ১৪-ই সংবাদ পাঠায় যে হ্যারী এ্যাণ্ড সন্সকে যেন ন'হাজার ছ'শ টাকা দেওয়া হয়।

এই ভাবে হঠাৎ বিদেশ থেকে টাকা আসার কারণ বোঝাবার চেষ্টায় বলা হয় হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স ব্যাটাভিয়ার নং ৫১ ও ৫২ হাই (High) ষ্ট্রীটে অবস্থিত কে. এ. জে. চোটিরমল (Chotirmull) কোম্পানীর সঙ্গে চিনি আমদানী ও দেশীয় পণ্য রপ্তানীর কারবার করছে। টাকা আসার সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সতর্ক হ'য়ে ওঠে এবং ১৯১৫ আগষ্ট ৭-ই হ্যারী এ্যাণ্ড সন্স-এর অফিস খানাতল্লাসীর পর হরিকুমার চক্রবর্ত্তী ও তাঁর দুই কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। ব্যাঙ্কে অবশিষ্ট টাকা ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

জার্ম্মাণ জাহাজ প্রচুর মাল নিয়ে আসবে। ভারতীয় কোনও প্রকাশ্য বন্দরে মাল খালাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং সুন্দরবনের রায় মঙ্গল, হাতিয়া (সন্দীপ), বালেশ্বর (ওড়িষ্যা) প্রভৃতি স্থানে সে সকল নামাবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। তখন নানা কেন্দ্রে হাতিয়ার ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ ইংরেজের শক্ত ঘাঁটি সকল আক্রমণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখা হয়। কোন্ বিপ্লবীর ওপর কি কাজের ভার পড়বে, কে কোন্ ঘাঁটি আক্রমণের নেতৃত্ব করবে সবিস্তারে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

জলপথে মালপত্র আনার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তারা অন্য পন্থার কথাও ভেবেছিলেন ও সে পরিকল্পনাকে কাজে প্রয়োগের কথাও স্থির করেছিলেন। এক চীনাকে তাঁরা আবিষ্কার করেন। কিছু মোটা টাকা, ১২৯-টি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও ২০,৮৩০ কার্ত্তুজ পাঠিয়ে দেন। কলকেতার নং ৯০।২-এ হ্যারিসন (মহাত্মা গান্ধী) রোডে অবস্থিত শ্রমজীবী সমবায়ের কর্ম্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পৌঁছে দেবার কথা। পদে পদে ব্যর্থতা এসে সব ভণ্ডুল করে ছাড়ছে; এখানেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। প্রতিপক্ষের তৎপরতায় চীনা গ্রেপ্তার হ'য়ে যান এবং সব মালপত্র টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিপদের ওপর বিপদ। এক বাঙ্গালী কর্ম্মী ধরা পড়েন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত কাগজ পত্রের মধ্যে বহু নাম ও ঠিকানা পুলিশ জেনে ফেলে।

অসাফল্যের সম্ভাবনা সব সময়েই বর্ত্তমান। অচিন্ত্যনীয় বিপদ ফাঁদ পেতে বসে আছে। আবার জেনে শুনে তারই মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার লোকও পাওয়া গেছে। আজ তাঁদের সকলের নাম পাবার উপায় নেই। জার্ম্মাণীতে বসে যাঁরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে Berlin-Indian Committee, Indian National Party, পরে Indian Independence League গড়েছিলেন তাঁদের কথা বিস্তারিত লেখার সুযোগের অভাব; তাই সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। বাঙ্গলার

বসে ঘাঁটি আগলাচ্ছেন ও পরামর্শ দিচ্ছেন - যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবাসুপোপাল মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, প্রভৃতি।

এ সম্পর্কে ভারতের বাইরে দূর প্রাচ্যে যাঁরা জার্ম্মাণীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা মালপত্র পাঠাবার বিলি-ব্যবস্থায় লিপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ( সি, মার্টিন ), জিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, হেরম্ব লাল গুপ্ত, অবনী মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপতি মজুমদার, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ফণীন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী ও মাত্র অপর দু'একজন। জার্ম্মাণীতে যাঁরা বসে সর্ব্বপ্রথমে এ অসম্ভব কাজে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দিকে এসে পড়েন তারকনাথ দাস, ধীরেন সরকার, ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য্য জিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, পারাঞ্জপে, সুখধাকর, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রমথ নাথ দত্ত ( দাউদ আলি খাঁ ), কারসাম্পা প্রভৃতি আরও কয়েক জন।

এখানে যাঁকে ভারত জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম বলি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে তাঁর কথা সংক্ষেপে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি।

## ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

যুবক ভোলানাথ প্রথমে কি ভাবে এসে জুটেছিলেন [illegible]র সন্ধান আজ আর পাবার উপায় নেই। তবে জানা [illegible] ছিল তারকেশ্বরে টেগরা গ্রামে। সিমলা [illegible]কে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর [illegible]জনে এক পথের পথিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ [illegible]গে ভোলানাথ শ্যাম ( থাইল্যাণ্ড )-এর [illegible] যাত্রা করেন। যুদ্ধ যখন বেঁধে গেল [illegible]নিকট কানাঘুষা কথা এসে পৌঁচেছিল যে [illegible] স্থাপন করতে পারলে জার্ম্মাণীর কাছ থেকে ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

ভোলানাথ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেননি; মায়ের বন্ধন শৃঙ্খল যেন তাঁকেই পিষ্ট করছিল। তিনি ধীরে ধীরে জার্ম্মাণ ঘাঁটিতে যাওয়া আসা শুরু করেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হলে তিনি আশ্বাস পান যে কোন দায়িত্বপূর্ণ লোক ভার নিলে কাজ দ্রুত অগ্রসর হবে।

ভোলানাথ রওনা দিয়ে ( ১৯১৪ ) নভেম্বর মাসে এসে কলকাতা পৌঁছুলেন। ডিসেম্বর ১-লা থেকে ৮ নং বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের এক মেসে আশ্রয় নেন। সেখানে ১৯১৫ মার্চ ৩১-এ পর্য্যন্ত ছিলেন। পরে অন্যত্র যান। ফেব্রুয়ারী ৬-ই নরেন্দ্র ও আর একজনের সঙ্গে ২নং হিদাম মুদি লেন ( অতুল কৃষ্ণ ঘোষের বাসা ) থেকে তাঁদের বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

দূর প্রাচ্যে জার্ম্মাণদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি জানতে পারেন যে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য সম্বন্ধে অন্য সূত্রে ও কথাবার্ত্তা চলছে জোর। ভোলানাথের কাজ হলো আর একটা যোগসূত্র স্থাপন এবং কলকাতায় ফিরে নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা।

নরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভোলানাথ সব অবস্থা জ্ঞাপন করলে সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ, অতুলকৃষ্ণ প্রভৃতিকে নিয়ে এক আলোচনা সভা বসে। সেখানে দুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম একটি কেন্দ্র যার ভিতর দিয়ে চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে, ( স্থায়ী এ্যাণ্ড সন্স )। আর দ্বিতীয়তঃ যতীন্দ্রনাথের নির্বাচিত একজন কর্মী তখনই শ্যাম, সাংলাই, ব্যাটেভিয়ার দিকে রওনা হয়ে যাবে। এ কার্য্যের ভার নরেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

কলকাতায় পাকা লোক রইলেন অনেক, কিন্তু করাসী, চন্দননগর দিয়ে যেমন অনেক গোপন কাজ পরিচালনার সুবিধা হ'তো, বিশেষ করে পলাতকদের আশ্রয় নিয়ে,

সেইভাবে ভারতে ওলন্দাজ অধিকৃত অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করতে পারলে ইংরেজের শ্যেন দৃষ্টি কিছুটা এড়ানো যেতে পারে, এই ভেবে বিনয়ভূষণ দত্ত ও ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯১৫ ডিসেম্বর ১৭-ই কলকাতা ছেড়ে রওনা দেন।

বিনয়ের কাছে শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কোড ও সাইফার (code and cypher) এ পত্রাদি প্রেরণের সঙ্কেত দিয়েছিলেন। কলকাতায় ঠিকানা ছিল: সুধীর কুমার ঘোষ, ৭৬-১ নং আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা। এটি ডাঃ শ্রীযাদুগোপালের গোপন ঠিকানা। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিনয়ভূষণ গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং সেইসূত্রে বহু সংবাদ পুলিশের হস্তগত হয়।

ভোলানাথের জন্য খোঁজাখুঁজি চলতে থাকে। আগষ্ট ১৪-ই তাঁর গ্রামের বাড়ী খানাতল্লাসী হয়। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় না, এদিকে ভোলানাথ গোয়া পৌঁচেছেন। সেখান থেকে মার্টিনের সংবাদ পাবার চেষ্টায় এক টেলিগ্রাম করে বসেন। মার্টিনের নাম তখন পুলিশের কাছে বিশেষ-ভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁকে কে এই টেলিগ্রাম করেছে, সেই খোঁজ করতে গিয়ে গোয়ায় ভোলানাথের সন্ধান পায়। তখন ইংরেজ সরকার গোয়া কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিয়ে ভোলানাথের গ্রেপ্তার সাধন করে। আরও চাপে পড়ে তারা গোয়ার রাজ্যসীমা পার করে তাঁকে ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। পৈশাচিক অত্যাচার চলতে থাকে গোপন তথ্য আদায় করবার আশায়। একটি কথাও পাওয়া গেল না ভোলানাথের মুখ থেকে। কিন্তু পুলিশ তাতে নিরস্ত হয়নি। অত্যাচার উত্তরোত্তর বেড়েই চলতে লাগলো। হয় তো শেষ পর্য্যন্ত সহনশক্তির বাইরে গিয়ে পড়ে কিছু প্রকাশ করে ফেলতে হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি পরিধানের ধুতির সাহায্যে পায়খানার মধ্যে ১৯১৬ জানুয়ারী ২৭-২৮ রাত্রে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যু সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি চলে আসছে সেটা ভারত সরকারের প্রচারিত তথ্য। সাধারণ লোকে অন্য ধারণা করে আছে যেটা ইংরেজ শাসনের পক্ষে কলঙ্কময়।

# সুভাষবাদ

পবিত্রকুমার ঘোষ

## বিপ্লবের তত্ত্ব

বিশ শতকে ভ্লাডিমির ইলিচ লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে। লেনিন কার্ল মার্ক্সের মতো পুঁথিজীবী ছিলেন না, কার্যক্ষেত্রে বিপ্লব করেছেন; ফলে বাস্তবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বেশি এবং তাঁর তত্ত্ব সে কারণেই স্পষ্ট, নিরেট ও অন্তত একটা বিশেষ কালে ও দেশে প্রয়োগযোগ্য ছিল। স্তালিন লেনিনের তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন: অনেকের ধারণা রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদের প্রয়োগেই লেনিনবাদের বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ধারণা অংশত সত্য। লেনিন রাশিয়ায় মার্ক্সবাদ প্রয়োগ করেছিলেন সত্য কিন্তু তিনি তাঁর সমকালীন বিশ্বকে নিজস্ব পদ্ধতিতে বিচার করেছিলেন আর লেনিনবাদের বৈশিষ্ট্য তার ফলেই বিকশিত হয়। লেনিন মার্ক্সবাদের বৈপ্লবিক দিকগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন (Lenin did indeed restore the revolutionary content of Marxism—Stalin), কিন্তু মার্ক্সবাদ থেকে এক ধাপ এগিয়েও তিনি গিয়েছিলেন। স্তালিনের ভাষায়:

> Leninism not only restored Marxism, but also took a step forward, developing Marxism further under the conditions of capitalism and of the class struggle of the proletariat.
>
> J. V. Stalin: Problems of Leninism, Foreign Languages Publishing House, Moscow 1947, Edition, p. 14.

মার্ক্সের সময়ও ক্যাপিটালিজম ছিল, বস্তুত তিনি তারই বিশ্লেষণ করে তাঁর সুবিখ্যাত 'ক্যাপিটাল' বইটি লিখেছেন। তাহলে লেনিনের সময় সেই ক্যাপিটালিজমের নতুন বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছিল, যার জন্য লেনিনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে চিন্তা করতে হয়েছিল?

স্তালিন এই প্রশ্নের জবাবে বলছেন যে ক্যাপিটালিজম যখন সাম্রাজ্যবাদ রূপে (imperialism) বিকাশ লাভ করে লেনিন তখনকার মানুষ, আর মার্ক্স প্রাক-সাম্রাজ্যবাদের যুগের মানুষ;—দুই ভিন্ন বিশ্বপরিস্থিতির জাতক হবার ফলে লেনিনকে নতুন করে বিশ্বের গতিধারা সম্পর্কে ভাবতে হয়েছিল, আর তারই ফলে মার্ক্সবাদের পরও আবার লেনিনবাদের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

লেনিন নিজে ধনতন্ত্রের চরম বিকাশ বলতে বুঝিয়েছিলেন —এবং যে অবস্থাটা মার্ক্স প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেননি— ব্যক্তিগত ও স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির ভিত্তি পালটে যখন মনোপলি, ট্রাস্ট, কার্টেল ইত্যাদির পর্য্যায় আসে। ধনতন্ত্র তখন অর্থনৈতিক সংগঠনের দিক থেকে গোটা বিশ্বকে ব্যেপে ধরে; একটা দেশের বা কয়েকটি দেশের বা সারা দুনিয়ার কাঁচা মাল, খনিজ পদার্থ, ইত্যাদির একত্রে হিসাব করা হয়, বিশ্বের বাজারকে একসঙ্গে হিসাবে

ধরা হয়, ও দাসবাজার মনোপলি প্রতিষ্ঠানগুলি সেই ভিত্তিতে উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। দক্ষ শ্রমিকদের মনোপলি প্রতিষ্ঠানরা নিয়োগ করে, সেরা ইঞ্জিনিয়ারদেরও তারাই নিয়োগ করে: পরিবহন ব্যবস্থা, যেমন আমেরিকায় রেলওয়ে, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় জাহাজ, (হায়, লেনিন বিমান পরিবহনের বর্তমান উন্নত রূপ কল্পনাও করেননি)—ইত্যাদিও তারাই দখল করে নেয়। ফলে:

Capitalism, in its imperialist stage, arrives at the threshold of the widest socialisation of production. It drags, as it were, the capitalists, against their will and understanding, into some new social order, which is transitional, leading from complete freedom of competition to complete socialisation.

(V. I. Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism, প্রথম অধ্যায়)

এই স্তরে উৎপাদন সামাজিক হয়ে ওঠে, টেকনিকাল আবিষ্কার ও উন্নতিগুলি পর্যন্ত—তা পুঁজিপতিরা চাক বা না চাক। কিন্তু উৎপাদনের ফল ভোগ করে ব্যক্তি। অর্থাৎ মালিকানা থেকে যায় ব্যক্তির হাতে। ফলে একটা অন্তঃসংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে এই ব্যবস্থায়—উৎপাদন সামাজিক, অথচ মালিকানা ব্যক্তিগত হলে সেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, চাপসৃষ্টি ইত্যাদি নানারকম কৌশলের আশ্রয় নিতেই হয়। তাতে শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে, সঙ্কট দেখা দেয়, আবার সর্ববিধ সঙ্কট মনোপলিতন্ত্রকে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠা দেয়:

Crises of every kind—economic crises most frequently, but not only these—in their turn increase very considerably the tendency towards concentration and monopoly.—(লেনিন, উক্ত গ্রন্থ, উক্ত অধ্যায়)।

লেনিন দেখিয়েছেন, মনোপলিতন্ত্রকে আরও মজবুত প্রতিষ্ঠা দিয়েছে আধুনিক ব্যাঙ্কিং। ব্যাঙ্কগুলি হয়ে উঠেছে মূলধনের মালিক ও তারা শিল্পপতি বা উদ্যোগীকে মূলধন ধার দেয় বলে মূলধন আধুনিক যুগে পরিণত হয়েছে ফাইনান্স ক্যাপিটাল তথা লগ্নী পুঁজিতে। লগ্নী পুঁজি সমগ্র সমাজকে মনোপলিষ্ট বা একচেটিয়া কারবারীদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দেয়:

Finance capital, concentrated in a few hands and exercising a virtual monopoly, exacts enormous and ever-increasing profits from the floating of companies, issuance of stock, state loans, etc., tightens the grip of financial oligarchies and levies tribute on the whole of society for the benefit of monopolists.

(উক্ত গ্রন্থ, তৃতীয় অধ্যায়)

এই মনোপলিষ্টরা জাতীয় সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শোষণ করার পর বিদেশে পুঁজি রপ্তানী সুরু করে। ধনতন্ত্রের গোড়ার যুগে বিদেশে মাল রপ্তানী করার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়, ধনতন্ত্রের শেষ যুগে রপ্তানী করা হয় পুঁজি। যে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত পুঁজি একটা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে জমে ওঠে, বিদেশে, অনগ্রসর দেশগুলিতে, যেখানে মূলধন-গঠন প্রায় হয় না, যেখানে পুঁজির একান্ত অভাব, মজুরী কম, জমি ও কাঁচামাল সস্তা,—সেখানে ঐ উদ্বৃত্ত পুঁজি রপ্তানী করলে পুঁজির মালিকরা বেশি লাভ পায়। রেল লাইন তথা আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগে বহু অনগ্রসর দেশ আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের বৃত্তের মধ্যে এসে পড়েছে, দেখা দিয়েছে সেই সব দেশে শিল্প বিকাশের সুযোগ। উন্নত দেশগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগের

ক্ষেত্র ও অবকাশ কমে যাওয়ায় ও কৃষি ব্যবস্থাকে পুঁজিপতিরা অবহেলা করে বলে তারা বিদেশে উদ্বৃত্ত পুঁজি রপ্তানী করে। যে সব দেশ পুঁজি রপ্তানী করে তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; তারা গোটা বিশ্বকে নিজেদের প্রভাবাধীন করে; এবং কোন দেশে বিশ্বের কোন অংশকে নিজেদের প্রভাবসীমার মধ্যে আনবে সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় আসে;—অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি দেশ, লেনিন তাঁর সময়ে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিলেন—গোটা বিশ্বকে নিজেদের শোষণক্ষেত্র রূপে ভাগ করে নেয়। আর তখনই ধনতন্ত্রবাদ পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদে।

লেনিনের মতে ১৮৮০ সাল নাগাদ স্বাধীন ও অবাধ প্রতিযোগিতাভিত্তিক অর্থনীতি মনোপলি-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তখন থেকেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী সাম্রাজ্য বিস্তারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনোপলিতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক দেখিয়ে লেনিন একথাও বলেছেন যে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ মনীষীরা ব্রিটিশ কলোনীগুলিকে স্বাধীন করে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং ভারতের মতো উপনিবেশকে ইংলণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর বোঝাস্বরূপ তাঁরা মনে করতেন। কিন্তু ১৮৮০ সালের পর ইংরেজ মনীষীদের চিন্তাধারা পালটে [illegible] এবং তাঁরা আরও উপনিবেশ দখলের পক্ষপাতী হয়ে [illegible] উপনিবেশ শোষণই তখন ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির

[illegible]ম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রের মনোপলি is the monopoly stage of [illegible] গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায়) কিন্তু এটাই ধনতন্ত্রের [illegible]ন উৎপাদনের সমাজীকরণের ফলে [illegible] বেমানান হয়ে পড়ছে এবং এই উৎপাদন এমন [illegible] পৌঁছেছে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি-সম্পর্কের খোলসটি ভেঙে চুরমার হয়ে পড়বে। সাম্রাজ্যবাদ তাই আসলে ধনতন্ত্রের অবসানেরও যুগ বটে।

স্তালিন বলছেন যে লেনিন ধনতন্ত্রের উচ্চতম পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব লক্ষ্য করে তার ভিতর তিনটি অন্তর্দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করেছিলেন, আর ঐ তিনটি অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই ধনতন্ত্র সমূলে উৎপাটিত হবে বলে মনে করেছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনটি হল: (১) পুঁজি ও শ্রমিকের মধ্যে, (২) বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে (৩) সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও উপনিবেশগুলির মধ্যে। এই তিনটি অন্তর্দ্বন্দ্ব যুগপৎ সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবকে আসন্ন করে তুলেছে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় লেনিনের এই তত্ত্ব তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যা কিছুই উক্ত হত সে সময় তাই আমাদের আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু লেনিনের গোটা বিপ্লবতত্ত্বই যে ইয়োরোপীয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভাবিত সেটা স্পষ্টই ধরা পড়ে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা থেকে। কারণ ইয়োরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছে সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে, উপনিবেশ শোষণের টাকায়—নইলে ধনতন্ত্র ও টেকনোলজিকাল উন্নতি কোনোটাই সম্ভব হতনা। লেনিন ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতে দিয়েছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন গঠিত হয় তখন ধনতন্ত্র ইংলণ্ডে বিকাশ লাভ করেনি। এমনকি মূলধনের অভাবে কয়েকটি যান্ত্রিক আবিষ্কারের সামাজিক প্রয়োগও তখন সম্ভব হয়নি। ইংলণ্ড তখন ভারত কেন, একা বাংলার তুলনায়ই দরিদ্র ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা ও ভারত শোষণের দ্বার যখন অবারিত হল তখন সেই টাকায় ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার সামাজিক প্রয়োগের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে, বাণিজ্যতন্ত্র রূপান্তরিত হতে পেরেছে ধনতন্ত্রে। সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া ইয়োরোপের ধনতন্ত্র বিকশিত হত না। এশিয়া ও

আফ্রিকা শোষণের টাকা ইয়োরোপে আমদানী না হলে আধুনিক বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর জন্মই হতনা ইয়োরোপ। আশ্চর্য এই যে পশ্চিমী জগতের মনীষীরা এই সরল সত্যটা কার্যক্ষেত্রে বেমালুম চেপে যায়। ধনতান্ত্রিক যুগ ও তার সমৃদ্ধি ইয়োরোপে সম্ভব হত না যদি না লর্ড ক্লাইভ ও তাঁর সমগোত্রীয়রা ভারত ও এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তেন ও সাম্রাজ্য পত্তনের দুর্দম বাসনা পোষণ করতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিল ও নথিপত্র দেখলে দেখা যায় যে ক্লাইভেরও আগে ভারতে ধীরে ধীরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কোম্পানীর পরিচালকরা স্থাপন করেছিলেন সচেতনভাবে। ফরাসী ও ওলন্দাজরাও সে চেষ্টা করেছিলেন।

লেনিনের বিপ্লবতত্ত্ব বিশ্ব পরিস্থিতির ভুল ব্যাখ্যার ওপর দাঁড়ানোর ফলে বিশ শতকের বিশ্ববিপ্লবের মূল সত্য এই তত্ত্বে ধরা পড়েনি। মার্ক্স যে ভুল করেছিলেন, লেনিনের ভুলও তদনুরূপ। মার্ক্স তাঁর সমকালে বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে জার্মানীতে বিপ্লব হবে। তা হয়নি। লেনিন রুশবিপ্লবের নয় মাস আগেও এক ছাত্র সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে বিপ্লব আসবে ইয়োরোপের কোনো দেশে, তবে তাঁর জীবদ্দশায় নয়।

লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব অনুসারে রাশিয়ার বিপ্লব আসেনি। রাশিয়া ছিল সাম্রাজ্যবাদের শিকার, তার কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি ছিল দুর্বল, জনসাধারণ নিরক্ষর ও অত্যন্ত দরিদ্র। যুদ্ধের ফলে শাসকগোষ্ঠীও পরাভবের গ্লানি অর্জিত হয়েছিল, ভেঙে পড়েছিল শাসন কাঠামো। রাশিয়ার ১৯১৭ সালের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ১৯১৬ সালেও লেনিন কল্পনা করতে পারেননি, এবং তাঁর বিপ্লবতত্ত্বে ঐ পরিস্থিতির কোনো আভাসই নেই।

চীনের বিপ্লব মার্ক্সীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের দ্বারা আদৌ ব্যাখ্যা করা যায় না, যে কারণে স্তালিন শেষ পর্যন্ত চীনের বিপ্লবকে ভুল বুঝে গিয়েছেন। চীনও ছিল সাম্রাজ্যবাদের শিকার, যদিও রাশিয়ার মতো সেও ছিল স্বাধীন। চীনে ধনতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত ও দরিদ্র কৃষক শ্রেণী উত্তপ্ত হয়েছে, বিক্ষুব্ধ হয়েছে, কিন্তু তারা বিদ্রোহ করেছে একটা ভালো, দরদী শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসাবার উদ্দেশ্যে। চিয়াং কাইশেককেও তারা সুযোগ দিয়েছিল, তাঁর শাসনও তারা হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করে নিত, যদি জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসা থাকত, দেশে একটা ন্যায়পূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারতেন। সর্বোপরি চীনা জনগণ লড়েছে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য। চীনা বিপ্লব জাতীয়তাবাদী যুদ্ধের মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করেছে।

বিশ শতকে কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লব হয়নি—বরং ইয়োরোপে ও আমেরিকায় বিপ্লববাদীদের কোনো প্রভাবই নেই। বিপ্লব হয়েছে কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে শাসনতন্ত্র ঘুণে ধরা ছিল এবং অসৎ, অক্ষম, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের বিরুদ্ধে জনচিত্তে ব্যাপক ক্ষোভ হয়েছিল। বিপ্লব সফল হয়েছে একমাত্র সেই দেশে যেখানে বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে শাসকগোষ্ঠী ক্লান্ত, জীর্ণ ও পরাভূত হয়েছে। বিশ শতকে বৃহত্তম সংগ্রাম হয়েছে জাতীয় মুক্তির জন্য, জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ;—ভারতবর্ষে, চীনে ও এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের তুলনায় রুশ [illegible] প্রায় ছেলেখেলার সমান। সংগ্রামের তী[illegible] ও স্থায়িত্বের দিক থেকে বিচার করলে [illegible] ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ অনেক বড় ঐতিহা[illegible] ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলেও। রুশবি[illegible] ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ কোনোটাই শিথিলমূল হয়নি। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াই সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকা নিয়েছে ধনতন্ত্রকে আমদানী করেছে ধীরে ধীরে। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার ফলে এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ প্রায় অপসারিত

হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী দেশ ইংলণ্ড হারিয়েছে তার উপনিবেশগুলি; জার্মানী ও ফ্রান্সও এখন সাম্রাজ্য-হারা। সাম্রাজ্য হারাবার ফলেই ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে আঘাত পড়ছে ক্রমশ তীব্রভাবে। ইয়োরোপ এখন দ্বিধাবিভক্ত; একভাগ পরিণত হয়েছে রাশিয়ান উপনিবেশে, আর এক ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন। বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু আজ আর রাশিয়ায় নেই, ইয়োরোপে বা আমেরিকায়ও নেই। বিশ্ববিপ্লবের নতুন অধ্যায় সুরু হবে এশিয়ায়, সম্ভবত ভারতে। কারণ বিশ্বসভ্যতার নতুন বিকাশের মন্ত্র ভারতই শোনাতে পারে।

কারণ ভারতবর্ষ ইতিহাসের প্রত্যূষ কাল থেকে কোনোদিন সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হয়নি। সাম্রাজ্য ভারতে গড়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু বৃহত্তর ভারতের সীমাকে কোনো সম্রাটই অস্ত্রবলের দ্বারা লঙ্ঘন করেননি। ভারতে পৌরাণিক যুগ থেকে যেসব সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটেছে সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতকে এক শাসনের অধীনে আনা, কিংবা একটি সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্র গড়ে তোলা। সেই সাম্রাজ্যেও প্রতিটি অঞ্চল বা রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা ছিল, কেন্দ্রের চাপে অঙ্গরাজ্যগুলির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে গুঁড়ো করে দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি আনুগত্যের অধিক কিছু কোনোদিন দাবী করা [illegible]। তার কারণ ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা [illegible]র রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা নয়, একটা [illegible] লৌহ খাঁচার মধ্যে পুরে দিয়েও নয়; [illegible]নির্ভর করা হয়েছিল সংস্কৃতি, সাহিত্য, [illegible]পর: সকলের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে [illegible] ও উদ্দেশ্যগত একটা একমুখিনতা সৃষ্টি [illegible]তীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলে, জীবনের প্রতি [illegible]। মিল বিকশিত করে। রাজনীতিকে [illegible] হয়েছিল জাতীয় ঐক্যের বিরোধী শক্তিগুলিকে সংযত ও কতকটা রজ্জুবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

ভারতবর্ষের বাইরে যে সকল দেশ ও জাতি অবস্থিত ভারত তাদের কাছে পাঠিয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার দূত। ভারতীয় সম্রাটরা দস্যুর মতো পররাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েননি। ভারতীয় সভ্যতার কাছ থেকে আলো নিয়ে ইয়োরোপে সভ্যতার দীপ জ্বালানো হয়েছিল প্রথম গ্রীসে। দীর্ঘকাল ধরে গ্রীক সভ্যতাও সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ইয়োরোপীয় মানসিকতা ক্রমে আত্ম-প্রাধান্য বিস্তার করল,—গ্রীস বেরিয়ে পড়ল বিশ্বজয়ের বাসনায়। সেই আঘাত আর্য ভারতের তট পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। গ্রীসের পতনের পর তার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রূপে আবির্ভূত রোম আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে ও স্থায়ী নিয়মকানুনের অধীনে স্থাপন করে সাম্রাজ্য। তারপর তাদের কাছ থেকে সাম্রাজ্যবাদে দীক্ষা নিয়েছে জার্মান, রুশ, ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রভৃতিরা। সাম্রাজ্যবাদ এক অর্থে ইয়োরোপীয়দেরই অবদান। মুসলমানরাও সাম্রাজ্যবাদের আদর্শে দীক্ষা পেয়েছিল রোমান সাম্রাজ্য ও ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের কাছ থেকে।

কার্ল মার্ক্স ইতিহাসে শ্রেণী সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু জাতির বিরুদ্ধে জাতির সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করতে ভুলে গেছেন কারণ তাঁর সমকালে ইয়োরোপ অন্যান্য মহাদেশের জাতিগুলিকে নিষ্পিষ্ট করেই গর্বোদ্ধত ভঙ্গী নিয়ে সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলেছিল। ইয়োরোপের সেই সভ্যতার জয়গানে কার্ল মার্ক্স ছিলেন মুখর। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মার্ক্স পোষণ করতেন গভীর অবজ্ঞা ও ও ঘৃণা, বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়:

I share not the opinion of those who believe in a golden age of Hindustan...this

stagnatory, and vegetative life, this passive sort of existence evoked on the other part, in contradistinction, wild, aimless, unbounded forces of destruction and rendered murder itself a religious rite in Hindustan·· (Selected Works, vol I, The British Rule in India )—মার্ক্সের মতে ভারতের ধর্ম হল পশুর পূজা, যেমন হনুমান ও গরুর পূজা। ভারতের অধ্যাত্মবাদ হল a religion of sensualist exuberance and a religion of self-torturing asceticism ( উক্ত প্রবন্ধ ) ভারতবর্ষের সভ্যতা সম্পর্কে এই হচ্ছে কার্ল মার্ক্সের মূল্যায়ন,—যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি উনিশ শতকের গোড়ায় প্রচলিত ইয়োরোপীয় মাপকাঠিতেই যে কোনো সভ্যতার বিচার করতেন; এবং তৎকালীন ইয়োরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁর ছিল না বিন্দুমাত্র সংশয়। কমিউনিষ্ট ইসতেহারের গোড়াতেই তিনি নিঃসংশয়চিত্তে ঘোষণা করেছেন যে উনিশ শতকের ইয়োরোপের বুর্জোয়া সভ্যতা বিশ্বের আর সকল সভ্যতাকে ম্লান করে দিয়েছে,—It has accomplished wonders far surpassing Egyptian Pyramids, Roman aqueducts and Gothic Cathedrals; it has conducted expeditions that put in the shade all former Exoduses and crusades. ( Communist Manifesto, অধ্যায় ১ ) আধুনিক ইয়োরোপীয় বুর্জোয়া সভ্যতা সম্পর্কে মার্ক্সের মোহান্ধতা ছিল বলেই তিনি ঐ সভ্যতার ভিতর সঙ্কটের সূত্রগুলি আবিষ্কার করে তার সমাধানের সাহায্যে ঐ পশ্চিমী সভ্যতাকেই তিনি চিরজীবী করতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বের আর কোন সভ্যতার মর্মবাণী তাঁর অনুদার হৃদয়ে সাড়া জাগায়নি বলে তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি মানবইতিহাসের প্রকৃত সমস্যাগুলির পাঠোদ্ধার করতে নিয়োজিত হয়নি। মার্ক্স ছিলেন একান্তভাবে পশ্চিমী সভ্যতার ধারক ও বাহক ও ব্যাখ্যাতা; প্রাচ্য সভ্যতার নয়। মানবজাতির কথা কোনো দিন তিনি ভাবেননি, ভেবেছেন তাঁর স্বজাতীয় পশ্চিমীগোষ্ঠীর কথা। তাই তাঁর সমাধি পার্শ্বে ভাষণ দিতে গিয়ে এঙ্গেলস সত্যই বলেছিলেন, যে তাঁর মৃত্যুতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রলিতারিয়েত শ্রেণীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ( Selected Works, vol 2, মস্কো ৫৫ সাল সংস্করণ, পৃঃ ১৬৭ ) গোটা মানবজাতির কথা এঙ্গেলস ভুলেও মুখে আনেননি।

উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রচারক ও সংস্কারকের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থাই বিশেষ মনঃপীড়ার কারণ ছিল, এশিয়া-আফ্রিকার সাত কোটি নিষ্পিষ্ট মানুষের সমস্যা নয়। ইতিহাসের চাকা ঠিক কিভাবে চলছে সে সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত বোধ তাই অপরিহার্য ছিল। সেই চাকা এশিয়া ও আফ্রিকাকে শ্মশান করে দিয়ে সকল ধনসম্পদ নিয়ে চলেছে বিশ্বের পশ্চিম প্রান্তে এই সরল সত্যটি বোঝার দায় ইয়োরোপীয় মনীষী ও বিপ্লবীদের ছিলনা, যেমন ছিল দাদাভাই নৌরজী বা রমেশ-চন্দ্র দত্তের। ইতিহাসের মূল ব্যাধিটা সাম্রাজ্যবাদ, জাতির দ্বারা জাতির নিপীড়ন; শ্রেণী সংগ্রামও কোনোদিন মিটতে পারেনা যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে। কারণ সাম্রাজ্য শোষণের টাকাতেই একটা সমাজ নিজের শ্রমিক শ্রেণী সন্তুষ্ট রাখতে সক্ষম হয়। পররাজ্য[illegible] সভ্যতাকেও আলোর সাজে সাজিয়ে [illegible] জাতিনাশী মনুষ্যত্ববিনাশী পরলোভী দাম্ভিক সভ্য[illegible] আছে যত অনিষ্টের বীজ, শতাব্দীর পর শতাব্দী [illegible] বীজকে লালন পালন করার ফলেই আজও মানবসভ্য[illegible] একটা নীতির ভিত্তিতে, মানবতার ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে দাঁড়াতে শেখেনি। তথাকথিত শ্রেণী সংগ্রাম যে পরজাতি শোষণের টাকার রসে ডুবিয়ে দেওয়া যায় লেনিনও সেকথা

পূর্বের আলোচিত পুস্তকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে বিপ্লব ছাড়া আর কোনো পথই খোলা নেই।

মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মানবসভ্যতার জটিল সমস্যা নির্ণয়ে ব্যর্থই হয়েছে, কারণ সভ্যতার গোড়ার ব্যাধিটা সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিধির মধ্যে আসেনি। লেনিনের বিপ্লবতত্ত্বকেও তাই আধা-বিপ্লবতত্ত্ব বলতে হয়, বিশ্ববিপ্লবের মূল সূত্র, মূল দায়িত্ব ও কর্তব্যই তাতে উপেক্ষিত, ইয়োরোপের কয়েক কোটি শ্রমিক বা অনুন্নত রাশিয়ার কয়েক কোটি মানুষ বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের কয়েক শত কোটি মানুষের সমস্যা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বাঁচতে পারে না —মার্ক্স ও লেনিন যদিও সেটাই তাদের শিখিয়েছেন। মানব-সভ্যতার বিকাশের পক্ষে তত্ত্বগত বাধা রূপেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ উপস্থিত হয়েছে। মানুষের স্বচ্ছ, মোহমুক্ত দৃষ্টির কাছ থেকে প্রকৃত সমস্যাকে তা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত অর্ধ শত কোটি ভারতবাসীর সংগ্রামী প্রতিনিধি এবং মানবসভ্যতা সম্পর্কে মোহমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী সুভাষচন্দ্র আধুনিক সভ্যতার মূল সমস্যা ইয়োরোপীয় মনীষী ও বিপ্লবীদের চেয়ে অনেক গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। বারবার তিনি বলেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতার লড়াই মানবসভ্যতাকে [illegible] প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়াসের অপরিহার্য অঙ্গ।

[illegible]ন সারা বিশ্বে এমন এক বিপ্লব যার ফলে [illegible]র ভিত্তিতে নতুন এক মানবসভ্যতা [illegible] আগেই বলেছি মানবতন্ত্র বলতে [illegible]বাধ; ইয়োরোপে আধুনিক যুগের [illegible]ষ্ঠা পেয়েছিল, ভারতে শোষিতরূপে [illegible] কিংবা বলা যায়, ভারতের ঐতিহ্যের [illegible] মানবতন্ত্র নিহিত রয়েছে। গোটা পৃথিবীতে মানবতন্ত্রের ভিত্তিতে মানবসভ্যতা কোনোদিন গড়ে ওঠেনি, ইতিহাসে ক্ষণে ক্ষণে হয়তো কচিৎ তার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে মাত্র। বস্তুতঃ এক মানবসমাজের ভাবনাও এতদিন বিশ্বে ছিল না, এখনও যে বিশেষভাবে দানা বেঁধেছে তা নয়। কল্পনাবিলাসীরা চেয়েছেন জাতিসত্তাগুলির বিলোপ ঘটিয়ে, সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় সংস্কৃতির ওপর একটা এককেন্দ্রিক কঠোর শাসন বা বৈচিত্র্যহীন একটা সমাজ ও সংস্কৃতির প্যাটার্ন চাপিয়ে দিয়ে বিশ্বে মানব সভ্যতাকে নতুন করে গড়ে তোলা যায় না। সেটা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। সকল জাতির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও আত্ম-বিকাশের দাবীকে উদার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমেই শোষণমুক্ত, সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নহীন মানবসভ্যতা ও মানব সমাজ গড়ে তোলা যায়। সেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী থাকবে, বিভিন্ন জীবিকা ও রুচিকে আশ্রয় করে, বিভিন্ন ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের বিচিত্র তাগিদই এক একটা গোষ্ঠীর জন্ম দেবে,—সব বৃত্তি, সব রুচি, সব প্রবণতাকে গুড়িয়ে যেমন এক করে দেওয়া চলে না, তেমনি সব গোষ্ঠী ও সব শ্রেণীকে একটি মাত্র ছকে ঢালাই করে ফেলা যায় না। শ্রেণী থাকবে, কিন্তু তাদের মধ্যে থাকবে আদান প্রদান, সংযোগ ও সহাবস্থান, সংগ্রাম নয়। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব উগ্রভাবে প্রযুক্ত হলে সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা অবাস্তব ও মানুষের বিকাশ ধর্মের বিরোধী। বলা যায় যে শ্রেণী শোষণ থাকবে না, মুষ্টিমেয় কর্তৃক অধিকাংশকে পীড়ন করা রহিত হবে, সমাজে শ্রেণীগুলির মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ ভারসাম্য থাকবে। বিশ্ব প্রকৃতিতে চেতনার উল্লেষ সর্বত্র সমান নয়, সেজন্যই জীবকুলে যেমন নানা স্তরে আছে তেমনি মানবসমাজেও আছে ও থাকবে। সবাইকে মুগুর পিটিয়ে সমান করার নীতিটাই ভুল। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো দেশে সে নীতি অদ্যাবধি প্রয়োগ করাও যায়নি। সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী, কিন্তু মার্ক্স-লেনিনের মতো ইয়োরোপের মুষ্টিমেয় শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিই তাঁর বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়, গোটা মানবসমাজ ও সভ্যতার উত্তরণই তাঁর বিপ্লব প্রয়াসের লক্ষ্য। (ক্রমশঃ)

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

# সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

**সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা** কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

ধারাবাহিক আলোচনা

# সুভাষচন্দ্র ও ভারত-চিন্তা

রবি রায়

১৯২৫-এর শেষার্ধ হতে ২৭ সন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবন এক অশুভ সর্বনাশা আত্মহননের মধ্যে বিপর্যস্ত। জাতির যিনি আশা-ভরসা ছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাপ্রয়াণ করেছেন। কোটী কোটী ভারতবাসীর হৃদয়ের শ্রদ্ধের মানুষ, ঋষিতুল্য, সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক চরিত্রের মহাত্মা গান্ধী ১৯২৪ সন থেকেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে খাদি আন্দোলনে মনোনিবেশ করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে, সন্ত্রাসবাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনার দ্বারা বিপ্লবের মধ্যে স্বরাজ সম্ভাবনা স্ফুরিত হবার কোন সম্ভাবনার স্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে না। পরন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনে, বিপ্লব ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সব চেয়ে বড় কথা মনুষ্যত্বের দিক থেকে, মারাত্মক ক্ষতিকর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ভারতের দুটি বড় সম্প্রদায়ের—হিন্দু ও মুসলমান—কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে, ধর্মান্ধতা প্রচারে উন্মত্ত হয়ে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাধায়। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এদের প্ররোচনা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্বল করে। এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাংলাদেশকে আঘাত করেছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। ১৯২৬ সনের নভেম্বর মাসে সারা দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে মৈত্রী অপেক্ষা বিদ্বেষের আবহাওয়া যাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাকে দূষিত করে সেই দিকে কারো কারো লক্ষ্য ছিল। অবশ্য এই বিপদের দিনে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরও অভাব ছিল না। 'মে' ও 'জুলাই' মাসে কয়েকটি ঘটনার সৃষ্টি করে হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটানো হলে মানবতার পূজারী বহু ব্যক্তি এই সর্বনাশা হানাহানি বন্ধ করার জন্য নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই বছরেই কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিরুদ্ধে বহু নেতার ধিক্কার ধ্বনিতে মুখরিত হয়। বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবাত্মার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তার বিখ্যাত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কোরাস গানটি রচনা করে উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে সম্মেলনে পরিবেশন করেন। বাংলার দুর্ভাগ্য মানবতার শাশ্বত বাণী সেদিনের উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারেনি। কৃষ্ণনগরে কবি যখন উদ্বোধনী সঙ্গীতের মন্ত্রে দেশনেতার উদ্দেশ্যে গাইছিলেন—

হিন্দু না মুসলিম্ জিজ্ঞাসে কোন জন
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার,

ঠিক সেই মুহূর্তে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কবির শান্তির—ভালবাসার ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত করে ঐ উত্তপ্ত সম্মেলনে সাম্প্রদায়িকতার তাপ যাতে আরো বৃদ্ধি পায় এই ধরণের কিছু ইস্তাহার বিলি করা হয়।

তবে শুধু দিন যাপনের গ্লানি পদে পদে বিবেককে রক্তাক্ত, জীবনকে দুর্বিষহ এবং দেশকে কলঙ্কিত করার ইতিহাস নিয়ে ১৯২৬-২৭ সনের পরিক্রমা নয়। শত দুঃখ কষ্টের অমানিশার মধ্যেও এক সুন্দর প্রভাতের রূপালি রেখা মধ্যে মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল। সারাভারত ব্যাপী যুবসমাজ এই সময় প্রবীণের হঠকারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চারিত হয়ে উঠছিল। পাঞ্জাবের নওজোয়ান ভারত সভা, নাগপুরে যুব সত্যাগ্রহ সরকারের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করে। মান্দালয় জেল থেকে কিছুকাল আগে মুক্তি পেয়ে ( ১৬ই মে, ১৯২৭ ) সুভাষচন্দ্র এই সময় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি ও নিখিল ভারত যুব সমিতি গঠন করার কাজে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে প্রভূত সাহায্য করেন। তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ইতিপূর্বে আলোচিত নূতনের সন্ধানে সেই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। ১৯২৭ সনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নীতি অনুসৃত হয়। ১৯২৬-এর এপ্রিলে লর্ড রেডিং এর পরিবর্তে ভাইসরয় রূপে লর্ড আরউইন ভারতে আসেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৭ সনে ভারত সরকারের সঙ্গে 'সাউথ' আফ্রিকার এক চুক্তির বলে ( কেপটাউন চুক্তি ) দক্ষিণ আফ্রিকার সীমানা রক্ষণের বিলের নামে ঐখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের জোর করে তাড়াবার যে ব্যবস্থা চলছিল, তা স্থগিত রাখা হয়, অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতীয়দের আগের থেকে উচ্চহারে বোনাস দিয়ে চলে যাবার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ( দক্ষিণ আফ্রিকা ) উৎসাহ পূর্বাপেক্ষা বেশী বৈ কম ছিল না। রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্কের অবনতিতে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎপরতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই সব পরিবর্ত্তনের ধারার সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তির দুর্বলতা এবং কলকারখানার মধ্যে শ্রমিকদের অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়, 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে'র লেখক সুভাষচন্দ্র এইসব পটপরিবর্তনের ইতিবৃত্ত থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন আন্দোলন ও সমস্যার বিবরণ দেবার আগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই স্মরণীয় দুই বৎসর ( ১৯২৫-২৭ ) তাঁর কারান্তরালের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন সপ্তম অধ্যায়ে—'বর্মায় বন্দী জীবন' শিরোনামে। স্মরণ থাকতে পারে ১৯২৪ সনের ২৫ অক্টোবর ক'লকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদে কাজ করা কালীন ১৮১৮ ৩নং ধারা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গভর্ণমেণ্ট এই অমূল্য বন্দীকে খুব বেশী দিন বাংলাদেশের জেলখানায়, কেবল বাংলাদেশের জেলখানায় কেন ভারতের জেলখানায় আটক রাখতে ভরসা না পেয়ে ২৫ সনের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীসহ সুভাষচন্দ্রকে মান্দালয়ে আটক রাখার উদ্দেশ্যে বর্মাগামী জাহাজে উঠিয়ে দেয়। সুতরাং ভারতের রাজনীতিতে এই দুই বৎসর ( সামগ্রিক ভাবে ২ বৎসর ৮ মাস ) সুভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক কারণে। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে যখন দ্রুত পরিবর্তনের মুখে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা বীর সুভাষ শেষ স্বাধীন ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয়ের দুর্গে বন্দী অবস্থায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতিবিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে যাঁদের মনে করতেন তাঁদের হয় আন্দামান নয়তো বর্মার এককালের স্বাধীন রাজধানী এই মান্দালয়ে পাঠাতেন। মান্দালয়ে এই ভাবে ছ বছরের কারাবাসের দুঃসহ অভিজ্ঞতা ছিল লোকমান্য তিলকের, এখানেই অনেকগুলি দিন কাটিয়েছেন লালা লাজপৎ রায়। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গী সাথী স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ সব মহানায়কদেরই

উত্তরসূরী। সুভাষ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন লোকমান্য তিলকের হাতে লাগানো ফলন্ত লেবু গাছগুলির দিকে, শুনতেন তিলকের বন্দীদশার বিভিন্ন ঘটনাবলী। বর্মার মানুষদের আরো আপন করে পাবার জন্য তিনি এবং অন্যান্য রাজবন্দীরা বর্মী ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন ঐ জেলেরই আর এক জন ভারতীয় রাজবন্দী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় প্রায় এক বছর আগেই মান্দালয় জেলে এসেছিলেন, মান্দালয় জেলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই সুভাষচন্দ্র কয়েদীদের উন্নতিকল্পে কারা সংস্কারের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। ইতিপূর্বে 'তরুণের স্বপ্ন'-এ মান্দালয় জেল থেকে দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি আলোচনা করা কালে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বর্মার সংস্কৃতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভূত মিল এবং এখনকার অধিবাসীদের ভারত, প্রীতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বর্মার রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে আলোচনা করে এখানকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল নিবারণ করতেন। বর্মার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলের মধ্যে ১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হয়। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক বন্দীরা জেলে অক্টোবর মাসে পূজার সময় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করেন। পূজার খরচ হিসাবে বন্দীদের ১৪০ টাকা এবং জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ৫৬০ টাকা আদায় হয়। পরবর্তীকালে গভর্ণমেণ্ট ঐ টাকা মঞ্জুর না করে রাজবন্দীদের ফেরৎ দিতে বলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র, সত্যেন মিত্র, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য রাজবন্দীরা দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ঐ টাকা সরকারেরই দেয় বলে দাবী জানান। ২রা ফেব্রুয়ারী বর্মা সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে লেখা একটি পত্রে তাঁরা ভারতের কারাবিধি অনুযায়ী উল্লিখিত অর্থ প্রদানের ব্যাপারে সরকারের নারাজ হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দেন খৃষ্টান বন্দীদের বড়দিনের উৎসব উপলক্ষ্যে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সরকার ১২০০ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসবে যদি গোলমাল করা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে তাঁরা অনশন করতে বাধ্য হবেন। ঐ পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন, এস. সি. বোস, এস. সি. মিত্র, টি. সি. গাঙ্গুলী, এম-এম. ভৌমিক, এস. এম. ঘোষ, এস, সি. চক্রবর্তী এবং জে, এল, চ্যাটার্জী। যথারীতি গভর্ণমেণ্ট ঐ চিঠি বা দাবীপত্রের কোন স্বীকৃতি প্রথমে দিলেন না; দণ্ডপ্রাপ্তকারীরা তাই ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ভাগ্যক্রমে সাগরপারের এই বন্দীশালার ঘটনা ক'লকাতায় ২০ তারিখ নাগাদ পৌঁছায়। পরদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে দেশবাসী জানতে পারে মান্দালয় জেলে কয়েকজন তরুণ রাজবন্দী তাঁদের ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য অনশনরত। ২১শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা, 'HUNGER STRIKE AT MANDALAYA JAIL' এই শিরোনামে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে লেখেন, 'The detenues at Mandalaya have gone on hunger-strike. One of the causes of the hunger-strike is the Government's attitude regarding the expenses incurred by them at the time of the last Durgapuja. The detenues paid Rs. 140 out of their own pocket for such expenses and asked Government to pay Rs. 560 etc.' এই সংবাদ প্রকাশের পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের পর প্রশ্নে এবং দেশবাসীর সমালোচনায় সরকার নাজেহাল হয়ে পড়লেন।

অবশেষে বন্দীদের দাবী মেনে নেওয়া হল, গোপন সংবাদ যাতে ভবিষ্যতে আর ফাঁস না হয় সেইজন্য সরকার জেলে নানারকম কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

মান্দালয় জেলে থাকাকালীন ২৬ সনের নভেম্বর মাসে দেশের সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়। জেল থেকে রাজবন্দীদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের বন্দী সিন ফিন নেতাদের মত ভারতের রাজনৈতিক বন্দীদের কাউকে কাউকে নির্বাচনে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করা হল। এর অন্যতম উদ্দেশ্য যদি দেশবাসী এইসব বন্দীদের নির্বাচিত করেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁদের এঁদের প্রতি আস্থা আছে এবং সরকারের নীতি ভ্রান্ত। সুতরাং সরকার এঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। মান্দালয় জেলের দুইজন বন্দী সুভাষচন্দ্র ও সত্যেন মিত্রকে কংগ্রেস যথাক্রমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতের আইন সভার প্রার্থীরূপে মনোনীত করে। সত্যেন মিত্রের বিপক্ষে কোন প্রার্থী না দাঁড়ানোর ফলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র উত্তর ক'লকাতা কেন্দ্র থেকে উদারনৈতিক নেতা শ্রীযতীন বসুকে পরাস্ত করে বিজয়ী হন। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়েও মান্দালয়-বন্দীদের কারামুক্তি ঘটল না। ভারত আয়ার্ল্যাণ্ড নয়, তাই আয়ার্ল্যাণ্ডের বন্দী সিন ফিন নেতারা নির্বাচনে জয়লাভ করলে তাঁদের মুক্তি দিয়ে সেখানকার সরকার যে রাজনৈতিক সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, ভারত সরকারের ক্ষেত্রে তার অভাব দেখা গেল। শুধু তাই নয় রাজ-বন্দীদের সঙ্গে কারা-কর্তৃপক্ষের ব্যবহার দিন দিন খারাপ হতে লাগল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জেল সুপারিনটেনডেণ্টের সম্পর্ক এত তিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, দারুণ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও এই দৃঢ়চেতা তরুণ নেতাকে বর্মার আর একটি জেল 'ইনসিন' এ বদলী করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। অবশ্য ইনসিন জেলে বদলী হওয়াতে সুভাষচন্দ্রের একদিক থেকে ভালই হয়েছিল, সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেজর ফিণ্ডলে একসময় মান্দালয় জেলে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, ঐখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল এবং মানুষ হিসাবেও তিনি কর্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোক ছিলেন। ইনসিন জেলে রুগ্ন দুর্বল সুভাষচন্দ্রকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন এবং অবিলম্বে এই অমূল্য বন্দীর খুবই জরুরী উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে কড়া নোট পাঠিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে মান্দালয়ে ব্রঙ্কো নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হবার পর সুভাষচন্দ্রকে ডাক্তারী পরীক্ষা পরে চিকিৎসকগণ ( চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম সদস্য ছিলেন সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ ডঃ সুনীলচন্দ্র বসু ) বন্দীর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে অবিলম্বে কারাগার থেকে তাঁকে মুক্তি দেবার সুপারিশ করেন। এখন ইনসিন জেলের কারা-প্রধান ফিণ্ডলের মন্তব্য পড়ে গভর্ণমেণ্ট সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেবার জন্য কিছুটা তৎপরতা দেখাবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জানালেন যে, সুভাষচন্দ্র যদি নিজ ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ড যেতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে গভর্ণমেণ্ট অতি সত্বর তাঁকে মুক্তি দিয়ে রেঙ্গুন থেকে সোজা সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। দেশের মাটী থেকে বিতাড়নের এই অভিসন্ধিমূলক সর্তাধীন ব্যবস্থা সুভাষচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করলেন। যুক্তপ্রদেশের আলমোড়া জেলে তাঁকে বদলী করা হচ্ছে এই অজুহাতে মে মাসের ( ১৯২৭ ) ১১।১২ তারিখ নাগাদ গোপনে তাঁকে রেঙ্গুন বন্দরের অপেক্ষমান এক জাহাজে ওঠানো হ'ল। দিন চারেক পর ভোরবেলায় তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, জাহাজ হুগলী নদীর মুখে ডায়মণ্ডহারবারে থেমেছে এবং বাংলাদেশের পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধান কর্তা লোম্যান তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। লোম্যান সুভাষচন্দ্রকে জাহাজ থেকে নেমে অপেক্ষমান গভর্ণরের-লঞ্চে উঠতে অনুরোধ করলে তাঁকে অন্য কোথাও পাঠান হবে সন্দেহে সুভাষচন্দ্র অসম্মতি জানালেন। লোম্যান জানালেন মুক্তি

দেবার প্রশ্নটি বাংলার নূতন গভর্ণর স্যার স্টানলী জ্যাকসন গভীরভাবে চিন্তা করছেন; সুভাষচন্দ্রকে এক্ষুণি একটি মেডিকেল বোর্ডে উপস্থিত করা হবে এবং সেই বোর্ডের রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং-এ গভর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বাংলা প্রদেশের ১নং নম্বর রাজকর্মচারীর লঞ্চেই অবস্থান করবেন। সত্য সত্যই তাঁকে স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, লেঃ কঃ স্যাণ্ডস্ এবং গভর্ণরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক মেজর হিস্টনকে নিয়ে গঠিত বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাজির করাবার পর ঐ লঞ্চেই থাকার ব্যবস্থা করা হল। পরদিন প্রাতে ১৬ই মে লোম্যান গভর্ণরের কাছ থেকে প্রাপ্ত টেলিগ্রাম এবং চিকিৎসকের রিপোর্ট দেখিয়ে সুভাষচন্দ্রকে জানালেন গভর্ণর তাঁকে বিনাসর্তে মুক্তি দিয়েছেন।

১৯২৮ সন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় বছর। ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা বৃটিশ-ভারতের শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির ক্ষমতা, স্থানীয় জনহিতকর সংস্থাগুলির কার্যধারা, স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে দ্বিতীয় কক্ষ চালু রাখা ঠিক হবে কিনা—এক কথায় ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য স্যার জন সাইমনকে সভাপতি করে সাতজন সদস্য-বিশিষ্ট একটি পার্লামেণ্টারী কমিশনকে ভারতে প্রেরণ করেন। ১৯২৭ সনের ২৬শে নভেম্বর এই কমিশনকে নিযুক্ত করা হয়। সাধারণভাবে 'সাইমন কমিশন' নামে পরিচিত কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে গঠিত এই পার্লামেণ্টারী দলকে ভারতবর্ষের দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের চিন্তায় বিভোর দেশবাসী তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের মুরুব্বীয়ানাকে অগ্রাহ্য করল। ভারতে এসে স্যার জন সাইমন বাস্তব অভিজ্ঞতার থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতীয়দের বাদ দিয়ে এই কমিশন বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারবে না। সুতরাং তিনি ভারতের বড়লাটকে এক পত্রে জানালেন 'খোলাখুলি ভাবে যৌথ আলোচনার' জন্য ভারতীয় আইন সভাগুলির মনোনীত প্রতিনিধি দল কমিশনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ভারতীয় আইন সভা সাইমনের এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করলেও মধ্য প্রদেশ আইন পরিষদ ব্যতীত বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভাগুলি কংগ্রেস ও উদারপন্থী সদস্যদের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কমিটি নিয়োগ করে। কিন্তু এতেও স্যার জন সাইমনের কপাল ফিরল না। হরতাল ও বিক্ষোভের দ্বারা জনসাধারণ এই কমিশনকে সর্বত্র প্রত্যাখ্যান করলো। পুলিশের নিপীড়ন, জাগ্রত ছাত্র সমাজ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসীর মনোবল নষ্ট করতে পারে নি। লাহোরে পাঞ্জাবের প্রিয় নেতা লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে এক বিরাট জনতা কালো পতাকা নিয়ে সাইমনের যাত্রাপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার কালে সশস্ত্র পুলিশ 'লাঠি ও বেটন চালনা করে।.. ...এই আক্রমণে লালাজী গুরুতরভাবে আহত হন।' শেষ পর্যন্ত আঘাত-জনিত কারণেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননেতার মৃত্যু হয়। লক্ষ্ণৌশহরেও সাইমনকে বিক্ষোভ জানানোর সময় পথের দু'পাশে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিক ও ছাত্র-জনতার উপর অশ্বারোহী পুলিশবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়; বাংলাদেশের দিকে দিকে সাইমন-বিরোধী ধিক্কার ধ্বনি ও সভা-সমিতি বিক্ষোভ ও হরতাল পালনের দ্বারা ভারতের প্রতিবাদ ও ঘৃণা প্রকাশিত হোলা। জাগ্রত ভারতের এই রূপকে স্বাগত জানিয়ে দৈনিক সংবাদ পত্র 'বাংলার কথা' ২রা ফেব্রুয়ারী'২৮ (১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) সম্পাদকীয়তে লিখলেন, 'আমাদের ভয় নাই, আমাদের সহস্র সহস্র ছাত্র পুস্তকের মায়া কাটাইয়া বেটনের মুখে বুক দিতে শিখিয়াছে;

আমাদের নাগরিকগণ পুলিশের তুবড় অশ্বের দ্বারা দলিত হইয়াও গর্জন করে—সাইমন ফিরিয়া যাও। যাহারা মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে শিখিয়াছে—তাহাদের মুক্তি কে ঠেকাইয়া রাখিবে?'

শুধুমাত্র সাইমন কমিশনকে বর্জন করার মধ্যেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিবদ্ধ ছিল না। আর একটি বড় কাজ দেশের নেতৃবৃন্দের সামনে ছিল তা হল সর্বসম্মত এক শাসনতন্ত্র রচনা করা। 'ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের মূল নীতিগুলি নির্ধারণ এবং ঐ সম্বন্ধে একটি খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য' পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে চেয়ারম্যান, সুভাষচন্দ্রসহ আরো কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বামপন্থী চিন্তার অন্যতম ধারক ও বাহক সুভাষচন্দ্রের সেই সময় প্রিয়তম সাথী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র ঐ সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন (১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ডাঃ এম. এ আন্সারীর সভাপতিত্বে মাদ্রাজ-কংগ্রেসে সুভাষ-স্রু—জওহরলাল এবং শ্রীযুক্ত সাহেব কুরশী সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হন।) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অনুকূলে দেশবাসীকে প্রভাবিত করার নিমিত্ত প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য এই বামপন্থী মনোভাব পূর্ণ নেতৃদ্বয় কংগ্রেসের সম্মেলনে বা অন্য সম্মেলনে নিজেদের নেতাদের সঙ্গে বাগ্-বিতণ্ডার দ্বারা ঐক্য ও অযথা কালহরণ না করার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সলীগ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হলেন। সুভাষচন্দ্র নেহরু কমিটির (মতিলাল নেহরু) শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা ছিল, বয়সে প্রবীণ হলেও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসী নতুন তুর্কীদের চিন্তার কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও গান্ধীজীর প্রভাব হতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। দেশবন্ধু, লাজপত রায় প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব দেবার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অপ্রতুলতা দেখা দেবার দীর্ঘ চার বৎসর পর মহাত্মা গান্ধীকে পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনের এবারের পরিবেশ অনেক বেশী বলিষ্ঠ। ছাত্র ও যুব সমাজের জাগরণ বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন নেতার নেতৃত্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনে মালিক ও সরকার পক্ষ বিপর্যস্ত, কংগ্রেসীদের মধ্যে বামপন্থী নেতাদের প্রভাবে প্রবীণদের মধ্যেও এক সমঝোতার ভাব স্বাধীনতা আন্দোলনকে দৃঢ় করেছিল। আশা করা গিয়েছিল কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে নবীন ও প্রবীণের এক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত হবে তার লক্ষ্য পথে। নবীনের শৌর্য-বীর্য ও প্রবীণের দৃঢ় নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে ভারতের এই মুক্তি যজ্ঞের সাফল্য সুনিশ্চিত। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত আশা-ভঙ্গের কারণ। মহাত্মাগান্ধী সম্মেলনে প্রস্তাব করলেন '১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে বা তাহার পূর্বে বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে কংগ্রেস-সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে নেহেরু কমিটি কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রকে পুরোপুরি ভাবেই গ্রহণ করিবে।' গান্ধিজীর প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছিল বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি এই সুযোগ (নেহরু কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ) গ্রহণ না করেন তবে কংগ্রেস কর্তৃক এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশব্যাপী গড়ে তুলবে। গান্ধিজীর এই প্রস্তাব কংগ্রেস শিবিরে তীব্র ক্ষোভের কারণ হল। কংগ্রেসের তরুণ কর্মীরা এবং বাঙলা দেশের প্রায় সকল প্রতিনিধি বলতে গেলে সম্মেলনের মধ্যেই বিদ্রোহ প্রকাশ করলেন। মহাত্মা গান্ধীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন নীতির সমর্থনের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র সংবাদ-

পত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে বললেন, 'মহাত্মাজীর আপোষ প্রস্তাবের ফল আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদাহানি,—আমরা দূর ভবিষ্যতে নহে, অচিরে পূর্ণ স্বাধীনতা চাহি।··· এই প্রস্তাব যখন পৃথিবীতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন তরুণ সম্প্রদায়ের প্রাণে অবসাদ আনিবে।' (বাংলার কথা—১০-১২-২৮)। সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁর সভাপতির ভাষণে যদিও বললেন, 'আমি চাই সত্যকার স্বাধীনতা,—স্বাধীনতার ছায়া নয়। আমি চাই পূর্ণ স্বাধীনতা', তথাপি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন সর্তাধীনে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই তিনি মনে করেন। কংগ্রেসের বিপ্লবী নেতা ও তরুণ কর্মীরা কিন্তু কিছুতেই মহাত্মাজীর প্রস্তাবকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না। গান্ধিজীর প্রস্তাবের উপর সুভাষচন্দ্র একটি সংশোধনী প্রস্তাব সম্মেলনে উপস্থিত করলেন। এই সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, 'কংগ্রেস স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না যদ্বারা বৃটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ বুঝাইবে।' সুভাষচন্দ্রের এই সংশোধনী প্রস্তাব ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রে ভোটে রাখা হল গান্ধিজীর মূল প্রস্তাবের পাশাপাশি। জওহরলাল নেহরু ছিলেন সুভাষ-প্রস্তাবের অন্যতম প্রধান সমর্থক। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব ৯৭৩—১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হল। অবশ্য একথা কারো বুঝতে অসুবিধা হল না মহাত্মাকে কংগ্রেসের মধ্যে ধরে রাখার জন্যই অনেক প্রতিনিধি গান্ধী প্রস্তাবে একমত না হয়েও মূল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি সুভাষ সংশোধনী প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হওয়া সত্ত্বেও কোন পক্ষকে ভোট প্রদান করেন নি একই আশঙ্কায়। আসলে অনেকেই গান্ধীজীকে কংগ্রেস থেকে আর হারাতে চাননি, গান্ধিজী যদি এই ভোটাভুটিতে পরাজিত হতেন, তাহলে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি আর একবার অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। যদি তাই হোত তাহলে কে বলতে পারে গান্ধিজীকে পুনরায় রাজধানীতিতে প্রত্যাবর্তন করতে দেখা যেত কি না? ভোটে পরাজয় ঘটলেও দেখা গেল কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমশঃ বামপন্থী চেতনা-সম্পন্ন মানুষের ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হচ্ছে। ক'লকাতা কংগ্রেস সম্মেলনে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা ভবিষ্যত ইতিহাসের পটভূমি তৈরী করেছিল। এই সম্মেলনেই দীর্ঘ-দিন ট্রেনিং প্রাপ্ত এক সুশৃঙ্খল, সামরিক নিয়মানুবর্তিতার অভ্যস্থ এক বিরাট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কংগ্রেস সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কাজে সহায়তা করছিল, এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

ক'লকাতা সম্মেলনে গান্ধিজী তাঁর নেতৃপদ বজায় রাখতে পারলেও নিজের দূরদর্শিতার দ্বারা অনুভব করেছিলেন কংগ্রেসে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এবং তাঁর ধ্যান-ধারণাকে এই সংগঠনের মাধ্যমে কার্যকরী করতে হলে বামপন্থা সদস্যদের মধ্যে কোন কোন সদস্যকে প্রভাবিত করার রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। কার্যতঃ তিনি নিজেও বুঝেছিলেন কংগ্রেসের লিখিত চরম-পত্রের কাজে ভয় পেয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী বিনা বাধায় মেনে নেবে এরকম বিশ্বাস করা রাজনৈতিক মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। অথচ ক'লকাতা কংগ্রেসে এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী গৃহীত হল। এমন কি ঐ সময় 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' মহাত্মার এই ধরণের প্রস্তাবকে অবিবেচনাপ্রসূত হাস্যকর বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই প্রস্তাব গ্রহণের পিছনে গান্ধিজীর দুটি মানসিকতা কাজ করছিল। প্রথমটি হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতেই কংগ্রেসের দ্বারা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলেই তিনি সময় নিচ্ছিলেন। দ্বিতীয়টি হল চরমপন্থী কংগ্রেসীদের প্রভাব খর্ব করা। ১৯২৮ সনে বামপন্থী কংগ্রেসীদের স্বাধীনতার

প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী গৃহীত হবার পর থেকেই রাজনৈতিক হাওয়া বুঝে তিনি বলতে শুরু করলেন মাত্র একটি বছর তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে হৃদয় পরিবর্তনের-সুযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। ১৯২৯ শের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা না হলে নূতন বছরের প্রথম দিন থেকেই তিনি নিজেই 'স্বাধীনতাওয়ালা' হয়ে যাবেন। বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে তিনি স্বাধীনতার কথা প্রচার করে বামপন্থীদের বেশ অসুবিধার মধ্যে ফেলেছিলেন এবং কোন কোন নেতাকে স্বপক্ষে এনে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন।

অন্যদিকে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনও এই সময় দানা বেঁধে ওঠে। ১৯২২ সনে যুক্ত প্রদেশের 'চৌরি-চৌরা' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারে বিপ্লবরা মনে করেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবের মধ্য দিয়েই অর্জন করা যাবে, অন্যভাবে নয়। দু'টি ঘটনার দ্বারা বৈপ্লবিক আন্দোলনের নতুন পর্যায় শুরু হল। ১৯২৮ সন সাইমন কমিশন-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর যে পুলিশবাহিনী অত্যাচার চালিয়েছিল এবং যার পরোক্ষ কারণে লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু ঘটে, সেই বাহিনীর অন্যতম ইন্সপেক্টর মিঃ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করা হয়। এবং কিছু সময়ের ব্যবধানে দিল্লীতে ভারতীয় আইন সভার অধিবেশন চলা কালে অধিবেশন কক্ষে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই বোমা নিক্ষেপের জন্য পাঞ্জাবের ভগৎ সিং এবং বাঙলার বটুকেশ্বর দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং স্যাণ্ডার্স হত্যা ও অন্যান্য বৈপ্লবিক কর্ম-তৎপরতা রোধ করার উদ্দেশ্যে সারা দেশব্যাপী প্রচুর যুবককে গ্রেপ্তার করে ১৯২৯ সনের মাঝামাঝি সরকার বিচারের জন্য লাহোরে সারা ভারত ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। এই মামলা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম বিচারাধীন বন্দী ছিলেন বাংলার যতীন দাস। দক্ষিণ ক'লকাতার তরুণ যুবক উত্তর ভারতের বিপ্লব ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়েছিলেন বাংলার অনুশীলন দলের সদস্যরূপে, যে দলে পাঞ্জাবের বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং, বাংলার বিপ্লবী-নেতা শচীন সান্যালের সহযোগে যুক্ত হন। এই সব বিচারাধীন বন্দীরা রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বোধহয় বিপ্লবী চরিত্রের সঙ্গে দাবী আদায়ের পন্থা হিসাবে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারছিলেন না বিপ্লবী যতীন দাস। অন্যান্য রাজ-বন্দীদের আগ্রহাতিশয্যে অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন এই সর্তে যে যতদিন না দাবী আদায় হবে, এই ধর্মঘট থেকে তাঁরা বিরত হবেন না। দিনের পর দিন যায়, অনশনরত বন্দীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের অনেকের জীবনের আশঙ্কা পর্যন্ত দেখা দিল। সারা দেশব্যাপী এদের দাবীর সমর্থনে বিক্ষোভ সভা-সমিতি, আন্দোলন শুরু হল। বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বহু কংগ্রেসসেবীকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বিচারার্থে কোর্টে হাজির করা হয়। সুভাষচন্দ্রও এই গ্রেপ্তার থেকে বাদ পড়েন নি। অনশনরত ধর্মঘটীদের অনেকেই কিছুদিন পর অনশন ত্যাগ করলেন। কিন্তু বিপ্লবী যতীন দাস অনড়—অটল, আপসতন্ত্রের কাছে তিনি কিছুতেই হার মানবেন না। অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা মুক্তির পথকে তিনি করায়ত্ত করবেনই। সফল হলেন বাঙলার বীর পঁচিশ বছরের যুবক যতীন দাস। ১৩ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি পথে পৌঁছালেন শহীদ যতীন—১৯২৮ সনের কংগ্রেস অধিবেশনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল সুভাষচন্দ্র বসুর প্রিয় অনুগত অফিসার মেজর যতীন দাস। অন্ত্যেষ্টির জন্য এই মহান সৈনিকের মরদেহ লাহোর থেকে ট্রেন যোগে ক'লকাতায় আনা হল। শহীদ যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে যে

শোকযাত্রা নগর পরিক্রমা করেছিল, এবং মৃত্যুর পর এই শহীদ জনগণের হৃদয় নিঙরানো যে সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ঐরূপ ঘটনা ছিল দুর্লভ। কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে বিশিষ্টতম ব্যক্তিটি যতীন দাসের আত্মত্যাগে নীরব ছিলেন—গান্ধী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়—যা তখনকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা পূর্ণ থাকত—শহীদ যতীনের সম্পর্কে কিছুই লিখলেন না। তিনি এই সময় ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিজের কর্মপদ্ধতি প্রয়োগে ব্যস্ত। ইতিপূর্বে জুলাইমাসে তাঁরই পরামর্শক্রমে হঠাৎ আইন সভার কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ করার নির্দেশ পাঠানো হল কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষ থেকে। কংগ্রেস ১৯২১ সনের মত আবার ভুল করতে যাচ্ছে - কার্যকরী কমিটির নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেবার দাবী জানালেন সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন এবং বিভিন্ন আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যরা। অবশেষে জোরালো প্রতিবাদের ফলে পদত্যাগের বিষয়টি ডিসেম্বরে লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন পর্যন্ত মুলতবী থাকল। কিন্তু ধীরে ধীরে গান্ধিজী তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা যতীন্দ্রমোহন এবং বামপন্থী কংগ্রেসীদের অন্যতম সমাজবাদী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে নিজের পক্ষে টেনে নিলেন। কংগ্রেসের বিরাট এক অংশের ইচ্ছা ছিল ১৯২৯ সনের লাহোর-কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতিরূপে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী আসন অলংকৃত করুন। কিন্তু গান্ধীজির ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি আগের বারের কংগ্রেস সভাপতির পুত্রকে সভাপতির প্রার্থীপদে মনোনীত করলেন। বামপন্থী মনোভাব সম্পন্ন যুব কংগ্রেসসেবীদের পরম দুর্ভাগ্য তাদের একজন শক্তিশালী নেতা গান্ধীজির ইচ্ছানুযায়ী সভাপতির সাক্ষী গোপালের পদ গ্রহণ করলেন। বামপন্থী কংগ্রেসী নেতারা মনে করতেন 'বামপন্থী নেতার তখনই সভাপতির পদ গ্রহণ করা উচিত যখন কংগ্রেসে তিনি তাঁর কর্মসূচী চালাতে সমর্থ হবেন। মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি রূপে জওহরলাল নেহরুকে নির্বাচিত করে তরুণদের ঐ ইচ্ছাকে ধূলিসাৎ করেন এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসে জওহরলালকে মহাত্মার একজন দৃঢ় ও অবিচল সমর্থকরূপে দেখা যায়।

ইতিপূর্বে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন বিলেতে শ্রমিক সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর ভারতে ফিরে ৩১শে অক্টোবর ঘোষণা করলেন যে, 'মহামান্য সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত—১৯১৭ সালের ঘোষণার মধ্যেই যাহা নিহিত রহিয়াছে—ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ।' সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর আলোচনার জন্য লণ্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে বড়লাট সাহেব প্রতিশ্রুতি দেন। আরউইনের এই ঘোষণায় কংগ্রেসী ও অন্যান্য দলের প্রবীণ নেতাদের খুশী আর ধরে না। তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই নভেম্বর মাসে দিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বড়লাটের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন এবং স্থির করলেন ঐ প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের পূর্বে সরকারকে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। ব্রিটিশের এই নয়া টোপ তরুণ জওহরলাল প্রথমে গিলতে চান নি। তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঠিক করেছিলেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন গ্রহণ ও তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের বিরোধিতা করে পৃথক বিবৃতি প্রচার করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজনীতির রঙ বদলিয়েছে। লাহোর 'কংগ্রেসের জন্য নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গান্ধীর প্রভাবে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে যে বিবৃতির বিরোধিতা

করার মনস্থ করেছিলেন, তাতেই তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করে স্বাক্ষর প্রদান করেন—মহাত্মা গান্ধী, পিতা মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র লাহৌরের ডাঃ এস. কিচলু এবং পাটনার আব্দুল বারিকের সহযোগিতায় উক্ত বিবৃতির বিরোধিতা করে পাল্টা বিবৃতি দিলেন। সাধারণ যুবসমাজ ও বামপন্থী কংগ্রেসীরা এই বিবৃতিটিকে স্বাগত জানালেও নামী ও ভারী কংগ্রেসী নেতাদের সই করা বিবৃতিটি জনসমর্থন লাভ করেছিল।

মহাত্মা গান্ধী লাহোর কংগ্রেস সম্মেলনের আগেই ভারতের স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্পষ্ট স্বীকৃতি পাবার চেষ্টায় বড়লাট আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক হলেন। ঐ সাক্ষাতের কয়েকদিন আগে বড়লাটের ট্রেনকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলেছিল এবং লর্ড আরউইন অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন। সারা ভারত জুড়ে চরম-পন্থী কার্যকলাপের ইঙ্গিত দেখা দিতে লাগল। মহাত্মা আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলেও শূন্য হাতে লাহোর কংগ্রেসে হাজির হলেন। বড়লাট কোন আশ্বাস দিতে পারলেন না। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করেই স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজে প্রস্তাব রাখেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে বোমা নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও দৈবকৃপায় বড়লাট অক্ষত থাকায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এক প্রস্তাব রাখা হয়। গান্ধী মনে করেছিলেন ভবিষ্যতে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হলে বড়লাটকে শান্ত করার জন্য এই ধরণের প্রস্তাব রাখার প্রয়োজন আছে। গান্ধিজীর এই প্রস্তাবে সম্মেলনে তুমুল ঝড় বয়ে গেল। অনেকে রাজনৈতিক প্রস্তাবে ঐ ধরণের ধারা রাখার বিরুদ্ধে গেলেন। কিন্তু গান্ধী ঐ ধারাকে রাখার জন্য জেদ ধরলেন এবং সেই ধারাকে তাঁর প্রতি আস্থার প্রশ্ন করে তোলেন। খুব অল্প সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে ঐ অভিনন্দন প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। লাহোর-কংগ্রেসে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য রূপে মেনে নেওয়া হলে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব রাখেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের একটি 'সমরূপ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা উচিত এবং ঐ কারণে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদিগকে সংগঠিত করার কাজ গ্রহণ করতে হবে।' কিন্তু এই যুক্তি পূর্ণ প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য করা হল। পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য রূপে ঘোষণা করা হলেও অধিবেশনে কোন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হল না। শুধু তাই নয়, মহাত্মার ইচ্ছানুযায়ী পরবর্তী বছরের সারা ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সুভাষচন্দ্র, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ জনপ্রিয় বামপন্থী নেতাদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গোঁড়া গান্ধীভক্তদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হল। শ্রীযুত আয়েঙ্গার ও সুভাষচন্দ্রের মত বিশিষ্ট এবং কার্যকরী নেতাদের কমিটির সভ্য হিসাবে রাখার জন্য সম্মেলনে জোরালো দাবী উঠলে গান্ধিজী পরিষ্কার জানান যে সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের নিয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তিনি নতুন করে কোন নাম অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী নন। এক্ষেত্রেও মহাত্মা সাফল্য লাভ করলেন। গান্ধিজীকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে হারাবার ভয়ে সভায় তাঁর ইচ্ছা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। (ক্রমশঃ)

পূর্বানুবৃত্তি

# মজুরি নির্ধারণের সঙ্গত নীতি

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

ইতিপূর্বে দুই প্রবন্ধে বিভিন্ন ধরণের শ্রমজীবীর মজুরি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে-সব জটিলতার উদ্ভব হয়ে থাকে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জিনিষপত্রের দাম বাড়ার ফলে মজুরি বাড়ানোর দাবির উদ্ভব এবং মজুরি বাড়বার পরবর্ত্তী স্তরে জিনিষপত্রের দামের পুনরায় বৃদ্ধি, মজুরি স্থিরভাবে নির্দ্ধারিত করে দেবার ক্ষেত্রে এ এক বিষম বাধা। অন্তর্বিধ অসুবিধার উদ্ভব হয় বিভিন্ন ধরণের যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমজীবীর মজুরির তারতম্য কতটা হবে তা' নিয়ে। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমিকদলের মজুরি যখন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়াবার চেষ্টা করা হয় তখন শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে হয়তো দেখা যায় যে তুলনামূলকভাবে কোনো গোষ্ঠীরই সুবিধা বিশেষ বাড়ে নি। শুধু মাঝখান থেকে সাধারণভাবে মজুরির হার অনেকটা বেড়ে গেছে। মজুরির এই উর্দ্ধ গতি জিনিষ-পত্রের দামকে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে আবার সারা দেশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে মজুরি বৃদ্ধির প্রেরণা জাগে। বলা বাহুল্য এই ধরণের মজুরি বৃদ্ধির ফলে চূড়ান্ত বিচারে কারও কোনো স্থায়ী লাভ হতে পারে না।

এই ধরণের এলোমেলো এবং অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীন মজুরি বৃদ্ধির পথ রোধ করা নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। একথা এখন মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে শ্রমজীবীদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সম্পূর্ণ বোঝাপড়া না থাকলে এবং তাদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে স্বতো-বিরোধিতা দূর করতে না পারলে মজুরি নির্ধারণের কোনো সুষ্ঠু নীতি রূপায়িত করা অসম্ভব। শ্রমিকদের সংগঠন যেখানে উঁচু স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের আয়ের তারতম্য প্রায় উপেক্ষনীয়, কেবলমাত্র সেই সব দেশেই মজুরি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর সংযত আচরণ আশা করা যেতে পারে। সেইজন্য ঐ সব দেশে (যথা, সুইডেন) রাষ্ট্র এবং শ্রমিক সংগঠন পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত মজুরির এক বাস্তবানুগ নীতি গ্রহণ করে তাকে কার্য্যে পরিণত করতে পারে। অন্য দিকে যেখানে শ্রমিক-সংগঠনগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করার কোনো সুযোগই পায় না এবং মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের নির্দ্দেশেই নীতি নির্ধারণ করে থাকে (যথা, সোভিয়েত রাশিয়া) সেখানেও নির্ধারিত মজুরিকে বজায় রেখে চলার পথে কোনো গুরুতর বাধা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এখানে বিভিন্ন শ্রমিকগোষ্ঠীর নীতির মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের দরুণ মজুরির প্রতিযোগিতা বন্ধ করা মোটেই সহজ নয়। আর শ্রমিক-সংগঠনের উপর রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ আরোপ কিংবা নির্দেশনার কথা এখানে ভাবাও যায় না। অতএব রাষ্ট্র এবং শ্রমিক-সংগঠনগুলির মিলিত চেষ্টার ফলে মজুরি নির্ধারণের কোনো সুষ্ঠু নীতি এদেশে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হবে এমন আশা করা বৃথা।

তাই বলে রাষ্ট্রব্যবস্থার যাঁরা নিয়ামক তাঁরা মজুরি নির্ধারণের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে চলবেন এমনও হতে পারে না। এমন একদিন ছিল

যখন শ্রমিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ণীত যে-কোনো মজুরি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। তখন মজুরির ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠনী ক্ষমতা বাড়বার ফলে বর্ত্তমানে যে-অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা আগেকার চেয়ে অনেক বেশী জটিল। পূর্ব্বে এই জটিলতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যদি কোনো শ্রমিকগোষ্ঠীই নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে না পারে, অথচ মাঝখান থেকে শুধু জিনিষপত্রের দামই বেড়ে যেতে থাকে, তবে দুরবস্থা চরমে পৌঁছাবার আগে কোনো-না কোনো উপযুক্ত নীতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ণধারগণকে অবলম্বন করতেই হবে। সেই নীতির সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজন জনমতের সমর্থন এবং শ্রমিক-সংগঠনগুলির পোষকতা।

মজুরি নির্ধারণের নীতিকে জনমত সঙ্গত বলে স্বীকার করবে শুধু তখনই যখন দেখানো যাবে যে, প্রথমতঃ এই নীতির ফলে অপেক্ষাকৃত কম সংগঠিত শ্রমিকের পক্ষেও তার যোগ্যতা অনুযায়ী মজুরি অর্জন করা অসম্ভব হচ্ছে না এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধরণের কর্ম্মীর মধ্যে মজুরির যে পার্থক্য রয়েছে তার পরিমাণ যোগ্যতার তারতম্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। যে-কোনো সমাজব্যবস্থায়ই মজুরির খানিকটা তারতম্য স্বীকার করে নিতে হবে। শুধু দেখা দরকার যে এই তারতম্যের ফলে একদিকে নিম্নবেতনভোগী শ্রমিকের কর্ম্মস্পৃহা হ্রাস পাচ্ছে না এবং অন্যদিকে অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জ্জনের আগ্রহও লোপ পেয়ে যাচ্ছে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে মজুরির তারতম্য কমিয়েও পদমর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে যোগ্যতা অর্জ্জনের স্পৃহা বজায় রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এইভাবে মজুরি নির্দ্ধারণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে সঙ্গত নীতির পথে মজুরিকে পরিচালনা করার চেষ্টা হলে রাষ্ট্রের সদিচ্ছার উপর শ্রমিক-সংগঠনগুলির আস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন বিধির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অসংগঠিত শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টা গত দুই দশকের অধিক কাল ধরে চলছে। এর ফলে এইটুকু অন্ততঃ লাভ হয়েছে যে শ্রমিকেরা নিজেদের সংগঠনকে রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপক্ষীয় বলে আর ভাবতে পারছে না। রাষ্ট্রের বিঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজেদের উদ্দেশ্যকে তাদের মেলাতে হচ্ছে। এইটুকুই অবশ্য যথেষ্ট নয়। বিশেষতঃ শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে সংগঠন-চেতনা জাগবার ফলে তারা যদি সেই সংগঠন ক্ষমতাকে মজুরি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হয় তবে বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। এই অবস্থায় রাষ্ট্র যদি আরও একটু দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসে মজুরি নির্ণয়ের কয়েকটি সরল নীতিকে জনমতের সামনে পেশ করে, তবে তাতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন-মত্ততা কিছুটা সংযত হতে পারে বলে আশা করা যায়।

মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে যে-সব নীতির উপর সাধারণতঃ যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় তার একটি হল ন্যূনতম জীবিকার নীতি। প্রত্যেক শ্রমিকেরই এমন হারে মজুরি পাওয়া যুক্তিযুক্ত যাতে সে এবং তার পরিবারের লোকেরা নূতনতম কতকগুলি চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, শিক্ষা ও ভ্রমণব্যয় ইত্যাদির হিসাব কষে প্রত্যেক শ্রমজীবীর ন্যূনতম সঙ্গত বেতন নির্ণয় করে দেওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান আর্থিক বিকাশের স্তরে সকল শ্রমজীবীকে এই ন্যূনতম মজুরি দেবার ব্যবস্থা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং অনন্যোপায় হয়েই আমাদের ন্যূনতম মজুরিকে জীবিকার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত রাখতে হচ্ছে। কোনো কোনো শ্রেণীভুক্ত শ্রমিককে ন্যূনতম জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে গেলে অন্যান্য শ্রমিককে ঐ স্তরের নীচে রাখতেই হবে। ঘুরে ফিরে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, মজুরির তারতম্য নির্ধারিত হবে কোন্ নীতির সহায়তায়? ন্যূনতম মজুরি দিয়ে সবক্ষেত্রে যোগ্যতার

যথোপযুক্ত সমাদর করা হবে না, এই আশঙ্কা থাকাতেই আমরা উচ্চবেতনভোগীদের মজুরি কমিয়ে সকলের মজুরিকে এক স্তরে নিয়ে আসার কথা ভাবতে পারি না। অথচ সব ক্ষেত্রেই মজুরির তারতম্য যোগ্যতার ভেদ অনুযায়ী যুক্তিযুক্তভাবে সাজানো, এমন দাবিও কি আমরা করতে পারি?

মজুরির তারতম্যকে যুক্তিগ্রাহ্য একটি রূপ দেবার জন্য রাষ্ট্র কিছু কিছু নীতির প্রবর্তন করতে পারে। বয়স, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছা ও পটুতা ইত্যাদি বিষয়ের মান অনুসারে যাতে মজুরির তারতম্য নির্ণীত হয় এবং একবার নির্ণীত হলে শুধু সংগঠন শক্তির প্রাচুর্য্যের জন্য কোনো বিশেষ শ্রমিকগোষ্ঠী তার মজুরি বাড়িয়ে নিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। গোড়ার দিকে এই নীতি অবলম্বনের ফলে কোনো কোনো গোষ্ঠীর বিরূপতা অর্জ্জন করতে হলেও রাষ্ট্র এই ব্যবস্থার সুফল লাভ করবে, যদি জনমতের সমর্থন পেতে তার অসুবিধা না হয়।

(সমাপ্ত)


## অনিল ব্লাহের
## সময়োপযোগী দুইটি বই

**সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০**

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

**নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০**

(তৃতীয় সংস্করণ)

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

**নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।**

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

: উপন্যাস

উত্তরখণ্ড

# কণ্ঠহারা বিম্ব

মিহির মুখোপাধ্যায়

## তেইশ

ত্রিবেণীর ঘাটে নৌকো পৌঁছুতে সন্ধ্যে লেগে গেল। গতকাল সন্ধ্যায় ছিল ফরাসডাঙ্গার ঘাটে। রামেশ্বর মুখুজ্জের সেই পঞ্চাশটা টাকা শোধ দিয়ে মাতৃদায়ের ঋণমুক্ত হয়ে এসেছে ভারত। কাল রাত কেটেছে ভায়রাভাই শিবদাস মুখুজ্জের বাড়িতে। আজ দুপুরেও যমুনাদিদি না খাইয়ে ছাড়লেন না। রওনা হতে হতে দুপুর ঘুরে গেল। এবেলা এখানেই রান্না-বান্নার যোগাড় করতে হবে। বিশ্বনাথ একজন মাঝিকে নিয়ে নেমে গেল কিছু কেনাকাটা করার জন্য। আর ভারতচন্দ্র নামল হাতপা খেলিয়ে নেবার জন্য। সারা দুপুর নৌকোয় শুয়ে বসে হাত-পা যেন ধরে গেছে। সারাটা পথ আসতে আসতে বিশ্বনাথের কাছে কেষ্টনগরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছে ভারতচন্দ্র। মহারাজার সভাসদবৃন্দ, আত্মীয়-পরিজন, আমলা-কর্মচারী যাদের সঙ্গে এই তিনমাসে আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তাদের সকলের কথাই বলেছে। রাজবাড়ির হালচাল আদব-কায়দা, জাঁকজমকের খবরও কিছু কিছু দিয়েছে। সর্বোপরি স্বয়ং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

সেদিন সেই জলাঙ্গীর ঘাটে বজরার ছাদের উপর ঘরোয়া বৈঠকে বসে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন মহারাজা —রায়মশাই মুখে মুখে সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারেন— তারপর ভারতচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি একটি কবিতা শোনান দেখি, সেবারের মত—একটু সময় চোখ বুজে কি যেন ভেবে নিয়ে আবার বললেন—একটি ফারসী শব্দ দিচ্ছি, শুনেছি আপনি উত্তম ফারসী জানেন, আচ্ছা বলুন কার্জোরফ্‌থ্‌, এর অর্থ জানেন—

—আজ্ঞে জানি—নম্রভাবে জবাব দিয়েছিল ভারতচন্দ্র— এই শব্দটির দুরকম অর্থ হয়, একটি হল, কার দ্বারা এই কর্ম হয়েছে, আরেকটি, কে এই কর্ম করে চলে গেল—

—ঠিক বলেছেন, আচ্ছা দেখুনতো এই শব্দটি দিয়ে ছোট একটি কবিতা রচনা করতে পারেন কিনা—মহারাজার আদেশ শুনে সভাস্থ সকলেই উৎসুক চোখে তাকালেন। এমন কি অনুকূল বাচস্পতিও গণনা বন্ধ করে মুখ তুলেছিলেন। মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত ভেবেছিল ভারতচন্দ্র। তারপর মহারাজার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল—আপনার আদেশ শিরোধার্য, এই শব্দটিকে দুটি অর্থেই ব্যবহার করে সাধ্যমত বলার চেষ্টা করছি,—মৃদু হাসি মুখে সভাস্থ সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, শেষে চোখ বন্ধ করে থেমে থেমে বলেছিল—

কামিনী যামিনী মুখে নিদ্রাগতা হয়ে সুখে ধীর শঠ তার মুখে
চুম্বিতে চুম্বন সুখে ধীরে ধীরে কার্জোরফ্‌থ্‌।
নিদ্রা হতে উঠে নারী আলশে অবশ ভারী আরসিতে মুখ হেরি
চুম্বচিহ্ন দৃষ্টি করি ভাবে ভাল কার্জোরফ্‌থ্‌।

—বাঃ, বাঃ, চমৎকার বলেছেন—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র।

রঘুনন্দন মিত্র শুধু বলেছিলেন—সাধু, সাধু—

বাচস্পতিমশাই কোন মন্তব্য করেননি। কিন্তু দেওয়ান-সহবর্তি

আর শুকদেব রায়, দু'জনেই খুব মুক্তকণ্ঠে তারিফ করেছিলেন।

এমন সময় নদীর ঘাটে একখানি পালকি আসার আওয়াজ শোনা গেল। বেহারাদের হুম-হুম্ হো-হো শব্দ। একটু পরেই আশাসোঁটাধারী একজন চোপদার এসে সংবাদ দিল, রায়-বকশী মদনগোপাল রায় হুজুরে হাজির হবার অনুমতি চাইছেন—

মহারাজা বেশ ব্যস্তভাবেই অনুমতি দিলেন—কই তাকে আসতে বল—তারপর ভারতচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—আচ্ছা রায়মশাই, পরে আপনার কবিতা শুনবো, আজ আমি কিছু ব্যস্ত আছি, ভাল কথা আপনি কোথায় উঠেছেন—

—আজ্ঞে আনন্দিরাম মুখুজ্জের বাড়িতে—

—কেন আমার অতিথিশালায় নয় কেন—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দেওয়ান-সহবতির দিকে তাকালেন কৃষ্ণচন্দ্র। আমতা আমতা করে জবাব দিলেন রামগোপাল চক্রবর্তী—আজ্ঞে সেই ব্যবস্থাইতো করেছিলাম, কিন্তু তার আগেই আনন্দিরাম নাকি ওকে একরকম জোর করে নিয়ে গেলেন—

—সে যাই হোক, আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন ওর একটা [illegible] ঠিক করে দেবেন, আচ্ছা আজ আসুন রায়-মশাই, আমার এখানে যখন এসে পড়েছেন তখন মা জগদম্বার [illegible] আপনার একটা ব্যবস্থা হবেই, কিছু চিন্তা করবেন না—

আপনার অনুগ্রহ—মহারাজকে এবং সভার অন্যান্য সকলকে নমস্কার দিয়ে চলে এসেছিল ভারতচন্দ্র।

তারপর সেদিন যেসব আলোচনা হয়েছিল, তার কিছু কিছু শুনেছে দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের মুখে আর কিছু শুনতে পেয়েছিল আনন্দিরামের কাছ থেকে।

সেদিন মহারাজা নাকি বলেছিলেন—এই ভারতচন্দ্র রায়, ভরদ্বাজ রাজবংশের সন্তান, ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আর বিশেষ গুণ স্বচ্ছন্দ কাব্যরচনার শক্তি, বর্তমানে ইনি নিরাশ্রয়, সাহায্যপ্রার্থী, আমার হিতৈষী, বিশিষ্ট বন্ধু দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ একে পাঠিয়েছেন, আমিও কথা দিয়েছিলুম এর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেব, এখন আপনারা বিবেচনা করে বলুন, কতটাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করলে এর উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে—

পর্যায়ক্রমে দুই দেওয়ানের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মহারাজ।

রঘুনন্দন মিত্র বলেছিলেন—আমার মনে হয়, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি ধার্য করলে এর উপযুক্ত হবে—

—অসম্ভব—আপত্তি করেছিলেন দেওয়ান-সহবতি রাম-গোপাল চক্রবর্তী—রাজকোষের বর্তমান যা অবস্থা, তা'তে পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিয়ে একজন কবি পোষার কোন যুক্তি নেই, আমাদের সভাপণ্ডিত যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে দুজন পঞ্চাশ টাকা করে বৃত্তি পান, শুধু পণ্ডিত সভার সভাপতি কালিদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চাশ টাকার বেশি পাচ্ছেন, অন্যান্য সকলেই পঞ্চাশ টাকার কম পান, কেউ চল্লিশ, কেউ পয়তাল্লিশ, তাঁরা সকলেই উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিত, ভারতচন্দ্র রায় উচ্চবংশের সন্তান হতে পারেন, কিন্তু ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী কিংবা নবদ্বীপের কোন টোল থেকে উনি কোন উচ্চ উপাধি পেয়েছেন বলে শুনিনি, যদি পেতেন তবে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ তার পত্রে নিশ্চয়ই সে কথা উল্লেখ করতেন, এক্ষেত্রে মহারাজ আমার বক্তব্য, আপনি যদি প্রথমেই ওর বৃত্তি পঞ্চাশ টাকা ধার্য করেন, তাতে আপনার পণ্ডিত সভার অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন, অপমানিত বোধ করবেন, তাছাড়া দেশের যা হালচাল, দিনকাল যা হয়েছে, তাতে আমাদের কাছে এখন একজন কবির চেয়ে একজন গোলন্দাজের প্রয়োজন বেশী, এই যে মদনগোপাল এসেছে ওকেই জিজ্ঞেস করে জানুন, একটা গোলন্দাজবাহিনী তৈরী করতে কি বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন—

তখন রায়-বকশী মদনগোপাল রায় সবেমাত্র এসে আসন গ্রহণ করেছেন।

আগের আলোচনা কিছু শোনেন নি বলেই বোধহয় তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

একটু আগে বিদায় নিয়েছিল ভারতচন্দ্র। তাকে চলে যেতে দেখলেও আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। সামান্য সময় সকলেই চুপচাপ। শুধু গড়গড়ার মৃদু শব্দ। জলাঙ্গীর জলে আষাঢ়ের দীর্ঘ অপরাহ্ন। এক ঝাঁক পানকৌড়ি মাথার উপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে উড়ে গেল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার মুখ তুলে দেখলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন—আপনার কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি ওকে আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে এনেছি, সেক্ষেত্রে কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করতেই হবে, এখন বলুন, আপনার বিবেচনায় কতটাকা ধার্য হওয়া উচিত—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছিলেন দেওয়ান-সহবতি—আপাততঃ গোটা তিরিশের টাকা ধার্য হোক, তারপর যথা সময়ে বিবেচনা করা যাবে—

তারপর কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললেন না। শেষে মহারাজ নাকি মৃদু হেসে বলেছিলেন,

—মিত্রমশাই বললেন পঞ্চাশ টাকা আর দেওয়ান-সহবতি বলছেন তিরিশ টাকা, আচ্ছা আমি এর মাঝামাঝি একটা রফা করে চল্লিশ টাকা মাসিক বৃত্তি ধার্য করছি—

তারপর রামগোপাল চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র—ভুলে যাবেন না, ইনি এক বিশিষ্ট রাজপরিবারের সন্তান, আজ না হয় ভাগ্য বিপর্যয়ে উনি আমার এখানে এসেছেন, নতুবা ভুরশুট রাজবাড়ির সন্তানেরতো আমার দ্বারস্থ হবার কথা নয়—

এসব বিবরণ কয়েকদিন পরে ভারতচন্দ্র শুনেছিল আনন্দিরামের মুখ থেকে।

গতকাল সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছেছিল ফরাসডাঙ্গার ঘাটে। রাত কেটেছে গোন্দলপাড়ায় শিবদাস মুখুজ্জের বাড়িতে। আজ দুপুরে যমুনাদিদি কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়লেন না। গুরুভোজনের পর নৌকোয় এসে শুয়ে পড়েছিল ভারতচন্দ্র আর বিশ্বনাথ। বিকেলের মুখে নৌকো ছেড়েছিল মাঝিরা। আবার উলটো পথে উজান বেয়ে ত্রিবেণী আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে এল। এখন ত্রিবেণীর ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রীদলের আনাগোনা দেখছিল ভারতচন্দ্র। গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতীর সঙ্গমে এই তীর্থস্থান।

প্রয়াগসঙ্গমের যুক্তবেণী এখানে এসে আবার তিনটি ধারায় মুক্তি পেয়ে মুক্তবেণী হয়েছে। কবিকঙ্কনের বর্ণনা মনে পড়ল,

বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥

বোধহয় সকাল কিংবা দুপুরের বর্ণনা। সে সময়েই যাত্রীদের কোলাহল বেশী থাকে।

কিন্তু এখন এই সন্ধ্যার মুখেও ভীড় নেহাত কম নয়। যাত্রী-বোঝাই খেয়ানৌকা গঙ্গার এপার-ওপার করছে। ঘাটের উপরেই দোকানপাট। অনেকে ঘাটে বসে জপতপ সন্ধ্যা-আহ্নিক সারছেন। স্নানও করছেন স্ত্রী-পুরুষ বহুজন। হঠাৎ একজন এই ভীড়ের ভেতর থেকে পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এসে বললেন—চেনা, চেনা মনে হচ্ছে—

—আরে হীরাদা যে—ভারতের কথা শেষ হবার আগেই দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন হীরারাম।

রামচন্দ্র দত্তমুনশীর ছোট ছেলে হীরারাম। বয়সে সামান্য কিছু বড়।

কিন্তু এককালে খুব মাখামাখি ছিল। সেই দেবানন্দপুর। সেই কৈশোর আর প্রথম যৌবনের দিনগুলির স্মৃতি। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলো না ভারত। তারপর এক সঙ্গে অনেক কথা—আপনি এখানে কোথায় এসেছেন?

আপনার বাড়ির সবাই কেমন আছেন, কেশবদা'র খবর কি, উঃ কতকাল পরে দেখা হল, আপনার বাবা, মুন্সীমশাই কেমন আছেন ?

এই শেষ প্রশ্নটির শুধু জবাব দিলেন হীরারাম—ওহো, তুমি জানো না, আর জানবেই বা কি করে, বাবাতো গেল মাঘমাসে—

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল ভারতচন্দ্র। সহসা কোন কথা বলতে পারলো না।

চারপাশে আশ্বিন সন্ধ্যার ম্লান আলো। গঙ্গার ওপারে অপরাহ্নের আকাশ।

আট মাস আগে চলে গেছেন মুন্সীমশাই। কতবার এই পথে আসা যাওয়ার সময় ভেবেছে ভারত। একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই একবার দেবানন্দপুর যাবে। মুন্সীমশাইর সঙ্গে দেখা করে আসবে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ আসেনি, সঙ্কল্প করেও সময় হয়নি। ওই গঙ্গার স্রোতের মত সময় বড় দ্রুত চলে যায়, চলে যাচ্ছে।

সেই কথাই বললো ভারত—আমার অপরাধের কোন সীমা নেই হীরাদা, কতবার ভেবেছি, কিন্তু যাব যাব করেও আর যাওয়া হয়নি, অথচ আপনার বাবার সাহায্য না পেলে, তাঁর অনুগ্রহে শিক্ষার সুযোগ না পেলে আজ আমি হয়তো এতদূর এসে পৌছুতে পারতুম না—

—আমরাওতো আর তোমার কোন খোঁজখবর নিতে পারিনি, তুমি কোথায় আছ, তাই জানতুম না—আস্তে আস্তে বললেন হীরারাম।

—তা' আপনি এখানে কোথায় এসেছিলেন—ভারতচন্দ্রের জিজ্ঞাসার জবাবে জানালেন—আমার মাসীমার বাড়ি এখানে, উনি অসুস্থ তাই দেখতে এসেছিলুম—

ঠিক এই সময় সারদাগ্রামে নরোত্তম আচার্যের বাড়ির সামনে পুকুরের পাশে একরাশ কাঠ কাটছিল রঘুনাথ আর শ্রীহরি। ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে অনেক কাঠের দরকার; আর চার-পাঁচদিন পরে নরোত্তম আচার্যর দৌহিত্রর মুখে ভাত। আচার্যদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির সংখ্যা কম নয় অনেক লোকের আয়োজন। তা'ছাড়া যে কোন গৃহস্থ বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম্বেরা দু'চারদিন আগে থাকতেই আসতে শুরু করেন। কাজ শেষ হবার পরেও যেতে যেতে আরো কয়েকটা দিন কেটে যায়। কমপক্ষে পঁচিশ-তিরিশ জন লোকের অন্ততঃ দশবারোদিনের রান্নার কাঠ যোগাড় রাখতে হবে। তা' কাঠ মন্দ যোগাড় হয়নি। নরোত্তম আচার্যের বাড়ির পেছনে আম-কাঠালের মস্ত বাগান রয়েছে। আরো নানা জাতের গাছ সেখানে। কুল, পেয়ারা, পিটুলি, শিরীষ, জাম, জামরুল। গোটা দুই কুল, একটা শেওড়া, একটা বুড়ো আমগাছ কাটা হয়েছে।

গেল পরশু এখানে এসেছে রঘুনাথ। তখন সামান্য দিবা-নিদ্রার পর বাইরের রোয়াকে বসে তামাক টানছিলেন নরোত্তম। পুবমুখী দালান। তখন সামনের রোয়াকে ছায়া পড়েছে। পায়ের শব্দ শুনে হুঁকো নামালেন নরোত্তম। বা-হাতখানি চোখের উপর তুলে বললেন—কে যায় ?

—আজ্ঞে যাই না, আলাম—

—এ্যা, কে তুমি, কোত্থেকে এলে—

—আইজ্ঞা, মোরে চিনতে পারলেন না—বাঙাল কথার টান শুনেই কতকটা যেন আন্দাজ করতে পেরেছিলেন নরোত্তম—হ্যাঁ চেনা, চেনা ঠেকছে, আমাদের ছোট জামাই বাবাজীর চাকর তুমি, কি যেন নাম তোমার—

—আইজ্ঞা মোর নাম রঘুনাথ শীল, পিতাঠাকুরের নাম বিশ্বনাথ শীল—বলতে বলতে নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল রঘুনাথ।

পরক্ষণেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন নরোত্তম—তুমি কি জামাই বাবাজীর সঙ্গে এসেছে, কোথায় সে, বিশু কোথায়—

যদিও দূরের সব কিছু ঝাপসা দেখেন তথাপি মুখ উঁচু করে তাকালেন।

পাশের ঘরে পালঙ্কে শুয়েছিল রাধা। দু'পাশে নিজের ছেলে আর ভাইপো।

দু'জনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। উঠোনের দিকে দরজার সামনে রোদদুপুরে পিঠ দিয়ে চুল শুকোচ্ছিল মাধবী। ধড়মড় করে উঠে বসল রাধা—আঁখ তো বউ, কে যেন এল, বাবা কার সঙ্গে কথা বলছেন—

সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে গেল। পর মুহূর্তেই ফিরে এসে বললো

—তোমাদের সেই চাকর রঘুনাথ এসেছে, আর কাউকে তো সঙ্গে দেখলাম না—

করেক মুহূর্ত রাধার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে আঁচল গুছিয়ে, আলগা খোঁপা জড়িয়ে নিল। মাথায় আঁচল তুলে সন্তর্পণে বাইরের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। সাবধানে উঁকি মেরে একবার দেখে নিল।

তারপর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রাধা—ওমা, রঘু যে, হঠাৎ তুমি কোথা থেকে এলে—

—আইজ্ঞা, ছোট মা 'ঠান ভুরশুট থিকা আসতাছি—রোয়াকের নিচে দাঁড়িয়েছিল রঘুনাথ। সেখান থেকেই রোয়াকে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। রাধাকে সে ডাকে ছোট মা'ঠান। তারপর যা বললো তার সারমর্ম হ'ল, পেল আষাঢ় মাসে সেজকর্তা অর্থাৎ দয়ারাম রায়ের সঙ্গে সে গোন্দলপাড়া গিয়েছিল। তখন শুনে এসেছিল, ছোটকর্তার নাকি একটি ছেলে হয়েছে। তারপর এই প্রায় মাস তিনেক ধরে অনেকবার সে এখানে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু নানা ঝামেলায় আর সময় পায়নি। সম্প্রতি রাজা মশাই অর্থাৎ নরেন্দ্রনারায়ণের হুকুম হয়েছে যে খবরটা পাকাপাকি নিয়ে আসতে হবে। ছেলেটি কেমন আছে, কতবড় হয়েছে, দেখে আসতে হবে। সেইজন্য এসেছে রঘুনাথ। না, সে কেষ্টনগর যায়নি, ছোটকর্তার সঙ্গে আর দেখাও হয়নি।

নরোত্তম জিজ্ঞেস করলেন—তা' তুমি কিছুদিন এখানে থাকতে পারবে তো, আর কয়েকটা দিন পরেই তোমার ছোটকর্তার ছেলের মুখে ভাত—

—তা' আপনি থাকতি বল্‌লি, অবিশ্যিই—মহাখুশি রঘুনাথ।

নরোত্তমও আশ্বস্ত হলেন। যা হোক একটা বিশ্বাসী কাজের লোক পাওয়া গেল।

শ্রীহরি বুড়ো হয়ে পড়েছে। একা-একা সবদিক সামলাতে পারতো না।

এদিকে বিশ্বনাথ আজো জামাইবাবাজীকে নিয়ে ফিরে এল না। সে এলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করতেন নরোত্তম। কি যে ব্যবস্থা হবে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সুতরাং মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেল রঘুনাথ। দু'দিন ধরে কাঠ কাটা হচ্ছে। আরো তিনটে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি রয়েছে। ছোট ছোট টুকরোয় কেটে উনুনের উপযোগী করে তুলতে আরো একটা দিন লাগবে।

* * *

পরের দিন দুপুর নাগাদ বিশ্বনাথ আর ভারতচন্দ্র এসে পৌছুল। গরুর গাড়িতে মালপত্তর বোঝাই করে পেছন পেছন হেঁটে আসছিল দু'জনে।

গাজীপুরের কাছে নদীর ঘাট থেকে প্রায় দেড়ক্রোশ রাস্তা। মস্ত মাঠের উপর দিয়ে পথ। বাড়ির কাছাকাছি আসতে আসতে খানিকটা দূর থেকে দেখল ভারত মহানিম গাছটার পাশে দু'জন লোক কাঠ কাটছে, কঠের টুকরো সাজিয়ে রাখছে।

কয়েকটা গাছের আড়াল পেড়িয়ে আরো কাছাকাছি এসে দেখতে পেল, দু' জন নয়। একজন। এ বাড়ির বুড়ো চাকর শ্রীহরি ওরফে ছিরু। রাধা ডাকে ছিরুদা।

বাড়ির বয়সে ছোটরা সবাই ডাকে ছিরুদা। ভারতও তাই বলে।

কুড়ুল নামিয়ে রেখে কাছে এগিয়ে এল ছিরু। মালপত্তর সব নামাতে হবে।

কিন্তু আরেকজন গেল কোথায়। ভারত কি ভুল দেখল।

তারপর শ্বশুর মশাইর সঙ্গে সাক্ষাত হ'ল। আত্মীয় কুটুম্বরা সব ঘিরে ধরল।

নানাজনের আলাপ আপ্যায়নের মধ্যে হঠাৎ সেই আবছা দেখা অস্পষ্ট লোকটির কথা আর খেয়াল রইল না। কিন্তু যার জন্য মনে মনে খুব উৎসুক ছিল ভারতচন্দ্র।

সারাটা পথ যার কথা ভাবতে ভাবতে এসেছে, তার সেই ছেলেকে, তার পরীক্ষিৎকে একবার কেউ নিয়ে এল না। আশ্চর্য এদের কাণ্ডজ্ঞান।

দিনের বেলা কথা বলাতো দূরে থাকুক, রাধা তার সামনেই আসবে না। কিন্তু অন্য কেউ তো ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে আসতে পারে।

ব্যাপারটা বোঝা গেল কিছু সময় পরে। তখন স্নান আহ্নিক সেরে ঘরে এসে বসেছে ভারত।

এক গেলাস ঘোলের সরবত নিয়ে এল মাধবী। কপালের উপর ঘোমটা টানা। পেছন পেছন নরোত্তম আচার্যের কাকীমা, সেই ঠানদিদি এলেন।

ভারত বললো—এখন আবার সরবত কেন—

—খেয়ে নিন এইটুকু, রান্না শেষ হতে দেরি হবে। মাধবীর জবাব শোনার পর সামান্য ইতস্তত: করে আবার বললো—খোকা কোথায়, ওকে একবার নিয়ে এসোত দেখি—

মাধবী কিছু বলার আগেই ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন ঠানদিদি—ও জামাই, আমার নাতনি তোমার খোকাকে লুকিয়ে রেখেছে, তুমি এই তিনমাস কোন খোঁজ নাওনি, খবর দাওনি, বলি ভেবেছ কি, আমার নাতনি কি ফ্যালনা—

—কি আর বলবো ঠাকুমা, পরের আশ্রয় থাকি, তাদের অনুমতি না পেলে কি নিজের ইচ্ছেয় আসতে পারি—এক চুমুকে সরবতের গেলাশটি নিঃশেষ করে মাধবীর হাতে ফিরিয়ে দিল ভারতচন্দ্র।

ঠানদিদি আবার বললেন—ওসব কথায় আমরা ভুলছি না, এই রকম কার্তিকের মত চেহারা নিয়ে একা-একা শহরে বন্দরে থাকা, কার পিরিতে মজে আমার নাতনিকে ভুলে আছ কে জানে—

—তেমন ইচ্ছে থাকলে, আমি তো কুলিন বামুনের ছেলে—হাসতে হাসতে জবাব দিল ভারতচন্দ্র—অন্ততঃ আরো গোটা দুই বিয়ে করে ফেললে আটকাতো কে—

—তা' যে করোনি তার পরমান কি—ঠানদিদিও সহজে ছাড়বার পাত্রী নন—গোপনে কোথায় কি করে রেখেছ, কে বলবে—

এমন সময় ছেলেকে নিয়ে ঘরে এল মাধবী। কোলে নেবার জন্য হাত বাড়াল ভারতচন্দ্র। ছেলে কিন্তু অচেনা কারো কাছে কিছুতেই আসবে না। মামীমার আঁচল আঁকড়ে ধরে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল। একবার জোর করে নেবার চেষ্টা করতেই পরিত্রাহি চিৎকার। ছেলেটা তাকে ভুলে গেছে। কেমন অপ্রস্তুত আর বিষণ্ণ বোধ করল ভারত। তারপর অনেক রাতে ছেলে কোলে নিয়ে যখন ঘরে এল রাধা তখন আরেকবার কোলে নেবার চেষ্টা করল—দাও, ওকে আমার কোলে দাও—

এবার ছেলের মা-ই আপত্তি করল, চাপা গলায় বললো—যান আপনার সঙ্গে কথা বলবো না, কেন দেবো আপনার কোলে, আপনি তো ছেলের কথা একটুও ভাবেন না—

—তুমিও যদি এই কথা বলো রাধা, তা হলে আমি যাই কোথায়—

—আস্তে কথা বলুন, ওর ঘুম বড় পাতলা, এক্ষুণি উঠে পড়বে ঘুমন্ত ছেলেকে স্বামীর কোলে দিল। তারপর গলায় আঁচল

দিয়ে প্রণাম করল। প্রদীপের ম্লান আলোয় মুগ্ধ চোখে ছেলেকে দেখছিল ভারতচন্দ্র। তারপর যেন কতকটা কৈফিয়ত দেবার সুরে এই তিনমাসের ঘটনাবলী বলতে শুরু করলো ভারতচন্দ্র।

আনন্দিরাম মুখুজ্জের বাড়ির আড্ডায় প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনে মুখে আঁচল তুলে হাসি চাপতে গিয়ে রাধার চোখে প্রায় জল এসে গেল—ইস্ আপনি কি বলুনতো, অতখানি সিদ্ধি কেউ খায় নাকি—

দুজনের চাপা হাসি আর কথাবার্তায় খোকা নড়েচড়ে উঠলো। রাধা তাড়াতাড়ি ছেলের মাথায় আস্তে আস্তে চাপড় মেরে গুণগুণ করলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার আরম্ভ করলো ভারতচন্দ্র—জলাঙ্গীর ঘাটে মহারাজার বজরা থেকে চলে আসার পর সেদিন আমার ভীষণ উদ্বেগ, কি হবে, কি খবর পাব—

(ক্রমশঃ)


## খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

| | |
|---|---|
| শ্রীগীতা | ৭·৫০ |
| শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম | ৭·০০ |
| ভারত-আত্মার বাণী | ৫·০০ |
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১·৫০ |
| কর্মবাণী | ১·২৫ |
| Soul of India Speaks | 5·00 |

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসাগর | ২·২৫ |
| মানুষের মত মানুষ | ·৭৫ |
| শিশু রামায়ণ | ·৬২ |
| শিশু মহাভারত | ·৭৫ |

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

| | |
|---|---|
| বাংলার ঋষি | ৩·০০ |
| বাংলার মনীষী | ১·৩০ |
| বাংলার বিদুষী | ২·০০ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১·৫০ |
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২·০০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ৪·০০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১·৫০ |
| রবীন্দ্রনাথ | ১·২৫ |
| যুগাচার্য বিবেকানন্দ | ১·৫০ |
| আচার্য জগদীশচন্দ্র | ২·৫০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১·৫০ |

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

( সম্পাদকীয়—৮২৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ )

দেশের' স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। গত ৭ই মার্চ ঢাকা রেস কোর্সের বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবর রহমান তাদের সংগ্রামকে মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে ঘোষণা করে রক্তের মূল্যে এই স্বাধীনতালাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সাড়ে সাতকোটি দেশবাসীকে। মুজিবর রহমান সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। পূর্ববঙ্গের, মুজিবরের 'বাংলাদেশের' নিরস্ত্র মানুষেরা সর্বস্বপণ সঙ্কল্প নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের নৃশংস বর্বর সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করে বাংলাদেশকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে এক অসম সংগ্রামে অকাতরে প্রাণ দিচ্ছেন। মাত্র পাঁচদিনের সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের কয়েক-লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে—নারীপুরুষ নির্বিশেষে শত্রুসৈন্যের দখল থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করবার জন্য। যে সংগ্রাম নিরস্ত্র জনতা অটুট মনোবল নিয়ে সুরু করেছিল, সেই সংগ্রামের পেছনে বাংলাদেশের সকল মানুষ, সংহত, মুহূর্তে সর্বাত্মক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। শেখ মুজিবর পূর্বাহ্নেই দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন হয়ত তিনি তাদের মধ্যে না ও থাকতে পারেন। সে-অবস্থায়ও দেশবাসীকে সর্বস্বপণ সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার ডাক দিয়ে গিয়েছেন। শেখ মুজিবর আত্মগোপন করে আজ এই সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশের মানুষ তাঁর আহ্বানে যে কোনো হাতিয়ার নিয়ে সংগ্রাম সুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ১২০০০ পূর্বপাকিস্তান রাইফেল বাহিনী, পুলিসবাহিনী, পূর্ব বাঙালী রেজিমেন্টের সাত ব্যাটেলিয়ান, ষাট হাজার আনসার ও মুজাহির মুজিবরের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদারবাহিনীকে প্রতিহত করে মুক্তি ফৌজ ইতিমধ্যে চাঁটগা, চালনা বন্দর, কুমিল্লা, খুলনা, যশোহর, ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের আক্রমণ-কারীদের শিবির ঘিরে ফেলেছে কিম্বা দখল করে অস্ত্রশস্ত্র আয়ত্তে নিয়ে মুক্তি ফৌজের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনতার এই সর্বাত্মক সংগ্রাম পৃথিবীর এক বিস্ময়। নিরস্ত্র জনতার সর্বাত্মক বিপ্লবের এরকম নজীর আর পৃথিবীতে নেই। জননেতার আহ্বানে জনসাধারণের অভূতপূর্ব সর্বাত্মক সাড়া দেখা গিয়েছিলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেতাজীর সর্বস্বপণের আহ্বানে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে। বাংলাদেশে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর জীবন-মরণ সংগ্রাম হয়েছিল আর বাংলাদেশের নিরস্ত্র সংগ্রামীদের বিধ্বস্ত করতে পাকিস্তানী শাসকেরা উন্মত্তের মত ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার, রকেট, বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপের পথ নিয়ে বাংলাদেশকে পুরোপুরি সর্বাত্মক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই দেশকে সামরিক দখলে ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখতে চাইছে।

মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনেও ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টি আসন দখল করে জাতীয় এবং প্রাদেশিক ভিত্তিতে সরকারী ক্ষমতা অর্জনের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ছিল ছয় দফা দাবী, যার মূল কথা পূর্ববাংলার এবং অন্যান্য প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন এবং প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং কারেন্সী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন। মুজিবর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব চেয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন নির্বাচিত সংখ্যা-গরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকারকে বানচাল করবার জন্যে পাঞ্জাবী ও সামরিক চক্র বদ্ধপরিকর ছিল।

৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক ভুট্টোর হুমকিতে বন্ধ করবার পর পূর্ববাংলার ব্যাপক বিক্ষোভ দমনে সেনাবাহিনী নির্মম হত্যায় অগ্রণী হলে মুজিবর পূর্ববঙ্গে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। তারপর ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ বেতারে জাতীয় পরিষদ মুলতবীর দায়িত্ব মুজিবরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। অবশ্য বৈঠক কোথায় হবে সে সম্পর্কে অস্পষ্টতা রেখে দেন। ৭ই মার্চ দশ লক্ষ লোকের জনসভায় মুজিবর লক্ষ্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত চূড়ান্ত সংগ্রামের আহ্বান দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে হিংসার বিরুদ্ধে সতর্ক করে চারটি শর্ত সাপেক্ষে ২৫শে মার্চের জাতীয় পরিষদে যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে ঘোষণা করেন। চারটি শর্ত হল (১) সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে (২) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে (৩) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে (৪) পূর্ববাংলার বিক্ষোভ দমনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা তদন্ত করে নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ঘটনার গতি দ্রুত এগিয়ে গেলো। সামরিক আইনের নির্দেশে ১৫ই মার্চ যথারীতি প্রতিরক্ষা বিভাগের সরকারী কর্মচারীদের অফিসে যোগদানের নির্দেশ দিলে তার পূর্বেই মুজিবর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারূপে পূর্ববাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব আওয়ামী লীগের হাতে তুলে নেন। মুজিবর হয়ে উঠলেন পূর্ববাংলার অঘোষিত সর্বময় কর্তা এবং আওয়ামী লীগ শাসক দল, যে ব্যবস্থা পূর্ববাংলার সকল স্তরের সরকারী বেসরকারী মানুষ সানন্দে স্বীকার করে নিয়ে সামরিক শাসকদের সকল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেন। এমন কি হাইকোর্টের জজেরা পর্যন্ত এই বিধান মেনে নিয়ে নবনিযুক্ত সামরিক শাসক জেনারেল টিক্কা খানকে শপথবাক্য পড়াতে অস্বীকার করেন। ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান এলেন পূর্ববাংলার সমস্যা সমাধানের জন্য। কয়েকবার মুজিবরের সঙ্গে বৈঠক করে এবং তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে মুজিবরের উপদেষ্টাদের বৈঠক করিয়ে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় ডাকিয়ে এনে—ভুট্টো সমেত—তাদের সঙ্গে বৈঠক করে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টির ছলনা করলেন যে ইয়াহিয়া খান সত্যই একটা মীমাংসায় আগ্রহী। কিন্তু ইয়াহিয়া দিন গুনছিলেন কখন জাহাজভর্তি পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ববাংলায় এসে পৌঁছায়। এই আয়োজন সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ২৩শে মার্চ থেকে সেনাবাহিনী আবার তৎপর হয়ে ওঠে এবং ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রে আপোষের মুখোশ খুলে ফেলে পূর্ববাংলার মানুষের উপর অন্তিম আক্রমণ সুরু করে সেদিনই মধ্যরাত্রে রাত্রির অন্ধকারে ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে পলায়ন করে করাচীতে পৌঁছায়।

শেখ মুজিবর রহমান এই ছলনায় বিভ্রান্ত হন নাই। পঁচিশ দিনের অহিংস অসহযোগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে প্রস্তুত করেছেন অন্তিম সংগ্রামের জন্য, শত্রুর চূড়ান্ত আঘাত প্রতিহত করবার প্রস্তুতি পরিচালনা করেছেন, সঙ্গোপনে সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি করে এবং বিশ্বের জনমতের সমর্থনলাভের জন্য তিনি যে বিচ্ছিন্নতাকামী নন সে-কথা বোঝাবার জন্য তার সমর্থকদের প্রবলচাপের সম্মুখেও ইয়াহিয়া আঘাত হানবার পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অভিযোগের উত্তরে মুজিবর বার বারই বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠদের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠরাই এই অপরাধে অপরাধী। বাঙালী জাতীয়তাবাদের এই অপরূপ বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি, অখণ্ড বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের উত্তরসাধকের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। পূর্বপাকিস্তানের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ বাংলাদেশের এই সর্বাত্মক বৈপ্লবিক জাতীয় জাগরণের প্রবল স্রোতের সামনে প্রতিহত

হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান মেজর জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত 'সূর্য সেন ব্রিগেড', 'বাঘা যতীন ব্রিগেড' আজ পূর্ব দিগন্তে নূতন অভ্যুদয়ের আলো বহন করে এনেছে। সেই আলোকে পশ্চিম বঙ্গ এবং ভারতবর্ষ আলোকিত হয়ে এই দেশে নব জাতীয়তা-বাদের জন্ম দেবে, বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব বিপ্লব সেই আহ্বানই জানাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে, বিপ্লবী বাঙালীদের সর্বতোভাবে সহায়তা করে আজ পশ্চিম বাংলা ও ভারতবর্ষের মানুষকে দেশবিভাগের প্রায়শ্চিত্ত করবার অমোঘ ঐতিহাসিক আহ্বানকে মেনে নিতেই হবে।

## পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচন

পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচনে সারা ভারতবর্ষের ইন্দিরা-স্রোত মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের শক্তি-বিন্যাস হ্রাস করতে সমর্থ হয় নাই। যুক্তফ্রন্টের আমলে দলীয় তাণ্ডব, সন্ত্রাস ও অত্যাচারের মুখেও মার্ক্সবাদীদের শক্তি-বিন্যাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও পশ্চিম বঙ্গে এবারকার নির্বাচন সামগ্রিকভাবে স্বাধীন, অপক্ষপাত হয়েছে কিনা, কি পরিমাণ সন্ত্রাসের ছায়ায় কিম্বা নির্বাচনী আইন-কানুন বিসর্জন দিয়ে হয়েছে, সে সম্পর্কে নির্বাচকমণ্ডলীর মনে প্রবল সংশয় রয়েছে। কিন্তু মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগী ব্যতীত অন্যান্য দলের তীব্র অভিযোগ ও প্রচার সত্ত্বেও তাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন জেলায় প্রভাব বৃদ্ধি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির অসংহতি, সংগঠনের ও আদর্শ সম্পর্কে নিষ্ঠার অভাব সূচিত করেছে। নির্বাচনের পূর্বে গণতান্ত্রিক সংহতি গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন নির্বাচকদের মনে মার্ক্সবাদীদের বিকল্প গণতান্ত্রিক শক্তি সমাবেশে স্থায়ী সরকারের সম্ভাবনা তাদের এই সংহতিকে জয়ী করতে উৎসাহিত করতো, অপরপক্ষে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে ভোট ভাগাভাগি না হয়ে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি আসন থেকে মার্ক্সবাদীরা বঞ্চিত হতো। সুতরাং, এই ধরণের সংহতির অভাবে একদিকে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল এবং অপরদিকে শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যে নির্বাচকমণ্ডলীদের বাছাই বহুলাংশে সীমিত হয়ে এই দুই দলের মধ্যে ভোটের মেরু সৃষ্টি হয়। সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও শাসক কংগ্রেসের এই সাফল্য দেখা গেছে তাদের নিছক ইন্দিরা-স্রোতের এবং মার্ক্সবাদীদের বিকল্প স্থায়ী সরকার দেবার সম্ভাব্য শক্তিরূপে মধ্যবিত্ত নির্বাচকদের মনে তারা চিহ্নিত হবার জন্য। শাসক কংগ্রেসের ১০৫টির মধ্যে কলকাতার ২২টি (১টি আসনে নির্বাচন বাকী আছে) আসনের ১৬টিতে জয় তাদের এক বিস্ময়কর সাফল্য। এই শহরের অনেক কেন্দ্রে নির্বাচনের ন্যূনতম উদ্যোগও গড়ে তুলতে না পারা সত্ত্বেও শাসক কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয় হয়েছে। শাসক কংগ্রেসের উত্তর বঙ্গে আশাতীত সাফল্য দেখা গেছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ১১টির সব কয়টি, কুচবিহারের ৮টির ৭টি, জলপাই-গুড়ির ১১টির ৯টি তারা দখল করেছে। তেমনি পুরুলিয়ার ১১টির ৯টি আসন তারা পেয়েছে। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দার্জিলিং, হুগলী ও হাওড়াতে তাদের আসন সংখ্যা বেড়েছে। বীরভূমে শাসক কংগ্রেস একটি আসনও পায় নাই এবং বর্ধমানে ও নদীয়ার তাদের আসন সংখ্যা কমেছে।

মার্ক্সবাদীরা ক'লকাতায় যেমন আসন হারিয়েছে তেমনি বর্ধমানে, বীরভূমে, বাঁকুড়ায়, নদীয়ায়, হুগলী এবং হাওড়ায় আসন বাড়িয়েছে। ২৪-পরগণায় তাদের পূর্বেকার আসন বজায় রেখেছে। বর্ধমান জেলায় ২৪টি আসনের (উখড়াতে পরে নির্বাচন হবে) তারা প্রায় ২৩টি আসন (একজন বামপন্থী সংযুক্ত ফ্রন্টের) পেয়েছে। বর্ধমানে শিল্পসমৃদ্ধ আসানসোল এবং দুর্গাপুর তাদের দখলে রেখেছে।

২৪-পরগণার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে তারা ভাটপাড়া এবং বীজপুর কংগ্রেসের কাছে হারিয়েছে এবং টিটাগড়ে তারা অপেক্ষাকৃত অল্প ভোটের ব্যবধানে জিতেছে। শাসক কংগ্রেস এবং মার্ক্সবাদীদের ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে বিভিন্ন জেলায় পারস্পরিক আসনের রদ-বদল এইরূপ :

| | সি, পি, এম | | কংগ্রেস | |
|---|---|---|---|---|
| | ১৯৬৯ | ১৯৭১ | ১৯৬৯ | ১৯৭১ |
| মোট আসন | | | | |
| কলিকাতা (২৩) | ৮ | ৫ | ৬ | ১৬ শাসক |
| ২৪-পরগণা (৫০) | ২৪ | ২৪ | ৪ | ১৪ শাসক |
| মেদিনীপুর (৩৫) | ২ | ৬ | ৭ | ১২ শাসক |
| | | | ১ | আদি |
| বর্ধমান (২৫) | ১৭ | ২১ | ২ | ১ (শা) |
| বীরভূম (১২) | ৩ | ৭ | × | × |
| বাঁকুড়া (১৩) | ৪ | ৮ | × | ৩ (শা) |
| পুরুলিয়া (১১) | × | ৩ | ৫ | ৯ (শা) |
| মুর্শিদাবাদ (১৮) | × | ৩ | ৫ | ৮ (শা) |
| মালদহ (১০) | × | ২ | ৪ | ৫ (শা) |
| পঃ দিনাজপুর (১১) | ২ | × | ৩ | ১১ (শা) |
| জলপাইগুড়ি (১১) | × | ১ | ৭ | ৯ (শা) |
| দার্জিলিং (৫) | × | ১ | ১ | ২ (শা) |
| কুচবিহার (৮) | × | × | ৬ | ৭ (শা) |
| নদীয়া (১৪) | ২ | ১০ | ৫ | ১ (শা) |
| হুগলী (১৮) | ৯ | ১০ | ২ | ৪ (শা) |
| হাওড়া (১৬) | ৮ | ১২ | ১ | ৩ (শা) |

১৯৬৯-র ৮০টি আসন সি, পি, এম, ১১১টিতে বাড়িয়েছে। তাদের সমর্থক নিয়ে সেবারকার নির্বাচনে ছিল ৮৩টি আসন, এবার ১২৩। ১৯৬৯তে দ্বিধাবিভক্তির-পর-শাসক-কংগ্রেসের ছিল ৪৮টি আসন ও বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৫টিতে। এই দুই দলের তুলনায় অন্যান্যদের আসন গুরুতরভাবে হ্রাস পেয়েছে। সি, পি, আই-র ৩০টি ১৩টিতে, ফরওয়ার্ড ব্লকের ২১টি ৩টিতে বাংলা কংগ্রেসের ৩৩টি ৫টিতে, আর এস, পির ১ টি ৩ টিতে, গোর্খা লীগের ৪টি ৭টিতে। এস্ ইউ, সি পূর্বেকার সাতটি আসনই রক্ষা করেছে। বিদ্রোহী পি, এস, পি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আর পি, এস, পি তিনটি আসন পেয়েছে। সংগঠন কংগ্রেস মাত্র ২ টি আসনে জয়ী হয়েছে। সংযুক্ত বামপন্থী গণফ্রন্টের আশা ছিল, কংগ্রেস বিরোধী বামঘেঁষা ভোটগুলি তাদের জোটকে সমর্থন করবে, সি, পি, এম-এর দৌরাত্ম্য দেখবার পর। তাদের সেই অনুমান নির্মমভাবে অগ্রাহ্য করে, এই নির্বাচকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সি, পি, এমকেই বেছে নিয়েছে। আর এদের জাতীয়তাবাদী সমর্থকেরা শাসক কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছে; আর, এস, পির ব্যর্থতার কারণও তাই। এস, ইউ, সির সংগঠন এই দলকে অক্ষত রেখেছে।

মুসলীম লীগ এবার ৭টি আসন পেয়েছে, তার ৪ টি মুর্শিদাবাদে, ২ টি ২৪ পরগণার একটি নদীয়ায়। ১৯৬৯ সালে প্রগ্রেসিভ মুসলীম লীগ পেয়েছিল ৩। মুসলীম লীগ-এর সাম্প্রদায়িক পুনরভ্যুত্থান কিনা তা এখনই স্পষ্ট হবে না। তাছাড়া মুজিবরের স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি পাবার পর পশ্চিম বঙ্গে মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার অবকাশ থাকবে না। ঝাড়খণ্ড দল এই রাজ্যে আর একটি নূতন উদ্যোগ। আদিবাসীদের বিভিন্ন দলের বাইরে এনে একটি সংগঠনে সংহতির প্রচেষ্টা এ-রাজ্যে নূতন হলেও পূর্বাঞ্চলে নূতন নয়। সুতরাং, তাদের এই প্রচেষ্টাও বেশীদূর গড়াবে বলে মনে হয় না।

পশ্চিম বাংলায় মার্ক্সবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি পেলেও, এখনও অমার্ক্সবাদী শক্তির সংখ্যাধিক্য এবারকার ভোটের পারস্পরিক শতকরা হার থেকে বোঝা যাবে। সেই সঙ্গে পর পর তিনটি নির্বাচনের শতকরা ভোটের ওঠানামা

অরশ্রী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি

[ সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী ]

( ৮নং রুল দ্রষ্টব্য )

| | | |
|---|---|---|
| ১। | যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা : | ২০১ বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ |
| ২। | প্রকাশের কাল : | মাসিক |
| ৩। | মুদ্রাকরের নাম, জাতি, | কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়, |
| | ঠিকানা : | ১০।৬৯এ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩ |
| ৪। | প্রকাশকের নাম, জাতি, | কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়, |
| | ঠিকানা : | ১০।৬৯এ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩ |
| ৫। | সম্পাদকের নাম, জাতি, | সুনীল দাস, ভারতীয়, |
| | ঠিকানা : | ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ |
| ৬। | স্বত্বাধিকারীর নাম | সুনীল দাস, ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলি-২৬ |
| | ঠিকানা : | বিজয় নাগ, ২৫১এ।৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪৭ |

আমি, কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। স্বাঃ

কিরণচন্দ্র মিত্র

প্রকাশক

২।৩।৭১

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অন্যান্য দলের ভোট কমলেও, মার্ক্সবাদীদের ভোটের শতকরা বৃদ্ধির দিকে।

বিধান সভায় প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার :

| | ১৯৭১ | ১৯৬৯ | ১৯৬৭ |
|---|---|---|---|
| সি, পি, এম | ৩১·৯৬ | ১৯·৯৭ | ১৮·১২ |
| শাসক কংগ্রেস | ২৮·২০ | ৪১·৩২ | ৪১·১৩ |
| সংগঠন কংগ্রেস | ৫.৫৮ | | |
| কম্যুনিষ্ট পার্টি | ৮·১৩ | ৭·০০ | ৬·৫৩ |
| বাংলা কংগ্রেস | ৫·১৮ | ৮·১৭ | ১০·৬১ |
| ফরোয়ার্ড ব্লক | ২·৭৪ | ৫·০১ | ৪·৪৩ |

ভোটের এই শতকরা হার বিচার করে আগামী দিনে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংহতি গড়ে উঠলে পশ্চিম বাংলায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রয়োজনের সীমানা ক্রমঃসঙ্কুচিত না হয়ে বর্ধিত হবে। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি কি সে পথ গ্রহণ করবে?

## নূতন কেন্দ্রীয় সরকার

গত ১৮ই মার্চ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৩ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ১৫ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৮ জন উপমন্ত্রী নিয়ে নূতন মন্ত্রী সভা গঠন করেছেন। দীনেশ, সিং, নন্দ, ডঃ ত্রিগুণা সেন, ভগত, ডঃ ভি, কে, আর ভি, রাও, সঞ্জীবায়া প্রভৃতি ৭ জন প্রাক্তন মন্ত্রী বাদ পড়েছেন আর নবাগতদের মধ্যে আছেন কুমারমঙ্গলম, সিদ্ধার্থ রায়, গোখেল, রাজ বাহাদুর এবং মৈমুল হক। স্বভাবতই বিপুল সংখ্যাধিক্যে শাসক কংগ্রেস দলকে জয়ী করে ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রীসভায় পছন্দসই লোকদের বাছাই করেছেন এবং যাদের নানাকারণে পছন্দ নয়, এই সুযোগে তাদের খারিজ করে দিয়েছেন। মন্ত্রীসভার নতুন মুখদের মধ্যে কুমারমঙ্গলম একদা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং এয়ার লাইনস করপোরেশনের চেয়ারম্যান রূপে ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করেন। সিদ্ধার্থ রায় আইনজীবি, শিক্ষার সঙ্গে একেবারেই যোগসূত্রহীন। রাজ বাহাদুর নেপালের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। গোখেল ছিলেন হাইকোর্টের জজ। সঞ্জীবায়াকে দলের সভাপতি করা হয়েছে, জগজীবন রাম মন্ত্রী ও এই পদটি আর এক সঙ্গে রাখতে পারেন নি। জগজীবন রাম, চ্যবন, ফকরুদ্দীন এবং সরণ সিং-এর দপ্তর অপরিবর্তিত থাকলেও আসামের মৈমুল হকের শিল্পোন্নয়ন দপ্তরে নিয়োগ, মন্ত্রীসভা থেকে ফকরুদ্দীন-এর বিদায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই মন্ত্রীসভায় অনেক রাজ্য যাজাতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব পেয়েছেন, যেমন মহারাষ্ট্র তেমনি অনেক রাজ্য সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পায় নাই। উত্তর প্রদেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া, আর কেউ মন্ত্রীসভা নেই। নূতন পরিস্থিতিতে মন্ত্রীসভার সংযোগবিধানে এবং কর্মসূচী রূপায়নের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য, প্রধানমন্ত্রীর কোনো দপ্তরের ভারমুক্ত থাকার প্রয়োজন থাকলেও স্বরাষ্ট্র দপ্তর, বেতার ও তথ্য দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের ভার নিজ হাতে রেখে প্রধান মন্ত্রী তার দায়িত্বভারকে গুরুতররূপে বৃদ্ধি করে কেন রেখেছেন, এ-প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে। তার অনেক সমর্থকও এই মন্ত্রীসভায় আশাহত হয়েছেন। আবার কয়েকমাসের মধ্যেই মন্ত্রীসভা ঢেলে সেজে আরও নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে। আগামী দিনে মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের অসাম্য দূর হলে ইন্দিরা মন্ত্রীসভার প্রকৃতি নিরূপণ সহজ হবে। ইন্দিরা-আনুগত্যই মন্ত্রীসভার একমাত্র নিয়ামক হবে, না শাসক কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি রূপায়নে যোগ্যব্যক্তির স্থান মন্ত্রীসভায় নির্দিষ্ট হবে—সেদিন তা পরিষ্কার হবে। ৩৬ জনের মন্ত্রীসভায় নূতন মুখ থাকলেও নূতন গতিবেগ সঞ্চয়ের প্রতিশ্রুতি নেই। ৩০. ৩. ৭১

২০৯ বি, বিধান সরণিস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

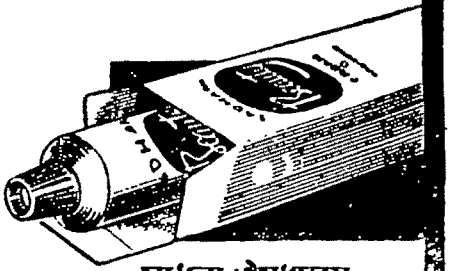

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৩

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs1·70
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47.

চৈত্র .
১৩৭৭

# জয়শ্রী

প্রতিষ্ঠাত্রী – সম্পাদিকা
লীলা রায়

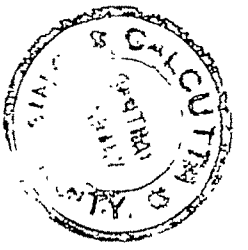

# সূচীপত্র

চৈত্র ১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৮৭৩ |
| জাগরণ ও বিস্ফোরণ ১৯১৪ (ধারাবাহিক রচনা) | কালীচরণ ঘোষ | ৮৮১ |
| সুভাষচন্দ্র ও ভারত-চিন্তা (ধারাবাহিক আলোচনা) | রবি রায় | ৮৮৯ |
| স্মরণী বন্ধু ক্ষিতীশ রায় (জীবন আলেখ্য) | বেণুগোপাল রায় | ৮৯৭ |
| নিত্যরঞ্জন গুপ্ত (জীবন স্মৃতি) | অর্পণা সেন | ৯০৫ |
| কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস) | মিহির মুখোপাধ্যায় | ৯০৭ |
| আপানের দিনগুলি (ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী) | বারীন বর্দ্ধন | ৯১০ |
| জাতীয়তার রূপায়ণ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) | দীপঙ্কর | ৯১৯ |


সম্পাদক : সুনীল দাস


## খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

| | |
|---|---|
| শ্রীগীতা | ৭·৫০ |
| শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম | ৭·০০ |
| ভারত-আত্মার বাণী | ৫·০০ |
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | ১·৫০ |
| কর্মবাণী | ১·২৫ |
| Soul of India Speaks | 5·00 |

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

| | |
|---|---|
| বিদ্যাসাগর | ২·২৫ |
| মানুষের মত মানুষ | ·৭৫ |
| শিশু রামায়ণ | ·৬২ |
| শিশু মহাভারত | ·৭৫ |

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

| | |
|---|---|
| বাংলার ঋষি | ৩·০০ |
| বাংলার মনীষী | ১·৩০ |
| বাংলার বিদুষী | ২·০০ |
| বীরত্বে বাঙালী | ১·৫০ |
| ব্যায়ামে বাঙালী | ২·০০ |
| বিজ্ঞানে বাঙালী | ৪·০০ |
| রাজর্ষি রামমোহন | ১·৫০ |
| রবীন্দ্রনাথ | ১·২৫ |
| যুগাচার্য বিবেকানন্দ | ১·৫০ |
| আচার্য জগদীশচন্দ্র | ২·৫০ |
| আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | ১·৫০ |

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

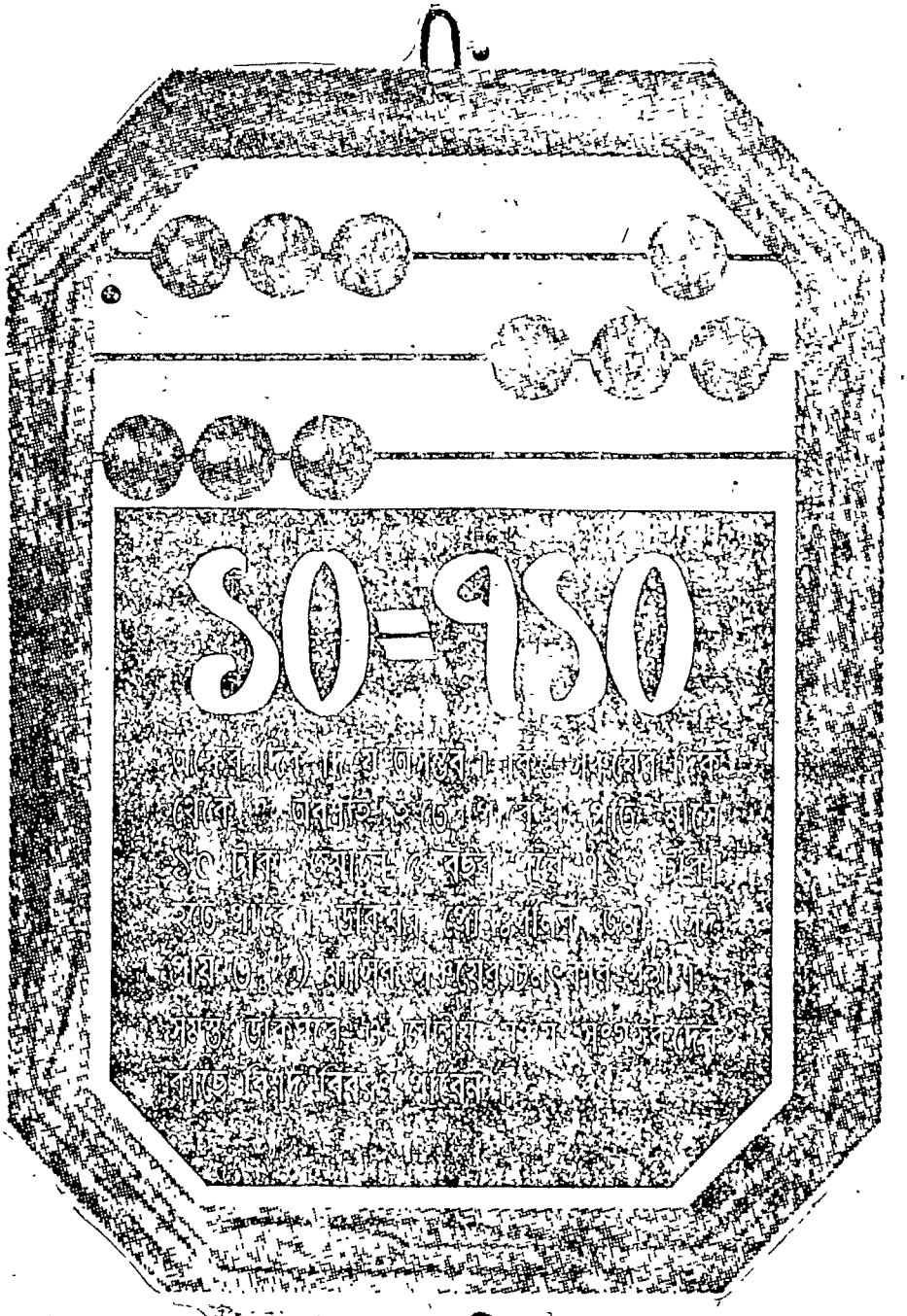


জাতীয়
সঞ্চয় সংস্থা

davp 70/664

জয়শ্রী

৩৫ বর্ষ ০ দ্বাদশ সংখ্যা ০ চৈত্র ১৩৭৭

## সম্পাদকীয়

### ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়

বাংলার অন্যতম বিপ্লবী, 'শ্রীসঙ্ঘের' বিশিষ্ট সদস্য শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র রায় গত ১০ই এপ্রিল দক্ষিণ ক'লকাতার রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিছুদিন যাবৎই তিনি রক্তের চাপ এবং হৃদরোগে ভুগছিলেন। এই শারীরিক গ্লানি নিয়েই প্রাত্যহিক জীবনের অবিরাম টানাপোড়েনের মধ্যেও 'জয়শ্রী'র জন্য তাঁর ভাবনা ছিল, নানাভাবে জয়শ্রীর উৎকর্ষ বিধানের জন্য আলোচনা করতেন। মূল্যবান পরামর্শ দিতেন এবং সর্বদাই 'জয়শ্রী'র শ্রীবৃদ্ধি কামনা করতেন। জয়শ্রীর প্রতি তাঁর এই মমত্ববোধ গত কয়েকবছরের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে তাঁকে 'জয়শ্রী'র পরিচালকদের কাছে একজন অন্তরঙ্গ আপনজনরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। বিপ্লবী জীবনের প্রচারবিমুখ অনাশক্তি তাঁর মনের একটি সহজাত সম্পর্কে পরিণতি পেয়েছিলো। তাঁর এই মানসিক গড়নের দুর্ভেদ্য আস্তরণ অতিক্রম করে যারাই তাঁর নিকট সান্নিধ্যে পৌঁছোন, তারা একটি দুর্লভ সংস্কৃতিবান উষ্ণ মানবিক প্রস্রবণ আবিষ্কার করেছেন তাঁর মনের গভীরে। বাইরের পৃথিবীর কাছে একজন অনাড়ম্বর, শিক্ষিত, একদা-বিপ্লবী মানুষরূপেই যাঁর পরিচয় সীমিত ছিল, তাঁর উষ্ণ-সান্নিধ্যে মানুষদের কাছে, তাঁর পরিচয় ছিল একেবারে ভিন্নতর। তাঁর মননার গভীরতা, চিন্তার ব্যাপকতা, মানবিক সহমর্মিতা ও সার্বিক উদারতা তাদের জন্য একটি স্বার্থলেশহীন আকর্ষণীয় সান্নিধ্য রচনা করে রেখেছিলো, যে সান্নিধ্যের জন্য প্রাত্যহিক অকিঞ্চিৎকতার মধ্যেও কিছু লোক উন্মুখ হয়ে থাকতো মানসিক অবকাশ যাপনের মধ্য দিয়ে নিজেকে আরও পূর্ণতর করে নিতে। ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের লোকান্তরে এই উন্মুখতার বঞ্চনা যাদের বেদনার্ত করবে, তাদের সংখ্যা কম হলেও, 'জয়শ্রী'র পরিচালকেরা তাদের সমগোত্রীয়। জয়শ্রীর পৃষ্ঠায় 'পথচারী' ছদ্মনামে নানাধরণের যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আর সংযোজন হবে না। কারণ 'পথচারী' ক্ষিতীশচন্দ্র রায় আজ লোকান্তরের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। এই ক্ষতির স্বাক্ষর 'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠায় চিরকালের মত আঁকা হয়ে রইলো।

ক্ষিতীশচন্দ্র বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের স্বগ্রামবাসী এবং কৈশোর থেকেই তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। মনের জগতে, চিন্তার জগতে বিপ্লবের স্ফুরণ কর্মের জগতে উত্তরণের পরই তাকে সার্থক বিপ্লব বলা চলে। মনের রাজ্য থেকে কর্মের রাজ্যে এই অতিক্রমণই বিপ্লবীর যথার্থ পরিচয়। তাই বিপ্লবীদের মননার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিপ্লবী ক্ষিতীশ রায়ের জীবনেও এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার

অবকাশ দেখা গেছে। তাই বিপ্লবী জীবনে প্রতিশ্রুত হয়েও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন অল্প কালের জন্য। ছক-কাটা চিন্তার রীতি-বিরোধী যারা—যাদের নন্-কনফরমিষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে—তাদের কাছে বিপ্লবী চরিত্রে এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান থাকলেও যারা ছক্ কাটা পথে চলতে অভ্যস্ত বিপ্লব-কর্মকেও ছকে ফেলেই তারা দেখতে চান্। তাদের কাছে এই ব্যতিক্রম ভ্রূকুটি পেয়ে থাকবে। কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্রের চরিত্রে এই নন্-কনফরমিসম প্রবলভাবে বাসা বেঁধেছিল। এ-জন্য তাঁকে কোনো কোনো সময় ভুল বুঝবার অবকাশ থাকলেও অনাসক্ত বিপ্লবীর মানবিক চরিত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। খেলাধূলা, লেখাপড়া ও কর্মকেন্দ্রও তার নন্-কনফরমিসম-এর স্বাক্ষর রয়ে গেছে। জীবনের কোনোদিকেই ছক কাটা গতিচ্ছন্দে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। খেলাধূলায় যখন চরম উৎকর্ষতা করায়ত্ত হোলো, খেলাধূলার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। আবার ঠিক তেমনি চলতি খেলার বাইরে হা-ডু-ডুতে গভীর আকর্ষণ দেখা গেছে। শরীর চর্চার ক্ষেত্রেও তাই। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তাই। তিনি বিজ্ঞানক্লাশের ছাত্র যেমন ছিলেন, তেমনি সাহিত্যের প্রতিও, ইংরাজী ও বাংলা উভয়ক্ষেত্রেই—তার প্রবল অনুরাগ ছিল। ঢাকায় বিপ্লবকর্মের উদ্যোগপর্বে মালিটোলার মেসে তাঁর ঘরটি ছিল একটি বিপ্লবীচক্র। সেদিনও তিনি সামনে বড় একটা আসতেন না, অথচ তরুণদের ভিড় ছিল তাঁর ঘরে। আলাপ আলোচনা বৈঠক শরীর চর্চা লেখাপড়া বহু তরুণের অন্তরালবর্তী উৎস ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র। ১৯৩০-এর এপ্রিলে নেতা অনিল রায়ের সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন ক'লকাতায় এবং হুগলী-হিজলী-দেউলী বন্দী নিবাস এবং প্রেসিডেন্সী জেলে কয়েকবছর বন্দী থাকার পর ১৯৩৮এ মুক্তি পান। জেলখানার আদর্শগত দ্বন্দ্ব সংঘাতে কিছুদিন একান্ত জীবনের দিকে ঝুঁকলেও ধীরে ধীরে ক্ষিতীশচন্দ্র আদর্শগত গোষ্ঠীজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না রাখতে পারলেও অনিল রায় ও লীলা রায়ের কর্মসাধনার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থেকেছেন। বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের মৃত্যুর পর তিনি দেশনেত্রী লীলা রায়ের কর্মসাধনার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত থেকে 'জয়শ্রী' সম্পাদনার এবং অন্যান্য কাজে সহায়তা করেন। ইদানীং ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও নেতাজীর আদর্শের ভিত্তিতে মানুষ গড়ার কাজে তরুণ বন্ধুদের উৎসাহিত করতেন।

শিক্ষকতায় তাঁর জুড়ি ছিল না। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বহু ছেলেদের পড়িয়েছেন। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে নিজে তিনি তখনও ডিগ্রি নেন নাই, অথচ ডিগ্রি পরীক্ষার ছাত্রদের অনায়াসে পড়িয়েছেন। শুধু পড়িয়েছেন বললে কম বলা হয়, তার পাণ্ডিত্য, পড়ানোর ধরন ছাত্র এবং অভিভাবকদের পরবর্তীকালে দেখা গেছে বিপ্লবীজীবনের বন্ধুরা তাদের দুরন্ত ছেলেদের তাঁর হেফাজতে দিয়ে গেছেন মানুষ করবার জন্য। অল্পসময়ের মধ্যেই এই সব দুরন্ত ছেলেরা তার চরিত্র-মাধুর্যে, পাঠন-পদ্ধতিতে মনোযোগী ছাত্র হয়ে উঠে ছে। কুমিল্লার শ্রীকাইল কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার সময়ও কলেজের ছাত্রদের উপর তাঁর মধুর প্রভাব কিম্বদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েও, তাঁকে কখনও পেছনের সারি থেকে সামনের সারিতে আনা যায়নি। ঘরোয়া আলাপ-আলোচনায় যে-ব্যক্তি তাঁর বৈদগ্ধ্যের দীপ্তি ছড়িয়ে ছোট-বড় সকল বয়সের বন্ধুদের চিত্তজয় করতেন তাঁকে কোনোদিন আনুষ্ঠানিক সভ্য-সমিতির সদরে এসে দাঁড়াতে রাজী করানো যায় নাই। একবারই শুধু এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করে ক্ষিতীশচন্দ্র পাঠ করেছিলেন। সে জীবনী শুধু ঘটনার সমাবেশ ছিল না। কয়েকটি কথার আঁচড়ে ভাব ও ভাষা সমৃদ্ধ বিচিত্রকার্য

পুরুষের অদ্ভুত চরিত্র-চিত্রন ক্ষিতীশচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে আছে।

তাঁর লোকান্তরে জয়শ্রীর ক্ষতি অপূরণীয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং পরিজনদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

## বাংলা দেশ-এর সংগ্রাম

আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত আশীহাজার পাক-ফৌজের অবর্ণনীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশ-এর মুক্তি ফৌজ অমিতবিক্রমে একমাসকাল তাদের সংগ্রাম পরিচালনা করে ইতিহাসের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তি ফৌজের অগ্রভাগে রয়েছে পূর্বপাকিস্তান রাইফেল বাহিনী ও ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় আঠার হাজার আধাসামরিক বাহিনী, তাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার পুলিশবাহিনী, আনসার, মুজাহিদ এবং সাধারণ মানুষ যে যেমন অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছে, তা নিয়েই সংগ্রাম করে গেছে। এমন কি বাঁশের বর্শাও তাদের হাতে হাতিয়ারের কাজ করেছে। ট্যাঙ্ক, রকেট, বোমারু বিমান, মর্টার, দূর পাল্লার ভারী কামান, নাপাম বোমা, বিষাক্ত-বোমা, কামান বহনকারী গাড়ী, গানবোট—এমন আধুনিক মারণাস্ত্র অস্ত্র নাই যা পাকিস্তানী সেনারা প্রায়-নিরস্ত্র মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে এবং নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়েছে। মুক্তি ফৌজের একমাত্র সম্বল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, স্বাধীনতার জন্য তার মরণপণ সংগ্রামের নির্দেশ, 'বাংলা দেশ'-এর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বস্বপণ সংগ্রামের দুর্জয় মনোবল। শুধু এই পুঁজি নিয়েই যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুক্তি ফৌজ পাক সেনাবাহিনীকে যশোর, খুলনা, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, রংপুর, সৈয়দপুর, রাজসাহীর ছাউনী এলাকায় অবরোধ করে বাংলাদেশ-এর উনিশটি জেলার বারটি জেলাকেই শত্রু কবল মুক্ত করেছিলো। 'বাংলাদেশ'-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিন ডিভিশন পাকিস্তানের সামরিক অভিযান আরম্ভ হবার পূর্বে মোতায়েন ছিল। কিন্তু জল্লাদ ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ থেকে ঢাকায় মুজিবরের সঙ্গে আলোচনার ছলনা শুরু করবার পর সেখানে আরও সৈন্য, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে 'বাংলা দেশ'-এ মজুদ পাকিস্তানী সেনা-বাহিনীর সংখ্যা আশী হাজারে বৃদ্ধি করে। ১৮ই মার্চ থেকে এরা চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে শুরু করলে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এই যুদ্ধোপকরণ খালাস করতে বন্দরের কর্মীদের অস্বীকৃতির উত্তরে সেদিন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করে। তারপর জয়দেবপুর, ঢাকা, রাজসাহীতে পর পর ২৩শে মার্চ পর্যন্ত গুলি বর্ষণের মধ্য দিয়ে আসন্ন আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ২৩শে মার্চ সমগ্র পূর্ববঙ্গে প্রতিরোধ দিবসরূপে প্রতিপালিত হয়। সেদিন পাকিস্তানী-বাহিনী জবরদস্তি ঢাকা বেতার কেন্দ্রে প্রবেশ করে, বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানী জাতীয় দিবসরূপে ঐ দিনটি পশ্চিম পাকিস্তানে পালিত হয়—প্রচারের চেষ্টা করলে বিরোধ বাধে।

পাকিস্তানী সামরিক দস্যুদের এই পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অস্পষ্ট ধারণা ছিল বলে পরবর্তী ঘটনা থেকে মনে হয়। ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার আন্দোলনকে যেরূপ দমনমূলক অত্যাচারে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা স্তব্ধ করেছে, এবার আরও প্রচণ্ড আঘাতে তাকে পর্যুদস্ত করবার জন্য তারা প্রস্তুত হয়েছে—এরকম একটা অনুমানের উপর ভিত্তি করেই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের সংগ্রাম কৌশল রচনা করে থাকবেন। ২৫ শে মার্চ রাত্রির অন্ধকারে ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে পলায়ন করবে, এবং তার অব্যবহিত পরে বেছে বেছে বিভিন্ন সহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, রাজনৈতিক দলের নেতা,

উকিল, ডাক্তার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক কথায় যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং আগামী দিনে স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারবে, তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় টেনে এনে নির্বিচারে হত্যা করবে, পুলিশ-বাহিনীর সদর দপ্তরগুলিতে হানা দিয়েই সেই রাত্রেই অতর্কিতে নিদ্রিত পুলিশবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নির্বিচারে হত্যা করবে—আক্রমণের এই বর্বর পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো সন্দেহই সংগ্রামী নেতৃত্বের মনে দেখা দেয় নাই। ঢাকা শহরে এবং অন্যত্র এলাকার পর এলাকা জ্বালিয়ে দেবে। অসহায় নারীদের উপর পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়বে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করবে—এককথায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালী উৎসাদনের পৈশাচিক মত্ততায় চীন-আমেরিকা-রাশিয়া-ফ্রান্স সেন্টো-সিয়াটোভুক্ত দেশ থেকে পাওয়া আধুনিক সর্ববিধ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে যত দ্রুত সম্ভব তাদের নিঃশেষ করে দেবে, কিম্বা বশ্যতায় আনতে বদ্ধপরিকর হবে—যে বর্বরতা নাৎসী বর্বতাকে হার মানাবে—স্বপ্নেও একথা 'বাংলা দেশ'-এর সংগ্রামী নেতারা ভাবতে পারেন নি। গত ডিসেম্বরের নির্বাচন, এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রায়-সামগ্রিক জয়ের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীরূপে ইথাহিয়ার বিবৃতি, জাতীয় পরিষদের বৈঠকের দিন নির্বাচন এবং ৩রা মার্চের বৈঠক বন্ধ করে দেবার পর ঢাকায় এসে মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাংবিধানিক আলোচনা—ঘটনা পরম্পরা সামরিক বাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ছলনামাত্র—'বাংলা দেশ'-এর সংগ্রামী নেতৃত্ব তা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন নি।

তবুও সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় একমাত্র দুর্জয় মনোবল সম্বল করে 'বাংলা দেশ'-এর সাড়ে সাত কোটি মানুষ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সমরাস্ত্রের সঙ্গে প্রায় তিন সপ্তাহকাল সংগ্রামে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। উত্তর ও পূর্ব রণাঙ্গণ তাদের করায়ত্ত ছিল, এক ঢাকা ছাড়া, যেখানে পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক ছাউনি রয়েছে—পশ্চিম রণাঙ্গন 'বাংলাদেশ'-এর সংগ্রামীদের দখলে ছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণের খুলনা-যশোহর ছাউনি ছাড়া এই রণাঙ্গনেও অধিকাংশই এলাকাই তাদের দখলে ছিল। কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যেও পাকিস্তানের বোমারু বিমানের আড়ালে তাদের সামরিক বাহিনী অভিযান সুরু করলে। ছত্রীসৈন্য আকাশ পথে নামাতে সুরু করলে এবং পূর্ববঙ্গের আভ্যন্তরীণ জলপথে ছোট ছোট সামরিক জাহাজ পরিচালিত ক'রলে অবস্থার রূপান্তর ঘটে। প্রতিটি রণাঙ্গনে মুক্তি ফৌজ পিছু হটেছে। শহরাঞ্চল তাদের দখলে চলে গেছে, বাড়ী-ঘর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে। হয়েছে, ট্যাঙ্ক এনে শহরের প্রতিরোধ চুড়মার করা হয়েছে, নাপাম বোমায় দরিদ্র গ্রামবাসীর চালাঘরগুলি পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিষাক্ত গ্যাসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবুও বাংলা দেশের শতকরা ৯০ ভাগ সংগ্রামীদের দখলে রয়েছে। মুক্তি ফৌজ গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে শত্রুক ধ্বংস করে দিচ্ছে, সেতু উড়িয়ে দিচ্ছে, খাল-বিল-ঝোপ-ঝাড় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে অতর্কিত আক্রমণে শত্রুসৈন্য পর্যুদস্ত করছে। 'বাংলা দেশ'-এ বর্ষা নেমে এসেছে, বর্ষায় যুদ্ধের স্তিমিত গতির আড়ালে মুক্তি ফৌজের সামরিক কম্যাণ্ডের সংহতি সাধন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ও প্রশাসনিক সংহতি সাধন করে সংগ্রাম পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করে প্রস্তুত হতে হবে। এরিমধ্যে তাদের কাছে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও সাহায্য না পৌঁছালে এই সংগ্রামের গতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন অনিবার্য্য হয়ে উঠবে।

## বিভিন্ন রাষ্ট্র কি করছে

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 'বাংলা দেশ' বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে এ-পর্যন্ত ব্যর্থ

হয়েছে। ভারতীয় পার্লামেন্ট পূর্ববাংলার মানুষের সংগ্রামে সহানুভূতি, পাকিস্তানী আক্রমণের নিন্দা করে, যারা পূর্ববাংলা থেকে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে আসছে তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলা দেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে স্বীকৃতি দেয় নাই। পূর্ববাংলার বৈদেশিক সাংবাদিকদের একটি দলকে ২৫শে মার্চের রাত্রে ঘরবন্দী করে করাচী দিয়ে পার করিয়ে দিলেও বৈদেশিক সাংবাদিকদের সূত্রে লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী মার্কিণী সংবাদপত্রে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে পরিবেশিত হবার পর সেখানকার জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছে অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং পূর্ববঙ্গের ঘটনা আর পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঘটনা নয়, এই মর্মে বিভিন্ন বৈদেশিক মহলের বিভিন্ন মত ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু, সরকারী স্তরে কোনো রাষ্ট্রই স্বীকৃতিদানের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে নাই এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রই পূর্ববঙ্গের ঘটনা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঘটনা এই অজুহাতের আড়ালে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় স্থির রয়েছে। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পডগরণী ইয়াহিয়াকে পত্র দিয়ে পূর্ববঙ্গের রক্তপাত বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমেরিকার রবার্ট কেনেডি এই ঘটনাকে গণহত্যারূপে চিহ্নিত করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখনও নির্বিকার। ইংলণ্ডের শ্রমিক দল হস্তক্ষেপের দাবী করলেও, সরকার খুব সাবধানতার ভাব অবলম্বন করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার সরকারীপত্রে ইসলামাবাদের তীব্র নিন্দা করলেও সরকারীস্তরে তারাও নীরব। আরব রাষ্ট্রগুলি পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। পাকিস্তানের সেন্টো জোটের সঙ্গী ইরান এবং তুর্কী সমরাস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন করছে, ফরাসী-জার্মানী কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই এবং চীন সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমনে ইয়াহিয়ার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে।

বৃহৎ শক্তিগুলিরও যেমন এই সংঘাতে প্রভূত দায়িত্ব রয়েছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দিক থেকে তাদের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী, তেমনি ভারতবর্ষের দায়িত্ব রয়েছে সব চাইতে বেশী। 'বাংলাদেশ' ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাজ্য দ্বিজাতিতত্ত্বের ভস্মস্তূপ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকারের ও ধর্মনিরপেক্ষতার দাবী নিয়ে যার আত্মপ্রকাশকে বর্বর আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ইসলামী রাষ্ট্র চুরমার করতে বদ্ধপরিকর। এই রাজ্যের স্বীকৃতি যত বিলম্বিত হবে, নিদারুণ অসম যুদ্ধে সেখানকার গণতান্ত্রিক শক্তি ততই ক্রুদ্ধ পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে; উগ্রপন্থীদের আধিপত্য বিস্তৃত হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী শক্তিসমূহ ভারতবর্ষের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সাহায্যে 'বাংলাদেশ'এ দৃঢ়মূল হয়ে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরী করবে। ভারতবর্ষ বিলম্বিত সিদ্ধান্তে এই ভাবে তার সীমান্তে বিপদ ডেকে আনবে। তাছাড়া 'বাংলাদেশ' স্বীকৃতি না পেলে, ভারতবর্ষের সামরিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শত্রু সৈন্যের হাতে দারুণভাবে পর্যুদস্ত হ'য়ে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের দুর্গত হিন্দু-মুসলমান আশ্রয়হীন ক্ষুধার্ত নর-নারী-শিশু ভারতের পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় নেবে। এই উদ্বাস্তু স্রোত ভারতবর্ষের আর্থিক কাঠামো বিপর্যস্ত করবে এবং এই অঞ্চলের অস্থির সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আরও দুর্বার অস্থিরতা আনবে। যে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ-দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এবং বিদেশের চরেরা পূর্বাঞ্চল ভারতে প্রবল বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন গড়ে সশস্ত্র অভিযানের দিকে এগিয়ে যাবে। 'বাংলাদেশ' কে স্বীকৃতি দিলে যে বহিঃসংঘাতের বিবাদের ঝুঁকি নিতে ভারতসরকার দ্বিধা করছে, বিলম্ব হলে তার ঘাত-প্রতিঘাত পূর্বাঞ্চল ভারতের সীমান্তের এপারে ও ওপারে তার চাইতে গুরুতর আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিবাদের সম্মুখীন হবে। 'বাংলাদেশে'এ সাতকোটি মানুষের স্বাধিকারের মানবতার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের

স্বার্থে যেমন ভারতবর্ষের জাতীয় স্বার্থেও অবিলম্বে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়া ভারতসরকারের কর্তব্য। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা ধ্বজা বহনের দাবী রাখে সে-সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রেরও নিজ নিজ স্বার্থে 'বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি দেবার অনিবার্য দায়িত্ব রয়ে গেছে।

## বাংলা দেশে-এর সরকার

১৩ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ-এর প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হবার পর, ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায় নূতন সরকার জন্ম নিলো এবং সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ, খোন্দকার মুস্তাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং কামারুজ্জামান ও মনসুর আলি মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যভার পরিচালনা করবেন। বৈদ্যনাথতলার নূতন নামকরণ হোলো মুজিবনগর। কর্নেল উসমানি প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন।

এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের অন্যতম স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন। এই ঘোষণা পত্রটি ১০ই এপ্রিল গৃহীত হয়েছিল। এই ঘোষণাটি ২৬শে মার্চ থেকেই কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। ঘোষণা পত্রটিতে বলা হয়েছে:

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলা দেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এবং যেহেতু ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনীভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলা দেশের গণপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনা চলাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ন্যায়নীতির বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটী মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথ ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলা দেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলা দেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলা দেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনার দ্বারা বাংলা দেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এবং যেহেতু বাংলা দেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলা দেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলা দেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যাণ্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলা দেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য দেইহেতু বাংলা

দেশকে সার্বভৌম গণ প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনী সমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকবেন। রাষ্ট্র প্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও আয়-ব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা ছাড়া বাংলা দেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন। বাংলা দেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, যদি কোন কারণে রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যদি অক্ষম হন তাহা হইলে রাষ্ট্র প্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতি সংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথ-ভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যাপক এস ইউসুফ আলিকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভা নিয়োগের কথা ঘোষণা করে বলেন :

আপনারা জানেন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ এবং শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গত ২৩ বছর ধরে বঙ্গবন্ধু, সব কিছু পরিত্যাগ করে আন্দোলন করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। আমি জোর দিয়ে বলছি তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। জাতির সঙ্কটের সময় আমরা তাঁর নেতৃত্ব পেয়েছি। তাই বলছি পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম লগ্নের সূচনা হ'ল তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোন শক্তি তা মুছে দিতে পারবে না।

আপনারা জেনে রাখুন, গত ২৩ বছর ধরে বাংলার সংগ্রামকে পদে পদে আঘাত করেছে পশ্চিমের স্বার্থবাদী, শিল্পপতি, পুঁজিবাদী ও সামরিক কুচক্রীরা।

আমরা চেয়েছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের অধিকার আদায় করতে। লজ্জার কথা, দুঃখের কথা ওই পশ্চিমীরা শেষ-ই বাংলাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল। শহীদ সরওয়ারদি সাহেবকে কারাগারে পাঠিয়েছিল। তাই ওদের সঙ্গে আপস নেই। নেই ক্ষমা।

আমাদের রাষ্ট্রপতি জনাব শেখ মুজিবুর বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য ১৯৬৬ সালে যে ৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৭১ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তা মেনে

নিয়েছেন। কায়েমী স্বার্থে এতে আঘাত এল। এরা উঠে-পড়ে লাগলেন আমাদের খতম করার জন্য। তা ওদের বলে দিতে চাই তোমরা তা পারবা না।

সারা বিশ্ববাসীকে আমরা বলতে চাই—২৫ মারচ রাতের অন্ধকারে কারফু না দিয়ে সামরিক বাহিনীর ঝুনটা ঢাকা শহরে বুদ্ধিজীবীদের খুন করতে শুরু করেছে। (শেষ শেষ) হাজার হাজার নিরস্ত্র নাগরিককে গুলি করা হল। বাংলার নারীরা ইজ্জত হারাল। তাঁদের কি অপরাধ। বিশ্বের জনগণের কাছে এর বিচার চাই। উপস্থিত বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা বলুন আমাদের কি অপরাধ। আমরা স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার চেয়েছিলাম। আমাদের কেন গুলি করা হল! তাই পৃথিবীর ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।

বক্তৃতার শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আমরা পরাজিত হওয়ার জন্য যুদ্ধে নামিনি। বাঙালী জাতি জেগে উঠেছে, জাগ্রত জাতি হিসাবে পৃথিবীর সঙ্গে সহঅবস্থান করতে চাই। যুগ যুগ ধরে মণীষীরা মানব মুক্তির জন্য পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। আমাদের জয় হবে, মানবতার জয়, গণতন্ত্রের জয়।

সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠাদিবস ২১শে অক্টোবরের অনুষ্ঠান। মুজিবুরের স্বাধীনতার সংকল্পে ২১শে অক্টোবরের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, বাঙালীর জাতীয় পুনর্জাগরণে।

## কলকাতার পাক-ডেপুটি হাইকমিশনার

বাংলা দেশ-এর প্রতি আনুগত্য সমস্ত বিশ্বকে চমকে দিয়ে স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসের পরদিন ক'লকাতায় পাক ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলি তার সত্তর জন বাঙালী কর্মচারীসহ নূতন সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে 'বাংলা দেশ' সরকারের পতাকা উত্তোলন করে কূটনীতির ইতিহাসে এক নূতন নজীর সৃষ্টি করেছেন। পাকিস্তানের অন্যান্য দূতাবাসেও এই ঢেউ-এর আঘাত লাগবার আশঙ্কা করে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার বৈদেশিক দূতাবাস-থেকে বাঙালী কর্মচারীদের ইসলামাবাদে তলব করেছে। যেমন হোসেন আলিকে তলব করা হয়েছিলো। আশা করা যায় অন্যান্য দূতাবাসের বাঙালী কর্মচারী হোসেন আলির পথ অনুসরণ করে 'বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতিদানের আন্তর্জাতিক আবশ্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করবেন। এই উপলক্ষে হোসেন আলির বিবৃতিও একটি ঐতিহাসিক দলিল। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক চক্রান্ত সুদূরপ্রসারিত এবং কত দূঢ়মূল, বাঙালী জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানের ইসলামী জাতীয়তাবাদের চাপে কিভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে; হোসেন আলির বিবৃতি তা চিহ্নিত করেছে। হোসেন আলি বলেছেন:

আমি প্রায় ২২ বছর ধরে পাকিস্তানের কূটনীতিক সারিসে আছি। আমি আমার জ্ঞান ও সাধ্যমত পূর্ণ আনুগত্য সহকারে পাকিস্তানের সেবা করেছি। এই দূতাবাসের অফিসার ও কর্মীরা সকলেই তাই করেছেন। পাকিস্তানী ফৌজের দ্বারা বাংলা দেশের জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার বর্তমান অভিযান শুরু হওয়ার পরও আমাদের সকলেই পাকিস্তান সরকারের সেবা করেছেন। পাকিস্তান সরকার যে সব বুলেটিন প্রচার করেন তাতে সবই স্বাভাবিক অথবা আয়ত্তাধীন বলে বর্ণনা করা হয়। যোগাযোগের সকল ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বাংলা দেশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে কোন যথাযথ সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়নি। এখন ক্রমে ক্রমে সব কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। আতঙ্কগ্রস্ত ও

[ শেষাংশ ৯০১ পৃষ্ঠায় ]

# জাগরণ ও বিস্ফোরণ

১৯১৪

কালীচরণ ঘোষ

সংক্ষিপ্তসার ঃ

বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাব,—'গদর' বা বিপ্লব,—বরিশাল ষড়যন্ত্র,—বাগমারী—কুরুল—গার্ডেন রীচ :—সরোজ দাস, রাধাচরণ প্রামাণিক।

## বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাব

( ১৯১৪-১৯১৫ )

বাংলার মত পাঞ্জাব ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রস্তুত ছিল। মাঝে মাঝে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়েছে, পুলিশ ও বিপ্লবী দু' পক্ষেই হতাহত হয়েছে; আর ছিল মামলা করে পাইকারী দরে ফাঁসি দেবার পালা।

বাংলার ইতিহাসে পাঞ্জাবের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সুযোগ নেই, অন্য ভাবে ভিন্ন পুস্তকে নিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ না করলে কাহিনীর এই অংশটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সে কারণে কয়েকটি ঘটনার পরিচয় রেখে দিতে হয়।

বিপ্লবীদের কর্ম্মতালিকায় প্রধান স্থান ছিল গভর্ণমেণ্টের বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যদের মন গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিরূপ করে নিজেদের দলে টেনে আনা এবং অভ্যুত্থানকালে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা। এ বিষয়ে কর্ম্মীরা বহুল পরিমাণে সফল হয়েছিল। Twelfth Cavalry, 128th Pioneers, 23rd Cavalry Regiment, 7th Rajputs প্রভৃতি সেনা বিভাগের মধ্যে প্রচুর কাজ হয়েছিল। কেবল এই প্রচেষ্টায় প্রায় কুড়ি জনের ফাঁসি হয়।

উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ, এবং দলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকারী ও বেসরকারী অর্থ লুণ্ঠন, পুলিশ ও পদস্থ কর্ম্মচারী হত্যা, পুল ভেঙ্গে ট্রেন চলাচল ব্যাহত, যোগাযোগের সকল পথ রোধ, টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার কাটা, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি কাজে তারা আত্মনিয়োগ করেছিল। এ সকল কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ চৌদ্দ জন ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করেন।

আমেরিকা, কানাডা, দূরপ্রাচ্য ইয়োরোপ ও বটেই, তুর্কী, আফগানিস্তান প্রভৃতি রাজ্যেও গদর বা বিপ্লবের সঙ্গে পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

সকল রকম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার রোধ কল্পে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নিয়ে স্বতন্ত্র মামলা হয়েছে, তার ওপর বড় রকম ষড়যন্ত্র (Conspiracy) মামলা হয়েছে পর পর তিনটি।

প্রথম মামলার রায় প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সেপ্টেম্বর ১৩-ই। এতে ২৪ জনের ফাঁসি এবং আর ছাব্বিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। বাকী বহুলোকের বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ফাঁসির চব্বিশ জনের মধ্যে সতেরো জনের দণ্ড বড় লাটের আদেশে দ্বীপান্তরে পরিণত হয় এবং বাকী সাত জনের ১৯১৫ নভেম্বর ১৭-ই ফাঁসি হয়। (The Roll of Honour, pp. 272-290).

পলাতক কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং নূতন আসামী জুড়ে দিয়ে দ্বিতীয় মামলা শুরু হয় অক্টোবর ২৯-এ। মোট ৭৪ জনকে আসামী করে মামলার যাত্রা আরম্ভ হয়। ১৯১৬ মার্চ্চ ৩০-শে রায় প্রকাশিত হয়, ছ'জনের মৃত্যু, পঁয়তাল্লিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আট জনের নানা মেয়াদের সাজা হয়েছিল।

এতেই পরিসমাপ্তি হয়নি। তৃতীয় মামলা রুজু হয় ১৯১৬ নভেম্বর ৮ই। স্বল্প মেয়াদী বিচার। রায় বেরিয়েছে ১৯১৭ জানুয়ারী ৫ই। ছ'জনের ফাঁসির আদেশ হয়। এর মধ্যে একজনের সাজা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। আর কয়েকজনের নানা মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'য়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণদণ্ডাদেশের সঙ্গে সর্ব্ব রকম সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'য়েছে।

এর বাইরে দু-একজন আসামীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মামলা ও সাজা হয়েছে। মোট কথা পাঞ্জাব নিয়ে গভর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না এবং নির্ম্মমভাবে বৈপ্লবিক অপরাধ দমনে অবতীর্ণ হয়েছিল।

## "গদর" বা বিপ্লব

বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয় বলে কিছু না লিখলে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হত না, তবে কাহিনীর সঙ্গতি রক্ষার জন্য গদর সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে হ'চ্ছে।

কোমাগাটা মারু ও বজবজের কথা লিখতে গিয়ে গদর পার্টির প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের বাইরে, বিশেষ করে আমেরিকা ও কানাডায় উদ্ভূত এই দলের দান অপরিসীম। আদি উদ্যোক্তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যে কেউ গিয়েছিল ঠিক তা নয়। প্রধান লক্ষ্য বিদেশে শিক্ষালাভ আর হয়ত কারও বা ছিল জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা।

কালিফোর্নিয়ার বার্কলে অঞ্চলে ১৯০৭ সালে কয়েকটি ছাত্র এসে জোটে। আলোচনা প্রসঙ্গে এদের মধ্যেই স্থির হয় অধ্যয়নের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করতে হবে। এদের প্রচেষ্টায় নানা-রকম প্রতিষ্ঠান যথা, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসান অফ্ দি প্যাসিফিক কোষ্ট, হিন্দুস্থানী এ্যাসোসিয়েসান, ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এ সময় কোনও কোনও সভ্যের মনে সামরিক শিক্ষালাভের কথাও উঠেছিল, কিন্তু কাজ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

আমেরিকায় যখন এই অভিযান চলছে, তখন কানাডা ও জার্ম্মানীতেও, বিশেষ করে জার্ম্মাণীতে, বিপ্লব সংস্থা গড়ে উঠছে। জার্ম্মাণদের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপিত হওয়ায় সমুদ্রপারের সমচিন্তাধর্ম্মীর মধ্যেও কেবল ভাবের আদান-প্রদান নয়, বিভিন্ন কার্য্যক্রমের আলোচনা এবং কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবর্জ্জন সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

আমেরিকায় পোর্টল্যাণ্ড ও সানফ্রানসিস্কোতে খুব বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠে। পাণ্ডুরং খানখোজে, তারকনাথ দাস, হরদয়াল, কাশীরাম প্রভৃতি আরও অনেকে মিলে সংগঠনে শক্তি সঞ্চার ও কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারে সহায়তা করেন। অতিরিক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে ওরেগন ও ওয়াশিংটন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্য্যারম্ভের পর বার বার মেলামেশা এবং আলোচনার ফলে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার, বিদেশে ত বটেই ভারতবর্ষেও

একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দলবদ্ধ হ'য়ে যে সংগ্রামী অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটেছিল, তার কথা চিন্তা করলেই বোঝা যায় যখন "লক্ষ্য, মোক্ষ এক" তখন ছোটখাট অন্তরায় আপনা হতেই দূর হয়ে যায়।

চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে রূপায়িত করবার জন্য ১৯১৩ নভেম্বর ১-লা 'গদর' বা বিদ্রোহ পত্রিকা সানফ্রান্সিস্‌কো থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলায় "যুগান্তর" ১৯০৬ সালে যা করেছিল এই গদর পত্রিকা বিদেশে সেই কাজ করেছে। ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু ও গুজরাটিতে পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। গুপ্তভাবে তা ভারতে আসতে আরম্ভ করে এবং ইংরেজের পক্ষে সংগ্রামে নিযুক্ত বা নিযুক্ত হতে পারে এমন যে সকল স্থানে ভারতীয় সৈন্য অধিক সংখ্যক অবস্থান করে, সে সব অঞ্চলে পত্রিকা প্রেরিত হ'ত। "ইংরেজ হত্যায় পাতক নেই, উপরন্তু ধর্ম্মকার্য্য, ভারতে অবস্থিত ইংরেজ অরিকে যে কোনও কৌশলে হত্যা কর নচেৎ বিতাড়িত কর," এই ছিল প্রতি-পাদ্য বিষয়। ক্রমে আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয় যে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে সেখানে একটা বড় রকম অভ্যুত্থানের জন্য জমি তৈরী করা,—আপাততঃ বেতনভুক সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে ইংরেজের আনুগত্যের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে প্রধান লক্ষ্য বলে ধরা হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হ'ল। আমেরিকা, কানাডা হ'তে ভারতগামী জাহাজে দলে দলে দলে প্রবাসী শিখ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করে দিলে। আমেরিকায় বসে যে ভাষায় ইংরেজকে আক্রমণ চলছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় আমেরিকা সরকার সে বিষয়ে বেশ সতর্ক হয়ে উঠেছিল। আমেরিকার নানা সহরে সভা সমিতি চলছে, আমেরিকাও সে সকলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছে। কার্লিফোর্ণিয়ার সাক্রামেণ্টোতে ১৯১৩ ডিসেম্বর ৩০-এ যে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বহু দূর দূরান্তর থেকে এসে উপস্থিত ভারতবাসীর সংখ্যা বহু সহস্রে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার পুলিশ লক্ষ্য করতে ভুল করেনি যে সে সভায় হোমরা চোমরা কয়েকজন জার্ম্মাণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও উপস্থিত ছিলেন।

এরপর আর আমেরিকা সরকার স্থির থাকতে পারেনি। জার্ম্মাণীর সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া থেকেই ত আমেরিকার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল তার জ্ঞাতি ভাই পূর্ব্বপুরুষ ইংরেজদের ওপরে। তার ওপর নিজেকেই সে মহা আহবে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হ'ল। সুতরাং আর নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে থাকা চলে না, প্রকাশ্যে বা গোপনে সব আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য ব্যাপক তোড়জোড় চলতে লাগলো। গ্রেপ্তারের উৎসব লেগে গেল। সানফ্রান্সিস্‌কো, ওরেগন, সিকাগো, ওয়াশিংটন প্রভৃতি বড় বড় সহর থেকে বেপরোয়া ধরপাকড় চলছে। শতাধিক লোককে পুলিশ নিজ হেপাজতে এনে রাখলে। তার মধ্যে বাছাই করে বিয়াল্লিশ জনকে আসামী খাড়া করে সানফ্রান্সিস্‌কোতে ১৯১৭ নভেম্বর ২০-এ এ মামলার শুনানী শেষ হয়। কয়েকজন ফেরার ছিল; তাঁদের অনুপস্থিতিতেই মামলা চলেছে। ১৯১৮ মে ২৪-এ এই মামলার রায় প্রদত্ত হয়। এই রায়ে জার্ম্মাণদের নিয়ে বত্রিশ জনের বিভিন্ন মেয়াদী কারাদণ্ড ঘটে। তার মধ্যে তিন জন ছিলেন বাঙ্গালী (তারকনাথ—২২ মাস, ধীরেন সরকার—৪ মাস, চন্দ্র চক্র—৩০ দিন, জরিমানা ৫০০০ ডলার)। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে অপসারিত হ'লে 'গদর' সম্বন্ধে আমেরিকার প্রায় সকল কর্ম্মের অবসান ঘটে।

পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, গদর দলের লোক বর্ম্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, সাংহাই, ক্যাণ্টন প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মালয় সিঙ্গাপুরে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তার মধ্যে আদিগদর পার্টির কর্ম্মীদের একটা বড় অংশ আছে। ভারতের মধ্যে পাঞ্জাবে যে সংগ্রাম চলতে থাকে আর ক্ষিপ্ত গভর্ণমেণ্ট ধরপাকড়, ষড়যন্ত্র মামলা, জেল ও ফাঁসিতে যে সকল

দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাদের মধ্যে আমেরিকা, কানাডা প্রত্যাগত গদর দলের বহু সভ্য ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় ১৯৪০ মার্চ্চ ১৩-ই ইংলণ্ডে কেন্‌সিংটনে যে যুবক, উধাম সিং, ওডায়ারকে হত্যা করেন, তিনি ও আমেরিকাবাস কালে গদর দলের লক্ষ্য ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে ভারতে ফিরে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংলণ্ডে চলে যান।

## ১৯১৫-র ঘটনাবলী

এতাবত যে পদ্ধতিতে ডাকাতি চলছিল, তার পরিবর্ত্তন ঘটে বেশ খানিকটা। পুলিশ অধ্যুষিত কলকাতার বড় হাঙ্গামা করতে অনেক সাহসের দরকার এবং কাজ ও উদ্ধার করতে হয় ত্বরিতে। আক্রমণ ও পলায়নের জন্য চাই দ্রুতগামী যান।

এ সকল ত্রুটি অনেক পরিমাণে দূর করতে সমর্থ হয় বিপ্লবীরা। তারা নূতন পন্থা গ্রহণ করে এবং লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে। আর্ম্মাণ ষড়যন্ত্র বা ব্যাপক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার সঙ্গে পুলিশ কর্মচারীদের ওপর হামলার সংখ্যা ও বৈপ্লবিক ঘটনা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চেষ্টা সফল হয়েছে।

পুলিশ দস্তুর মত বিব্রত হয়ে পড়ে। প্রতিকারের উপায় স্বরূপ তারা কলকাতার প্রায় সব বড় রাস্তার মোড় বা সংযোগস্থলে গাড়ীর গতি রোধ করবার জন্য রেল লাইনের লেভেল ক্রসিং ( level crossing ) এর ওপর নির্ম্মিত দ্রুত ওঠা নামানোর ব্যবস্থাযুক্ত "কপাট" বসানো হয়েছিল। ডাকাতি করে যাতে মোটর নিয়ে ঝট্ করে শহরের বাইরে চলে যেতে না-পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা। তাছাড়া যাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক-বন্দী করে রাখা যায়, সে রকম আইন ও পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বিপ্লবীদের উৎপাত রোধে অসমর্থ হয়ে গভর্ণমেণ্ট এই আইনটির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পাহাড় থেকে ঢল নেমেছে, তাকে আবার উৎস মুখে ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব। বাংলার হিংসাত্মক বিপ্লবে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

মামুলি খুচরো ডাকাতির সঙ্গে এ সময় কয়েকটি বড় ধরণের ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল। সে সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের কাজের ধারার পরিচয় থাকার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে।

যুদ্ধের সমস্ত সময়টা বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা অত্যন্ত তীব্র হয়েছিল, বিশেষ করে ডাকাতি, খুন, জখম প্রভৃতি খুবই বৃদ্ধি পায়। সরকারী নীতি, ষড়যন্ত্র মামলা জুড়ে দেওয়া চলেছে খুব; তার আরম্ভ হয় বরিশালের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলার উদ্বোধনে।

### বরিশাল দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলা

বরিশাল প্রথম ষড়যন্ত্র মামলার বড় আসামী কয়েকজন ফেরার ছিলেন; সে সময় এদের ধরা পড়ার জন্যে অপেক্ষা না-করেই প্রথম দফা মামলার শুরু ও নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ পলাতকদের ধরবার চেষ্টা সমানেই রেখেছিল এবং যথাসময়ে এক এক জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছিল।

পাঁচজন আসামী খাড়া করে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে দেওয়া হয় ১৯১৫ জানুয়ারী ৪-ঠা। সেখান থেকে মামলা দায়রায় যায় মার্চ্চ ২৪-এ। আসামী হলেন পাঁচ জন:

(১) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, (২) মদনমোহন ভৌমিক, (৩) প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, (৪) রমেশচন্দ্র ( দত্ত ) চৌধুরী (৫) খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সেসনে মামলা শুরু হয় মে ২৪-এ এবং রায় দেওয়া হয় নভেম্বর ২৯-এ। তাতে একজনের ১৫ বৎসরের দ্বীপান্তর

আর চার জনের প্রত্যেকের দশ বৎসরের দ্বীপান্তর আদেশ হয়।

মামলার আপীল হলো হাইকোর্টের। কদিন শুনানীর পর রায় প্রকাশিত হলো (১৯১৬) জুলাই ১০-ই। তাতে দেখা গেল দুজন মুক্তি লাভ করেছেন আর তিনজনের দণ্ড বহাল আছে, অবশ্য দুজনের ক্ষেত্রে পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস করা হয়েছে।

মোট দাঁড়াচ্ছে—

| আসামী | দায়রা (রায়) | হাইকোর্ট |
|---|---|---|
| | ১৯. ১১. ১৫ | ১০. ৭. ১৬ |
| | দ্বীপান্তর | দ্বীপান্তর |
| ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী | ১৫ বৎসর | ১০ বৎসর |
| মদন ভৌমিক | ১০ বৎসর | ১০ বৎসর |
| খগেন চৌধুরী | ১০ ” | ৭ ” |
| রমেশ চৌধুরী | ১০ ” | মুক্তি |
| প্রতুল গাঙ্গুলী | ১০ ” | মুক্তি |

খগেনের পূর্ব্বে তিন বৎসর সাজা হয়েছিল ১৯১৪ জুন ১৫-ই বরানগর ডাকাতি মামলায়। বর্ত্তমান ৭ বৎসর সাজা পূর্ব্ব মেয়াদ শেষ হবার পর শুরু হবে—অর্থাৎ মোট দশ বৎসরই রয়ে গেল।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার জের রায় দানের সঙ্গে মেটেনি বেশ কিছুদিন পরে পলাতক আসামী চণ্ডীচরণ কর গ্রেপ্তার হয়। তখন চণ্ডী ক্লান্ত, মামলা চালাবার অর্থ সঙ্গতিহীন। সুতরাং অপরাধ কবুল করলেন। ১৯১৫ মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁর তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

## বাগমারি—

ত্রিপুরার ধনীর ঘরে ডাকাতি—বাগমারি গ্রাম, থানা লখিমপুর। ১৯১৫ জানুয়ারী ২২-এ মধ্য রাত্রে জন বিশেক যুবক গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর বাড়ী চড়াও হয়। বাড়ীর চারজন পরিচারক ও পিওনকে হাত পা বেঁধে একটা ঘরে বন্ধকরে ফেলে আগন্তুকরা হাজার চারেক টাকা নিয়ে নিরাপদে প্রস্থান করে।

## কুরুল :

রংপুরে লালমণির হাট থানার অখ্যাত গ্রাম কুরুল। জন বিশ পঁচিশ “ডাকাত” ১৯১৫ জানুয়ারী ২৩-এ গভীর রাত্রে সেখানে হাজির হয়। এত লোক মিলে এলে কি হয়? হিসেবে ঠিকে ভুল; মালিক কালীনাথ সরকার নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। লুঠের পরিমাণ মাল সমেত সাড়ে তিনশ’ টাকা।

## গার্ডেনরীচ :

কলকাতার বুকের ওপর ভরা দুপুরে (বেলা দু’টা নাগাদ) গার্ডেনরীচ (Garden Reach) এ যে নূতনতর ডাকাতি হয় তার তুলনা সে কালে কোথাও ছিল না। ঘটনাটিতে নিখুঁত সংবাদ সংগ্রহ এবং অতি দ্রুত কাজ উদ্ধার করার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ফেব্রুয়ারী ১২-ই (১৯১৫) বার্ড কোম্পানীর এক সরকার দু’জন দারোয়ান নিয়ে একখানা ১৫১ নম্বর যুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকা ঘোড়ার গাড়ী করে বদরতলায় অবস্থিত তাদের সাউথ ইউনিয়ন মিল নামে পাট কলের কর্ম্মচারীদের মাহিনা বাবদ ১০ টা পাটের থলে ভরে ১৮,৪০০ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। যখন গার্ডেন রীচ সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে মান্ধাতার আমলের ছ্যাকড়া গাড়ী এসে পৌঁছেচে তখন একখানা (A 7) ট্যাক্সি এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। সেখানে জন ছয় বাঙ্গালী যুবক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল আর ট্যাক্সি (A-7) তে এল আর চার জন। ঘোড়ার গাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থামাতে ঘোড়ার গাড়ী অচল। ট্যাক্সি থেকে সব নেমে পড়লো। ঘোড়ার গাড়ীর দরজা

খুলে সরকার ( নেপাল চন্দ্র বেলাল ) ও দারোয়ানদের জোর করে নামিয়ে দিয়ে সব থলে ট্যাক্সিতে ওঠানো হলো। থলেগুলির ওজন মন্দ হবার কথা নয়। কারণ তাতে ছিল ৩৪০ খানা নোটে ৩,৪০০ টাকা। চাঁদীর এক টাকা হিসাবে ১৩,৩০০ টাকা, আধুলি ৯৪০ টাকা আর বাকী সব চার আনি, দুয়ানি ও ১৯২০ টা ডবল পয়সা।

সাত জনকে নিয়ে ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো সহরের দক্ষিণ দিকে, অর্থাৎ বারুইপুরকে উদ্দেশ্য করে। রাজপুরের কাছে একটা টিউব ফেটে গেলে ও সেই অবস্থায় সুবুদ্ধিপুর পর্য্যন্ত মোটর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খুব কাছেই বারুইপুর। সেখানে হরিসাধন নাথের দোকান থেকে একটা ঘোর নীল ও একটা ফিকে লাল রঙের তোরঙ্গ যথাক্রমে পৌনে চার টাকা ও পাঁচ সিকিতে কিনে তার মধ্যে টাকা পয়সা ভরা হলো। ট্যাক্সিখানাকে স্থানীয় একজনের জিম্মায় রেখে বলে যায় যে কলকাতা থেকে মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি আনতে যাচ্ছে।

বারুইপুর ষ্টেশন থেকে দুখানা ঘোড়ার গাড়ী এনে তাতে টাকার বাক্স তুলে দেওয়া হলে গাড়ী উত্তর ভাগের দিকে চলতে থাকে। সেখানে প্রত্যেক গাড়ী ভাড়া বাবদ সাড়ে পাঁচ টাকা দিয়ে তারা নৌকা ভাড়া করে ধোসার দিকে চলতে থাকে। পেচুয়াখালিতে এসে তারা নৌকা বদল করে টাকী গিয়ে উপস্থিত হয় ১৫-ই বেলা ১১ টার সময়। আরও দুটো ট্রাঙ্ক কিনে সবগুলোতে মাল সমানভাবে ভর্তি করা হলে একটা গরুর গাড়ী করে রেল ষ্টেশনে পৌঁছে শ্যামবাজার যাবার জন্য দুখানা ইন্টার ক্লাস টিকিট ( নং ৩১৯-৩৮৪ ) কেনে। বাক্স কটা বি, টি, বসুর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকলে পাতিপুকুর পৌঁছায় সেই রাত্রিতে আটটার সময়। তারপর একখানা দ্বিতীয় ও অপর একখানা দ্বিতীয় ও অপর একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া করে ২০ নং ফকির চাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটে সকলে হাজির হয়েছিল। এই বাড়ীর সন্ধান করে এসে পুলিশ রাধাচরণ প্রামাণিককে মসার পিস্তল সমেত গ্রেপ্তার করে। গভর্ণমেণ্ট বিশেষ বিচলিত হ'লো ডাকাতির ধরণ দেখে। কলকাতার বুকে এ একেবারে নতুন পদ্ধতি। ধর পাকড় চলতে লাগলো; প্রধান সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট থেকে ( ১৯১৫ ) ফেব্রুয়ারী ১৮-ই গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২২-এ দুজন মোক্তার কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও শশীভূষণ দাস প্রত্যেকে ৫০০ টাকার জামীন দাঁড়ালে নরেনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মামলার দিন মার্চ্চ ২-রা হাজির হবার কথা। মার্চ্চ ১৬-ই খবর হলো আসামী ফেরার। জামীনদারদের তলব হ'লে জামীনের টাকা, মোট এক হাজার গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে তাঁরা রেহাই পেলেন। গোপনে এ টাকা তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। নরেন সেই যে উধাও, বহুকাল আর তাঁর পাত্তা পাওয়া যায় নি। এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রথমে সি. মার্টিন ও পরে এম্. এন. রায় বলে জগতে পরিচিত হয়ে গে'ছেন।

মার্চ্চ ২-রা এক মামলার শুনানী আরম্ভ; নরেন বাদে আসামী আর দু'জন। সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ যোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণাভাবে সকলকে ছেড়ে দিতে হ'লো।

মামলার দু জন আসামী সম্পর্কে বিধাতা পুরুষ কিছু ভিন্ন ব্যবস্থা করলেন। তন্মধ্যে একজন সরোজ ভূষণ দাস।

## সরোজ ভূষণ দাস ঃ

বেলিয়াঘাটা ১৩ নং কাঁকুড়গাছিতে তাঁর বাসস্থান। ইচ্ছায় বা অজ্ঞাতে গভর্ণমেণ্ট এমন একটি "চিকিৎসা" করলে যার ফলে রোগীর প্রাণহানি ঘটেছিল। (১৯১৫) ফেব্রুয়ারী ১২-ই গার্ডেনরীচ ডাকাতি সংঘটিত হয়। বেপরোয়া ধর পাকড়ের মধ্যে কলিকাতা মেট্রোপলিটন স্কুলের শিক্ষক সরোজ ভূষণ দাসকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে আটক

রাখে ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই থেকে। ১৮-ই পর্য্যন্ত তাঁহার দেহে কোন ব্যাধি ছিল না।

সাধারণ প্রথামত জেলের মধ্যেই সরোজকে টীকা দেন জেলের ডাক্তার। কয়েকদিনের মধ্যে সরোজের দেহে উৎকট বসন্ত দেখা দেয়। গভর্ণমেণ্ট একটু বিব্রত বোধ করেছিল। আত্মীয়রা জামীনের দরখাস্ত করতে গভর্ণমেণ্ট আপত্তি করেনি; হয়তো ডাক্তারের রিপোর্টে যা ছিল, তাতে আপত্তি করার প্রয়োজন ছিল না। ১৯১৫ মার্চ্চ ২-রা জামীনের বাধা নিষেধ অতিক্রম করে আসামী পরপারের যাত্রাপথে রওনা দিলেন। গভর্ণমেণ্ট স্বস্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করে পরিত্রাণ পেয়েছিল।

**রাধাচরণ প্রামাণিক ঃ**

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাধাচরণ প্রামাণিক। তাঁকে গার্ডেনরীচ মামলায় জুলাই ২-রা অতিরিক্ত আসামী খাড়া করা হয়। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এমন সময় ২০ নং ফকিরচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট থেকে ফেব্রুয়ারী ২৪-শে একটা মসার পিস্তল আর কয়েকটা কার্তুজ সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলায় ২৭-শে মে হীরালাল বিশ্বাস (ওরফে টেঁপা) ও রাধাচরণ প্রত্যেকের দুবৎসর করে কারাদণ্ড হয়। হীরালাল হাইকোর্টে আপীল করলে সেপ্টেম্বর ২৭-শে সেটা নাকচ হয়।

বাঘে ছুঁয়েছে; নিষ্কৃতি নেই। রাধাচরণের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আনা হয়। ম্যাজিস্টেটের কাছে প্রাথমিক তদন্ত শেষ হলে মামলা গেল দায়রায় আগষ্ট ১৭-ই। দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা মতে নভেম্বর ২২-শে আসামীর ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এটা তো হলো বিচারের ব্যাপার। অবিচার ও তার প্রতিরোধে, মর্য্যাদা রক্ষার কথা অনেক বেশী শিক্ষণীয়; বড়ই গৌরবের।

বছর দুই জেলে কাটাবার পর রাধাচরণের চক্ষুর পীড়া দেখা দেয়। জেলের নিয়মেই দণ্ডিত ব্যক্তি জেলের অধ্যক্ষকে তাঁর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তর পেয়েছিলেন যে তাঁর মত খুনে ডাকাতরা অন্ধ হয়ে গেলে ভালই হবে। রাধাচরণ সিদ্ধান্ত নিলেন জেলে থাকাকালে তিনি আর সরকারী ডাক্তার দেখাবেন না; তাঁদের ওষুধ গ্রহণ করবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর মারাত্মক রক্ত আমাশয় রোগ দেখা দিল। জেলের বন্ধুবান্ধব সকলেই ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মুখ থেকে যে কথা বেরিয়েছে তার আর নড়চড় হবে না। রাধাচরণকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। দুরন্ত রোগের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে লাগলেন। রোগের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল এবং ১৯১৭ ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন আত্মসম্মান রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালন করতে একটি অমূল্য জীবনের অবসান ঘটে গেল।

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

# সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

**সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা** কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর [illegible] রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নবেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-1/69

ধারাবাহিক আলোচনা

# সুভাষচন্দ্র ও ভারত-চিন্তা

রবি রায়

কংগ্রেসে গান্ধীজী কেবলমাত্র তাঁর অনুগতদের নিয়ে কমিটি গঠন করে রাজনৈতিক জটিলতার ও দলের মধ্যে তাঁর অসন্তোষের কারণ হলেও জনসাধারণের সামনে তিনি এক উজ্জ্বল আশার আলোকবর্তিকা তুলে ধরে ছিলেন। দেশবাসী তাঁর কাছ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে নতুন বছরে (১৯৫০) স্বাধীনতার জন্য তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো। ২৬শে জানুয়ারীকে ভারতের স্বাধীনতাদিবসরূপে পালন করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানানো হল। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরাধীনতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার শপথ কংগ্রেসের ইস্তাহারে প্রচার করা হল। সারা দেশ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত করার পর অনুকূল পরিস্থিতিতে মহাত্মা ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ তাঁর কর্মসূচী প্রকাশ করে জানালেন ১২ মার্চ্চ তারিখে তিনি কিছু সহযোগী সহ লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবেন। আইন অমান্য সম্বন্ধে দেশবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। ১৯২১ সনের আইন অমান্যের ব্যর্থ পরিণাম দেশবাসীর কাছে চরম হতাশা এনে দিয়েছিল। গান্ধীজী জনমানসের এই প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, আইন অমান্যের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে কোন হিংসাত্মক কাজ সংঘটিত না হতে পারে, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় "আইন অমান্য একবার শুরু হলে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইন অমান্যকারীও মুক্ত কিংবা জীবিত থাকবেন ততক্ষণ তা বন্ধ করা হবে না।' গান্ধীজির এই ঘোষণায় জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ আশান্বিত হলেন এই ভেবে যে, ১৯২২ সনের চৌরি-চৌরার মত যদি দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটেও, তথাপি বারদৌলির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মহাত্মা ঘটাবেন না।

ভারতের ঝটিকাক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পটভূমিতে গান্ধীজী ১৯৩০ সনের ঐতিহাসিক লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ মুখাপেক্ষী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি গান্ধীজীর এহেন প্রয়াসকে প্রথমদিকে করুণার চোখে দেখেছিলেন। ব্রিটিশ মুখাপেক্ষী ষ্টেটস্‌ম্যান ১২ মার্চের সম্পাদকীয়তে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে লিখলেন, 'To-day Mr. Gandhi begins his slow march to the sea-coast where he and his disciples if they arrive, are to boil sea-water till India obtains Dominion status or something else happens.' কিন্তু ৬ই এপ্রিল তারিখে সমুদ্রস্নানের পর গান্ধীজী বে-আইনী লবণ উৎপাদনের দ্বারা আইন অমান্যের সূচনা করলে সারা দেশব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলনে অধিকতর সক্রিয় এবং আন্তরিকভাবে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১০ই এপ্রিল 'ইয়ংইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে

ভারতীয় নারী সমাজের প্রতি গান্ধীজী আহ্বান জানালেন। জাগ্রত হল নারী শক্তি, হাজার হাজার কিশোরী, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা ঘরের বন্ধন কাটিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি সঙ্কল্পে পথে এসে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বরণ করলেন ব্রিটিশের দেওয়া লৌহ বলয়। শত অপমান ও নির্যাতন তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। ব্রিটিশের কারাগার পুরুষ ও মহিলা সত্যাগ্রহীতে উপচে পড়তে লাগল। প্রবল সত্যাগ্রহের সঙ্গে মদ ও মাদকদ্রব্য বর্জনের আন্দোলন, কর ও ভূমিরাজস্ব প্রদান থেকে বিরত থাকার আন্দোলন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আব্দুল গফ্‌ফর খানের (সীমান্ত গান্ধী) নেতৃত্বে লাল কোর্তা পরিহিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 'খোদাই খিদমদগারদে'র (ঈশ্বরের সেবক) অহিংস আন্দোলনের বহুমুখী ধারাতে এবার সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যেমন করেই হোক এই গণজাগরণকে স্তব্ধ করতে হবে, চূর্ণ করতে হবে সাধারণের স্পর্ধা, প্রথমে আইনের মার-প্যাঁচের দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হল যে জনগণের মধ্যে প্রচারের অন্যতম শক্তিশালী মন্ত্র বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হল। কিন্তু এর দ্বারা আন্দোলনকে স্তিমিত করা গেল না। সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পুলিশের অগোচরে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ইস্তাহার, সংবাদপত্র-বিলি, এমন কি দেশের কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে রেডিওর মাধ্যমে জনসাধারণকে আন্দোলন তীব্রতর করে তোলার জন্য ক্রমাগত আহ্বান জানানো হলো। অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মম পুলিশী অত্যাচারও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল এমন কি জেলের মধ্যে আবদ্ধ রাজবন্দীদের উপরও আক্রমণ চালাতে বৃটিশের আরক্ষাবাহিনীর পাশবিক উৎসাহের অভাব ছিল না। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তদানীন্তন মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বাংলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কিরণশঙ্কর রায়, লিবার্টি পত্রিকার সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট বন্দী কংগ্রেস নেতাদের উপর এই ধরনের আক্রমণ চালানো হয়েছিল। জেলের রক্ষীরা সুভাষচন্দ্রকে সজোরে ঠেলে ফেলে দেবার ফলে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। ২৩শে এপ্রিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে এক বিশাল জনতা সেখানকার আন্দোলনকারী কয়েকজন নেতার গ্রেপ্তারের পর যখন শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল, তখন তাদের দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে নিযুক্ত করা হয় এবং নির্বিচারে গুলি চালানোর ফলে ঘটনা স্থলেই কয়েক শ নিরস্ত্র লোকের প্রাণহানি ঘটে।

অপরদিকে ভারতের আইন সভাও প্রকৃতপক্ষে প্রতি-নিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল, কংগ্রেসী সদস্যরা আইনসভা বর্জন করলেও নির্দল নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রথম দিকে বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে তুলা শুল্ক আইনের ব্যাপারে রাজকীয় পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা একযোগে সদস্যপদ ত্যাগ করেন। গভর্ণমেণ্টের একপেশে নীতি ও আইন সভা স্বধর্ম হারিয়ে ফেলাতে সভার অধ্যক্ষও (ভি. জে. প্যাটেল) পদত্যাগ করেন। আবার আর এক দিকে সহিংস বিপ্লব প্রয়াস পূর্ব আকাশে পুনরায় লাল আভা ছড়িয়ে দিল। ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ১০টায় পূর্বাঞ্চলের পূর্বতম প্রান্ত চট্টগ্রামে বিপ্লবী নেতা সূর্যসেনের (মাষ্টারদা) নির্দেশে অনুশীলনও যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় সদস্যরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার এবং টেলিগ্রাফ-টেলিফোন অফিস, পুলিশ অস্ত্রাগার প্রভৃতি দখল করে নেয়। বিপ্লবীরা চট্টগ্রামকে বৃটিশ ভারত থেকে ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। বিপ্লবীদের তখনকার অনুভূতি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম কর্মী লোকনাথ বলের

ভাষায়, 'চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হোল।...আজীবন পরাধীনতার দূষিত আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হয়ে জীবনে সেদিন আমরা প্রথম পেলাম স্বাধীনতার আলো, স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়ার প্রথম পরশ। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত পবিত্রতা দিয়ে বুঝি গড়ে উঠেছিল সেই অনুভূতি।' কিন্তু ভারতের একপ্রান্তের ছোট্ট একটি অংশের স্বাধীনতার প্রদীপ দানবের কালো হাতের ঝাপটা হতে বেশীক্ষণের জন্য জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বিপ্লবীরা তা জানতেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁরা ভারতবাসীর অন্তরে দেশপ্রেমের শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছিলেন। ৪।৫ দিন পর (২২শে এপ্রিল) চট্টগ্রামের অদূরে জালালাবাদের পাহাড়ে আত্মগোপনকারী ঐ সব বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকাংশ বিপ্লবী শহীদের মৃত্যু বরণ করে। পরবর্ত্তীকালে নেতা মাষ্টারদা এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হন, বিচারে মাষ্টারদার ফাঁসি হয়। অন্যান্য বন্দীদের অধিকাংশকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পূর্বদিগন্তের এই বিপ্লব প্রয়াসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও আফ্রিদি উপজাতিদের চাঞ্চল্যও ব্রিটিশ সরকারকে নাজেহাল কোরে তুলেছিল।

একদিকে সারাভারতব্যাপী অহিংস সত্যাগ্রহ, অপরদিকে সহিংস আন্দোলনের চাপে শাসক সম্প্রদায়ের নিপীড়ন চরমে দাঁড়াল। প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকার গান্ধীজীকে জেলের বাইরে রাখা উচিত নয় মনে করে ৫ই মে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকেও এর কিছুদিন পর গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এইসব গ্রেপ্তারের দ্বারা আন্দোলনকে দমন করা গেল না। ৭ই জুন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রচার করা হলে দেখা গেল কমিশনের রিপোর্ট এতই প্রতিক্রিয়াশীল যে দেশের সকল প্রান্ত হতেই তীব্র প্রতিবাদ উঠল। এমন কি জাতীয়তাবাদী দল বর্জিত ভারতীয় আইন সভাও রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে। দেশের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের ভিক্ত অবস্থার পরিবর্তন না হলে কোন আলোচনা যে ফলপ্রসূ হতে পারে না সেই সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল ছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক সহজ কোরে তোলার ব্যাপারে একজন বিটিশ সাংবাদিক মিঃ জর্জ স্লোকম্বে মধ্যস্থর ভূমিকাতে অগ্রণী হলেন। ডেইলি হেরাল্ডের এই প্রতিনিধি পুনায় য়ারবেদা জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করে কংগ্রেসের আন্দোলন প্রত্যাহার করার ব্যাপারে কি কি সর্ত আছে এবং সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে রাজী হবে না জানতে চাইলে গান্ধীজী চার দফা দাবীর কথা উল্লেখ করেন। তারপর মহাত্মার সঙ্গে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল য়ারবেদা জেলে আলোচনান্তে ১৫ই আগষ্ট বড়লাটের উদ্দেশ্যে এক যুক্ত বিবৃতিতে জানালেন যে, 'স্বেচ্ছায় ভারতের সাম্রাজ্যের বাইরে আসার অধিকার, জনগণের প্রতিনিধিমূলক একটি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের অধিকার দান, যে অধিকারে দেশরক্ষা ও অর্থদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং তথাকথিত সরকারী ঋণ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত বসাবার অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের কাছে কোন সমাধানই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু বড়লাট লর্ড আরুইনের পক্ষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপরোক্ত সর্তাবলী গ্রহণ করা সম্ভব নয় জানাতে শান্তি প্রয়াসের চেষ্টা ব্যর্থ হল।

ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধিস্থানীয় গণ সংগঠন কংগ্রেস ভারতের শাসনতন্ত্র ও ভবিষ্যত কর্মধারা সম্পর্কে ব্রিটিশের সঙ্গে বিফল আলোচনায় অনিচ্ছুক জানালেও প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১২ই নভেম্বর ১৯৩০ লণ্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠক শুরু করেন। ৮৯ জন সদস্য-বিশিষ্ট এই অধিবেশনে বৃটিশ ভারতের ৫৭ জন, ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে

১৬ জন এবং ব্রিটিশ দলগুলির ৩৬ জন প্রতিনিধি ছিলেন। সরকার প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন যাতে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রবেশ ত্বরান্বিত হয়। সাইমনের রিপোর্টে ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের হবে বলে সুপারিশ করা হয়েছিল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির জন্য দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ এবং তাঁদের সম্মতি আদায়ের পিছনে এক কূটনৈতিক কৌশল লুকিয়েছিল। প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারত আগমনের পর থেকেই দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে বৃটিশ সরকারের মিতালি ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। এমন কি বৃটিশ ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামিল হওয়ার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণ যখন গণআন্দোলনের মধ্যে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, রাজন্যবর্গরা অনেক ক্ষেত্রেই ঐ আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারের সাহায্যও চেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ঐ সব দেশীয় নৃপতিগণ কেন্দ্রীয় আইন সভায় অংশ গ্রহণ করলে বৃটিশ ভারতের চরমপন্থী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করাতে প্রচুর সাহায্য করতে পারবেন বলে সরকারের দৃঢ় ধারণা ছিল। কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নয়, ভারতের গণ জাগরণকে ব্যর্থ করার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের পিছনে কাজ করেছিল। ১৯৩১ সনের ১৯শে জানুয়ারী গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ও রক্ষাকবচে ভারত সম্মত হলেই কেন্দ্রে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভব হবে। লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠক থেকে দৃষ্টিপট সরিয়ে নিয়ে দিল্লীর আইন সভার দিকে ফেরালে দেখা যায় ঐদিন আরুইন সাহেব প্রকাশ্যে আইন সভাগৃহে কংগ্রেসের সহযোগিতার জন্য আবেদন জানালেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর গোলটেবিল বৈঠকে প্রদত্ত বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য

কয়েকদিনের মধ্যেই কার্যনির্বাহক সমিতির সমস্ত সদস্য ও মহাত্মাকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হল (২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩১)। কংগ্রেস সংগঠনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা'ও সরকার প্রত্যাহার করে নিলেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির জরুরী অধিবেশন এলাহাবাদে আরম্ভ হল। কংগ্রেস যে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারে গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণকারী উদারপন্থী নেতারা আশঙ্কা করেছিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন থেকে দেশে ফিরেই স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ডি, এস, শাস্ত্রী ও এম, আর জয়াকার প্রমুখ উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের কার্যকরী বৈঠকের স্থান এলাহাবাদে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবগুলির প্রতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের মনোভাব বিরূপ ছিল, কিন্তু উদারপন্থী এবং অন্যান্য আপোষকামী নেতারা মহাত্মা এবং তাঁর অনুগত সদস্যদের বোঝাতে কৃতকার্য হয়েছিলেন যে, মহাত্মা যেন বড়লাটের সঙ্গে একবার আলোচনা না করা পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব বিবেচনাধীন রাখেন। অবশেষে নানা বাদ-প্রতিবাদের পর ঠিক হল গান্ধীজী ১১ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে লর্ড আরুইনের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। গুরুতর অসুস্থ থাকার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ব্যতীত কার্যকরী সমিতির বিশিষ্ট নেতাদের প্রায় সকলেই গান্ধীজীর দিল্লী যাত্রার সঙ্গী হলেন। কলকাতায় ২৬শে জানুয়ারী 'Congress Ban lifted at last', 'All Working Committe Members Released', 'Mahatma Gandhi out of Prison', প্রভৃতি শিরোনাম দিয়ে প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি আনন্দের বার্তা জানিয়ে সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করেছিল যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তথা ভারতের গভর্ণর জেনারেলের শুভবুদ্ধি দেশ তথা কংগ্রেসের পক্ষে এক ফলপ্রসূ সম্ভাবনার তোরণ খুলে দিতে পারবে, ঐদিন অপরাহ্নে দেখা গেল বিপরীত দৃশ্যপট, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র

সুভাষচন্দ্র 'স্বাধীনতা দিবসে' ময়দানের অভিমুখে একটি মিছিল পরিচালনাকালে পুলিশ প্রথমে কোন গ্রেপ্তার বা সতর্ক না করেই মিছিলের উপর বল প্রয়োগ করে এবং আহত অবস্থায় তখনকার কলকাতার প্রথম নাগরিককে তাঁর সঙ্গী শিক্ষা-অধিকর্তা ( কর্পোরেশনের ) ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের অন্যতম নেতা কিরণশঙ্কর রায় সহ গ্রেপ্তার করে। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার এবং তাঁর উপর আক্রমণ চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু বাংলা দেশ নয়, সারা ভারত-ব্যাপী বিক্ষোভের ঝড় দেখা দিল। সকলের মনে একই প্রশ্ন—গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে সরকার যে সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছিলেন, একদিনের ব্যবধানে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে তা অসত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। পত্র-পত্রিকাগুলিতে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে এরকমও মন্তব্য করা হয় ( যেমন Sind Herald ) যে তরুণ সমাজের মুকুটহীন রাজা সুভাষকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দারুণ ভীতির চক্ষে দেখে বলেই আপোষ-আলোচনার প্রাক্কালে তাকে বন্দী করেছে। ব্রিটিশের চোখে ভারতের 'ডি ভ্যালেরা' সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করতে পারলেও সুভাষ-ভাবনা তথা যৌবনের ভাবনায় পুষ্ট ভারতের তারুণ্য-শক্তিকে আবদ্ধ করে রাখার মত বিশাল কারাগার ব্রিটিশের ছিলনা।

এদিকে দিল্লীতে গান্ধীজীকে কেন্দ্র করে এক বিরাট জটলা। গান্ধীজীর কাছে এসেছেন ভারতের নানা প্রান্ত থেকে ধনী অভিজাত সম্প্রদায়, এসেছেন শিল্পপতি আর আপোষের পক্ষপাতী বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সকলেরই একান্ত ইচ্ছা যেমন করেই হোক ব্রিটিশের সঙ্গে একটা মীমাংসা যেন হয়। শুরু হ'ল মহাত্মার সঙ্গে বড়লাট আরুইনের নিভৃত আলোচনা। প্রতিদিন লাট প্রাসাদে লর্ড আরুইনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন, ফিরে এসে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের তার বিবরণ দেন, পরামর্শ করেন তাঁদের সঙ্গে। এইভাবে ৪ঠা মার্চ তারিখে ঐ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। এবার মহাত্মা কার্যকরী সমিতির কাছে চুক্তির সর্তগুলি পরিবেশন করে জানান যে তাঁদের সকলের সমর্থন ব্যতীত তিনি চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হবেন না। চুক্তির সর্ত হিসাবে কংগ্রেসের পক্ষে গান্ধীজী রাজী ছিলেন, (১) আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা, (২) (ক) যুক্তরাষ্ট্র, (খ) দায়িত্ব ও (গ) সমন্বয় সাধন এবং ভারতের স্বার্থে যে সব রক্ষা-কবচের প্রয়োজন হতে পারে তার ভিত্তিতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া তৈরী করার জন্য আসন্ন গোল-টেবিল বৈঠকের আলোচনায় যোগদান করা। (৩) ভারতের বিভিন্ন অংশে পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে তার তদন্ত করা। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হতে বড়লাট আরুইন সম্মত ছিলেন, (১) অহিংস আন্দোলনের ব্যাপারে কারারুদ্ধ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া, (২) আইন অমান্য ও করবন্ধের দরুণ গভর্ণমেণ্ট যে সব জমি দখল বা বাজেয়াপ্ত করেছেন ইতিমধ্যে তা বিক্রী বা নিলাম না হয়ে গেলে পূর্বতন মালিককে তা প্রত্যর্পণ করা, (৩) জরুরী বিধিগুলি প্রত্যাহার করা, (৪) সমুদ্রতীর হতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত বসবাসকারী জনগণকে বিনাশুল্কে লবণ সংগ্রহ এবং তৈরী করার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান এবং (৫) দেশীয় শিল্পগুলির প্রসারে মদ, আফিং ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করতে অনুমতি দেওয়া।'

উপরোক্ত চুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই চুক্তির দ্বারা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাফল্য প্রমাণিত হয় না, বরং দেশব্যাপী বিপুল অসন্তোষকে সাময়িকভাবে চাপা দিয়ে ভবিষ্যতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় করে তুলে কংগ্রেসের মোকাবিলা করার কৌশল ছিল শাসক সম্প্রদায়ের। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অনুমোদনের পর ৫ই মার্চ বড়লাট ও গান্ধীজীর স্বাক্ষর দানের দ্বারা তাদের এই 'বিশেষ

উদ্দেশ্য' প্রাথমিকভাবে সফল হল। সুভাষচন্দ্র 'গান্ধী-আরুইন' এই চুক্তিকে 'কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধ' রূপে চিহ্নিত করেছেন তাঁর ভারতের মুক্তি সংগ্রামে।

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ চুক্তির বিবরণ জানার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় গান্ধীজীর প্রয়াসকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁরা মনে করেছিলেন এই চুক্তির দ্বারা কংগ্রেসের আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক সচেতন বাঙলাদেশ এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের যুবসমাজ এই মীমাংসার সূচীতে নৈরাশ্যবোধ করছিলেন। চুক্তিবিরোধী কংগ্রেসের বামপন্থীরা, যাঁদের নেতা সুভাষচন্দ্র, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য বিরোধী নেতারা তখনও পর্যন্ত জেলে বন্দী। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী কেবলমাত্র সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন জেলে হাজার হাজার বিপ্লবী ও অন্যান্য শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত হবার সুযোগ না ঘটায় তাঁদের সঙ্গে মহাত্মার একটি দুস্তর ব্যবধান পড়ে উঠেছিল।

গান্ধীজী 'দিল্লী চুক্তি' জয়ের পর করাচীতে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধিদের দ্বারা ঐ চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করাচীর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিশ্বস্ত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ৮ই মার্চ সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে দেওয়া হলে তিনি সোজা বোম্বাইএ গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর মনোভাব জ্ঞাপন করার জন্য। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঋষিতুল্য এই মানুষটিকে সুভাষচন্দ্র খুব জোরের সঙ্গে জানালেন স্বরাজ সম্পর্কে যদি কখনো তাঁর (গান্ধীজীর) দ্বিধা দেখা দেয় তাহলে তিনি এবং তাঁর মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে লড়াই করাকে কর্তব্যরূপে বিবেচনা করবেন। গান্ধীজী ক্ষুব্ধ সুভাষকে শান্তভাবে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিলেন যে আসন্ন করাচী কংগ্রেসে গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিয়ে এক নির্দেশ জারী করার জন্য তিনি অনুরোধ জানাবেন। লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতার অর্থ সম্বন্ধে ঘোষণার কোন পরিবর্তন করা হবে না এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে চুক্তিবহির্ভূত অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রয়াসে তাঁর সর্বশক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে আরো বিশদভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এবং জনগণের মনে গান্ধীজীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করার জন্য সুভাষচন্দ্র বোম্বাই হতে গান্ধীজীর সঙ্গে একই ট্রেনে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন। দিল্লীতে পৌঁছে শোনা গেল লাহোর ষড়যন্ত্রের অন্যতম সর্দার ভগৎ সিং এবং তাঁর সহ-কর্মীদের মধ্য থেকে দু'জনকে ফাঁসি দেওয়া হবে বলে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেছেন। বিপ্লবীদের প্রাণ রক্ষার্থ চেষ্টা করবার জন্য গান্ধীজীর উপর চাপ সৃষ্টি করা হল। সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন যে গভর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে নারাজ হন, তাহলে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই তাঁর এবং বড়লাটের আলোচনা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। গান্ধীজী অতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে ইচ্ছুক না হলেও বিপ্লবীদের ফাঁসি রদ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি বড়লাট তাঁকে জানিয়েছিলেন ফাঁসি স্থগিত রাখার বিষয়টি তিনি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। বড়লাটের এই মনোভাব কেবলমাত্র গান্ধীজী নন, দেশের সকল মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছিল।

সব মানুষ যখন প্রত্যাশা করছিলেন সর্দার ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের ফাঁসি রদ করা হবে, অনেকটা নিশ্চিত হয়ে ২৪শে মার্চ কলকাতা থেকে কংগ্রেসের সম্মেলনের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ যাত্রা শুরু করেছেন, তখন সংবাদ এল ২৩শে মার্চ রাত্রিবেলায় পাঞ্জাবের যুব নেতা সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসী হয়ে গেছে। এই ঘটনার পর

স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস অধিবেশন মণ্ডপে শোকের ছায়া নেমে আসে। সভাপতির নির্দেশে অধিবেশনের প্রথম দিনে প্রচলিত উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হল। করাচীর সন্নিকটে গান্ধীজীকেও এক যুবগোষ্ঠীর বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। কালো ফুল ও মালা হাতে এই যুবক দলের ধারণা হ'ল যে ভগৎ সিং অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় মহাত্মাজী তৎপর ছিলেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে চরম চাপ সৃষ্টি করতে নীতিগত কারণে গান্ধীজী অপারগ হলেও বিপ্লবীত্রয়ের প্রাণরক্ষার জন্য সক্রিয় ছিলেন এবং বড়লাট লর্ড আরুইনের সঙ্গে আলোচনায় মনে হয়েছিল তাঁর দৌত্য সফল হবে। অহিংসা ও শান্তির দূত মহাত্মা গান্ধী রক্তাক্ত বিপ্লবের পথকে কখনই গ্রহণ করতে পারেন নি, পারেন নি ঐ পথে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে। আয়ার্ল্যাণ্ডে সিন ফিন দলের সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে চুক্তিকালে অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়। সিন ফিন দলের নেতৃবৃন্দ চুক্তি সম্পাদনের আলোচনা চালানোর সর্ত রূপে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এক রাজবন্দীর মুক্তির জন্য কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি ঘটল না।

কংগ্রেসের সম্মেলনে গান্ধী-আরুইন চুক্তির সমর্থকবৃন্দ কিছুটা শঙ্কিত হলেও বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি যোগ দেবার ফলে তাঁরা যে চুক্তি অনুমোদন করাতে সফল হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এই চুক্তির বিরোধী সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ গভীর চিন্তা ও আলাপ আলোচনার পর ঠিক করলেন কেবলমাত্র বিরোধিতা করে সভার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু হবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে চুক্তির বিরোধিতা করে আন্দোলন ও বিপুল জনসমর্থন লাভ করা সম্ভবপর নয়। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরানোর জন্য গভর্ণমেণ্টের এই টোপ গেলা রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কারণ চুক্তিবিরোধীরা যদি সভার মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হত, পরবর্তীকালে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বলা সম্ভব হত যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে কোন লাভ নেই, এই কারণে যে নেতাদের মতামত কর্মীরা গ্রাহ্য করে না। সমগ্র রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সুভাষচন্দ্র তাঁর ভারতসংগ্রামে লিখলেন, 'সঙ্কটমুহূর্তে নেতৃবৃন্দ ভুল করছেন জেনেও দলকে কখনও কখনও নেতাদের পাশে দাঁড়াতে হয়।' সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বামপন্থী সমর্থকবৃন্দ তাই প্রত্যক্ষ বিরোধীতার দিকে না গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি বিবৃতিতে জানালেন যে, 'কংগ্রেসের বামপন্থী দল গান্ধী-আরুইন চুক্তির অনুমোদন করে না।' তবে নানা দিক বিবেচনা করে তাঁরা সভার ভিতরে অনৈক্য প্রয়াসে বিরত থাকবেন বলে স্থির করছেন। সুভাষচন্দ্র প্রদত্ত এই বিবৃতিতে চুক্তি-সমর্থকবৃন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, অপরদিকে তাঁর অত্যুৎসাহী সমর্থকবৃন্দ নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। ২৯শে মার্চ কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মেলনে চুক্তি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। লাহোর কংগ্রেসের ন্যায় করাচী কংগ্রেসেও কেবলমাত্র গান্ধীজীর অত্যুৎসাহী ভক্তদের দ্বারা কার্যকরী কমিটির সদস্য তালিকা পূর্ণ করা হয়। কংগ্রেসের এই সম্মেলনে আর একজন শক্তিশালী নেতার অভাব গভীর শোকের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল। তিনি হলেন সদ্য পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

করাচী কংগ্রেসে ঠিক করা হয় আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকের জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধি তালিকা ঠিক করার ভার কার্যকরী সমিতির উপর ন্যস্ত থাকবে। এই উদ্দেশ্যে ২রা এপ্রিল কার্যনির্বাহক সমিতির যে বৈঠক বসে, অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা গেল সমিতি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন, তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী ঘোষণা

করলেন যে তাঁর ইংল্যাণ্ড যাবার পূর্বেই (গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য) যদি ভারতের মুসলমানগণ যুক্তভাবে নূতন শাসনতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব মূলক নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কে যদি কোন দাবী রাখেন, তাহলে তিনি তা মেনে নেবেন। গান্ধীজীর এই ধরণের ঘোষণা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল না। পরন্তু এই ঘোষণার প্রতিশ্রুতি প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজে লাগাতে যত্নবান হতে দেখা গেল। তাঁরা নির্বাচনে পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতি এবং দেশের ঐক্যের পরিপন্থী বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করেন। গান্ধীজী এই ধরণের অস্বাস্থকর অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের জন্য। ডাঃ আন্সারী, শেরওয়ানি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছিলেন যে কংগ্রেস যৌথ নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করে যদি হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী প্রতিক্রিয়াশীলদের ইচ্ছানুযায়ী মেনে নেয়, তবে দেশের ঐক্যের খাতিরে তাঁরা তার বিরোধিতা করবেন। এরপর গান্ধীজী এক বিবৃতিতে জানালেন, 'সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমান নেতাদের দাবীগুলি তিনি মেনে নিতে পারেন না, কারণ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ঐগুলির বিরোধী।'

গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুযায়ী কাজ করার কোন লক্ষণ কিন্তু গভর্ণমেণ্টের মধ্যে দেখা গেল না, বড়লাট লর্ড আরুইন যদিও আন্তরিকভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে এক সম্মানজনক মীমাংসার আগ্রহী ছিলেন। তথাপি আমলাতন্ত্রের দমনমূলক মনোভাবের জন্য শান্তি প্রয়াসের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এমত অবস্থার মধ্যে ১৮ই এপ্রিল আরুইনের কার্যকাল শেষ হলে তাঁর স্থলে ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড উইলিংডন। কড়া মানুষ উইলিংডনের রাজত্বে আমলারা গান্ধী-আরুইন চুক্তিকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে তুলল। বৈপ্লবিক আন্দোলন চালানো হচ্ছে এই অভিযোগে পুনরায় বাঙলা দেশে শতশত ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক করা হল। নির্যাতনের পাল্টা হিসাবে অবশ্য মাঝে মাঝে শাসক সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের ঘটনাও দেখা দিতে লাগল। এবার গান্ধীজীও ক্ষুব্ধ হলেন। সরকার চুক্তি মানছেন না এই অভিযোগ করে গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তিনি এক স্মারক লিপি পেশ করেন। যেনতেন প্রকারেণ গান্ধীজীকে গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত করানো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনের কথা ছিল। ভারত গভর্ণমেণ্টের এই অসহযোগিতার দরুণ শেষ পর্যন্ত যাতে তিনি তাঁর যাত্রা না বন্ধ করেন, সাগরপারের কর্তারা গান্ধীজীকে সন্তুষ্ট করার জন্য লর্ড উইলিংডনকে চাপ দিতে লাগলো। বাড়ীর প্রভুদের মনোভাব উপলব্ধি করে বড়লাট বাহাদুর আগস্ট মাসে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় বসে মোটামুটিভাবে কাজ চালানো গোছের প্রতিশ্রুতি দিলেন যাতে বিভিন্ন অভিযোগগুলির প্রতিকার হওয়া সম্ভব। বড়লাটের আশ্বাসের পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত ভারতের লক্ষ লক্ষ মূক মানুষের একক প্রতিনিধি ১৯৩১ সনের আগস্টের শেষে বোম্বাইএর আরব সাগরের দরিয়ায় অপেক্ষারত এস. এস. রাজপুতানা জাহাজে উঠলেন। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের আসর লণ্ডন অভিমুখে রাজপুতানা ভেসে চলল ভারতবাসীর এই প্রিয়তম মানুষটিকে নিয়ে।

(ক্রমশঃ)

# মরমী বন্ধু ক্ষিতীশ রায়

বেণুগোপাল রায়

গত শনিবার ১০ই এপ্রিল বেলা চারটায় বন্ধুবর ক্ষিতীশ রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আর আমাদের দেখা হইবে না। তাঁহার মধুর সান্নিধ্য আমরা চিরকালের জন্য হারাইলাম।

অনেক দিন হইতেই তিনি অসুস্থ হইয়া হাঁসপাতালে ছিলেন। একটু ভাল হইলেই হাঁসপাতালে যাইয়া দেখা করিব, এই আশা ছিল। কিন্তু, শেষপর্য্যন্ত আর যাওয়া হইল না। এই অপরাধবোধ মনকে আরো বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

খবর পাওয়া মাত্র হাসপাতালের দিকে রওনা হইলাম। অবশ্য শৈলেনই আমাকে ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিলাম বন্ধুর গুণমুগ্ধজনেরা বিষণ্ণ মুখে কেহ দাঁড়াইয়া আছেন, কেউবা ঘোরাঘুরি করিতেছেন। বন্ধু কম্বা তপতী চোখ বুজিয়া আছে, আর অশ্রুধারা তার দুই চোখে বান ডাকিয়াছে। বন্ধুর শয্যায় গেলাম, দুই বৎসরের মধ্যেত এমন সুন্দর চেহারা যেন দেখি নাই। গাল দুইটি ভরিয়া উঠিয়াছে, চাপা ঠোঁটে যেন হাসি খেলছে, চিবুক, উন্নত নাশা, প্রশস্ত কপাল সকলই পূর্ববৎ আছে, কেবল চোখ বোজা। যে চোখের ব্যঞ্জনা, স্মৃতি সর্ব্বদাই বন্ধুদিগকে আকর্ষণ করিত, মুগ্ধ করিত, সেই চোখ দুইটি বোজা ছিল। তখনও শরীরে কঠোরতা দেখা দেয় নাই, শুধু হাত দুইটা যেন একটু শক্ত হইতে চলিয়াছে। মুখে হাত বুলাইয়া দিলাম, ঠোঁট দুইটি একটু যেন কাঁপিয়া উঠিয়া সূক্ষ্ম হাসি তুলিল।

বন্ধুকে, কবিকে আর দেখিব না। এই ক্ষতি আর যার পক্ষেই যাহাহোক, আমার পক্ষে অতি দুর্ব্বিসহ, অতি গুরুভার। যখনই মন ভারাক্রান্ত হইয়াছে, জাতীয় এবং সামাজিক জীবনের ঘটনাবলী দুর্ব্বোধ্য মনে হইয়াছে, তখনই গিয়াছি কবির নিকট, বন্ধুর নিকটে। তাঁহার সঙ্গে আলোচনায়, তাঁহার মন্তব্যে, একটা নূতন দিক যেন খুলিয়া যাইত, ভারমুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতাম।

বস্তুতঃ বন্ধুবরের যেন ইহাই বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন কবি, পণ্ডিত ও দার্শনিক। তাঁহার অকপট জীবন যাত্রা এবং মতবাদ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত ও সমাদর লাভ করিত।

কবিকে কবে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই। হয়ত আশে পাশে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম ভালো ভাবে দেখা হয় ১৯২৩ সালে। তাঁহাদের গ্রামের দুই ছেলে, যাদের উপরে সকলের দৃষ্টি ছিল, সেই দুই ছেলে—রাজা ও ক্ষিতীশ ছোটবেলা হইতেই এক সঙ্গে পড়ে, প্রতিযোগিতা করে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে ক্ষিতীশ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। অবশ্য, খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কয়েক বৎসর পর হইতে সুখে দুঃখে আনন্দে কবিকে সাথে পাইয়াছি, তাঁহাকে দিন দিন যেমন শ্রদ্ধা করিতে শিখিলাম, তেমনি তাহাকে ভালোবাসিয়াছি বন্ধু, সখা, বয়স্য হিসাবে। আমি তাঁহাকে কবি ডাকিতাম এবং বন্ধু সেই ডাকেই সাড়া দিতেন।

ক্ষিতীশ ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। মেসে থাকিয়াছেন, কখনো কখনো বাসা ভাড়া করিয়াছেন, পিতা, ভাই বোনদের নিয়া একত্রে রহিয়াছেন। আর একমাত্র টুইসানি। নিজে ম্যাট্রিকুলেশন তখনও পাশ করেন নাই, কিন্তু পড়াইয়াছেন ম্যাট্রিক পড়ুয়াদের। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক— এ সমস্ত যেন তাহার জলভাত ছিল, তাই ছাত্র মিলিত, ভাল রোজকার করিয়া নিজে লেখাপড়া করিয়াছেন, ভাই বোনদের সাহায্য করিয়াছেন। প্রচুর মিষ্টি খাইতে পারিতেন, এবং খাওয়াইতেন। নারায়ণগঞ্জের দেবেন নামে একজন রসগোল্লা বিক্রয় করিতে আসিত। ক্ষিতীশদের মেসে, কিংবা অনিলদের (ঘোষ) প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরীতে, কখন কখন আমাদের বাসায়, যখনই দেবেন আসিত এবং রসগোল্লার ভাড়ের মুখ খুলিয়া দিত তখন দেখিতে দেখিতে তাহা শেষ হইয়া যাইত। আমরা সকলে যখন জেলে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, শুনিয়াছি দেবেন বলিত—আমার সব বাবুদের নিয়ে গেছে, আমি এখন কি করিব।

ক্ষিতীশ একজন ভালো জাতের ফুটবল খেলোয়ার ছিলেন। ক্ষীণকটি, প্রশস্ত বক্ষ, সুগোল বাহুদ্বয়, উন্নত নাশা, চলার ছন্দ সমস্তই প্রকাশ করিত তার খেলোয়াবসুলভ স্বভাব। তিনি হকি এবং ব্যাডমিন্টনও ভালো খেলিতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার পাণ্ডিত্য। কবিতা, প্রবন্ধ, দর্শন, সমাজদর্শন, অর্থনীতি লোক সাহিত্য, সমস্ত কিছুতেই তাহার প্রকাশ সাবলীল ও গভীর ছিল। জাতীর মূল উৎস ও তাহার নানাদিকের প্রকাশ সম্বন্ধে তাহার নির্মল দৃষ্টি ভঙ্গী এবং মমতাবোধেই কোন প্রকার ভেজাল ছিল না। এরকম পণ্ডিত, দরদী কিন্তু একান্তভাবে প্রচার বিমুখ ব্যক্তি আমি কমই দেখিয়াছি। নিরলস পরিশ্রমী, আপন ভোলা, নিজের প্রতি মর্যাদা বোধ এবং অন্যকেও মর্যাদা দেওয়া, খাঁটি নির্মল চরিত্রের ব্যক্তি আজকাল বড় দেখা যায় না। তাহার ব্যক্তিত্ব অন্যকে দুরে ঠেলিয়া দিত না, বরং কাছেই টানিত। দাদার (অনিল রায়) মধ্যে নানা প্রকার গুণের যে বিকাশ দেখিয়াছি এমন কোন মানুষ আমি দেখি নাই, এমন মানুষের কথা পড়ি নাই, শুনিও নাই। ক্ষিতীশও যেন দাদার একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারও একটী মৌল পৃথকভঙ্গী এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁহার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার বোধের প্রতি আমার প্রবল শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁহার মত আমার উপরে প্রবলভাবে প্রাধান্য স্থাপন করিত। এরকম ক্রুপদী classical ব্যক্তির অভাব, বিশেষতঃ সে যদি আপনজন ও প্রিয় জন হয়, তবে তাহার স্থান কে পূরণ করিবে?

যখনই তাঁহার বালিগঞ্জের বাসায় গিয়াছি, সেখানে এই দৃশ্যটি দেখিতাম—একটী মাত্র ঘর, তাহার ছাদ পর্যান্ত র‍্যাকে ভর্ত্তি বই। টেবিলের উপরে, খাটের তলায়, বিছানার উপরে খবরের কাগজের স্তূপ, বই পত্র, স্টোভ্, দুধের বোতল, দুই একখানি বাসন পত্র। এর মধ্যে কয়েকটী ছেলে বসিয়া আছে, ক্ষিতীশ রান্না করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে অঙ্ক বুঝাইয়া দিতেছেন; রচনার নানাবিধ বিষয় বস্তু প্রকাশ ভঙ্গীর সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেছেন। কোথায়ও বিরক্তি নাই, ধৈর্য্যের অভাব নাই। আমি বলিতাম—এ সব কি হইতেছে। ক্ষিতীশ বলিতেন—আগে ছোট ভাইদের পড়াইয়াছি এখন ভাইস্তাদের নিয়া আছি। ক্ষিতীশের মামার বাড়ী মানিকগঞ্জ ছিল। এক কাকা মানিকগঞ্জে মাস্টারী করিতেন, মানিকগঞ্জের নানা-প্রকার রসাল কথা তাহার নিকটে শুনিতাম।

ক্ষিতীশের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধুবর অনিল ঘোষের ছোট বোন। তাহাকে খুব ছোট দেখিয়াছি, কিন্তু অনেক বৎসর পর যখন ক্ষিতীশকে দেখি তখন তার স্ত্রী মারা গিয়াছেন। আজ যদি তাহার স্ত্রী জীবিত থাকিতেন তবে এই

জ্ঞান তপস্বীর জীবন বোধ হয় আরো একটু দীর্ঘ হইত।

ক্ষিতীশের যারা বন্ধুব্যক্তি—সমগোত্রই বলিতে পারি—যেমন অনিল ঘোষ, শৈলেশ রায়, বারীন রায়, তাঁহারা ক্ষিতীশকে নানাভাবে দেখিয়াছেন, তাঁহারা যদি ক্ষিতীশের সম্বন্ধে লিখেন, তবে তাহার ব্যক্তিত্বের আরো নানা দিক প্রকাশ পাইতে পারে। আরো একজন আছেন—যার সম্বন্ধে ক্ষিতীশের একটা কোমল মধুর স্নেহ ছিল - সেই সুনীল দাসও কিছু লিখিতে পারেন। 'জয়শ্রীর' পরিচালনায় তাঁহার কতটুকু অবদান ছিল, তাহা জয়শ্রী পরিচালকমণ্ডলী ও বন্ধুবর্গ ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

আমি ক্ষিতীশের বন্ধু, কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির সমগোত্রীয় নহি। আমি ক্ষিতীশকে শ্রদ্ধা করিতাম, বিশ্বাস করিতাম, ভালবাসিতাম, তার প্রতিদানও পাইয়াছি। দেউলী জেলে ক্ষিতীশ অসুস্থ ছিলেন। জীবনের নানা বিষয়ে কত নূতন ভাবে মূল্যায়ন করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার জীবন একটু নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও আমার সঙ্গে তাহার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

প্রতি বৎসরের প্রথম দিনে তাঁহার অনিন্দনীয় লিপিতে একখানা করিয়া চিঠি পাইতাম, যাহাতে থাকিত আন্তরিক শুভ বাসনা ও প্রীতি। আর সেই চিঠি পাইব না। এমন গুণী দরদী বন্ধু আর কোথায় পাইব! তিনি short hand এর একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান ছিল, আবার, অনিল দাস, শৈলেশ রায় যখন বোমা তৈরীর জন্য Picric Acid তৈয়ার করিতেন, ভাবিতে অবাক লাগে, ক্ষিতীশ তাহাতেও অংশিদার ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও দরদ এই দুইটী বৃত্তি যেন সব সময়ই তাহার মধ্যে ওতোপ্রোতভাবে জড়ান ছিল।

ইদানীংকালে দেখিয়াছি—কোন বক্তব্য কেহ উপস্থাপিত করিলে, ক্ষিতীশ তাহার বিরুদ্ধে কিম্বা সেই বক্তব্যকে সংশোধন করিতে পারে, এইরূপ অসংখ্য আধুনিক মতবাদ উপস্থাপিত করিতেন। এর উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল, বক্তব্যকে ঝাড়িয়া মুছিয়া আরো পরিষ্কার করা। কিন্তু কোন মতেই ক্ষিতীশ তর্কের জন্য তর্ক করিতেন না, কিংবা পাণ্ডিত্যের তরোয়াল ঘুরাইতেন না। কেন না, একটা অকপট আন্তরিক দরদী সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার ছিল। এই তাঁহার স্বভাব ছিল। তাঁহার সারাটা কর্মপ্রচেষ্টা এবং জীবন যাপন তাঁহার নির্ম্মল স্বভাবেরই প্রকাশ ছিল। একটা মহীরুহের যেন পতন হইল। প্রচার বিমুখ, সংগ্রামী, নিরলস, স্বাধীনজীবন প্রয়াসী, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী, বন্ধুবৎসল, সমাজসচেতন ব্যক্তির মৃত্যু যেন একটা যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করিতেছে, তাঁহার শূন্যতা আমার জীবনে পূর্ণ হইবে না। দাদা, দিদি, লীলা রায় ক্ষিতীশ—পর পর তিনজনকে হারাইয়া আমরা যেন একটা যুগের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

# জয়শ্রী

# বাংলা দেশ বিশেষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৭৮

বাংলা দেশের এই উত্তাল ঘটনার সম্ভাবনা এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে যে সব ইঙ্গিত ইতিপূর্বে জয়শ্রীর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে তা আজ রূঢ় বাস্তবে পরিণত, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশের মানুষ এখনও সম্বিৎ ফিরে পায়নি এখনও জাতীয়তাবাদের মূল্য নিরূপণ করতে পারছেনা দেশবাসী, রাজনৈতিক দাবা খেলা এখনও দেশবাসীকে বিভ্রান্ত, বিব্রত করে রেখেছে।

এই পরিস্থিতিতে জয়শ্রী পথনির্দেশ স্বরূপ 'বাংলা দেশ' সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সংখ্যার আকর্ষণ

**চারণিকের কলমে 'বাংলা দেশ'**

**'বাংলা দেশের সংগ্রাম' সুনীল দাস**

**মনীষীদের চোখে 'বাংলা দেশ'**

এছাড়া লিখবেন

পান্নালাল দাশগুপ্ত, পরেশ সাহা, পুলকেশ দে সরকার,
দক্ষিণারঞ্জন বসু, অধ্যাপক সমর গুহ,
দুই বাংলার 'কবিতা'

দাম ১·৫০

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪৭

[ সম্পাদকীয়—৮৮০ পৃষ্ঠার পর ]

বিকলাঙ্গ হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলমান রক্ত জমানো অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী বহন করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছেন। নিয়তির কী পরিহাস, যে ভারতকে পাকিস্তানের শত্রু বলে গণ্য করা হয় সেই ভারতই এখন নিজ সরকার দ্বারা বিতাড়িত ও সন্ত্রস্ত হাজার হাজার পাকিস্তানীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। ভারতীয়রাই তাঁদের আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। যে সব পাকিস্তানী দূতাবাস আছে তার মধ্যে এটিই বাংলা দেশের সবচেয়ে নিকটবর্তী। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই সব উদ্বাস্তুর মধ্যে অনেকের সঙ্গে দেখা করেছেন। বিদেশী এবং নিরপেক্ষ যে সব সাংবাদিক বাংলা দেশের ভিতরে গিয়ে নিকট থেকে ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাও তথ্যসংগ্রহের নিরপেক্ষ সূত্র।

ওই সব তথ্য থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তা ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ। ইতিপূর্বে ঠাণ্ডা মাথায় বেছে বেছে গণহত্যা চালানো হয়েছে। এখন সারা বাংলা দেশ জুড়ে এটি চলছে। সকল তথ্য ও সংবাদ থেকে এটিই প্রতিভাত হয় যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সারা বাংলা দেশের নিরস্ত্র ও নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে (বস্তুত পাকিস্তানের জনগণের অধিকাংশের বিরুদ্ধে) সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে। তারা বিমান থেকে ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ করছে, শহর ও গ্রামের ওপর কামান দাগছে। ট্যাংক, কামান, মরটার এবং মেশিনগানের মত আধুনিক লোকক্ষয়ী হাতিয়ারও তাদের ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে। তারা আগুনে-বোমা ফেলছে, এমন কী নাপাম বোমা ব্যবহারেরও খবর পাওয়া গিয়েছে। সারা পাকিস্তানের সরকার বলে নিজেদের দাবি করে যে সরকার সেই সরকারই দুপুর-রাতে বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং জননেতাদের হত্যা করেছে। তারা বিপুলসংখ্যক অধ্যাপক ও ছাত্রকে ইচ্ছামতভাবে হত্যা করেছে। তাদের বিশেষ লক্ষ্য বাঙালী পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী এবং বাংলা দেশে মোতায়েন সেনাবাহিনীর লোক। খবরে প্রকাশ, এখন তারা ধারাবাহিকভাবে সকল সমর্থ বাঙালীকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে নেমেছে। তা ছাড়া ব্যাপক মানুষ হত্যা চলেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ দেখেছেন। তাড়াতাড়ি খোঁড়া কবর থেকে মৃতদেহের বের হয়ে আসা অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং চট্টগ্রাম, যশোহর, রাজসাহী, পাবনা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি শহরের অধিকাংশ এলাকাই হয় আংশিক অথবা পুরাপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। অন্যান্য শহর ও অনেক পল্লী এলাকার চেহারা বীভৎস। কারণ লোকেরা নিরাপত্তার জন্য হয় ভিতরে পালিয়ে গিয়েছেন অথবা সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছেন। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এখনও চলছে। এমন কী পলায়মান নর-নারী ও শিশুকে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে। তরুণীদের প্রথমে ধর্ষণ ও পরে হত্যা করা হয়েছে। শিল্প ও কারখানা এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়েছে। এমন কী মজুত শস্যও পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, ব্যাঙ্ক লুঠ হয়েছে। সোনা, গহনা ও টাকাপয়সা মহিলাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়েছে।

ঘটনাবলী থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সরকার সুপরিকল্পিতভাবে সমস্ত বাঙালী জাতিকে বশ্যতা স্বীকার করানো এবং ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল, যেখানে বাঙালী দাস এবং পদলিকাদি হওয়া ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে না। তরুণ ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে জননেতা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও কর্মক্ষম লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি যাতে বাংলা দেশ যুগ যুগ ধরে কোন নেতৃত্ব দিতে না পারে।

এই ধারাবাহিক ও ইচ্ছাকৃত গণহত্যার দ্বারা পাকিস্তান সরকার নিজেই বাংলা দেশে একটি পৃথক জাতির অস্তিত্বের

স্বীকৃতি দিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলা দেশের একেবারেই কোন ভাবাবেগগত বন্ধন নেই। বাংলা দেশ যে পৃথক দেশ তা এতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এমন কী মৌখিক-ভাবেও বাংলা দেশে গণহত্যার নিন্দা করেননি।

বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর আওয়ামী লীগ দল সকল প্রদেশের স্বাধিকারের কর্মসূচীর সমর্থনে বিপুলভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তাঁরা শুধু এক অখণ্ড দেশে এবং অন্যান্য প্রদেশের জন্য সুবিচার চেয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান বার বার ঘোষণা করেছেন, তিনি বিচ্ছিন্ন হতে চান না, কারণ, সংখ্যালঘিষ্ঠের থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বাভাবিক নয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান নিজেই ঘোষণা করেন যে, নির্বাচন অপক্ষপাত হয়েছে। পরে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীরূপে শেখ মুজিবুর রহমানের নামও করেন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছে। পূর্ববঙ্গের (এখন বাংলা দেশ) প্রায় সব ভোটদাতাই আওয়ামী লীগ এবং স্বাধিকারের কর্মসূচীর সমর্থন করেন। বস্তুত এটি গণ-ভোট ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের নির্দেশে জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশের সংবিধান তৈরি করে জনপ্রিয় সরকার গঠন করার ব্যাপারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টের অধিবেশনে বসার স্বাভাবিক পথ অনুসরণের কোন সুযোগ দিতে চাইলেন না। তবুও আমরা আশা করেছিলাম, শুভ-বুদ্ধির উদয় হবে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা জনগণের রায় মেনে নেবেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় পৌঁছিবেন। কিন্তু ঘটনাবলীর দরুণ আমাদের আশা সফল হল না।

এখন শেখ মুজিবুরকে রাষ্ট্রপতি করে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। নতুন সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তারা বাংলা দেশের নির্বাচিত জনপ্রিয় নেতা। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত সহকর্মীও। আমরা তাই বাংলা দেশের নির্বাচিত জনগণের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য মেলাতে চাই। কারণ আমার বিবেকের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সেবা করতে পারি না। যে সরকার আমাদের জনগণকে পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন করতে চায় এবং যার সেনাবাহিনী ব্যাপক হত্যা অভিযান চালিয়েছে (এর মধ্যে যুদ্ধাপরাধিও আছে) এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করছে।

এই কূটনৈতিক দূতাবাসের প্রধান হিসেবে আমি আজ বাংলা দেশের স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং তার নবগঠিত সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করছি। আমার অফিসারদের মধ্যে তিনজন ওই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা আমাদের সারভিস বাংলা দেশের হাতে সমর্পণ করছি। এই অফিস এখন থেকে ভারতে বাংলা দেশের দূতাবাস রূপে কাজ করবে।

দূতাবাসের কর্মীদের মধ্যে যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান তাদের এরূপ আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, তাদের যথাসম্ভব শীঘ্র বিনাবাধায় সেখানে যেতে দেওয়া হবে।

আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বের সকল দেশের কাছে বাংলা দেশ এবং এর সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলা-দেশ সরকার ওই দেশের সকল জনগণের সমর্থন ও আনুগত্যের অধিকারী এই দেশ রাষ্ট্রত্বের সকল শর্তও পূরণ করছে। এর স্বীকৃত সীমানা আছে। জনসংখ্যা সাত সাত কোটি এবং এর জনপ্রিয় সরকার দেশের মধ্যে কাজ করছেন। এখনও আমরা জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে বাংলা দেশের ঘটনার বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে এর স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধও জানাচ্ছি। তাদের

ক্ষতে এটি হবে উচ্চপর্যায়ের রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং দেরি হলেও শুভেচ্ছার ইঙ্গিতবাহী। এতে সারা বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে গভীর আঘাত সঞ্চার করা হয়েছে তা নিরাময়ের সহায়ক হবে। ইতিমধ্যে আমরা সকল স্বাধীনতাকামীদেশের নিকট বাংলা দেশের জনগণের বেচে থাকার এই জীবনমরণ সংগ্রামে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য আবেদন জানাই। এই মনুষ্যসৃষ্ট ধ্বংসলীলার আগেও এই দেশের জনগণের অর্থনীতি সারা বিশ্বের মধ্যে দরিদ্রতম ছিল। এর কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা গত পঁচিশ বছর ধরে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে এই দেশকে শোষণ ও বঞ্চিত করা হয়েছে। এই দেশের অর্থনীতি এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কোন আমদানী, উৎপাদন বা বণ্টন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই।

বাংলা দেশের দুর্গত জনসাধারণের ত্রাণ ব্যবস্থার কোন বিলম্ব ঘটলে তাদের কার্যত হত্যা, ধ্বংস পীড়া, মরক এমনকি অনাহারের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ আগামী ৬ মাস বর্ষার জন্য তারা জলবন্দী হয়ে থাকবে। এটি মানবতার আবেদন আমরা আশা করি মানুষের বিবেকের যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা এর দ্বারা জাগ্রত হয়ে উঠবে। আল্লা আমাদের ন্যায্য সংগ্রামকে আশীর্বাদ করুন।

হোসেন আলির এই মর্মন্তুদ বিবৃতির পরও কি বিশ্বের বিবেক নীরব থাকবে!

## কবি নরেন দেব

প্রখ্যাত কবি শ্রীনরেন দেব সোমবার ১৯শে এপ্রিল লোকান্তরিত হয়েছেন। পরিণত বয়সে প্রবীণ কবি অপটু শরীর নিয়ে কিছুকাল যাবৎই শেষদিনের জন্য অপেক্ষা করলেও এই সদানন্দময় মানুষটি তাঁর প্রাণ-প্রাচুর্যের দীপশিখাটি শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল রেখে গেছেন। তিনি ছোট-বড় সবাইকার ছিলেন সার্বজনীন 'নরেনদা'—সাহিত্যিক অসাহিত্যিক নির্বিশেষে সবাইকে তিনি এমন আপন করে নিয়েছিলেন যে যারা একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তারাই এই পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাই ব্যক্তিজীবনে যেমন সাহিত্যেও তিনি ছিলেন অজাতশত্রু—দলাদলির সংকীর্ণতা কোনোদিন তাঁর মানসিক ঔদার্যকে মলিন করতে পারে নি।

নরেন দেবের সাহিত্য সাধনা 'ভারতী'র যুগে সুরু হয়ে 'কল্লোল' যুগ অতিক্রম আধুনিক পত্র-পত্রিকার প্রসারিত হয়েছে। তাই সাহিত্যে তিন যুগের সেতুবন্ধনে তাঁর দান রয়েছে। 'জয়শ্রী'র সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। ৺ লীলা রায় এবং ৺ অনিল রায়ের সঙ্গে তাঁর সহিত সম্পর্ক ছিল মধুর। অন্যান্য প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতির সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসেন। অনেক উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কাব্যগ্রন্থ রচনার মধ্যে তার সাহিত্যিক-প্রতিভা ব্যাপ্ত থাকলেও ওমর খৈয়াম ও মেঘদূতের অনুবাদ তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি। নরেন দেবের পত্নী কবি রাধারাণী দেবীও বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্না এবং এই কবিদম্পতি বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং শ্রীমতী রাধারাণী দেবী এবং তাঁর কন্যা ও জামাতাকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

২০. ৪. ৭১

জয়শ্রী প্রকাশনের জাতীয়তাবাদী গ্রন্থসম্ভার প্রকাশিত হল

**রামমোহন** ভারতবর্ষে সার্বিক স্বাধীনতা চিন্তার-সূচনা সুরজিৎ দাশগুপ্ত
রামমোহন শুধুমাত্র আধুনিক ভারতবর্ষের জনক নন, সর্বদেশের সর্বকালের প্রগতির যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের অন্যতম এবং আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যেও তিনি একজন অগ্রগণ্য মনীষী।
দাম চার টাকা

**সুভাষচন্দ্র** দ্বিতীয় খণ্ড পবিত্রকুমার ঘোষ
নেতাজীর নেতৃত্বলাভের দুর্লভভাগ্য ভারতের হবেই—কিন্তু যতদিন তা না ঘটছে ততদিন তাঁর জীবন, বাণী ও কর্মকে অনুধাবন ও অনুসরণ করে ভারতে সুভাষ যুগকে আনয়ন করতে হবে। 'সুভাষচন্দ্র' ভারতে সেই যুগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে। দাম বারো টাকা। প্রথম খণ্ড ৯·০০

**ধর্ম ও বিজ্ঞান** অনিল রায়
বিশ শতকে যে নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছে তা জড়বাদকে প্রত্যাখান করেছে; অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে জড়বাদ বা নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করা চলবে না। ২·০০

**I POINT TO INDIA**
Max Mueller
Edited by Nanda Mookherjee
Max Mueller dedicated his whole life to India and appreciating his service to India, Vivekananda rightly said: "There are certain great souls in the West who sincerely desire the good of India, but we are not aware whether Europe can point out another well-wisher of India who feels more for India's well-being than Professor Max Mueller." Rs. 8·00

**NETAJI THROUGH GERMAN LENS**
Nandalal Mookherjee
'All those who knew Netaji, who had worked with him or who had the opportunity of knowing him personally are gratefull to Providence for having met a man of his magnitude and mark'—Dr. Werth.

# নিত্যরঞ্জন গুপ্ত

অপর্ণা সেন

স্বাধীনতার পূর্বে যেসকল প্রতিভাবান ভারতীয় গবেষক চিকিৎসাশাস্ত্রে অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন ডাক্তার নিত্যরঞ্জন গুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি যেভাবে একনিষ্ঠভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, দীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরিয়া, তাহা আজিকার তরুণ গবেষকদের নিকট দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার নিত্যরঞ্জন গুপ্ত ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে (বাংলা আষাঢ়) বরিশাল জেলার অন্তর্গত সরমহল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত বরিশাল সহরে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ তখনকার অনেক স্বদেশী নেতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিয়াছেন। চিকিৎসক ছাড়াও দেশ হিতৈষী হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এইরকম পরিবেশের মধ্যে ডাক্তার নিত্যরঞ্জন গুপ্তের শৈশব ও বাল্যকাল কাটে। তাঁহার পিতার দৃষ্টান্ত অনুসারে কর্মসাধনা এবং পরোপকার তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়। তিনি ১৯০৯ সালে বি. এম. স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বাদেশিকতার কেন্দ্র বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ হইতে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন সুরু করেন। তিনি এম. বি. উপাধি লাভ করিয়া প্রথমে কিছুদিন প্যাথলজি বিষয়ে মেডিক্যাল কলেজে গবেষণা করেন। তারপর তিনি বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং অন্যান্য কাজের মধ্যেও তিনি তাঁহার গবেষণা চালাইয়া যান।

তিনি ১৯২৭ সালে ইংল্যাণ্ডে যান এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যে তিনি এম. বি.; এম. আর. সিপি.; ডিপি. এইচ.; ডিটি এম এণ্ড এইচ উপাধি অর্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তখনকার যুগে কৃতি ভারতীয়দেরও কর্মক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুযোগের অভাব ছিল এবং উচ্চপদগুলি শুধুমাত্র ইংরাজ চিকিৎসকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৩২ সালে তিনি ঢাকা মিড্‌ফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালে প্যাথলজি এবং মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে দীর্ঘ নয় বৎসর ধরিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার গবেষণা চালাইয়া যান। তাঁহার গবেষণার প্রবন্ধগুলি দেশী এবং বিদেশী বহু চিকিৎসা-শাস্ত্রের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং গবেষক হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি প্রিফিথ স্কলারশিপ্ পাইয়াছিলেন। চিকিৎসক এবং মানুষ হিসাবেও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং ঢাকার বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি জেলা সিভিলসার্জেনএর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে

ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন; কিন্তু, তিন বৎসর পরে আসাম গভর্নমেণ্টের অনুরোধে আবার তিনি ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। সেখানে তিনি পাঁচবৎসর কাটান এবং নূতন প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের গঠন ও গবেষণা বিষয়ে উন্নতি সাধনে প্রচুর সাহায্য করেন।

তিনি ১৯৫৪ সালে দ্বিতীয়বার অবসর গ্রহণ করিয়া পণ্ডিচারী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগদান করেন। তাঁহার মত অভিজ্ঞ ও লোক হিতৈষী চিকিৎসকের পক্ষে কর্মজগৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকা কখনই সম্ভব নয়, তাই পণ্ডিচারী আশ্রমে থাকাকালে বৃদ্ধবয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি আশ্রমের একটী ক্লিনিকের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার এই একনিষ্ঠ কাজের জন্য তিনি আশ্রমের একজন অতি সম্মানিত ও জনপ্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁহার শেষ কর্মস্থল পণ্ডিচারী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তিনি ১৯৬৯ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী, পরলোক গমন করেন।


## অনিল ব্লাকের

## সময়োপযোগী দুইটি বই

**সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০**

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০**

( তৃতীয় সংস্করণ )

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ( ভূমিকা )

**নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।**

পাওয়া যাবে :

**জয়শ্রী :** ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

**জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন**

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

: উপন্যাস

উত্তরখণ্ড

# কণ্ঠভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

## ছাব্বিশ

সেদিন সন্ধ্যের কিছু পরে আনন্দিরামের বৈঠকখানায় ফিরে এসেছিল ভারতচন্দ্র।

বৈঠকখানা ঘরে তখন আলো জ্বলছিল। উঁকি মেরে দেখল, রাজকিশোর মুখুজ্জে একা-একা পাশার ছক সাজিয়ে বসে আছেন। অনুকূল বাচস্পতিকে মহারাজার বজরায় দেখে এসেছে।

গোবিন্দ কবিরাজ নাকি রোগী দেখতে গেছেন শান্তিপুরে। এ খবরটা বিকেলে শুনেছিল রঘুনন্দন মিত্রর সেরেস্তায় বসে। আজ আর আসতে পারবেন না কবিরাজ-মশাই। বোধহয় ওখান থেকে সোজা নবদ্বীপ ঘাটে গিয়ে মহারাজার বজরায় উঠবেন। কাল বিকেল নাগাদ ফিরলেও ফিরতে পারেন।

কিন্তু এই সন্ধ্যের সময় আনন্দিরাম গেলেন কোথায়?

রাজকিশোর মুখুজ্জে ডাক দিলেন—আরে রায়-মশাই আসুন, একা একা ছক সাজিয়ে বসে আছি, এক হাত হয়ে যাক্—

—আমি তো পাশা ভাল জানি না, তা'ছাড়া দু'জনে পাশা তেমন জমবে না—

—তা'হলে দুজনের খেলাই হোক, দাবা খেলতে জানেন—

—তা একটু-আধটু জানি—

—আপনি দেখছি সব কিছুই একটু-আধটু জানেন—হাসলেন রাজকিশোর। তারপর হাঁক দিলেন—ওরে পঞ্চা, দাবার ছকটা দিয়ে যা—

ভারতচন্দ্র মন্তব্য করল—এ বাড়িতে দেখছি সব রকম জিনিসই পাওয়া যায়—

ঠিক বলেছেন, দাদার এখানে সব পাবেন, দাদা সব যোগার করে দিতে পারেন, শুধু ওই নদীয়ার রাজমুকুটটি ছাড়া—বলতে বলতে হোহো করে হেসে উঠলেন রাজকিশোর।

—ওরে বাবা, অমন সাংঘাতিক লোভ আমার নেই—আতকে ওঠার ভান করল ভারত—

—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হলেই খুব খুশি—পঞ্চানন দাবার ছক দিয়ে গেল। মোটা চটের উপর রঙিন সুতোয় বোনা আসনের মত ছকটি। শাদা-কালো চৌকো-চৌকো চৌষট্টি ঘর। শাদা-কালো কাঠের ঘুঁটি শাদা ঘুঁটি নিলেন রাজকিশোর। কালো ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে জিজ্ঞেস করল ভারতচন্দ্র—আপনার দাদা গেলেন কোথায়—

—দাদা, কোথায় যেতে পারেন, আগে তাই বলুন—রাজকিশোরের উদ্ভট প্রশ্ন শুনে হাসল ভারত—বাঃ আমি কি করে জানবো—

—আন্দাজ করুন—

—আমি নতুন মানুষ এখানকার কিছুই জানি না, আন্দাজ করবো কি করে—

—তাও তো বটে, আপনি আবার নতুন মানুষ—মুখ তুলে তাকালেন রাজকিশোর। ভুরু কুচ্‌কে চোখ দুটি ছোট করে বললেন—আপনার সঙ্গে দাদার শেষবার দেখা হয়েছে কোথায়—

—বিকেল বেলা উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে মিত্র দেওয়ানজীর বাড়িতে গেলেন, আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে রেখে বললেন, আমি একটু কাজে যাচ্ছি, দেওয়ানজী আপনাকে

মহারাজার সভায় নিয়ে যাবেন—ভারতচন্দ্রের জবাব শুনে মুখ টিপে হাসলেন রাজকিশোর, হাসিমুখে বললেন—দাদা তা হলে কাছে পিঠেই কোথাও আছেন, বেশীদূর কোথাও যাননি—

এমন সময় দুটি শ্বেত পাথরের গেলাশে সিদ্ধির সরবত নিয়ে এল পঞ্চানন।

একটি গেলাশ তুলে নিলেন রাজকিশোর। কিন্তু আপত্তির সুরে বললো ভারত—না আমি নেব না—

—কেন, কি হল আপনার—

—কাল খুব শরীর খারাপ হয়েছিল, আর নতুন জায়গায়, নতুন বাড়িতে রোজ রোজ এসব উচিত নয়, তা' ছাড়া বাড়ির কর্তাও যখন উপস্থিত নেই—ভারতের জবাব শুনে আবার হাসলেন রাজকিশোর—তা'হলে আমিই মেরে দিচ্ছি—বলতে বলতে গেলাশটি তুলে নিলেন, একচুমুকে শেষ করে বললেন—আসুন খেলা শুরু করা যাক—

পর পর দুটি গেলাশ সিদ্ধির সরবত টেনেও কিন্তু রাজকিশোরের বুদ্ধি ঘোলাটে হল না। চোখে ঝাপসা দেখলেন না। হাতও একটু কাঁপল না। বাঘের মত খেলতে লাগলেন। চারটি বোড়ে কয়েক ঘর এগিয়ে দিলেন। তারপর দুই ঘোড়া তুলে আনলেন। আর কোন গুটি চাললেন না। হাতি, নৌকা, রাজা, মন্ত্রী সব দাঁড়িয়ে রইল।

ঘোড়ার আড়াই চাল। শুধু দুই ঘোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে ভারতচন্দ্রের সাজানো ব্যূহ তছনছ করে দিল। এক নৌকো আর মন্ত্রীর বদলে একটি ঘোড়াকে ঘায়েল করল বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।—হাল ছেড়ে দিয়ে হাসল ভারত—এ বাজি হেরে গেলুম, আরেকবাজি হোক—

আবার গুটি সাজানো হল। এবার শাদা গুটি ভারতের, কালো নিলেন রাজকিশোর। খুব সাবধানে শুরু করলো ভারত। কিন্তু ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ বাইরে একটা পাল্কীর শব্দ শুনে দু'জনেই তাকাল। পঞ্চানন এগিয়ে গেল।

এবার খেয়াল হ'ল ভারতের। রাত হয়েছে বেশ। দাবা খেলতে খেলতে আর সময়ের হিসেব ছিল না। পঞ্চাননের কাঁধে ভর দিয়ে ভেতরে এলেন আনন্দিরাম।

ইষৎ টলটলায়মান। সারা গায়ে গোলাপী গন্ধ। চোখের মণি দুটি কেমন স্থির নিষ্প্রভ। সামান্ত জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—এই যে কবিবর, কেল্লা মেরে দিয়েছেন—

বলতে বলতে ঝুপ করে ফরাসের উপর বসে পড়লেন। ভারতচন্দ্রের কাঁধে একটা চাপড় মেরে আবার বললেন—কেল্লা ফতে করেছেন—তারপর মুখ ঘুরিয়ে—বুঝলে, রাজকিশোর ভায়া, আমাদের কবির কপাল খুলে গেছে—

—তাতো বুঝলুম—কিছুটা যেন বিরক্তির সঙ্গে বললেন রাজকিশোর—কিন্তু আপনি আবার ওই ছেলে ছোকরাদের আড্ডায় গেলেন কেন, আপনাকে না কতদিন বারণ করেছি—

সামান্ত যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন আনন্দিরাম। হাসবার চেষ্টা করে বললেন—আরে সদাশিব এসে ধরে নিয়ে গেল, আমি কি ইচ্ছে করে গেলাম নাকি—

—বিকেলবেলা আপনি তো ছিলেন দেওয়ানজীর বৈঠকখানায়, সেখানে সদাশিব কি করে ধরলো আপনাকে—রাজকিশোরের কথা শুনে চোখ বড়বড় করে তাকালেন আনন্দিরাম—ভায়া তুমি যে দেখছি ফৌজদারী এজলাসের উকিলের মত জেরা শুরু করলে, এসব খবর জানলে কি করে অ্যাঁ, তুমি যে দেখছি পাকা গোয়েন্দাকেও হার মানালে অ্যাঁ, এবার রায় বক্সীকে বলে ইমামবকসকে সরিয়ে তোমাকেই কোতোয়ালের কাজে পাকাপাকি বহাল করাতে হবে—

—ওসব কথা রাখুন—রাজকিশোর বললেন—সদাশিব আপনাকে ধরতে আসেনি, আপনি ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছেন—

এবার হেসে উঠলেন আনন্দিরাম—সুরাসুন্দরীর আমন্ত্রণে কি ধরা না দিয়ে পারা যায়, আপনিই বলুন রায়মশাই আমার কথা ঠিক কি না—না আপনার কথা ঠিক নয়—বেশ জোর দিয়ে আপত্তির সুরে বললেন রাজকিশোর—হাজার বার আমন্ত্রণ এলেও আপনার যাওয়া উচিত নয়, সদাশিব চন্দ্রশেখর, ওরা আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, সম্পর্কেও ছোট, আমরা হলুম গিয়ে ওদের মেশোমশাই, আমাদের কি উচিত ওদের আড্ডায় গিয়ে ফূর্তি করা, আপনিই বলুন রায়মশাই—দু'জনেই ভারতচন্দ্রকে সাক্ষী মানছেন। এক জন কড়া সিদ্ধির সরবত খেয়েছেন, আরেক জন মদ্যপান করে এসেছেন। কাউকেই বোধহয় পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ বলা চলে না।

মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন আনন্দিরাম—তোমার কথা আমি মানতে পারছি না ভায়া—তারপর দুহাত নেড়ে হেসে হেসে বললেন—সুরাসুন্দরীর সভায় কোন সম্পর্কের ব্যবধান নেই, বয়সের বাধা নেই, সেখানে সবাই সমান, সব সমান—

রাজকিশোর আর কোন জবাব দেবার আগেই বাধা দিল ভারতচন্দ্র—থামুন, আপনাদের এ তর্কের কোন মীমাংসা হবে না—তারপর আনন্দিরামকে লক্ষ্য করে—তার চেয়ে আপনি আমার কপাল খুলে যাবার কথা কি বলছিলেন, সেটাই বরং খোলসা করে বলুন—

—আরে ভায়া—ভারতচন্দ্রকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন আনন্দিরাম, সহজেই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এলেন। তোমার কবিতা শুনে সবাই চমকে গেছে, মহারাজ খুব খুশি, তোমার বৃত্তি ধার্য করেছেন মাসে চল্লিশ টাকা, কাল আমি তোমাকে দেওয়ান-সহবতির দপ্তরে নিয়ে যাব, কালকেই তুমি পয়লা কিস্তির টাকা আগাম পেয়ে যাবে—

পরমুহূর্তে বুকের মধ্যে যেন রক্ত চলকে উঠেছিল। দমবন্ধ করে কোনরকমে জিজ্ঞেস করতে পেরেছিল ভারতচন্দ্র—আপনি কি করে জানলেন, কার কাছে শুনলেন খবরটা—

—আরে ভায়া আমি নেশা করি আর যাই করি, আসলে ঠিক আছি, আমি নকুলকে টিপে রেখেছিলাম, দেওয়ানজীর পেয়ারের চাপরাশী তো অনেক খবর আগেভাগে পেয়ে যায়, ওকে তোমার আরেকবার বখশিশ দিতে হবে—

পরের দিন সকালবেলা আনন্দিরামের সঙ্গে দেওয়ান-সহবতির দপ্তরে গিয়েছিল ভারতচন্দ্র। যেতে যেতে বলছিলেন আনন্দিরাম—আমি কিন্তু খুব খুশি হয়নি, আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের গুণী ব্যক্তির অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকার বেশী মাসিক বৃত্তি পাওয়া উচিত ছিল—

—তা' যা পেয়েছি, তাই বা মন্দ কি—আমতা আমতা করে বলেছিল ভারতচন্দ্র—বেশী লোভ ভাল নয়, জানেন তো, অতি লোভ ন কর্তব্যঃ লক্কং নৈব পরিত্যজেৎ—

—আপনার ও কথা আমি মানতে পারলুম না—আনন্দিরামের গলায় আপত্তির সুর

—অনেক আজেবাজে লোক স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে, দুটো খোশামোদের কথা বলে মোটা টাকা আদায় করে নিয়ে যায়, আপনি খোশামোদ করতে শিখুন, যেখানে যেমন দরকার তেল দিতে শিখুন, দেখবেন আপনিও অনেক টাকা হাতাতে পারবেন—

এ বক্তব্যের উপর কোন মন্তব্য করলো না ভারতচন্দ্র, অন্য কথা বললো—কাল রাত্তিরে বেশতো তুমি তুমি বলেছিলেন, অনেকটা ঘনিষ্ঠ বোধ করেছিলাম, আজ আবার আপনি-আপনি আরম্ভ করলেন কেন—

—বলেছিলুম নাকি—মুখ ফিরিয়ে সামান্য হাসলেন আনন্দিরাম। তারপর আবার সামনের দিকে চোখ রেখে পাশাপাশি যেতে যেতে বললেন—রাত্তির বেলা বিশেষতঃ দুপুর রাতে কি বলি, দিনের বেলা আর মনে থাকে না, আমি

দিনের বেলা এক রকম থাকি রাত্তিরে আরেক রকম হয়ে যাই—

কথা শেষ না করেই হোহো করে হেসে উঠলেন। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে আবার বললেন—জানেন, অনেক আজে বাজে বামুন পণ্ডিত, ছুটো সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে মোটা পৈতের গোছা দেখিয়ে, মোটা টিকি নেড়ে মোটা টাকা মাসোহারা আদায় করে নেয়, রাজসভার মহা মহা পণ্ডিতদের সকলেই আমি ভালো করে চিনি, দু' একজনকে বাদ দিলে অন্য সকলের কার পেটে কতখানি বিদ্যেবুদ্ধি আছে এ আমি কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারি, এই যে অনুকূল বাচস্পতি, উনি তো রাজসভার একজন মহাপণ্ডিত, উনি কি পারলেন আপনার সব কথার জবাব দিতে, নিজেই স্বীকার করলেন ছন্দ-অলঙ্কার ভুলে গেছেন, তবে, হ্যাঁ, জ্যোতিষ শাস্ত্রটা মোটামুটি ভালই জানেন, মনোযোগ দিয়ে গণনা করলে নির্ভুল মিলিয়ে দিতে পারেন—

—ওই তো যথেষ্ট, সবাই যে সব বিষয়ে পারদর্শী হবেন, এমন কি কথা আছে, আমি তো জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কিছুই জানি না —বলতে বলতে সামান্য হাসল ভারত। মৃদু হাসি মুখে বললো—মুখুজ্জে মশাই, আপনি পণ্ডিতের পূর্বে মহা শব্দ দিলেন কেন, মহাপণ্ডিত মানে তো মূর্খ, কোন কোন ক্ষেত্রে 'মহা' শব্দ দিলে বিশেষ অর্থ হয়, যেমন মহামাংস, মহানিদ্রা, মহাবৈদ্য, মহাযাত্রা—

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন আনন্দিরাম। পরমুহূর্তেই হেসে বললেন—আমি জানি, খেয়াল ছিল না, তা'ছাড়া ওই যে বললুম, দু'চারজনকে বাদ দিলে বাকি সকলেই প্রায় মহাপণ্ডিত—

ঘরের কোণে মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। রাত দুপুর। বাইরে শরতের আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না। এক একবার হালকা মেঘের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। আবার মহানিম গাছের পাতায় পাতায় আলো ছায়ার আলপনা। বালিশে কনুই ভর দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে কৃষ্ণনগরের বিবরণ শুনছিল রাধা। ছোট্ট একটা হাই তুলে মুখের সামনে হাত চাপা দিল। সামনে সামান্য ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল ভারতচন্দ্র—তোমার কি ঘুম পাচ্ছে, তা হলে থাক—

—না আপনি বলুন, আমি শুনছি—

—আনন্দিরাম মুখুজ্জে বলেছিলেন, চল্লিশ টাকায় নাকি সংসার চলেবে না, আমি বলেছিলুম, আমার গিন্নী খুব গোছালো, দেখবেন ওই চল্লিশ টাকাতেই, কেমন সুন্দরভাবে সংসার গুছিয়ে নেবে, তুমি কি বলো—

আরেকবার হাই তুলে আবার মুখে হাত চাপা দিল রাধা। তারপর অলসভঙ্গিতে বললো—শহর কখনো চোখে দেখিনি, সেখানকার খরচপাতি কি রকম, কি করে জানবো, তবে মাসে মাসে চল্লিশ টাকা তো কম কথা নয়, ভালোভাবেই চলা উচিত—

—আমিও তাই বলি, আমরা আড়াইজন লোকে, কেষ্টনগরে বাসাভাড়া করে থাকলেও চল্লিশটাকায় বেশ চলে যাবে, বেশী টাকা আমাদের দরকার কি—

—তা ঠিক—মুখ টিপে হাসল রাধা—তবে লোক আড়াইজন নয়, সাড়ে তিনজন বলতে পারেন—

অবাক হল ভারতচন্দ্র—তুমি, আমি আর আমাদের পরীক্ষিৎ এই তো আড়াইজন, আরেকজন তুমি পেলে কোথায়—

—কেন রঘুনাথ, রঘুও থাকবে আমাদের সঙ্গে, ওরমত এত শক্ত সমর্থ বিশ্বাসী লোক সঙ্গে থাকা ভাল—

—সে কি, তুমি রঘুকে এখন পাবে কোথায়—বিস্মিত শুনে খুক খুক করে একটু হাসল রাধা। শেষে বললো—রঘুতো আজ তিন দিন হ'ল আমাদের এখানে আছে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি—

—কই না তো, পাজিটা আবার এখানে এসে জুটেছে—

—আহা ওর দোষ কি, আমি সব শুনেছি ওর মুখে,

আপনারা সবাই মিলে শুধু শুধু ওকে মেরে তাড়িয়েছিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন—রাধার অনুরোধ শুনে মৃদু হেসে বললো ভরতচন্দ্র—নাপিতের ব্যাটার পেটে পেটে কুবুদ্ধি, আমার কাছে যেতে সাহস পায়নি, তোমাকে এসে ঠিক ধরেছে—

—তা' আপনি যাই বলুন, ও কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসে, ভক্তি করে—

রাধার মন্তব্য শোনার পর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কি যেন ভাবল ভারতচন্দ্র। তারপর বললো—ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, তখন রঘু থাকবে আমাদের সঙ্গে, কিন্তু ও আমার সঙ্গে দেখা করলো না কেন, আজ সারা বিকেল সন্ধ্যের মধ্যে একবারও দেখতে পেলুম না—

—আপনার সামনে আসতে ভয় পাচ্ছে বোধহয়, কেন আপনি দেখেন নি, আপনারা যখন এসে পৌঁছুলেন, তখন তো রঘু আর ছিরুদা' ঘাটের পাশে কাঠ কাটছিল—

এবার যেন মনে পড়ল ভারতের—হ্যাঁ, মনে পড়েছে আসতে আসতে দু'জন লোক যেন দেখেছিলুম, কাছে এসে দেখি শুধু ছিরুদা, রঘু ছিল কিনা ঠিক বুঝতে পারিনি—

আবার হাসল রাধা—রঘু বোধহয় আপনাকে আসতে দেখেই বাড়ির পেছনের বাশবাগানে লুকিয়েছিল—

আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল ভারতচন্দ্র—একটু জল খেয়ে নিই—

—ওকি দাঁড়ান, আমি এনে দিচ্ছি—তাড়াতাড়ি উঠে বসল রাধা।

—থাক; আমিই নিচ্ছি, এক গেলাশ জল নিয়ে খেতে পারবো না, তুমি শুয়ে থাকো, সারাদিন খাটাখাটুনি করেছ—

ঘরের কোণে ছোট একটি পেতলের কলসীতে খাবার জল। কলসীর মুখে কাঁসার রেকাবী ঢাকা। পাশে ঝকঝকে কাঁসার গেলাশ। জল খেয়ে জানালার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বাইরে জ্যোৎস্না। সামান্য ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। একটু ইতস্তত: করে জিজ্ঞেস করল ভারত—বাইরে পুকুর ঘাটে গিয়ে বসবে নাকি রাধা, সেই সেবারের মত—

—কি যে বলেন আপনি, একবাড়ি আত্মীয়-কুটুম, বাবার ঘরে বসে খুড়োমশাই এখনো কথা বলছেন, আমি ঘরে আসার সময় বিষকেও সেখানে দেখে এসেছি—চাপা গলায় কথা বলছিল রাধা। কিন্তু কথার মধ্যে দৃঢ় আপত্তির সুর।

অগত্যা আবার খাটে এসে বসল ভারত। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো—তা'হলে আর কি করবে এখন ঘুমোর—

—না এখন আর ঘুম আসবে না, ঘুম ছুটে গেছে—জবাব দিল রাধা—তার চেয়ে আপনি কেষ্টনগরের গল্প বলুন, যা বলছিলেন, তারপর কি হ'ল—

সামান্য সময় চুপচাপ থেকে আস্তে আস্তে আবার আরম্ভ করল ভারতচন্দ্র—তারপর আমি আর আনন্দিরাম মুখুজ্জে দেওয়ান সহবতির দপ্তরে গেলুম—

সেদিন দেওয়ান সহবতির দপ্তরে রায়-বক্সী মদন গোপালও উপস্থিত ছিলেন।

এরা দু'জন সহোদর ভাই। দেওয়ান-সহবতি রামগোপাল আর রায়-বক্সী মদনগোপাল। দু'জনের চেহারার মধ্যেও বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। এক ধরণের কাটাকাটা নাকমুখের গড়ন। পাকানো গোঁফ। বলিষ্ঠ চেহারা। তবে রাম গোপালের রঙ্ ফরসা, শরীরে সামান্য মেদ জমেছে। চেহারায় বয়সের ছাপ। মাথার চুল, গোঁফের রঙ কাঁচাপাকা।

মদনগোপাল কনিষ্ঠ। মেদহীন বলিষ্ঠ গড়ন। জাঁকালো গোঁফের সঙ্গে জমকালো গালপাট্টা। মাথায় বাবরী চুল। সব কুচকুচে কালো।

রাজবাড়ির বাইরের দিকে সেরেস্তা মহলের এক অংশে দেওয়ান-সহবতির দপ্তর। রাজবাড়ির জামাই বলে সর্বত্র

অবাধগতি আনন্দিরামের। আগে ভাগে চাপরাশীর মারফত কোন খবর পাঠাবার কোন দরকার করে না। তাঁর পেছন পেছন সহজেই দেওয়ানজীর খাশ-কামরায় ঢুকতে পারলো ভারতচন্দ্র।

দু'জনকেই সমাদর করে বসালেন রামগোপাল। মদন গোপালের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। মামুলি কুশল প্রশ্ন আর শিষ্টাচারের বিনিময় হল।

তারপর ভারতচন্দ্রকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন মদন গোপাল—আচ্ছা রায়মশাই, আপনিতো বহুদিন ফরাসডাঙ্গায় ছিলেন, ওখানকার ফরাসীকুঠি থেকে গোলাবারুদ কেনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, কিংবা কিছু ভাল গোলন্দাজ যোদ্ধাকে আমাদের চাকরিতে বহাল করা যায় কিনা, এ বিষয়ে আপনি কি কোন পরামর্শ দিতে পারেন—

আমতা আমতা করে জবাব দিল ভারতচন্দ্র—আজ্ঞে আমি গোলাবারুদ, সেপাইশান্ত্রী সম্বন্ধে তেমন কোন পরামর্শ দিতে পারবো না, এ ব্যাপারে আপনারা বরং দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন—

এবার গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিলেন রামগোপাল—না, ইন্দ্রনারায়ণের দ্বারা আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না, বরং বিঘ্ন ঘটবে, হাজার হোক ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসী সরকারের নিমক খান, তিনি সব সময় ফরাসীকুঠিরের স্বার্থ দেখবেন, আমরা গোলাবারুদ মজুত করছি, সেপাইশান্ত্রী সংগ্রহ করছি, এসব খবর উনি অবশ্যই ফরাসীকুঠিরের কর্তাদের জানাবেন, তারা আবার রঙ চড়িয়ে খবরটি নবাববাহাদুরের দরবারে পৌঁছে দেবেন, একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে, যদিও নবাববাহাদুরের হুকুম আমরা পেয়েছি, বর্গীর হাঙ্গামা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে পারি, সেপাইশান্ত্রীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করতে পারি, কিন্তু এ হুকুম সাময়িক জরুরী অবস্থার জন্য এবং অস্ত্র সংগ্রহেরও মোটামুটি একটা সীমা আছে, যেমন আমরা নতুন কামান কিনতে পারবো না, তৈরী করাতেও পারবো না, প্রথম কারণেই এ খবর পাঁচকান হোক এটা আমরা চাই না—

মদনগোপাল সায় দিলেন—ঠিক কথা, আপনি এখন আমাদের লোক হয়ে গেছেন, তাই আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি—

নম্রভাবে জবাব দিল ভারতচন্দ্র—আজ্ঞে এসব ব্যাপারে আমারতো তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবে একজন যোদ্ধার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তার নাম মামুদ জাফর, কথাবার্তায় মানুষটি যেমন মার্জিত, তেমনি অবরদস্ত যোদ্ধা, চমৎকার উর্দু বলেন, বাঙলাও বেশ বলতে পারেন, নবাব-বাহাদুরের বাহিনীর সঙ্গে থেকে বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করেছেন বহুদিন। ভাস্করপণ্ডিতকে হত্যা করার জন্য যেসব বাছাবাছা যোদ্ধাদের বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হয়েছিল, এই মামুদ জাফরও তাদের মধ্যে ছিলেন, হুগলীতে এর বাড়ি, আদিনিবাস বোধহয় দিল্লী, তিন পুরুষ ধরে হুগলীর বাসিন্দা, হুগলীর ফৌজদারের অধীনে আগে চাকরি করেছেন, এখন অবশ্য নবাববাহাদুরের বাহিনীর সঙ্গে আছেন, আপনারা বরং এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সত্যি কথা বলতে কি, মানুষটির সঙ্গে আলাপ করে আমার খুব ভাল লেগেছিল, যদি এই মামুদ জাফরকে আপনাদের এখানে আনতে পারেন, তবে এর সাহায্য ও পরামর্শে আপনারা উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস—

ভারতচন্দ্রের কথা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল রাধা। শান্ত, ক্লান্ত, মুখশ্রী। গল্প বলা বন্ধ করল ভারত। আর ডাকল না। সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। আহা ঘুমোক। সন্তর্পণে খাট থেকে নামল সে। আরেকবার জল খেল। ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেবাল।

দক্ষিণের জানালার বাইরে চালতা গাছের পাতার আড়াল থেকে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না এসে পড়ল সারা বিছানায়।

(ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

# জাপানের দিনগুলি

## বারীন বর্দ্ধন

পঞ্চাশ্তর মাইল পরিধির পরিচয় পেলাম বাস চলার কিছুক্ষণ পরেই। রাস্তার দু'ধারে কিছু দূরে ছড়িয়ে রয়েছে সুচাল পাহাড়। সারা দেহ সবুজ ঘাসে মোড়া। অনেকটা দেখতে সবুজ মখমলের মত। দেখেই মনে হয় কিছুদিন আগেও এ ছিল আসোরই মত ভয়ঙ্কর। সমস্তটা জায়গা জুড়ে রয়েছে এ রকম কয়েকটা আগুনের পাহাড়। তাদেরই এদিক ওদিক ঘুরে গাড়ী গিয়ে পৌঁছুল মাউন্ট্ আসোর নীচে।

মাউন্ট্ আসো জলন্ত আগুনের পাহাড় হলেও এখন পর্য্যন্ত হোক্কাইদোর পাহাড়গুলির মত উঁচু হয়ে উঠেনি। তাছাড়া পাহাড়ের খাড়াই-ও ফুজিসানের মত নয়। কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গিনীদের নিয়ে আমরা পাহাড় চড়তে সুরু করলাম।

দূরে দেখা যাচ্ছে আগ্নেয়গিরির মুখ! মুখ থেকে বেরোচ্ছে ঘন কাল ধোঁয়া। গন্ধক এবং ঐ জাতীয় পদার্থের গন্ধে ভরপুর। জলন্ত আগুনের পাহাড় এর আগেও দেখেছি। কিন্তু তার গোল সুচাল মুখ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী কখনও দেখিনি। উত্তেজনায় দশ মিনিটের পথ দু'মিনিটে পার হয়ে ছুটে গেলাম ক্রেটারের ধারে।

ক্রেটারের পরিধি ফুজিসানের চেয়েও বড়। প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর খাদের ভিতর ধোঁয়ার অন্ধকার। হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় ধোঁয়া সরে যেতেই সমস্ত খাদটি পরিষ্কার নজরে এল। নীল আর সবুজে মেশান তরল পদার্থ টগ্‌বগ্ করে ফুটছে চায়ের জলের মত। আর তারই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে আকাশ বাতাস ছাত্রজীবনে জেনেছিলাম পৃথিবীর অভ্যন্তরের গরম তরল পদার্থ মাটির দুর্বল অংশ দিয়ে বেরিয়ে এসে তৈরী করে আগুনের পাহাড়। মাউন্ট্ আসো হয়ত এই ধরণের একটি দুর্বল অংশ। পৃথিবীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জন্মালেও মাউন্ট্ আসো নিজে দুর্বল ছিল না। কারণ এর কয়েকদিন পরেই টোকিওতে ফিরে এসে কাগজে দেখেছিলাম মাউন্ট্ আসোর অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ সুরু হয়েছে এবং তার রঙীন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে বহুদূর থেকে। আশেপাশের জনপদ বিপর্য্যস্ত আসোর তাণ্ডবে।

এখান থেকেই সুরু হল কুমামোতো হয়ে দক্ষিণায়নের শেষ যাত্রা। গন্তব্যস্থল ছিল ইতিহাসখ্যাত নাগাসাকি। শেষ যাত্রা বলছি কারণ নাগাসাকি থেকেই আমাদের সুরু হয়েছিল উত্তরায়ণ। হিরোসিমা হয়ে ওসাকা—টোকিওর পথে।

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় খবরের কাগজ মারফৎ বহু জায়গার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। লেলিনগ্রাদ সেবাস্তোপোল বা ষ্ট্যালিনগ্রাদ, ডানকার্ক, ডুরুক বা এল্ আলেমাইন—প্রতিটি জায়গাই ছিল প্রতিদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু বিভীষিকার মানদণ্ডে হিরোসিমা এবং তার দোসর নাগাসাকিকে এরা বোধহয় কেউই ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। জার্মানীর আত্মসমর্পণের পরেও যে জাপানের আত্মবিশ্বাস

টলেনি, মাত্র দু'টো বোমার ঘায়ে পঙ্গু হয়ে গেল তার রণনীতির চাঞ্চল্য। তখনকার খবরের কাগজে ফলাও করে বেরিয়েছিল আণবিক বোমার প্রচণ্ডতা। কিন্তু বোমার বীভৎসতা কতখানি সে সম্বন্ধে অনেকেরই সঠিক ধারণা ছিল না। আর ধারণা করাও সহজ নয়।—দু'টো বোমার ঘায়ে দু'টো সহর উড়ে গিয়েছে—ছ' বছরের যুদ্ধে এরকম কত সহরই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে কামানের গোলার মুখে। তাই যেদিন টোকিও ওসাকা ছেড়ে হিরোসিমা এবং নাগাসাকির দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম কোনরকম অসম্ভব কল্পনা বা আশঙ্কা মনে ছিল না। টোকিওর ছাত্রবন্ধুরা 'উনিশ' পয়তাল্লিশ সালে নেহাৎই ছিল অপোগণ্ড। আণবিক বোমার প্রত্যক্ষ বিবরণ তারা শুনেছে মা বাবার মুখে। তাই তাদের পক্ষে সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া টোকিও থেকে হিরোসিমা বা নাগাসাকির দূরত্বও ছিল সাধারণের যাতায়াতের পক্ষে প্রধান বাধা। এ দু'টো সহর বাইরের জগতের কাছে যতটা দর্শনীয় বস্তু বলে পরিচিত হয়েছে, জাপানীদের কাছে তারা সেরকম মর্য্যাদা পায়নি। তার দুটো কারণ দিতে পারি। প্রথমটায় জাপানীরা নিতান্তই স্বল্পভাষী এবং সেজন্য নোটেই উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়। আর দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্মুখ জীবনে পিছনের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করবার মত অবসর তাদের নেই।

কয়দিন আগে কুমামোতো-নাগাসাকি অঞ্চলে হয়ে গিয়েছে 'এ্যালিসের' তাণ্ডব। এ 'এ্যালিস্' 'এ্যালিস্ ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের' ছোট্ট মেয়ে এ্যালিস্ নয়। ঋতুর পরিবর্ত্তনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুক থেকে যে টাইফুনের দল ছুটে আসে একের পর এক, তাদেরই প্রথমা হলেন এ্যালিস্। অন্য সবকিছুর সঙ্গে জাপানী জীবনে টাইফুনেরও একটা অংশ আছে। প্রতি বছরই বর্ণমালার অক্ষর অনুযায়ী এদের নামাকরণ করা হয়। 'বি' অক্ষর দিয়ে হয়ত দ্বিতীয় টাইফুনটির ধ্বংসের সঙ্গে তাল রেখে নাম হওয়া উচিত ছিল 'বুলডজার'। কিন্তু কলাকুশলী জাপানীরা তার নাম দিল 'বার্থা'।

প্রায় এক সপ্তাহ আগে এ্যালিস্ চলে গিয়েছিল নাগাসাকির পাশ দিয়ে। তার বিধ্বংসী ছাপ তখনও, ছড়িয়ে রয়েছে রেললাইনের দু'পাশে। কুমামোতো থেকে ট্রেন ছাড়ার পর মাইলের পর মাইল এই দৃশ্য দেখে যাচ্ছিলাম আর মনে মনে একটা আন্দাজ করছিলাম নাগাসাকির বার বছর আগেকার আগষ্ট্ মাসের সেই বিশিষ্ট দিনটি। আমাদের অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে নাগাসাকির উপর আণবিক বোমার বিস্ফোরণ অনেকটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য। শিল্পাঞ্চল হিসাবে নাগাসাকির বৈশিষ্ট্য অনেকদিনের। জাপানের বিখ্যাত মিৎসুবিশী কোম্পানির জাহাজনির্মাণ কারখানা এই নাগাসাকি উপসাগরের পাশে। কাজেই বোমারু বিমানের লক্ষ্যস্থল হতে হলে যে সমস্ত গুণাবলীর প্রয়োজন তার সবগুলিই ছিল নাগাসাকির। তবুও শত্রুরা তাক করেছিল পাশেই কোকুরা সহরকে। কিন্তু B 29 যেদিন প্লুটোনিয়ম বোমাটি নিয়ে কোকুরার দিকে এগিয়ে গেল সেদিন কোকুরার আকাশ ছিল ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। তাই কোকুরা বেচে গেল ধ্বংসের হাত থেকে আর সেই মুহূর্ত্তেই কপাল ভাঙ্গল নাগাসাকির।

নাগাসাকি সহর পাহাড়ে। বড় রাস্তাঘাট থাকে সহরটা প্রাকৃতিক বাধার দরুণ আপনা থেকেই এক একটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। সোজা সমতলে চলবার উপায় নেই। একটু এগোলেই সামনে এসে দাঁড়াবে উঁচু পাহাড়। রাস্তা চলে গিয়েছে তারই গা বেয়ে অন্যদিকে। পায়ে হেটে গেলে নাজেহাল হওয়া বিচিত্র নয় ভেবে ট্যাক্সি চেপে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সি বেশ জোরেই ছুটেছে। কিন্তু আণবিক বোমার কোন চিহ্ন বা নিদর্শন না দেখে মনে মনে অনেকটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। দ্বিতীয় আর কোন দর্শনীয় বস্তুর কথা

একেবারেই মনে আসেনি। তাই শুরুতে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলেছিলাম নাগাসাকি মিউজিয়মের দিকে যাবার জন্য। আর যেতে যেতে খুঁটিয়ে পরখ করছিলাম বার বছর আগেকার কোন নিদর্শন মিলে কিনা। বাড়ীঘরের কোথাও এতটুকু কোন পরিবর্ত্তন নজরে পড়লনা। মনে আছে বৈজ্ঞানিকমহল আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর বলেছিলেন যে অন্ততঃ পচাত্তর বছরের মধ্যে এ জায়গায় কোনরকম গাছপালা জন্মান অসম্ভব। সেই বৈজ্ঞানিক মতবাদেরও কোন প্রমাণ খুঁজে পেলামনা নাগাসাকির পথে ঘাটে। পাহাড়গুলিতে জন্মে রয়েছে দুর্বাঘাস থেকে শুরু করে ছোট বড় নানা আকারের গাছ। বাড়ীঘরের সামনে উঠানেও রয়েছে ছোট্ট ফুলের বাগান। কেবল একটি ব্যতিক্রম নজর এড়াতে পারলনা। গাছগাছড়া কোনটাই দশ বার হাতের বেশী উঁচু নয়। সবাই কৈশোরের পর্য্যায়ে। বুঝতে কষ্ট হলনা যে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরই এরা জন্ম নিয়েছে ধরিত্রীর বুকে।

অসংখ্য ছোট বড় রাস্তা পেরিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল নাগাসাকি মিউজিয়মের দরজায়। পথে যেতে যেতে আশে-পাশের ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছিল ড্রাইভার। গাড়ী দাঁড়াতেই ছুটে এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল—এটাই নাগাসাকি মিউজিয়ম। অনেক দেখবার জিনিষ পাবেন এখানে।

চারতলা উঁচু বাড়ীটা একটা পার্কের মধ্যে। ঘরে ঢুকতেই দেখলাম দরজার দু'পাশে ছোট ছোট ষ্টল্ সাজিয়ে বসে আছে বিক্রয়কারিণীর দল। পৃথিবীর কাছে নাগাসাকির কৌলিন্য যদিও নির্দ্দিষ্ট হয়েছে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর জাপানীদের কাছে এর পরিচয় অন্যধরণের। মিৎসুবিশী কোম্পানীর কথা আগেই বলেছি। সেই সঙ্গে এখানকার হাড়ের জিনিষ জাপানীদের কাছে মহা আদরের। এই হাড়ের জিনিষ নিয়ে বসে আছে পসারিণীর দল। আমি এবং ডাক্তার আগরওয়াল সেদিকে নজর না দিয়ে সোজা চলে এলাম দোতলায়।

দোতলাটা পুরোপুরি একটা কামরা। তাতে সাজান রয়েছে বহুরকমের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র। আর এগুলিই আগষ্টমাসের ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য বহন করছে। কাঠের ফ্রেমে বাঁধা রয়েছে তখনকার আমলে B 29 থেকে তোলা সব ছবি। কোকুরার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুণ বোমাটি ফেলা হয়েছিল দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি উপত্যকায়। নিয়তির পরিহাসের মতই সমস্ত ভয়াবহতা একত্র করে বোমাটি পড়েছিল দূর প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় রোমান্ ক্যাথলিক চার্চ্ অর্থাৎ উরাকামি চার্চ থেকে মাত্র পাঁচশ' গজ দূরে। চার্চটার কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে জাপানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার মিশনারীদের জীবনে এনেছিল একটা চরম সঙ্কট। সম্রাটের আদেশে বহু মিশনারীর জীবন চিরতরে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গিয়েছে। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বাধাবিপত্তির মধ্যে এ্যাড্মিরাল পেরী প্রথম জাপানকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করালেন যদিও কাজটা নিতান্তই অহিংস উপায়ে সাধিত হয়নি। বছরের পর বছর যে ভয়াবহ দুর্যোগ মাথায় নিয়ে খ্রীস্টধর্ম্ম জাপানে প্রসার লাভ করেছিল, যে উরাকামি চার্চের স্মৃতির পিছনে লুকিয়ে রয়েছে শুধু ঐকান্তিক চেষ্টা এবং অধ্যবসায়, খ্রীষ্টীয় জগতের সবচেয়ে উন্নত দেশ তারই উপর হানল চরম আঘাত। যে কয়টি ভাঙ্গা দেওয়াল বোমার ঘা খেয়েও দাঁড়িয়েছিল, জাপানী সরকার ভ্রাম্যমাণদের জন্য সেগুলিকে একই অবস্থায় রেখে দিয়েছে। এই চার্চের প্রাঙ্গনেই তৈরী হয়েছিল নাগাসাকি মিউজিয়ম।

ছবিগুলি যদিও তুলে ধরেছে চোখের সামনে আগষ্টের বীভৎসতা এবং আমাদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করছিল আর পাঁচ জনের মত, তবুও বীভৎসতার পুরো চেহারা মিলল ঘুরের উল্টোদিকে।

ডাক্তার আগরওয়াল বিস্মিত কণ্ঠে ডেকে বললেন—

ওদিকে কি দেখছেন? আণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ দেখতে চান তো এদিকে আসুন।

ডাক শুনে ফিরে দেখি ডাক্তার আপরওয়াল তন্ময় হয়ে দেখছে তাকের উপর সাজান কতগুলি পাথর এবং কাঁচের তৈরী বাসনপত্র। পাশেই ছিল ফ্রেমে আটা বিবরণ। এই বিবরণীতেই পরিচয় দেওয়া ছিল তাকের উপর সাজান জিনিষগুলির।

সবার উপরে ছিল বড় বড় কয়েকটা পাথরের চাই। গা সাধারণ পাথরের মত মসৃণ নয়। অনেকটা অবাক হয়েই হাত দিয়ে পরখ করলাম। পাথরের গায়ে জমে শক্ত হয়ে আছে ছোট ছোট ফুস্কুরি। জলবুদ্বুদের মত। ততক্ষণে নজর গিয়ে পড়েছে বিবরণীর উপর।

লেখক লিখেছেন—এ পাথরের টুকরোগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল উরাকামি চার্চ এবং অন্যান্য বাড়ীঘরের ধ্বংসস্তূপ থেকে। যে ভয়ঙ্কর উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর, তাতেই গলে গিয়েছিল পাথরের উপরকার অংশ। সেই বুদ্বুদ ঝড়ো হাওয়ায় ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে পাথরের মসৃণতাকে নষ্ট করে দিয়েছে চিরতরে।

উত্তাপে পাথর গলে গিয়েছে—ভাবতে গিয়েও শিউরে উঠলাম। বিশ্বাস হচ্ছিলনা কিছুতেই। হাত দিয়ে ছোঁয়া নিষেধ। তবুও আরেকবার পরখ করে দেখলাম গলিত পাথরের গা। কিন্তু আরও দেখার বাকী ছিল।

দ্বিতীয় তাকে সাজান ছিল কতগুলি অদ্ভুতাকৃতি কাঁচের বাসনপত্র। লম্বা, সুচাল বোতল হয়ে আছে বাটির মত। কিন্তু ভেঙ্গে যায়নি। কোনটার একদিক চেপ্টা অন্যদিক গোল। এই আকারের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লেখক বলছেন যে পাথর গলান তাপে কাঁচের জিনিষপত্রগুলির বোমার আঘাতে ভেঙ্গে যাবার বদলে আকার পালটে গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে ভাবছিলাম ওই আগষ্ট মাসে নাগাসাকি-বাসীদের চরম অবস্থার কথা। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ হিরোসিমাতে তিন দিন আগে হলেও সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে নাগাসাকির লোকদের দ্বিতীয় বোমা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তিন দিনের ব্যবধানে ঐ মারণাস্ত্র সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ জাপানীদের সম্ভব ছিলনা কোনরকম নিশ্চিত রক্ষাব্যবস্থা চালু করা। কাজেই নাগাসাকির ধ্বংসলীলা কোন অংশে কম হওয়ার কথা নয়। তবুও হিরোসিমার চেয়ে নাগাসাকির ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছিল তার একমাত্র কারণ নাগাসাকির প্রাকৃতিক পরিবেশ। সহরের মধ্যে দিয়ে বড় বড় পাহাড়ের শ্রেণী চলে যাওয়ার দরুণ বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা অনেকটা কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল। বোমার আগুনে পাহাড়ের একদিক যদিও ঝলসে গিয়েছিল অন্যদিকে কিন্তু ছোটখাট এবং জাপানীদের জীবনে অতি সাধারণ ভূমিকম্প ছাড়া কোনই আলোড়ন হয়নি। পর্বতপ্রমাণ বাধা সত্ত্বেও বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে এক মাইল দূরে যারা ছিল তারা যে শুধুই মৃত্যুকবলিত হয়েছিল তা নয়। ডাক্তার কিংবা এ্যাম্বুলেন্স্ গিয়ে তাদের কোন চিহ্নই খুঁজে পায়নি। মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টি—দুইই হয়ে গিয়েছিল একসঙ্গে।

কি শৃঙ্খলার ঢেউই না বয়ে যাচ্ছে জাপানীদের শিরায় শিরায়! ছবিগুলিই তার প্রমাণ। নিকাদোন্ বা আলো এবং আওয়াজ এ দুয়ের সমন্বয়ে যে বীভৎসতার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে আত্মরক্ষা অনেকেই করতে পারেনি। সকাল ১১টা ২ মিনিটে সুরু হয়েছিল ধ্বংসতাণ্ডব এবং তখনকার সরকারী নথিতে হিসাব লেখা হয়েছিল—নিহত একুশ হাজার। পাঁচ মাস পরে এই অঙ্কই দাঁড়িয়েছিল উনচল্লিশ হাজার। আহতের সংখ্যা তখন ছিল চল্লিশ হাজার। দ্বিতীয় দিনেই সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সামরিক বিভাগের সহায়তায় উদ্ধারকার্য্য সুরু করে। বাড়ীঘর রাস্তাঘাট—সবই ধ্বংসস্তূপে আচ্ছন্ন। তারই মাঝে এতটুকু

জায়গায় কয়েকটি কুড়েঘর তৈরী করে আহতদের প্রাথমিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। ডাক্তার এবং ওষুধ—দুটিই ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। জ্বালাযন্ত্রণা কারুরই কম ছিলনা। কিন্তু তাহলে কি হয়! আহতের দল লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অদ্ভুত সব বিকলাঙ্গদের পরীক্ষা করছে ডাক্তার। চোখমুখের ভাব দেখে মনে হয় তার ডাক্তারী জীবনে এ ধরণের বিকলাঙ্গদের তিনি কোনদিন প্রত্যক্ষ করেননি। দেরী হচ্ছে প্রতিটি রোগীকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে। কিন্তু তার জন্যে রোগীদের নেই কোন তাড়াহুড়া বা শৃঙ্খলাবিহীন আচরণ।

আণবিক বোমার বীভৎসতাকে উষ্ণীস করে জন্ম নিয়েছে এই মিউজিয়ম। তাই সবগুলি তলাতেই ছিল বীভৎসতার এই ধরণের সংগ্রহ। যতটা স্ফূর্তি এবং উত্তেজনা নিয়ে বেরিয়েছিলাম হোটেল থেকে তার সবই তলিয়ে গেল ধ্বংস-স্তূপের নীচে। জানিনা নাগাসাকিবাসীরা এ দুর্বিপাক কি করে সহ্য করেছিল। মাথা নীচু করে আমরা সবাই মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে এলাম।

ট্যাক্সি এবার ছুটে চলল পীস্ প্যাগোডা বা শান্তি স্তম্ভের দিকে। লড়াইয়ের শেষে এটা তৈরী করা হয়েছে। উঁচু একটা স্তম্ভের উপর আকাশের দিকে ডানহাতের তর্জনী তুলে বসে আছে পাথরের বিরাট মূর্ত্তি। তর্জনী নির্দেশ করে সবাইকে দেখাচ্ছে ধ্বংসের উৎস। ট্যাক্সি এবার নাগাসাকি উপসাগরের পাশ দিয়ে সোজা চলে এল ষ্টেশনে।

দুটোর সময় ট্রেন ছাড়বে হিরোসিমার দিকে। আধ ঘণ্টার মধ্যে খাওয়াপর্ব শেষ করে প্ল্যাটফর্মের গেটে এসে দেখি তিনটি গেট্ ধরে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর দল। গেটগুলি তখনও বন্ধ। বিদেশী বলে একটু বেপরোয়া হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম পাশের রেলকর্মচারীকে।

—আচ্ছা, কোন গাড়ীটা হিরোসিমার দিকে যাবে?

কোন কথা না বলে কর্মচারীটি আঙ্গুল দিয়ে দূরে দেখিয়ে দিল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ান গাড়ীটাকে।

রেলকর্মচারিটির ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে একটু ভয়ই হল। মহিলা দুজনকে নিয়ে কি হাঙ্গামাতে—ওতারুর হাঙ্গামায় পড়তে হবে? ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আট্ ঘণ্টা দু পা সম্বল করে? এখনেও কি সেই একশ' গজ দৌড়?

(ক্রমশঃ)

# এগমার্ক কী জন্যে?

আপনি সুন্দর রঙচঙে টিন দেখে ঘী কিনলেন, কিন্তু তাতে হয়তো ভেজাল আছে। বাসমতী চালের প্যাকেটে বা বস্তায় বেশ খানিকটা ধুলোবালি মেশানো থাকতে পারে। দেখতে তাজা, বড় বড় ডিম, আসলে হয়তো পচা।

● মন খুঁত খুঁত না ক'রে নিঃসন্দেহচিত্তে জিনিষ কিনতে হ'লে এগমার্ক ছাপ আছে কি না তা' দেখা উচিত।

**এগমার্ক ছাপ**

দেওয়া সব জিনিষের লেবেলে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ জিনিষের জন্য এগমার্ক ছাপ দেখে নিন।

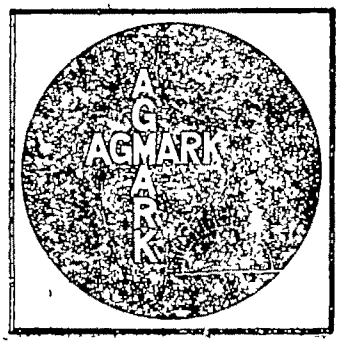


**এগমার্ক হ'ল**

উৎকর্ষের প্রতীক। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর এই গ্যারাণ্টী দেওয়া হয়।

৩৫৮ ৭০/৪৩০

পূর্বপ্রকাশিতের পর

# জাতীয়তার রূপায়ন

দীপঙ্কর

পুরাতন প্রসঙ্গে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা যাইতেছে। বাংলার বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহী যুবজনকে নিবেদিতা তাহার মনের হোমাগ্নির পবিত্র তাপে উত্তপ্ত করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

[ ভারত সন্ধানে : জওহরলাল নেহরু পৃঃ ৩১৩ ]

নিবেদিতা চাহিয়াছিলেন, বিপ্লবীদের চাহিতে শিখাইয়াছিলেন মানুষের ন্যায্য অধিকার, চাহিয়াছিলেন ইংরাজ শাসক ভারতীয় ন্যায্য অধিকারের ঘোষণাপত্র বিশ্ব সমক্ষে তুলিয়া ধরুক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইংরাজের তেমন সুমতি হয় নাই।

কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, সর্বসম্মতিক্রমে স্বল্পসংখ্যক কার্যই সম্পন্ন হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ও দেখা গিয়াছে যে, বাংলার বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ চরমপন্থীদল বয়কট্ প্রস্তাব আন্তরিকভাবে সমর্থন করিলেও সভাপতি মহামতী গোখলে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বয়কট্ কথাটীর বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে প্রতিশোধ এবং বিদ্বেষের ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষে নহে, বড়লাট কার্জন যে-ভাবে বাংলাকে খণ্ডিত করিয়াছে তাহাতে বাঙালীর পক্ষে বাংলা দেশেই বয়কট্ সমর্থনযোগ্য।

শোপেন হাওয়ার বলিয়াছেন, "মানুষ তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা তার ইচ্ছাধীন নহে।" তাই বিপ্লবীদের শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একধারা ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিত না হইয়া ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে নূতন নেতার নূতন অভিনয় আরম্ভ হইল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে নূতন পথে পদযাত্রা। জাতীয়তাবোধ হইতেই ইহার উৎপত্তি সুতরাং ইহা জাতীয় আন্দোলন নামের অন্তরালে অসহযোগ আন্দোলন নামে অভিহিত।

এই আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধীজী। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। সেখানে তিনি ভারতীয়দের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে যুদ্ধের এক নূতন কৌশল দেখাইয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার সেই নূতন কৌশল সত্যই অভিনব। ইহার নাম 'সত্যাগ্রহ', যাহার অর্থ সত্য এবং প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় করা এবং এই সত্যাগ্রহের শক্তিও অন্তরের পবিত্রতা এবং নিজস্ব সত্ত্বার সত্যতা হইতে উদ্ভূত।

স্বাভাবিকই ভারতের ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাতীয়তাবোধে তিনি যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন তাহাতে তাঁহার অস্ত্রও ভারতভূমির শাশ্বত ও সনাতন অস্ত্র অহিংসা। ভারতের বিগত জীবনের বহু মহাপুরুষের বিঘোষিত বাণী এই অহিংসাকেই মহাত্মাজী তাহার জীবনযুদ্ধের তীক্ষ্ণতম অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সারাজীবন উহা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

সময়ের হিসাবে এই সময়টী ছিল ১৮২১ সাল। সারা ভারতব্যাপী এই আন্দোলনেও বাংলার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

অসহযোগ !—কাহার সঙ্গে ?—ইংরাজ সরকারের সঙ্গেই। বিপ্লবীগণ বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উহারই উত্তাপে এদেশের মাটী হইতে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবার যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা বরণপণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাত্মাজী সেই ইংরাজ-রাজকেই তল্পি গুটাইয়া স্বদেশে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ের আঘাতে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘপত্রে লিখিয়াছিলেন,… "In this crisis, as a great leader of men, have stood among us to proclaim your faith in the ideal which you know to be that of India, the ideal which is both against the cowardliness of hidden revenge and the cowed submissiveness of the terror stricken. You have said, as Lord Buddha has done in his time and for all time to come…… conquer anger by the power of non-anger and evil by the power of good."

[ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩ ]

গান্ধীজীর এ-পথে তাঁহার অনুগামী সংখ্যা সংখ্যাতীত। বাংলার প্রত্যেকটী নদ-নদীর ঢেউয়ের সংগে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বেলিত মুক্ত তরঙ্গ, স্বদেশ প্রেমিক জনসাধারণকে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়াছিল। আইন পাশ করিয়া যাহারা স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় লিপ্ত ছিল তাহারা জীবিকা অর্জনের কথা মুহূর্তে ভুলিয়া সরকারের প্রতিষ্ঠিত আদালত বয়কট করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিল। মানুষের মনে তখন বিলাতীবর্জন নীতি নীতিগতভাবে বদ্ধমূল। ঘরে ঘরে চরখার পবিত্রধ্বনি। চরখা-জাত সূতায় স্বীয় হাতে উৎপন্ন কাপড় ছিল অবশ্য পরিধেয়। হাটে-বাজারে বিলাতী বর্জনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাদের পিকেটিং এবং সেই পিকেটিংএর অপরাধে বাংলা মায়ের অসংখ্য সন্তানের কারাবাস ছিল তখন নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু কারাবাস বা পুলিশের লাঠির ভয়ে ভীত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বীয় কাজে এতটুকু পশ্চাদপদ হয় নাই। তাহারা কারাবাস বরণ করিয়াছে, মুখে তাহাদের হাসি। সেই হাসিতে মাখা ঋষি বঙ্কিমের মাতৃপূজার অভয় মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'।

এই আন্দোলনে বাংলার মেয়েদের ভূমিকাও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ইহার কারণ, কংগ্রেসের আন্দোলনে মেয়েরা কোনদিনই পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই। সেই ধারাই সমপরিমাণে সমস্ত আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহার ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয়, ১৮৮৯ সাল বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের অধিবেশনে ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথের সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবী যোগদান করিয়াছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সাখি সমিতির' মাধ্যমে ভারতীয় নারী সমাজে দেশ প্রেমের বীজ বপন করিয়া উহাকেই উপযুক্ত পরিমাণে জল সিঞ্চন করিয়া জাতীয়তাবোধের বিশাল মহীরুহে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

উত্তর কালে ১৯২৮ সালেও এই ধারাকে অব্যাহতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঋষি অরবিন্দের অগ্রজ বিখ্যাত কবি মনমোহন ঘোষের কন্যা লতিকা ঘোষ ও অরু সেন প্রভৃতি বাংলার দেশ প্রেমিকা কন্যা ও ভগ্নিগণ আত্মসম্মানে সচেতন হইয়া দেশ প্রেমের একনিষ্ঠ পূজারিণী হইবার জন্য কাজ করিতে থাকেন।

( ক্রমশঃ )

# বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ৩৫ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৭


| লেখক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **অ** | | |
| ডঃ অশোক মিত্র | একটি স্মৃতি | ২১৯ |
| অর্ধেন্দু দত্ত | বাংলার মেয়ে লীলাদি (শ্রদ্ধাঞ্জলি) | ২৪১ |
| অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত | ব্যক্তিত্ব (উৎসর্গ : লীলা রায়) | ৩০১ |
| " " | ওঁরা দুই জন | ৩০১ |
| " " | সময় এবং কল্পলতা | ৪৪১ |
| অনিল ঘোষ | দিদি | ৩৫৩ |
| " " | (ধারাবাহিক রচনা) | ৪১১ |
| অমিতাভ দাস | রাজার আসার কথা ছিলো (কবিতা) | ৭১৮ |
| অচ্যুত গোস্বামী | ব্যর্থতা (বড় গল্প) | ৪৭৮ |
| অমিয় রায় | ঠিকানা নেই (গল্প) | ৪৯২ |
| অর্পণা সেন | নিত্যরঞ্জন গুপ্ত | ৯০৫ |
| **আ** | | |
| | আমাদের কথা | ৩৬৫; ৫৪১ |
| আশুতোষ গাঙ্গুলী | লীলা রায় | ৩৪৭ |
| আশাপূর্ণা লাহিড়ী | দিদিকে যেমন দেখেছি | ৫১১ |
| **ক** | | |
| কালীচরণ ঘোষ | ক্ষণজন্মা পুরুষ অরবিন্দ (রাজনৈতিক প্রবন্ধ) | ৯ |
| " " | বিস্ফোরণ (ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ) | ৭৯ ৩৭৩, ৪৩১ |
| কালীচরণ ঘোষ | বিস্ফোরণ (১৯১০) | ৫৫১ |
| " " | | ৫১৯, ৬৫৩ |
| " " | (১৯১৩) রাজনৈতিক প্রবন্ধ | ৭৪৯ |
| " " | বিস্ফোরণ ১৯১৪ (ধারাবাহিক রচনা) | ৭৭৯ |
| " " | জাগরণ ও বিস্ফোরণ | ৮৩১, ৮৮১ |
| কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত | কেরালার রায় | ৫৩৫ |
| " " | দিদি | ২২৩ |
| " " | এখন দরজাগুলো বন্ধ | ৪৪১ |
| কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ৬৯৩ |
| কণা রায় | মৈত্রেয়ী | ৩৫৮ |
| | যা কিছু পেয়েছি যাহা কিছু গেল চুকে (স্মৃতিকণা) | ৬৩৪ |
| | (কয়েকটি চিঠি : লীলা রায়ের লেখা) | ১৯৭ |
| **ক্ষ** | | |
| ক্ষণেশ ঘোষাল | নাস্ত পন্থা (প্রবন্ধ) | ৭৬১ |
| ক্ষিতীশদেব সিকদার | অনুষ্ঠান বর্জনের উৎসব | ৫৬৬ |
| **গ** | | |
| | গান্ধীজীর চিঠি | ১২৫ |
| গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় | আদিম বালক | ৪৪৪ |
| গৌরী বসু | শৈশবে ফিরে যাব (কবিতা) | ৬৫২ |

# বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ৩৫ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৭


| লেখক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **চ** | | |
| চারণিক | ভূতলোকে মহাকাল দর্শন | ৪২৩ |
| ” ” | গান গেয়ে যে খুঁজি তোমায় | ১০৫ |
| চিত্ত ঘোষ | বৃষ্টি হ ( কবিতা ) | ৩৮০ |
| **জ** | | |
| জয়ন্ত সাহা | চেতনায় মননের সেই অন্ধকার ( কবিতা ) | ৩৮১ |
| জ্যোতিরীশ চক্রবর্ত্তী | এমন কবিতা চাই (কবিতা) | ৬৩৮ |
| **ত** | | |
| অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন | পাবকশিখা রূপিণী | ৩১৯ |
| ” ” | নেতাজীর ভারত আবিষ্কার ( প্রবন্ধ ) | ১০৩ |
| **দ** | | |
| দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | কবিতা গুচ্ছ : | |
| ” ” | একদিন আমায় আমার অগোচরে নিয়ে গেছো | ২৭ |
| | এক রাত্রি ঘুম | ২৭ |
| | এক অজানা জনের জন্য | ২৮ |
| | গাছের প্রতীক | ২৯ |
| | পুরানো মানুষদের ভূত | ২৯ |
| | দেখেছি রূপোবাহিনী নদীজলে | ৩০ |
| | একদিন আমাদের | ৩১ |
| দীপঙ্কর | জাতীয়তার রূপায়ণ | ৬৩ |
| ” | ” (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) | ১১১ |
| ” | ” | ৫৮১ |
| ” | ” | ৬৩১, ৯১৯ |
| দক্ষিণারঞ্জন বসু | জয়শ্রী লীলা রায় | ২৪৫ |
| দীপকরঞ্জন মুখার্জী | লীলাদি স্মরণে | ৩৬০ |
| দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | তিনটি : ভাঙ্কোপোপা (অনুবাদ কবিতা) | ৪৪৭ |
| ” | ”প্রয়াণ রাত্রি ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ | ৩৫৭ |
| দুর্গাপদ দাস | পিসি | ৫১৫ |
| দেবদাস জোয়ারদার | সার্ধ শত বর্ষের আলোয় বিদ্যাসাগর | ৪১৫ |
| **ধ** | | |
| অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য | বিদেশী ঋণের পরিশোধ : | |
| ” ” | জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন (প্রবন্ধ) | ১৭ |
| ” ” | দাম-স্তর আর মজুরির চলমান সিঁড়ি (অর্থ নৈতিক প্রবন্ধ) | ৬৭১ |
| ” ” | মজুরী স্থিরীকরণের সমস্যা ( অর্থ নৈতিক প্রবন্ধ ) | ৮১৯ |
| ” ” | মজুরী নির্ধারণের সঙ্গত নীতি | ৮৫৭ |

# বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ৩৫ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৭


| লেখক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **ম** | | |
| ননীগোপাল দেব | স্মৃতির ভিড় থেকে | ২৬৩ |
| নিশীথনাথ কুণ্ডু | মৃত্যু বিজয়িনী দেশ নেত্রী লীলা রায় | ২৯১ |
| নরেন্দ্রনাথ মিত্র | লীলা রায় | ২৯৯ |
| নারায়ণ চৌধুরী | স্মৃতি তর্পণ | ৩৪৭ |
| নচিকেতা ভরদ্বাজ | শেষ প্রার্থনা | ৩৫৫ |
| ” ” | তোমার মুখের দিকে | ৪৪৩ |
| ” ” | কোন কোন বৃক্ষ থেকে (কবিতা) | ৬৩৭ |
| ” ” | তেইশে জানুয়ারীর স্বাগত চিন্তা | ৭৬০ |
| ” ” | প্রণাম | ৫৬৬ |
| নন্দ মুখার্জি | জার্মানির চোখে নেতাজী (অনুবাদক : পথচারী) | ৭৮৭ |
| নিকুঞ্জ সেনগুপ্ত | লীলাদির স্বপ্ন | ২২৯ |
| N. G. Goray | An Humble Homage | ২০২ |
| **প** | | |
| স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী | হে নারি | ১২৬ |
| ” ” | হে ত্রস্ত নাবিক ! (কবিতা) | ৫৯৭ |
| পথচারী | অনিল রায় ( আলেখ্য ) | ১৯১ |
| প্রভা দত্ত | শ্রদ্ধেয়া লীলাদি | ২৩৪ |
| প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় | মনস্বিনী লীলা রায় | ২৫৭ |
| পুলকেশ দে সরকার | বিপ্লবী প্রতিমা লীলা রায় | ২৬৭ |
| প্রভাতচন্দ্র নাগ | দিদিকে যেমনটি দেখেছি ( কণিষ্ঠের চোখে ) | ২৮৭ |
| প্রীতি চট্টোপাধ্যায় | লীলা (সহপাঠীর দৃষ্টিতে) | ২৯৩ |
| প্রবীরকুমার গুপ্ত | পিসির উদ্দেশ্যে | ৩৫৯ |
| পবিত্র কুমার ঘোষ | জয়শ্রী ও সুভাষচন্দ্র | ৩২৩ |
| ” ” | সুভাষবাদ ( আলোচনা ) | ৫২৭ |
| ” ” | ” | ৫৫৯ |
| ” ” | ” ৬১১, | ৬৪৭ |
| ” ” | ” ৭২৫, | ৮৩৯ |
| | ‘পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমস্তে’ | ৭০১ |
| | পত্রাঞ্জলি | ৩৬৩ |
| **ল** | | |
| প্রভাষ মজুমদার | জোনাথন্ সুইফট : একটি বিতর্কিত প্রতিভা ( আলোচনা ) | ৪৯৪ |
| প্রভাকর মাঝি | ঈশ্বরের বিকল্প (কবিতা) | ৫৬৪ |
| ” ” | কাত্যায়নী ( কবিতা ) | ৬৫২ |
| প্রফুল্ল কুমার দত্ত | সূর্যটার কাছে | ৪৪৫ |

# বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ৩৫ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৭


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **ব** | | |
| | বজ্রবাণী | ২ |
| বারিন বর্দ্ধন | জাপানের দিনগুলি (ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী) | ৫৭ |
| ,, ,, | | ১০৫, ৪০৩, ৫৭৫, ৬২৯, |
| ,, ,, | | ৬৯৫, ৭৯২, ৯১৩ |
| বিজয় কুমার দত্ত | সাহিত্যের লক্ষ্যহীন যাত্রা (আলোচনা) | ৫১ |
| ,, ,, | চিরন্তন দ্বন্দ্বে | ৪৪৫ |
| বাসুদেব দেব | অবেলার সিঁড়ি (উপন্যাস) | ৯৭ |
| ,, ,, | | ৫৯১, ৪৬৩ |
| বিভা সরকার | অবিস্মরণীয় মহাপ্রাণ | ২৫৯ |
| বিশ্বনাথ রায় | শ্রদ্ধাঞ্জলি | ২৭৩ |
| বিজয়কুমার নাগ | অনন্তের হাতছানি | ২৭৫ |
| বিজয়কুমার ঘোষ | নতুন লেখকের চোখে | ২৮৫ |
| ,, ,, | গুণ্ডা (গল্প) | ৪৮৬ |
| বেণুগোপাল রায় | মরমী বন্ধু ক্ষিতীশ রায় | ৮৯৭ |
| বলেশ্বর রায় | দিদি : যাঁকে ভুলতে পারি না | ৩০৯ |
| **ভ** | | |
| অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী | পিসির কথা | ২১১ |
| ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় | প্রশান্ত শরন | ২২৭ |
| **ম** | | |
| মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় | কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস) | ৪৫ |
| মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় | কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস) | |
| ,, ,, | | ৩৯৯, ৫০১, ৫৬৭, ৬২৩ |
| ,, ,, | | ৬৮৫, ৮১১, ৮৬৩, ৯০৭ |
| মহাকাল | নিবসিষ্যসি মযোব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয় | ১২৩ |
| মধুসূদন চক্রবর্তী | লীলাদিকে যেমন দেখেছি (সাংবাদিকের চোখে) | ২৩৭ |
| মঞ্জুষ দাশগুপ্ত | স্মৃতি তর্পণ | ৪৪৬ |
| মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | কি জানি কেমন আছি আজ | ৪৪৭ |
| মানস রায় চৌধুরী | ক্ষয় ক্ষতি | ৪৪৪ |
| **য** | | |
| যোগেশচন্দ্র বাগল | স্মৃতি-কথা | ৩০৭ |
| **র** | | |
| ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার | লীলা রায় | ২০৬ |
| রাতুল রায় চৌধুরী | একে একে নিভিছে দেউটি | ৩০৫ |
| রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার | জয়শ্রী'র বিজয়িনী ভূমিকা | ৩৩৫ |
| ,, ,, | উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য | ৫৮৭ |
| রামকৃষ্ণ চন্দ | মাধবী ও সে (গল্প) | ৫১৯ |
| রবি রায় | তরুণের স্বপ্ন (প্রবন্ধ) | ৬০৭ |
| ,, ,, | ,, ,, | ৬৬১ |

# বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ৩৫ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৭


| লেখক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| রবি রায় | সুভাষচন্দ্র ও ভারত চিন্তা | |
| ,, | (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) | ৭৪১ |
| | | ৮০৩, ৮৪৭, ৮৮৯ |
| **ল** | | |
| | লীলা রায় (সংক্ষিপ্ত জীবনী) | ১৩১ |
| লীলা রায় | আমার কথা | ১২৭ |
| **শ** | | |
| শকুন্তলা রায় | স্মৃতি-চারণ | ২০৭ |
| | শোকপ্রস্তাব | ১১৭ |
| অধ্যাপিকা শান্তিসুধা ঘোষ | | |
| | লীলাদি স্মরণে | ২১৭ |
| শৈলেশ রায় | শ্রদ্ধাঞ্জলি | ৩০৩ |
| শান্তি লাহিড়ী | মাকে ভাবতে যেমন (কবিতা) | ৩৭৮ |
| শিবদাস চক্রবর্ত্তী | কুম্ভকর্ণ | ৪৪২ |
| শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় | বকুল ঝরে যায় | ৪৪২ |
| শান্তশীল দাশ | শেষ নমস্কার | ৩৫৭ |
| ,, ,, | বিস্ময় | ৪৪৫ |
| ,, ,, | হে মহানায়ক এস | ৭৬০ |
| শচীন্দ্রনাথ বসু | অনামী (বড় গল্প) | ৪৪৯ |
| ,, ,, | ইচ্ছা ( গল্প ) | ৭৯১ |
| শংকর দে | যুক্ত প্রতিনিধি | ৫৬৪ |
| **স** | | |
| | সুভাষ বাণী | ১ |
| সুনীল দাস | দীপ নিভে গেছে | ৭১ |
| | সরোজিনী নাইডুর বাণী | ১২৪ |
| সুরজিৎ দাশগুপ্ত | বাংলা ছোট গল্পের মানচিত্র : ৯ | |
| ,, ,, | ( প্রবন্ধ ) | ৩৩ |
| | বাংলা ছোট গল্পের মানচিত্র : ৯ | |
| | ( ধারাবাহিক আলোচনা ) | ৮৭ |
| ,, ,, | ,, | ৩৮৯ |
| সুজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় | কবি-কাহিনী (কবিতা) | ২৫ |
| ,, ,, | প্রাচীন ভারতের সাম্যবাদ (কবিতা) | ৮২৭ |
| | সম্পাদকীয় ৫, ১১৮, ৩৬৭, ৫৪৩, ৫৯১, ৬৪৫, ৭৭১, ৮২৩, ৮৭৩ | |
| ডঃ সরোজেন্দ্র নাথ রায় | শ্রীমতী লীলা রায়-প্রয়াণ | ২০৫ |
| সুবোধ বসু | বজ্রকুসুম | ২২১ |
| সুবোধ রায় | অদ্বিতীয়া লীলাদি | ২৪৩ |
| সুরমা বসু | স্মৃতি-চারণ | ২৫১ |
| সুষমা সেনগুপ্ত | শ্রীযুক্তা লীলা রায় | ,, |
| | ( কলেজ জীবনের স্মৃতি ) | ২৯৭ |
| সাগরিকা ঘোষ | মহালগ্নঃ শোকযাত্রা | ৩১৫ |
| সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত | প্রতিদিনই | ৪৪৫ |
| সামসুল হক | প্রতিদ্বন্দ্বী | ৪৪৬ |
| স্বদেশ রঞ্জন দত্ত | নিলিপ্ত দর্শক ১৯৭০ | ৪৪৬ |
| সুনীল বসু | যাঁর কর স্পর্শেঃ | ৫৬৩ |
| সুভাষচন্দ্র বসু | অপ্রকাশিত ইংরাজী অভিভাষণ (টোকিও ৮ই নভেম্বর ১৯৪০) | ৭১৭ |
| **হ** | | |
| হেলেনা দত্ত | প্রণাম | ২৫৫ |
| H. V. Kamath | Leela Roy as I knew Her. | 200 |


( সম্পাদক : সুনীল দাস )

২০৯ বি, বিধান সরণিস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নেতাজী প্রসঙ্গে কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

## সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং

নেতাজীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে তার বৈপ্লবিক পরিকল্পনার কথা এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করার প্রয়াস আজ পর্যন্ত কোনও লেখকের মধ্যে দেখিনি। —দেশ

এমন একখানি বই সহজেই আমাদের হাতে আসবে তা যেন ভাবিনি।....এমন অভিজ্ঞ, অনুসন্ধিৎসু ও বিচারশীল লেখক বর্তমানে অল্পই আছেন। যুগবাণী

দাম ৬·০০ বাঁধাই ৭·০০

নন্দ মুখোপাধ্যায়

**নেতাজী থ্রু জারমান লেনস্** (এ নিউ ডিসকভারী) বইটিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে একটি দুষ্প্রাপ্য দলিল বললে অত্যুক্তি হয় না। —দেশ

দাম ৩·০০

শচীন্দ্রনাথ বসু

**প্রাগৈতিহাসের মানুষ** : রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

সৃষ্টি থেকে সভ্যতা পর্যন্ত মানুষের কাহিনী ৮·০০

পবিত্রকুমার ঘোষ : সুভাষচন্দ্র ৯·০০, অনিল রায় : নেতাজীর জীবনবাদ ১·৫০, সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ ২·৫০, গান্ধীবাদ অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ ০·৫০, What Netaji Stands for ০·৫০, সুভাষচন্দ্র বসু : বিপ্লব কি ০·২০, নেতাজীর বাণী ০·২০, Revolution What it is ০·২৫ বঙ্গ আমার জননী আমার : সুভাষচন্দ্র বসু ০·২০, লীলা রায় : এ আমরা সইব না ০·১৫, সুনীল দাস : ভূমিসমস্যা ০·২০ কালীচরণ ঘোষ : মাতৃমন্ত্র, দেশাত্মবোধক সংগীত সংকলন ১·৫০, শচীন্দ্রনাথ বসু : শনিবারের সন্ধ্যায় ৬·০০, বিশ্বসভ্যতায় বাংলার বিশেষ দান : সুভাষচন্দ্র বসু (যন্ত্রস্থ)।

জাতীয়তাবাদী গ্রন্থপঞ্জী ০·১৫

**নেতাজী সম্বন্ধে জানতে হলে 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকা পড়ুন**

**প্রকাশক** : জয়শ্রী প্রকাশন, ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিঃ ২৬।

**প্রাপ্তিস্থান** : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

বোস এণ্ড সন্স, পি ২১/২২ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন।

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোম
আমার এই অপরূপ লা

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

সাধনা

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with P
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose